

କ୍ରିଷ୍ଣଚରଣଗୋସାଇଁ ଜୟତ:



୧୬ଶ ବର୍ଷ } ଫାଲ୍‌ଗୁନ, ୧୩୭୦ { ୧ମ ସଂଖ୍ୟା



ଶ୍ରୀପିଛଳନା ଗୋଡ଼ାୟ ଯଥେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଗଣ

କଳ୍ପେ ଶ୍ରୀଗୌର-ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ୧୨ କଳ୍ପେ ଶ୍ରୀରାଧା-ବିନୋଦବିହାରୀଜୀଉ

ସମ୍ପାଦକ—ବ୍ରଜଦିଗ୍‌ମ୍ୟାମୀ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଯତ୍ ଭକ୍ତିକୁଶଳ ନାରସିଂହ ମହାରାଜ

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ—ଶ୍ରୀଦେବାବଳ ଗୋଡ଼ାୟ ଯଥେ, ତେସରିମାଡ଼ା, ନବସିପ (ନନ୍ଦୀୟା)

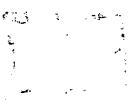
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

ষোড়শ বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাক্ষ ৪৭৭ গোবিন্দ হইতে ৪৭৮ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৭০ ফাল্গুন হইতে ১৩৭১ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৪ মার্চ হইতে ১৯৬৫ ফেব্রুয়ারী]



প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

প্রকাশক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

বার্ষিক ভিক্ষা—৫.০০ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণুদেবত মহারাজ

—(*)—

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত স্বামী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমস্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত নিমাইচরণ ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীহরি ব্রহ্মচারী, ভক্তিপ্রতাপ

পণ্ডিত শ্রীযুত ভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্ত্যুৎসাহ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজ-কর্তৃক নবদ্বীপস্থ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে মুদ্রিত।

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অকিঞ্চনের অকিঞ্চন [কবিতা]	৪।১৩৫
২। অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ্ প্রভু—পরলোকে শ্রীপাদ	৭।২৭৯
৩। অন্নকূট-মহোৎসব—[বিবরণ]	৯।৩৫৯
৪। অপরাধী [কবিতা]	৬।২১১
৫। অবতার-তত্ত্ব [প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১১।৪১১
৬। আউলাদি মত কি শুদ্ধ ? [পত্রে প্র এবং তত্ত্ব]	৯।৩৪৮
৭। আদৌ গুরু-পদাশ্রয়	৩।১০৯
৮। আমিষ-নিরামিষ [“জনবাণী” পত্রিকার সমালোচনা— শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৩।১০৯ ১০।৩৬৬
৯। আরাধ্য, আরাধক ও আরাধনা	৫।১৮৫
১০। আর্তি-নিবেদন [প্রবাসে অবস্থানকালে-কবিতা]	৪।১৪৫
১১। আলোচকের আলোচনা [“হিতবাদী” পত্রিকার সমালোচনার প্রতিবাদ—শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৩।৮৪ ৩।৮৪
১২। উৎসব-সমীক্ষা [শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বার্ষিক প্রতিষ্ঠা মহোৎসব ; পিছলদা, কালনা ও চুঁচুড়া মঠে শ্রীস্নানযাত্রা ; চুঁচুড়া, নবদ্বীপ, মথুরা মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ- মহোৎসব, চুঁচুড়া মঠে শ্রীশ্রীরথযাত্রা মহোৎসবদির বিবরণ]	৬।২৩৮
১৩। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব—শ্রীল (চুঁচুড়ায়)	১১।৪৩৯
১৪। উর্জরতে কলিকাতায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ—[বিবরণ]	৯।৩৫৮
১৫। এখন উপায় কি ! [বিষ্ণু-বৈষ্ণব-ভক্তিবিরোধী- সমালোচনা]	৯।৩৫৫
১৬। কৃষ্ণই পরতত্ত্ব [কবিতা]	৭।২৫৪
১৭। কৃষ্ণতত্ত্ব—শ্রী [প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৮।২৯০, ৯।৩৩১, ১০।৩৬৯
১৮। কৃষ্ণধাম—স্বরূপ ও তত্ত্ব [প্রশ্নোত্তর—ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৬।২০৯
১৯। গুপ্ত বৃন্দাঙ্গন [নবদ্বীপস্থ অন্তর্দ্বীপ, কোলদ্বীপাদির মহিমা]	১০।৬৮৩
২০। গোপালচম্পু [গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ স্থতীপত্র]	৭।২৬৭
২১। গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ—শ্রীমদ্ [কবিতা]	১০।৩৯২
২২। গোবর্দ্ধন-পূজা ও বিরাট অন্নকূট মহামহোৎসব—শ্রীশ্রী	১১।৪২১
২৩। গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব—শ্রীল	৯।৩১০
২৪। গৌর-জন্মভূমি শ্রীধাম-মাথাপুর ও শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা—শ্রীশ্রী [প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১।১০ ১।১০
২৫। গৌর-জন্মলীলা—শ্রীশ্রী [কবিতা—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী]	১।১৪
২৬। গৌর-শক্তি ও অপ্রাকৃত রস-বৈশিষ্ট্য—শ্রীশ্রী [প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	২।৫৪

- ২৭। গৌরসুন্দর ও তমহিমা—শ্রীশ্রী [প্রণোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ
ঠাকুর] ২।৫২
- ২৮। গৌরসুন্দরের রজক উদ্ধার—শ্রীশ্রী [কবিতা] ২।৫৭, ৩।২৪
- ২৯। গোড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠি—শ্রী [সংস্কৃত পরীক্ষার ফলাফল] ১২।৪৫৬
- ৩০। গোড়ীয়ের ষোড়শ বর্ষ ১।৩৭
- ৩১। জন্মাষ্টমী-প্রদর্শনীতে সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ
[নবদ্বীপ মঠে] ৭।২৭৫, ৮।৩০৭
- ৩২। জীব গোস্থামিপাদের তিরোভাব-তিথিতে অভিভাষণ—শ্রীল
[প্রাকৃত সহজিয়াবাদ-নিরাস ও বিগুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম] ১।২০, ২।৬৫
- ৩৩। জ্ঞান-ই অজ্ঞান ৬।২২৫
- ৩৪। দামোদর ব্রতারণ—শ্রী (বিবরণ) ২।৩৫৮
- ৩৫। দর্শনে ভ্রান্তি [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১।৫
- ৩৬। দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব—শ্রী [শ্রীনবদ্বীপ মঠে] ১।১৪৩৮
- ৩৭। দেহারামীর ভব-ব্যাপি ও তদুপশম-প্রয়াস ১২।৪৬২
- ৩৮। ধর্ম-ব্যবধের ইতিহাস [বরাহ-পুরাণাবলম্বনে] ১২।৪৫২
- ৩৯। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [শ্রীধাম-
মাহাত্ম্যসহ পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-বিবরণ] ৩।১১৭, ৪।১৪৭
- ৪০। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী [পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র] ১।১৪২৩
- ৪১। নবদ্বীপ-শতক—শ্রীশ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত পদ্যানুবাদ]
৬।২২২, ৭।২৭১, ৮।৩০৫, ৯।৩৪৬, ১০।৩৭২, ১১।৪১৫
- ৪২। নবদ্বীপ-শতক—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-
গোস্থামিপাদ বিবচিতম্] ৫।১৬১, ৬।২০১, ৭।২৪১, ৮।২৮১,
৯।৩২১, ১০।৩৬১, ১১।৪০১
- ৪৩। নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসবে শ্রীল
আচার্যদেব—শ্রীল (আনন্দপাড়ায়) ১২।৫৮০
- ৪৪। নারায়ণ-স্তব দশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীমার্কণ্ডেয়-কৃতম্] ১২।৪৪১
- ৪৫। নির্য্যাণ [শ্রীপাদ হরিধন দামাধিকারী প্রভুর] ৭।২৮০
- ৪৬। নির্য্যাণ-সংবাদ [শ্রীপাদ ভক্তসেবক ব্রজবাসী প্রভুর] ৪।১৫৭
- ৪৭। নৃসিংহ-হয়গ্রীব-স্তব-দ্বাদশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীপ্রহ্লাদ-
ভদ্রপ্রবা-কৃতম্] ১।১
- ৪৮। ঠাকা-বোকার স্বরূপ [“হিতবাদী” পত্রিকার সমালোচনার ২য়
প্রতিবাদ — শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৪।১২৩
- ৪৯। পরলোকে শ্রীপাদ অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ প্রভু ৭।২৭২
- ৫০। পিতার আদর্শ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন ? [আসনবনিত্তে শ্রীল
আচার্যদেবের বক্তৃতা] ১০।৩৯৯
- ৫১। পুরুষোত্তম-ধাম ও শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্্তন-ভজন—শ্রী [প্রণোত্তর—
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৭।২৪৯

- ৫২। প্রচারকের ডায়েরী [সুন্দরবনাঞ্চলের অন্তর্গত মইগীঠ বিনোদপুরের]
 ১।৩৪, ২।৭২, [নদীয়ার শান্তিপুর অঞ্চলের] ৩।১০০, [মেদিনী-
 পুরের অন্তর্গত গড়ের রাজবাড়ী প্রভৃতি স্থানের] ৮।৩১৪
- ৫৩। প্রচার-প্রসঙ্গ [আসামের গোলোকগঞ্জ, বঙ্গাইগাঁও, চড়াই-
 খোলা, ধুবড়ী, সাপটগ্রাম, ফকিরাগ্রাম, গোসাইগাঁও, তাঁমারহাট,
 পশ্চিম-বঙ্গের আলিপুরদুয়ারে] ৯।৩২০০, শিলিগুড়িতে] ৯।৩৬০
- ৫৪। প্রচার প্রসঙ্গ [সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত আসনবনি, সারসা-
 জোলে] ৪।১৫০, [রাজধন্দ, পলাশী, বারমাসিয়া, ধাদিকা,
 কুমড়াবাদ, ছমকা প্রভৃতি স্থানে] ৫।১৯৫
- ৫৫। প্রচ্যুয়-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীলক্ষ্মীদেবী-কৃতম্] ২।৪১
- ৫৬। প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রদত্ত উত্তর—শ্রীশ্রীগৌর
 জন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা] ১।১০ ;
 [শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও তন্মহিমা] ২।৫২ ; [শ্রীশ্রীগৌরশক্তি ও অপ্ৰাকৃত
 রস-বৈশিষ্ট্য] ২।৫৪ ; [বেদানুগক্রম ও বেদবিরুদ্ধ অপসম্প্রদায়
 ৩।৮৭, ৪।১২২, ৫।১৭০ ; [শ্রীকৃষ্ণধাম—স্বরূপ ও তত্ত্ব] ৬।২০৯ ;
 [শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম ও শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন-ভজন] ৭।২৪২ ;
 [শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব] ৮।২৯০, ৯।৩৩১, ১০।৩৬৯ ; [অবতার-তত্ত্ব] ১১।৪১১
- ৫৭। প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ-নিরাস ও বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম [শ্রীল জীব-
 গোস্বামিপাদের তিরোভাব-তিথিতে অভিভাষণ] ১।২০, ২।৬৫
- ৫৮। বঞ্চিতা আমি [কবিতা] ২।৭১
- ৫৯। বরাহদেব-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীপৃথ্বীদেবী-কৃতম্] ৪।১২১
- ৬০। বর্তমানে সমাজ-উন্নয়ন-চেষ্টার স্বরূপ [ধাদিকায় শ্রীল
 আচার্য্যদেবের বক্তৃতা] ৬।২৩৪
- ৬১। বর্তমান সমাজ ও নিরাকারবাদ [সারসাজোলে শ্রীল
 আচার্য্যদেবের বক্তৃতা] ১০।৩৯৫
- ৬২। বাঙা-পূরণ [কবিতা] ৮।৩৩৫
- ৬৩। বিবিধ সংবাদ—[চাতুর্মাশ্য ব্রত, শ্রীকুলন্যাত্রা, শ্রীবলদেব-
 আবির্ভাব-ব্রতোপবাস, শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব,
 শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-প্রদর্শনী] ৭।২৭৩
- ৬৪। বিরহ-তিথি—[নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে
 শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের] ১১।৪৩৮
- ৬৫। বিরহ-বার্তা [শ্রীগোড়ীয়-সম্প্রতি শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী
 মহারাজের নিশাস্তলীলায় প্রবেশ] ৬।২৩৫
- ৬৬। বেদানুগক্রম ও বেদবিরুদ্ধ অপসম্প্রদায় [প্রশ্নোত্তর—শ্রীল
 ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৩।৮৭, ৪।১২২, ৫।১৭০

- ৩৭। ব্যাসপূজা কাহাকে বলে ?—শ্রী ২।৭৪
- ৬৮। ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ] ২।৮০
- ৬৯। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [অনুষ্ঠান-স্বচীসহ নিমন্ত্রণ-পত্র] ১০।৪০০
- ৭০। ব্যাসপূজায় ভক্তি-অর্থ্য—শ্রী ২।৭৭
- ৭১। ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুর—শ্রীশ্রীমদ্ [কবিতা] ৮।২৯৫
- ৭২। ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদের ছমকা-জিলার বিভিন্ন
স্থানে প্রচারের সারমর্ম [আসনবনি, সারসাজোল, ধাদিকা
প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা] ৬।২৩৩, ১০।৩৯৫
- ৭৩। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব—শ্রীল (বিবরণ) ৮।৩১৮
- ৭৪। ভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্কৃতি গোস্বামী ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব—
শ্রীশ্রীমদ্ [সিদ্ধবাটী মঠে] ১।১৪২৯
- ৭৫। ভক্তের লক্ষণ—[কবিতা] ৩।১০৩
- ৭৬। ভগবদ্-রসতত্ত্ব—[প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১২।৪৫০
- ৭৭। ভাগবত-বিবৃতি—[শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৬।২০৫
- ৭৮। ভারত-তীর্থ দর্শন [শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, তিরুপতি বালাজী] ৩।১১৩
- ৭৯। ভ্রম-সংশোধন ১০।৩৯৯
- ৮০। মংগল-কুর্মদেব-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং মনু-অর্থ্যমা-কৃতম্] ৩।৮১
- ৮১। মধ্বাচার্য্যের শুভ আবির্ভাবোৎসব—শ্রীল (বিবরণ) ৮।৩২০
- ৮২। মহাভারতের আবির্ভাব-কাল ও ইতিবৃত্ত ১।২৪
- ৮৩। মানব কে ? [সারসাজোলে শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা] ৬।২৩৩
- ৮৪। মায়ামুক্ত জীব [কবিতা] ৫।১৭৭
- ৮৫। রথযাত্রায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৪।১৫৯
- ৮৬। টেটমেণ্ট—[ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের
রেজিষ্টারী সংক্রান্ত আইনমতে প্রকাশিত] ১।৪০
- ৮৭। সনাতনের বন্ধন মোচন—[পঞ্চাঙ্ক নাটিকা] ৬।২১৮, ৭।২৫৯,
৮।৩০০, ৯।৫৪০, ১০।৩৭৭, ১১।৩২৫, ১২।৪৫৭
- ৮৮। সন্দর্ভ-সার—[শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ-২১] ১।১৬, [২২] ২।৬১, [২৩]
৩।৯৭, [২৪] ৪।১৩৭, [২৫] ৫।১৭৯, [২৬] ৬।২১২, [২৭]
৭।২৫৬, [২৮] ৮।২৯৭, [২৯] ৯।৩৩৭, [৩০] ১০।৩৭৪, [৩১] ১১।৪১৮
- ৮৯। সন্ন্যাসী—[কবিতা—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১।৩০
- ৯০। সভাপতি-মহোদয়ের অভিভাষণ [জন্মাষ্টমী-প্রদর্শনীতে] ৭।২৭৫, ৮।৩০৭
- ৯১। সমিতি-সমাচার [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসব-

শ্রীবিষ্ণুরূপ মহোৎসব, শ্রীল মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব] ৮।৩১৮,
[শ্রীদামোদর ব্রত, উর্জ্জব্রতে কলিকাতায় প্রচার, অনুকূট-
মহোৎসব, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব-

সব ৯।৩৫৮, [বিরহ-তিথি] শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের), শ্রীদেবানন্দ
গৌড়ীয় মঠে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয়
মঠে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব] ১১।৪৩৮

- ৯২। সাত্তত শ্রাদ্ধ—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও আলমবাজারে
[গদামধুরানিবাসী শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার দাসাধিকারীর জ্যেষ্ঠা
মহাশয় ও আলমবাজার-নিবাসিনী শ্রীমতী অমলারানী বসুর স্বামী
স্বরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের] ১১।৪৩৯
- ৯৩। সাত্তত-শ্রাদ্ধ ও কৰ্ম্মজড়-স্মৃতি [পত্রে প্রশ্ন এবং তাহার সহতর
—শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ২।৪৪
- ৯৪। সাধুসঙ্গ ৩।১০৬
- ৯৫। সাধুসঙ্গ ও গুরু-তত্ত্ব ৪।১৪২
- ৯৬। সাধুসঙ্গে তীর্থ-দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ—[সংক্ষিপ্ত ভারত-তীর্থের
তালিকা ও নিয়মাবলীসহ নিমন্ত্রণ-পত্র] ৬।২২৩
- ৯৭। সাময়িক-প্রসঙ্গ [কলিপঞ্চকসেবী, গুরুক্রম, বৈষ্ণবক্রম, জাতি
গোষ্ঠামিগণের মতবাদ-নিরসন—শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৫।১৬৭ ;
[অনিত্যবস্তুতে প্রেমধর্মের আরোপ, গৌড়ীয় ও অগৌড়ীয়ে
পার্থক্য, বৈষ্ণবের বেষ্ণ, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের পার্থক্য-বিচার]
৭।২৪৬ ; [“গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম” গ্রন্থের সমালোচনা, দীক্ষাবিধান
ও ভূতগুহা, “অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর,” “জীবের
স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস” বিষয়ের আলোচনা] ৮।২৮৭, [ভোগ-
বাদ ও ত্যাগবাদ, গতানুগতিক মতবাদ, জীবত্বকৈকবাদ নিরসন
বিশুদ্ধ ভক্তিবাদ বা নিত্যধর্ম স্থাপন, সাম্প্রদায়িকতার অণব্যখ্যা
ও সংসম্প্রদায়ানুগত্যের মহিমা-বর্ণন] ৯।৩২৫ ; [“জিনবাণী”
পত্রিকার প্রতিবাদ] ১০।৩৬৬
- ৯৮। সিদ্ধগাটী গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের সপ্তবিংশ-বার্ষিক
[বিরহ মহোৎসব] ১১।৪২৫
- ৯৯। সূত্র-বিবেচ—[“ভারতবর্ষ” পত্রিকার “অকালমৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ”
প্রবন্ধের সমালোচনা]—শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১১।৪০৯, ১২।৪৪৫
- ১০০। স্বাধীনতা [কবিতা] ১২।৪৫১
- ১০১। ‘হিন্দু’-শব্দের তাৎপর্য—[আসনবনিতে শ্রীল আচার্যদেবের বক্তৃতা]
৬।২৩৩

শ্রীল নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব উৎসবে শ্রীল আচার্যাদেব

বিগত ৮ই মাঘ পৌষী কৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে ২৪ পরগণার বনগাঁর নিকট-বর্তী আনন্দপাড়ায় শ্রীল নরহরি সেবা-বিগ্রহ প্রভুর বার্ষিক তিরোভাব-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পূর্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্র উৎসবকারী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু মহাশয়ের একান্ত আস্থানে দ্বাদশ-মূর্ত্তি বৈষ্ণব-সহ শ্রীল আচার্যপাদপদ্ম তথায় শুভবিজয় করেন। নির্দিষ্ট দিবসে বিবিধ বিরহ-ব্যঞ্জক কীর্তনাদির মধ্যে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য অর্চনান্তে তৎপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হয়। এতদুপলক্ষ্যে ঐ দিবস সকাল ১০ ঘটিকায় একটী মহতী সভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্যাদেব তাহাতে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভান্তে সমাগত সকলকেই (প্রায় ১৩১৪ শত) আকর্ষণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। গোপালবাবুর পিতৃদেব ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয় উভয়েই জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রিত হইলেও গোপালবাবু প্রতি বৎসরই এই তিথি বিশেষ আগ্রহের সহিত পালন করেন। “দীক্ষিত হইয়া ভজে তুয়া পদ, তাঁহারে প্রণতি করি। অনন্তভজনে বিজ্ঞ যেই জন, তাঁহারে সেবিব হরি॥”—এই শাস্ত্রবাণী তাঁহার আচরণে পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অসামান্য ব্যক্তিত্ব আমরা ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি। আরও বিপুল-ভাবে তাঁহার সেবা করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট হইতে সংগোষ্ঠী গোপালবাবু করুণা লাভ করুন—ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বলা বাহুল্য, এই মহতী তিথি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র এবং অগাছ শাখামঠসমূহেও বিশেষভাবে পালিতা হইয়াছেন। আনন্দপাড়ায় সভাপতি মহোদয় শ্রীল আচার্যাদেবের প্রদত্ত বক্তৃতা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

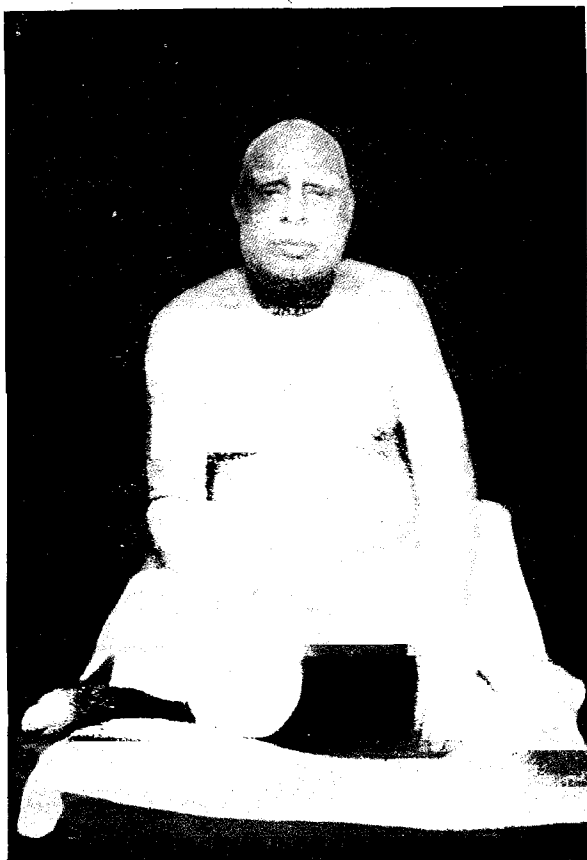
—প্রচার সম্পাদক

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সান্ন্যাসত

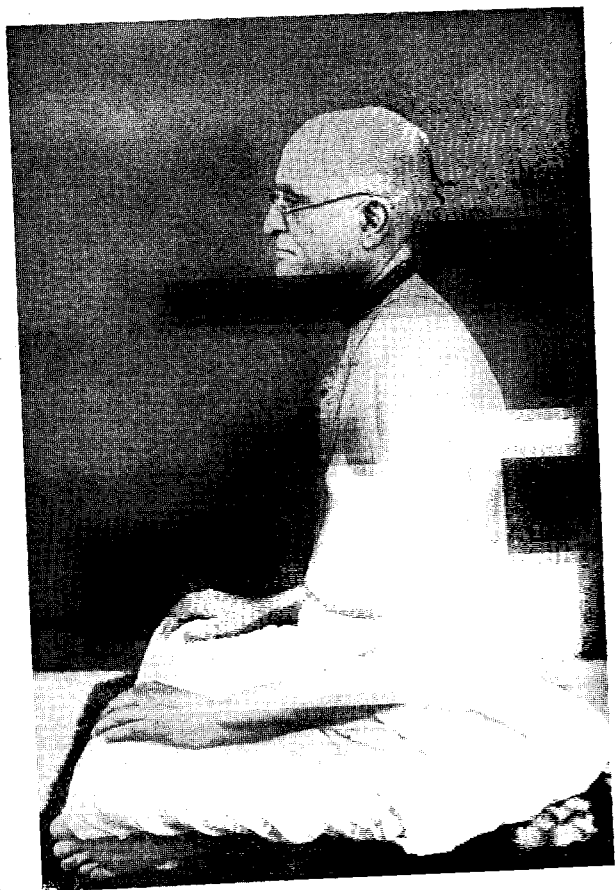
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিক (পূর্বার্ধ)

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যা বর্তীয়া দিন ‘শ্রীহরিভক্তি-বিলাস’-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য—১.০০ টাকা, ডাক মাণ্ডুল স্বতন্ত্র।



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

* স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরথোক্ষজে । *

ধর্মঃ হৃদয়ঃ পুংসাং বিশ্বকুসেন-কথাঃ যঃ ॥



লোৎপাদমোদোদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

* অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্না স্প্রসাদীতি ॥ *

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিচক্ষুত ॥

অন্ত ধর্ম হৃদরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রক্তি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

১৬শ বর্ষ } শ্রীরোদশায়ী, ১৬ গোবিন্দ, ৪৭৭ গৌরাক
শনিবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৭০; ইং ১৪।৩।১৯৬৪ { ১ম সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

শ্রীপ্রহ্লাদ-ভক্তপ্রব-কৃতং শ্রীশ্রীনৃসিংহ-হয়গ্রীব-স্তবদ্বাদশকম্

(শ্রীশ্রীবৈদ্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে
অষ্টাদশোহধ্যায়ে—৮-১৪, ২-৬)

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ,—

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীনরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে আবিরাবির্ভব
বজ্রনখ বজ্রদংষ্ট্র কর্মাশয়ান্ রক্ষয় রক্ষয় তমো এস এস ওঁ স্বাহা অভয়-
মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠাঃ ওঁ ক্ষৌম্ ইতি ॥ ১ ॥

(হরিবর্ষে ভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীপ্রহ্লাদ অব্যভিচারি-ভক্তিয়োগে
এই মন্ত্র-স্তোত্রাদি জপ ও পাঠদ্বারা তাঁহার অতীষ্ট শ্রীনৃসিংহদেবের
আরাধনাপূর্বক বলিয়া থাকেন,—)

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ-দেবকে নমস্কার ; তিনি—তেজঃসকলেরও
তেজঃ। হে বজ্রনখ, হে বজ্রদংষ্ট্র, আমাদিগের কৰ্ম্মবাসনাসমূহ
দাহ করুন, অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করুন। আপনা হইতে আমাদের
আত্মাতে অভয় আবির্ভূত হউক ॥ ১ ॥

স্বস্ত্যস্ত বিশ্বস্ত খলঃ প্রসীদতাং
 ধ্যায়ন্ত ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া ।
 মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
 আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী ॥ ২ ॥

নিখিল বিশ্বের মঙ্গল হউক ; খল-ব্যক্তিগণ অহুকুল হউক ; প্রাণি-
 সকল (বুদ্ধিযোগে) পরস্পরের মঙ্গলচিন্তা করুক ; তাহাদিগের মন
 মঙ্গল (উপশমাদি) ভজনা করুক এবং আমাদের বুদ্ধি নিক্ষেপ হইয়া
 অধোক্ষজ শ্রীহরিতে প্রবিষ্ট হউক ॥ ২ ॥

মাগার-দারাত্মজ-বিত্ত-বন্ধু
 সঙ্গো যদি স্যাদ্ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ ।
 যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
 সিধ্যাত্যদূরান তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥

হে প্রভো ! কোনরূপ বিষয়েই যেন আমাদের আসক্তি না জন্মে ।
 যদি আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে যেন গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ও বন্ধুগণে না
 জন্মিয়া ভগবৎপ্রিয় পুরুষগণেই আসক্তি উদ্ভিত হয় । যে আত্মতত্ত্ববিৎ
 পুরুষ কেবলমাত্র প্রাণধারণোপযোগী যদৃচ্ছা লাভে পরিতুষ্ট থাকেন,
 শীঘ্রই তিনি কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন, গৃহাদিবিষয়াসক্ত ব্যক্তি সেরূপ
 হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

যৎসঙ্গলব্ধং নিজবীৰ্য্য-বৈভবং
 তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসম্ ।
 হরত্যজোহন্তঃ শ্রুতিভির্গতোহঙ্গজঃ
 কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দ-বিক্রমম্ ? ৪ ॥

(হে ভগবন্ !) ভগবৎপ্রিয়-পুরুষগণের সঙ্গ হইতেই মুকুন্দের
 বিক্রমের কথা জানিতে পারা যায় এবং সেই বীৰ্য্যবৈভবের অসাধারণ
 ক্ষমতা আছে । যে-সকল ব্যক্তি কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার
 নিরন্তর সেবা করেন, শ্রীহরি তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া
 তাঁহাদের মনোমল বিনাশ করিয়া থাকেন । গঙ্গাদি-তীর্থ বারংবার
 সেবন করিলে কেবল অঙ্গজ মল নষ্ট হয়, কিন্তু ইতর-বাসনারূপ

অনর্থ বিনষ্ট হয় না । অতএব কোন্ বিবেকিব্যক্তি সেই ভগবদ্ভক্ত-
দিগের সেবা না করিবেন ? ৪ ॥

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা

সর্বৈবগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।

হরাবভক্তস্য কুতো মহদগুণা

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৫ ॥

(হে ভক্ত-প্রাণধন !) ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কামা সেবা-
প্রবৃত্তি বর্তমান, ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাदि সমস্ত-গুণের সহিত দেবতাবর্গ
তঁাহাতেই সম্যগ্রূপে অবস্থান করেন । হরিভক্তিবহীন ব্যক্তি—
অন্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞান-যোগ-রত বা গৃহাদিতে আসক্ত ; সুতরাং
হরিতে তাহার কেবলা-ভক্তি নাই । মনোধর্মের দ্বারা সে অসৎ
বহির্বিষয়ে ধাবিত ; তাহাতে মহৎ-গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায় ? ৫ ॥

হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবাজুরীরিণা-

মাত্মা ষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্ ।

হিত্বা মহান্তং যদি সজ্জতে গৃহে

তদা মহত্বং বয়সা দম্পতীনাম্ ॥ ৬ ॥

(হে অন্তর্যামিন !) জল যেরূপ মীনগণের অভীষ্ট বস্তু, সাক্ষাৎ
ভগবান্ শ্রীহরিও (আপনিও) তদ্রূপ প্রাণিগণেরও আত্মা । মহদ-
ব্যক্তিও যদি সেই শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসক্ত হন,
তাহা হইলে (শূদ্রাদি জাতিতেও) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র
বয়সদ্বারা যে মহত্ব প্রসিদ্ধ আছে, তিনিও সেই তুচ্ছ পার্থিব
মহত্বই ধারণ করেন,—জ্ঞানাদির দ্বারা যথার্থ মহত্ব তঁাহাতে কিছুই
থাকে না ॥ ৬ ॥

তস্মাদ্রজোরাগ-বিষাদমন্যু-

মান-স্পৃহা-ভয়-দৈন্ত্যধিমূলম্ ।

হিত্বা গৃহং সংসৃতি-চক্রবালং

নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোভয়ম্ ॥ ৭ ॥

অতএব, হে গৃহব্রত অমুরগণ ! এই গৃহই (গৃহাসক্তিই) রাগ, তৃষ্ণা,
বিষাদ, ক্রোধ, মান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্ত্য প্রভৃতির নিদান (মূলকারণ) ;
অতএব উহা জন্ম-মরণাদি সংসার-মালায় আলবাল-স্বরূপ ।
তোমরা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয় শ্রীনৃসিংহের চরণ-
কমল ভজনা কর ॥ ৭ ॥

শ্রীভদ্রশ্রবস উচুঃ,—

ওঁ নমো ভগবতে ধর্মায়াত্মবিশোধনায় নম ইতি ॥ ৮ ॥

(ভদ্রাশ্ব-বর্ষে অনুচরগণের সহিত উক্ত বর্ষাধিপতি ভদ্রশ্রবা ভগবান্ বাসুদেবের অতিপ্রিয় হয়গ্রীব-মূর্ত্তিকে নিম্নলিখিত মন্তাদি উচ্চারণদ্বারা স্তবপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন,—)

আমরা ভগবান্ ধর্ম্মকে নমস্কার করি ; যিনি জীবের অবিভ্যাক্রম মলিনতা দূরীভূত করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বে স্বয়ং প্রকাশিত, সেই ভগবান্কে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতং
দ্রুন্তং জনোহয়ং হি মিশন্ ন পশ্যতি ।
ধ্যায়ন্নসদ্যহি বিকর্ম্ম সেবিতুং
নিহৃত্য পুত্রং পিতরং জিজীবিষতি ॥ ৯ ॥

আহা কি আশ্চর্য্য ! এইসকল মনুষ্য প্রাণাপহারক মৃত্যুকে দেখিয়াও দেখিতেছে না ; যেহেতু মৃত পিতা বা পুত্রকে দাহ করিয়া তাহারা (জীবিত পিতা বা পুত্র) তাহাদের (মৃত পিতা বা পুত্রের) ধনদ্বারাই তুচ্ছ বিষয়সুখ ভোগ করিবার আশায় জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৯ ॥

বদন্তি বিশ্বং কবয়ঃ স্ম নশ্বরং
পশ্যন্তি চাধ্যাত্মবিদো বিপশ্চিতঃ ।
তথাপি মুহুন্তি তবাজ মায়ায়া
সুবিস্মিতং কৃত্যমজং নতোহস্মি তম্ ॥ ১০ ॥

হে অজ ! যদিও বেদান্ত-বিদ্যাধ্যয়নকারী জ্ঞানিগণ এবং বিবেকিগণ বিশ্বকে নশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং সমাধি-সময়ে ইহার নশ্বরত্ব প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, তথাপি যে তাঁহারা আপনার মায়া দ্বারা মুগ্ধ হন, ইহা আপনারই লীলা । হে প্রভো, আপনার মায়া—অতি বিচিত্রা । আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

বিশ্বোদ্ভব-স্থান-নিরোধকর্ম্ম তে
হৃকর্ত্তুরঙ্গীকৃতমপ্যপাবৃতঃ ।
যুক্তং ন চিত্রং ত্বয়ি কার্য্যকারণে
সর্ব্বাণি ব্যতিরিক্তে চ বস্তুনি ॥ ১১ ॥

আপনি নিরাবরণ ও অকর্তা হইলেও বেদে যে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসরূপ কার্য্য আপনার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই ; তাহা উপযুক্তই হইয়াছে ; কারণ, আপনার অচিন্ত্যশক্তিবলে সকলই সম্ভব ; আপনি—কার্য্যের কারণ, সকলের আত্মা অথচ সকল হইতে পৃথক,—ইহা আপনার অচিন্ত্যশক্তিরই পরিচয় ॥১১॥

বেদান্ যুগান্তে তমসা তিরস্কৃতান্
রসোতলাদৃষো নৃতুরঙ্গ-বিগ্রহঃ ।
প্রত্যাদদে বৈ কবয়েহভিষাচতে
তস্মৈ নমস্তেহবিতথেহিতায় ॥১২॥

কল্পান্তসময়ে দৈত্যরূপী অজ্ঞান বেদসমূহ অপহরণ করিলে, যিনি “হয়গ্রীব”-মূর্ত্তি প্রকট করিয়া রসাতল হইতে ঐসকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা প্রার্থনা করিলে, যিনি তাঁহাকে ঐসকল বেদ সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই সত্যসঙ্কল্প আপনাকে নমস্কার করি ॥১২॥

দর্শনে ভ্রান্তি

অনাদি-বহিস্পৃথ বিরূপগ্রস্ত জীবের ‘অপব্যবহার’ একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা নিসর্গ। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে জীবের কৃষ্ণ-বিমুখতা ; স্তবরাং জীব স্বরূপে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার বিরূপের স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না ।

জগতে আমরা প্রত্যেক বস্তু বা প্রত্যেক কার্য্যের ‘সদ্যবহার’ ও ‘অপব্যবহার’ লক্ষ্য করিয়া থাকি। সামান্য দুই একটি উদাহরণ দিলেই এ বিষয়টী উপলব্ধি হইবে। বৈদ্যাতিক শক্তির সদ্যবহার দ্বারা জগতে কত প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্যে অতি সুচারুরূপে, অতি অল্প সময়ে, অতি অল্পব্যয়ে, অতি অল্প আয়াসে সাধিত হইয়া মানব-সমাজের মহত্বপূর্ণ সাধন করিতেছে, এই বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। আবার সেই বৈদ্যাতিক-শক্তির অপব্যবহার-ফলে কত বহুমূল্য জীবন, কত সুসমৃদ্ধনগর, জনপদ, সুরম্যপ্রাসাদ মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ হইতেছে। অস্ত্রের সদ্যবহার-ফলে মানবজীবনের কৃত

প্রয়োজনীয় কার্যসমূহ সাধিত হয়, আর তাহার অপব্যবহার-ফলে জগতে কতই না উৎপাত উপস্থিত হয়।

স্বাতি-নক্ষত্রের জল যখন সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়, তখন তাহাতে বহুমূল্য মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে ; সেই মুক্তা শ্রীভগবদ্বিগ্রহের গলদেশে মালিকা-স্বরূপে এবং রাজত্ববর্গের রাজমুকুটোপরি বর্তমান থাকিয়া পরম শোভা বিস্তার করে। আর সেই স্বাতি-নক্ষত্রের জলই যখন সর্পের উপরে পতিত হয়, তখন তাহাতে সর্পের বিষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ; সেই বিষধর সর্প হইতে সকলে ভীত এবং সেই সর্পের দংশনে জীবন সংশয়াপন্ন হয়। গঙ্গাতীরে নিম্ব, কপিথ, আম্র ও কদলী বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ পাদপরাজি সকলেই এক গঙ্গার জল পান করিলেও ফল-প্রদান-কালে নিম্ব ও কপিথ তিত্ত এবং কষায় ফল প্রদান করে, আর আম্র ও কদলী স্নমধুর ফলই প্রদান করিয়া থাকে। অতএব গ্রহণকারীর যোগ্যতানুসারে এবং একই বস্তুর সদ্যবহার বা অপব্যবহার ফলে সৎ ও অসৎ ফললাভ ঘটে।

এই পরম সত্য এবং অতি সহজ ও সরল কথাটি অনেকেই বিস্মৃত হইয়া যান, তৎফলে তাঁহারা সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হন। কাহারও ধারণা—যখন সাধু বা গুরুর নিকট আগমনের অভিনয় বা শাস্ত্র পাঠের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষ বিপথগামী হইয়াছেন, তখন ‘সাধু’, ‘শাস্ত্র’ ও ‘গুরু’—ইহা হারাই তজ্জন্ত দোষী। অবশ্য সাধু-গুরুর অভিনয়কারী ব্যক্তি বা কুবল্লবৎ কলিত শাস্ত্রের আশ্রয়কারীর বিপথগমন স্বাভাবিক। সেইরূপ ব্যক্তি আদৌ পথই পায় নাই, বিপথেই রহিয়াছে। বিপথে পতিত ব্যক্তির তদপেক্ষা অধিকতর তমোরাজে প্রবেশ স্বাভাবিক। অভিনয়কারী বা অনুকরণকারী কখনও অনুসরণকারী বা আনুগত্য-ধর্ম-যাজনকারী নহেন, ইহা স্বেচ্ছা-স্ববুদ্ধিমানগণ জানেন। ভগবান্ সর্ব-জীবকেই স্বতন্ত্রতা-রত্ন প্রদান করিয়াছেন, কোনও ব্যক্তিবিশেষ যদি স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া ভগবদ্বিনুগ ও অসদাচারী হইয়া পড়ে, তজ্জন্ত ভগবান্কে দোষারোপ করা যাইতে পারে না; তজ্জন্ত ‘আর কাহারও ভগবানের উপাসনা করা উচিত নহে’,—এইরূপ নাস্তিকোচিত বাক্যও বলা যাইতে পারে না ; বরং যাহাতে সর্বতোভাবে ভগবানে শরণাগত হইয়া স্বতন্ত্রতার সদ্যবহার অর্থাৎ ভগবচ্চরণ-সেবায় অনুরক্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়েই স্বেচ্ছা-স্ববুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ দৃঢ়সঙ্কল্প করেন। যাহারা ভক্তিরাজ্যের একান্তপাশ্বিক হইয়াছেন, তাঁহারা

নিয়তই দেখিতে পান যে, যে কার্যে অ-স্বরগণ বিমোহিত হন, সেই কার্যে স্বরগণের অর্থাৎ ভক্তগণের ভগবন্নিষ্ঠা দৃঢ় হয়। স্বরগণ ভক্তিরাজ্যের বিপাক বা বিঘ্নকে ভগবদনুকম্পারূপে জানিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানে আরও অধিকতরভাবে আসক্ত হন, আর অস্বরগণ বিপাক-সমূহ দর্শন করিবার পূর্বেই—‘দূর ছাই! এমন ভগবান্কেও আবার লোকে ভজনা করে, যে-ভগবান তাহার আশ্রিতবর্গকে বিপথ হইতে রক্ষা করিতে পারেন না! এই ভগবান্ ভগবান্ নহে’—এইরূপ বলিয়া তাহারা নিজেরাই নরকের পথে গমন করে এবং তাহাদের সমশীল অপর ব্যক্তিগণকেও সেই পথের পথিক করিতে প্রবৃত্ত হয়। স্বরগণ কিন্তু মোহিত অস্বরগণের ‘হাতে তালি’ বা ‘টিট্কারী’ শুনিয়া ভক্তিপথ বা আনুগত্য-ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন না; পরন্তু আরও ঐকান্তিক নিষ্ঠা-সহকারে ভগবানের প্রপন্ন হন।

শাস্ত্রপাঠেরও অনেক অপব্যবহার দৃষ্ট হয়। বেদপাঠের অপব্যবহার-ফলে চার্বাক ব্রাহ্মণ বেদনিন্দক, নাস্তিক হইয়াছেন। শৌক্ৰবর্ণোচিত ব্রাহ্মণতার ফলে চার্বাক-ব্রাহ্মণ বেদে অধিকারপ্রাপ্ত হইলেও কীট যেরূপ বহুমূল্য গ্রন্থরাশি নষ্ট করিবার জন্তই গ্রন্থ-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ চার্বাকও বেদনিন্দা করিবার জন্তই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কীট যেরূপ গ্রন্থের মর্ম বা সার গ্রহণ করিতে পারে না, কেবল বাহ্যবস্তু গ্রহণ করিয়া মরণের পথে ধাবিত হয়, তদ্রূপ যাহারা শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়ে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া অক্ষজ্ঞ জ্ঞানদ্বারা শাস্ত্রকে মাপিয়া লইতে চায়, তাহারাও কীটেরই স্থায় অকিঞ্চিংকর ও মৃত্যুপথের পথিক। শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া সুবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি ‘ভাগবত’ হন, কিন্তু আবার কেহ ভাগবতের নিন্দকও হইয়া পড়েন—ভাগবতের কথা ‘গাঁজাখুরে’ গল্প মনে করেন। বেদ-পুরাণ-পঞ্চরাত্র পড়িয়া কেহ সর্বত্র বিষ্ণু-উপাসনারই সার্থকতা দেখিতে পান, সর্বত্রই বিষ্ণুর কীর্তি গীত রহিয়াছে উপলব্ধি করেন, আবার কেহবা ঐ সকল পাঠ করিয়া বিষ্ণু-বিরোধী নাস্তিক হইয়া পড়েন। শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু তাঁহার অধ্যাপনা-নীলায় প্রতি ধাতু, প্রতি শব্দ, প্রতি বর্ণ, ব্যাকরণের প্রতি স্বত্রে সর্বত্র ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ দেখিয়াছেন, শ্রীজীবগোশ্বামী প্রভু শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণে সর্বত্র শ্রীহরি-

নামের প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু আবার কেহ কেহ ব্যাকরণ পড়িয়া নাস্তিক হইয়া থাকেন ।

‘গৌড়ীয়’ পাঠের সদ্যবহার-ফলে জীব ‘গৌড়ীয়’ অর্থাৎ গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপরূপানুগ শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন, আবার ‘গৌড়ীয়’ পাঠের অপব্যবহার-ফলে অনেকে গৌড়ীয়েশ্বর বাহ্য আবরণ দেখিয়া ‘গৌড়ীয়’কে একজন ‘নিন্দক’, ‘সমালোচক’, ‘গোঁড়া’ প্রভৃতি মনে করিতে থাকেন । যাহারা অন্তরে প্রবিষ্ট না হইয়া—শব্দের পরম মুখ্যবৃত্তিকে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা না করিয়া শব্দের বাহ্যাকৃতিমাত্র দর্শন করেন, তাঁহাদের এইরূপই দুর্ভাগ্যের উদয় হয় । এ বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা শ্রুত হয়—

একদা কোন গ্রামে একটি মহতী বিদ্যৎসভা হইয়াছিল, সেই সভায় বহু বৈষ্ণব-পণ্ডিত আগমন করিয়াছিলেন । বহু সঙ্গীতাচার্য্য হরিগুণ-সংকীৰ্ত্তন করিবার জন্ত তথায় সমবেত হইয়াছিলেন । সেই সভার উদ্দিষ্ট ও আলোচ্য বিষয় ছিল—শাস্ত্রালোচনামুখে জৈব জগতের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় আবিষ্কার করা । কতকগুলি ভিন্নদেশীয় ‘ভবঘুরে’ লোক ভ্রমণ করিতে করিতে যে-স্থানে সেই মহতী-সভা সমবেত হইয়াছিল, তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল । উহারা দূর হইতে মহতী সভায় সমবেত বহুলোকের কৃষ্ণ-কোলাহল ও বাগ্মতাগাদির শব্দ শ্রবণ করিয়া মনে করিল, বোধ হয় এই স্থানে ভীষণ কলহ ও পরস্পর যুদ্ধ হইতেছে । কৃষ্ণ-কোলাহলকে তাহারা ‘কলহ’ এবং বাগ্মাদির শব্দকে তাহারা ‘যুদ্ধ-বাগ্মের শব্দ’ বিবেচনা করিল । এইরূপ বিচার করিয়া তাহারা সৰ্ব্বত্র এই বলিয়া মিথ্যা-গুজব রটনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকিল,—‘ওহে ভ্রাতৃগণ ! সাবধান, তোমরা স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস কর, সতর্ক হও ! নিকটস্থ গ্রামে এক ভীষণ কলহ ও যুদ্ধ বাধিয়াছে ; তোমাদিগের পুত্রসন্তান ও আত্মীয়-স্বজনগণকে বাড়ীর বাহির হইতে দিওনা, তাহারা যেন ভুলক্রমেও সেই পূর্বদিকস্থ গ্রামে না যায় । সেখানে গেলে প্রাণ নাশ অবশ্যস্তাবী । যাহারা ঐ সকল ‘ভবঘুরের’ বাক্য শুনিয়া উহাকে ‘সত্য বাক্য’ বলিয়া বিশ্বাস করিল, তাহারা বৃথা ভয়ে অভিভূত থাকিয়া গৃহে আবদ্ধ হইয়া রহিল । তাহাদের পূর্বদিকস্থ গ্রামে গিয়া সেই স্থানে হরিকথা-কীর্ত্তন-মহোৎসবাদিতে যোগদান করিবার ভাগ্য ঘটিল না, অপিচ হরিকথাকে ‘কলহ’ এবং জীবের মঙ্গলাকাজ্জী নিৰ্ম্মণের পুরুষগণকে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত এবং অপরের অনিষ্টকারী অনুমান

করিয়া আত্ম-বঞ্চিত হইল। উপরিউক্ত ভবস্বরেণ ত' সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইলই, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এই আত্মায়িকার পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চকের আদর্শ, আর তাহাদিগের কথাকে সত্যজ্ঞান-কারিগণ আত্মবঞ্চক-স্থানীয়।

যাহারা এইরূপ 'গৌড়ীয়ে'র' জীব-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা—গৌড়ীয়ে'র মহান্ উদ্দেশ্য—মহাবদাত্তা—অমনোদয়া দয়া—পরস্পর বিবদমান-বাদ-প্রতিবাদ-সাম্য প্রয়াস—মহাচিৎসম্বয়-চেষ্ঠা না বুঝিয়া তাঁহাকে 'বাদ-প্রতিবাদকারী' বা 'নিন্দক' মনে করেন, তাঁহারাও উপরি উক্ত ব্যক্তিগণের স্থায় গৌড়ীয়-মহোৎসবে বঞ্চিত।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্যাচার্য্য প্রভৃতি বিষ্ণুভক্তি-সংরক্ষক আচার্য্যগণ বিষ্ণুবিরোধী অদৈব-দলের নানাপ্রকার বিষ্ণুবিরোধি-মতবাদকে নানাপ্রকার যুক্তিপ্রমাণের দ্বারা খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করিয়া জগতে বিষ্ণুভক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া এবং নির্বিশেষবাদিগণ তাঁহাদিগের অকাট্য যুক্তির নিকট পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা এখনও শ্রীরামানুজ-মধ্যকে 'প্রচ্ছন্ন-ভার্কিক' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীজীবপ্রমুখ আচার্য্যগণ তাঁহাদিগকে 'ভক্তিসংরক্ষক আচার্য্য' বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন।

যাঁহারা ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা ই সেই স্থানের মহা-ঐক্যতান-মাধুরী উপলব্ধি করিতে পারেন, আর যাঁহারা বাহিরে থাকিয়া বিচার করিতেছেন, তাঁহারা বঞ্চিতই হন মাত্র। 'শ্রীগৌড়ীয়' শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত-প্রচারিত সার্বজনীন নিত্যধর্ম্মেরই বিবৃতি। যাঁহারা গৌড়ীয়ে'র হইয়া অর্থাৎ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গৌড়ীয়ে'কে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, গৌড়ীয়ে'র বাক্যে যে মহাচিৎসম্বয় রহিয়াছে, তাহাতে পরমানন্দ-প্রকাশিনী যে পরিপূর্ণ-নির্ম্মলতা বিদ্যমান আছে, তাহাতে যেরূপ স্তম্ভভাবে যাবতীয় শাস্ত্রবিবাদ ও পরস্পর বিবদমান মতসমূহ চিরতরে প্রশমিত হইয়াছে, তাঁহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সর্বদা যেরূপ সমতা দান করিতেছে এবং অপ্রাকৃত রসোৎসাহিমুখে লইয়া যাইতেছে এবং অতি-বিস্তারিণী অমনোদয়দয়া বিতরণ করিতেছে, তাহা অতুল্য অসম্ভব। অতএব আমরা সকলকে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া কাকুবাদে বলিতেছি,—গৌড়ীয়ে'র অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন—গৌড়ীয়ে'র অন্তরঙ্গ হউন। আপানারা সাধু বলিয়াই আপনাদের কাছে এই নিবেদন করিতে সাহসী হইতেছি।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর

ও শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

১। শ্রীমায়াপুরের বৈশিষ্ট্য কি ?

“শ্রীগোকুলের অপর প্রকাশ-স্বরূপ এই মায়াপুর মহাতীর্থ কলিকালে অতিশয় প্রবল। শ্রীবৃন্দাবনে যেরূপ পৌর্ণমাসী, মায়াপুরে কোলদ্বীপে সেইরূপ শ্রীপ্রৌঢ়মায়া (যাঁহাকে লোকে ‘পোড়ামা’ বলিয়া বলে) সর্বাধিকারিণী। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া প্রভৃতি সপ্ত মহাতীর্থের মধ্যে মায়াতীর্থ এক স্বরূপে হরিদ্বারে ও দ্বিতীয় স্বরূপে গৌড়ে বিরাজমান। মায়াতীর্থের একরূপ প্রভাব যে, তথায় অপতিত যে কয়েকটি মুসলমান বাস করেন, তাঁহারা আমাদের প্রাণনাথ গৌরাঙ্গকে স্বীয় প্রভু বলিয়া অভিমান করেন এবং গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগকে বান্ধবের স্থায় যত্ন করেন।”

—‘শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম’, বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

২। শ্রীমায়াপুরের ইতিবৃত্ত কি কি ?

“শ্রীগঙ্গানগর, ভরহাজটিলা (ভারুইডাঙ্গা) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামসমূহ অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত, গঙ্গানগর গ্রামেই শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল। মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব অংশে যে পতিত ভূমি আছে, তাহা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সময় হইতে সেইরূপই আছে—ইহা ‘ভক্তিরত্নাকরে’ দেখা যায়। সেই স্থান হইতে স্তবর্ণবিহার দৃষ্ট হয়। ঐ ভূমি জগদ্বিধাতা ব্রহ্মার তপস্যা-স্থল বলিয়া তন্ম্বে উল্লিখিত আছে। অতি পূর্বে মায়াপুরের পূর্ব-অংশে ও অন্তর্দ্বীপের মধ্য দিয়া বাগ্‌দেবীর একটি ক্ষুদ্র প্রবাহ ভাগীরথী পর্য্যন্ত ছিল। শিবের ডোবার কিছু দক্ষিণ-পূর্বভাগে সেই প্রণালীর মুখ পরিলক্ষিত হয়। ঐ বাগ্‌দেবীর তীরে তৎকালে প্রৌঢ়া মায়ার মন্দির ছিল। বিদ্যার্থীগণ বাগ্‌দেবীর প্রণালীতে স্নান করত প্রৌঢ়ামায়ার মন্দিরে বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া উপাধিগ্রহণ করিতেন।”

—‘শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম’, বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৩। শ্রীভক্তিবিনোদ কি প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন ?

“মনে হইল, আমি বৃথা দিন কাটাইলাম। আমার কিছুই হইল না।

* * * মথুরা বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যামুন-পুলিনময় বনে একটু স্থান করিয়া

তথায় নির্জন ভজন করিব। * * আমি কার্যোপলক্ষে একবার তারকেশ্বরে গেলাম। তথায় রাত্রে শয়ন করিলে নিদ্রাকালে প্রভু আমাকে বলিলেন,—
“তুমি বৃন্দাবন যাইবে? তোমার গৃহের নিকটবর্তী শ্রীনবদ্বীপ-ধামে যে কার্য আছে, তাহার কি করিলে?”
—‘ঠাকুরের আশ্চরিত’

৪। শ্রীভক্তিবিনোদ লুপ্ত গৌরজন্মভূমি আবিষ্কারের জন্ত কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন?

“প্রভু ও প্রভুপার্ষদগণের লীলাস্থান দেখিবার জন্ত আমাদের শ্রায় অকিঞ্চন পামরগণ নিত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। ব্রজভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান দেখিতে যখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, তখন দয়া-সমুদ্র শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন প্রভুতে শক্তিসংস্কার-পূর্বক দুই ধাতুক্ষেত্রে শ্রীরাধা-কুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড দেখাইয়া দিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর কৃপায় এখন সকলেই সেই তীর্থদ্বয়ের মহিমা উপলব্ধি করিতেছেন। হে জগন্নাথদাস প্রভৃতি অধুনাতন গৌরাঙ্গপ্রিয় ভক্তগণ, আপনাদের চরণে আমরা দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাজলিপূর্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা শ্রীসনাতন গোস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া শ্রীশ্রীমায়াপুরের স্থানসমূহ নির্দেশ করুন। এখন আপনারাই আমাদের গুরু, আর কাহাকে জানাইব?”

—‘শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম’, বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৫। লুপ্ত গৌর-লীলাস্থলী আবিষ্কারের জন্ত শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপ ব্যাকুল আস্থান করিয়াছিলেন?

“হে ভক্তবৃন্দ, আজকাল অণু আশা, অণু চিন্তা দূরে রাখিয়া এই লুপ্ত মহাতীর্থের স্থানগুলি আবিষ্কার করিতে যত্ন করুন। ভাস্করাচার্য্য, আর্য্যভট্ট প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণের গ্রহ-নক্ষত্রস্বরূপ ও গতিসম্বন্ধীয় গবেষণার শ্রায় আপনাদের গবেষণা কঠিন নয়। তাঁহারা জড়বিদ পণ্ডিত, স্ত্রতরাং জড়বিষয় অনুসন্ধান করিতে গেলে জড়ীয় যন্ত্রাদি-নিৰ্ম্মাণরূপে বহু কষ্টকর কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু হে নিত্যানন্দের বাতুলসকল, তোমাদের স্থিতি জড়জগতে নয়; তোমরা মনে করিলে অনায়াসে সকলই করিতে পার। প্রভু নিত্যানন্দের পাদপদ্মে পতিত হইয়া যদি একবার আব্দার কর, তাহা হইলে অপ্রাকৃত ঈশ্বরদ্বীপকেও হস্তামলকবৎ সংগ্রহ করিতে পার। তোমরা যদি হা গৌরাঙ্গ! হা বিষ্ণুপ্রিয়া!

হা প্রভু নিত্যানন্দ! হা প্রভু অদ্বৈত! হা গদাধর! হা শ্রীনিবাস
বলিয়া পঞ্চতত্ত্বের চিন্ময় ধামে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে থাক, তাহা হইলে
শ্রীপঞ্চতত্ত্ব তোমাদের প্রতি রূপা করিয়া সমস্ত স্থানই দেখাইয়া
দিবেন। হে বৈষ্ণবগণ, আর বিলম্ব করিও না।”

—‘শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম’, বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৬। কিরূপভাবে শ্রীমায়াপুর আত্মপ্রকাশ করেন?

“আমি প্রতি শনিবারে নবদ্বীপ যাইয়া প্রভুর লীলাস্থান অন্বেষণ করিয়াও
কিছুই পাই না, তাহাতে বড়ই দুঃখ হয়। এখনকার নবদ্বীপের লোকেরা
কেবল নিজ-নিজ পেট ইত্যাদি বুঝিয়া থাকেন, প্রভুর লীলাস্থান সম্বন্ধে কিছুই
যত্ন করেন না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি ও কমল এবং একজন কেরাণী
ছাদের উপর উঠিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। গঙ্গাপার উত্তরদিকে
একটি আলাকময় অট্টালিকা দেখিলাম। * * * প্রাতে সেই রাণীর
বাটীর ছাদ হইতে সেই স্থানটা ভাল করিয়া দেখিলে দেখিলাম যে, তথায়
একটি তালগাছ আছে। অশ্ব লোককে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল—
ঐস্থান বল্লালদাঁঘি, তথায় লক্ষ্মণসেনের দুর্গাচিহ্ন ইত্যাদি আছে।
সে সোমবারে কৃষ্ণনগর গিয়া পর শনিবার বল্লালদাঁঘি গেলাম। তথায়
রাত্রি আবার ঐ প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরদিন পদব্রজে ঐ সব স্থান
দর্শন করিলাম এবং তত্রস্থ পুরাতন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া
ঐ স্থানটী শ্রীময়হাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া জানিলাম। শ্রীনরহরি
ঠাকুরের ‘পরিক্রমা পদ্ধতি’, ‘ভক্তিরত্নাকর’ ও ‘শ্রীচৈতন্যভাগবতে’ যে-সমস্ত
গ্রাম-পল্লীর উল্লেখ আছে, ক্রমশঃ সমস্ত দেখিলাম। কৃষ্ণনগর বসিয়া
‘শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য’ রচনা করিয়া কলিকাতায় ছাপিতে পাঠাইলাম।

—ঠাকুরের আশ্বস্তিরত

৭। শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদের মনোহরীষ্ট কি?

“বল্লালদাঁঘির দক্ষিণ কোণে একটি অপূর্ব স্থান আছে, সেখানে অট্টালিকা
নির্মাণ করত শ্রীশ্রীগৌরাজ-বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীমাতা প্রভৃতির শ্রীমূর্তিসেবা
প্রকাশ করা যাইতে পারে। সেই সেবার অধীনে জন্মস্থান-নির্দেশক
সুস্ব-রক্ষা, মাঘ ফাল্গুন মাসে মেলা ও যাত্রীনিবাসের স্থান নির্মাণাদি কার্য
অনায়াসে চলিতে পারে।”

—‘শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম’, বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৮। শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা পুনঃপ্রবর্তনের অভিলাষ কাহার হৃদয়ে প্রথম
উদিত হয়?

“বিধি আছে যে, শ্রীমায়াপুর হইতে নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। মায়াপুরে সম্প্রতি এমন স্থান নাই, যেখানে যাত্রিগণ রাত্রিবাস করিতে পারেন। প্রভূত ঐশ্বর্যশালী গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের কর্তব্য এই যে, অবিলম্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি বৃহৎ স্তম্ভ নির্মাণ করেন। * * * জগন্নাথমিশ্রের গৃহ-নির্দেশক স্তম্ভের উপর একটি বৃহৎ পতাকা ও একটি আলোক দেওয়া কর্তব্য।” —‘শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম’, বিঃ পঃ ১ম বর্ষ

৯। লুপ্ত-গৌর-জন্মস্থানের উদ্ধার হইলে ধর্মব্যবসারিগণের কিরূপ মাৎসার্যের উদয় হইয়াছিল?

“প্রাচীন নবদ্বীপের প্রকাশ হইলে আধুনিক কুলিয়া নবদ্বীপে বড়ই হিংসার উদয় হইল। কত কথা বলিতে লাগিল, গৌরাজ-ভক্ত দিগকে অনেকপ্রকার গালি বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু যাঁহারা গৌরাজের চরণে দেহ-মন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সয়তানী কথায় কেন পশ্চাৎপদ হইবেন? তাঁহারা বহির্মুখ ধনলোভী লোক-দিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেব-সেবা ও মন্দির-স্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন।” —ঠাকুরের আশ্চরিত

১০। শ্রীমায়াপুরের প্রথম শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসবকে খেতুরীর মহোৎসবের সহিত তুলনা করা যায় কেন?

“শ্রীমায়াপুরের মহোৎসবের ছায় বিশ্বব্যাপী মহোৎসব শ্রীপাট খেতুরীর মহোৎসবের পর বোধ হয়, কুত্রাপি আর হয় নাই। * * * প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ লোক এই মহোৎসব-সন্দর্শনার্থ বহুদূর হইতে শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছিলেন। কেবল কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তি নবীন নবদ্বীপের গৌরব খর্ব্ব হইবার আশঙ্কায় প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরের উল্লতির বিরোধে কিছু কিছু কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত-গণ শ্রীমায়াপুরের মাহাত্ম্য অবগত আছেন বলিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত বাধাসকল তিরস্কার করত শ্রীমায়াপুরে আসিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।”

—‘শ্রীশ্রীমায়াপুরের মহামহোৎসব’, সং: তো: ৬।১

১১। শ্রীযোগপীঠে শ্রীমহাপ্রভুর ভাবি-মন্দির সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদের ভবিষ্যদ্বাণীটি কি?

“অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ। গৌরাজের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ॥”

—শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ৫ম অঃ

১২। শ্রীমায়াপুর যে ভাবি-কালে বিশ্ববিখ্যাত হইবেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদের ভবিষ্যদ্বাণীটি কি?

“জগতের সর্বজাতির মধ্যে যাঁহারা ভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা একদিন বহু বহু দূরদেশ হইতে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান দেখিতে আসিবার আশা করিবেন।” —‘গতবর্ষ’, সং: তো: ১২।১

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রী শ্রীগৌর-জন্মলীলা

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি, কৃপা করি' হইল উদয় ।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস, জগভরি' হরিধ্বনি হয় ॥
সেইকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়, নৃত্য করে আনন্দিত-মনে ।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীৰ্ত্তনরঙ্গে, কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥
দেখি' উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি, আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান ।
পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে, ব্রাহ্মণেরে দিল নানাদান ॥
জগৎ আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়, ঠারে ঠারে কহে হরিদাস ।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন, দেখি—কিছুকার্য্যে আছে ভাস ॥
আচার্য্য-রত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস, যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে ।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি সঙ্কীৰ্ত্তন, নানাদান কৈল মনোবলে ॥
এইমত ভক্ত-ততি, যার যেই দেশেস্থিতি, তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে ।
নাচে করে সঙ্কীৰ্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন, দান করে গ্রহণের ছলে ॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী, নানাদ্রব্যে থালী ভরি, আইলা সবে যৌতুক লইয়া ।
যেন কাঁচা-সোণা-ত্যাগি, দেখি বালকেরমূর্ত্তি, আশীৰ্ব্বাদ করে সুখপাঞা ॥
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রত্না অরুন্ধতী, আর যত দেবনারীগণ ।
নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি, আসি সবে করে দরশন ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ, স্তুতি-নৃত্য করে বাজ-গীত ।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট, সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত ॥
কেরাআসে কেবাযায়, কেবানাচে কেবাগায়, সম্ভালিতে নারেকার বোল ।
খণ্ডিলেক ছুঃখশোক, প্রমোদপূরিত লোক, মিশ্রহৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ, আসি তাঁরে করে সাবধান ।
করাইল জাতকৰ্ম্ম, যে আছিল বিধিধৰ্ম্ম, তবে মিশ্র করে নানা দান ॥
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত, সব ধন বিপ্রে দিল দান ।
যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন, ধন দিয়া কৈলা সবার মান ॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী, আচার্য্যরত্নের পত্নী সঙ্গে ।
সিন্দূর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নারিকেল, দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥
অদ্বৈত আচার্য্যভার্য্যা, জগৎপূজিতা আৰ্য্যা, নাম তাঁর সীতাঠাকুরাণী ।
আচার্য্যের আজ্ঞাপাঞা, গেলা উপহারলঞা, দেখিতে বালকশিরোমণি ॥

সুবর্ণের কড়িউলি, রজতমুদ্রা-পাশুলি, সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ ।
 ছ-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবন্ধ, স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ ॥
 ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পটুসূত্র-ডোরী, হস্ত-পদের যত আভরণ ।
 চিত্রবর্ণ পটুশাড়ী, বুনি ফোতো পটুপাড়ী, স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন ॥
 দুর্ব্বা ধাতু গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন, মঙ্গলদ্রব্য পাত্র ভরিয়া ।
 বস্ত্রগুপ্ত দোলাচড়ি, সঙ্কেলএগা দামীচেড়ী, বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥
 ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লইল বহুভার, শচীগৃহে হৈল উপনীত ।
 দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান, বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥
 সর্ব্ব অঙ্গ সুনিৰ্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান, সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময় ।
 বালকের দিব্যজ্যোতি, দেখিপাইল বহুপ্রীতি, বাৎসল্যেতে দ্রবিলহৃদয় ।
 দুর্ব্বা ধাতু দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে, চিরজীবী হও তুই ভাই ।
 ডাকিনী শাখিনী হৈতে, শঙ্কাউপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল নিমাই ॥
 পুত্রমাতা স্নানদিনে, দিল বস্ত্র-বিভূষণে, পুত্র-সহ মিশ্রেরে সম্মানি' ।
 শচীমিশ্রের পূজালএ, মনেতেহরিশহএ, ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী ॥
 ঐছে শচী-জগন্নাথ, পুত্র পাএগা লক্ষ্মীনাথ, পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত ।
 ধন-ধাণ্ডে ভরে ঘর, লোকমাগ্ন কলেবর, দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥
 মিশ্র—বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দাস্ত, ধনভোগে নাহি অভিমান ।
 পুত্রের প্রভাবেযত, ধন আসি মিলে তত, বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥
 লগ্ন গণি' হর্ব্বমতি, নীলাম্বর চক্রবর্তী, গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে ।
 মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন, দেখি এই তারিবে সংসারে ॥
 ঐছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে, যেই ইহা করয়ে জ্ঞাবণ ।
 গৌরপ্রভু দয়াময়, তাঁরে হইল সদয়, সেই পায় তাঁহার চরণ ॥
 পাইয়া মানুষ-জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ, হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল ।
 পাইয়া অমৃতধূনী, পিয়ে বিষগর্ত-পানি, জন্মিয়া সে কেন নাহি মৈল ॥
 শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, আচার্য্য-অদ্বৈতচন্দ্র, স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস ।
 ইহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন, জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥

—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

সন্দভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দভ-২১)

দুর্যোধনকে যখন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন, তখন যাদবগণকে নিজ আবারণরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন—মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে দেখা যায়। তবে যে যাদবগণের মৈরেষ্ট পান করিয়া বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে এবং তাহারা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন শুনা যায়, শ্রীভগবৎপার্ষদে ইহা কিরূপে সম্ভব? উত্তর—এসকল পার্শদ-বিরুদ্ধ-ধর্ম, যথার্থ নহে। শ্রীঅর্জুনের পরাজয় ও বিমোহ পর্য্যন্ত সকলই ইন্দ্রজালবৎ মায়া-কল্পিত। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীবাক্য—
“মহিষীহরণ, মৌষল-লীলা—সব মায়াময়।”

ব্রহ্মশাপের কখনও অত্থথা ঘটে না, ইহা জানাইবার জন্ত গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারী শ্রীভগবান্ উক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণ পিণ্ডারক-তীর্থে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন; বিশ্বামিত্র, অসিত, কথ প্রভৃতি মুনিগণ যখন যজ্ঞস্থল হইতে নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিতেছিলেন, তখন পশ্চিমধ্যে যাদব-বালকগণ জাম্ববতী-পুত্র সান্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া মুনিগণের সন্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—এই গর্ভবতী কি সন্তান প্রসব করিবেন, আপনারা আজ্ঞা করুন। মুনিগণ উহাদের দৃষ্ট ব্যবহারে কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন—ইনি তোমাদের কুল নাশন মুষল প্রসব করিবেন। তখন বালকগণ সান্বের উদর-বস্ত্র মোচন করিয়া দেখেন, তথায় সত্যই একটা মুষল রহিয়াছে। তাহারা ভীত হইয়া উগ্রসেনের নিকট ঐ সকল বৃত্তান্ত জানাইলে তিনি উহা চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে বলেন। চূর্ণের সহিত নগণ্য ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র এক বৃহৎ মৎস্য উহা গ্রাস করে; আর চূর্ণসকল তরঙ্গ-আঘাতে তীরে লাগিয়া এরকা-তৃণ সৃষ্টি করিল। ঐ মৎস্য জালে ধৃত হইলে তাহার উদর হইতে ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড নিক্ষেপিত হয় এবং জরা-ব্যাধ উহা শরের অগ্রভাগে যোজিত করিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণসহ প্রভাষতীর্থে গমন করেন। তথায় যাদবগণ মৈরেষ্ট মধুপান করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহারা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হন এবং পরিশেষে এরকা-তৃণদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া নিধন প্রাপ্ত হন।

নিত্যপার্ষদ যাদবগণের দেহত্যাগাদি লীলা মায়ািক, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—

রাজন্ পরশু তনুভৃজ্জননাপায়েহা,

মায়াবিড়বনমবেহি যথা নটশ্চ ।

স্বষ্ট্যায়নেন্দমনুবশ্চ বিহত্য চান্তে,

সংহত্য চাপ্পমহিনোপরতঃ স আস্তে ॥ (ভাঃ ১১।৩১৯)

পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণের ঝাঁহারা তনুভৃৎ অর্থাৎ দেবর্ষি নারদের “প্রযুজ্যমানে ময়ি ত্বাং শুক্লাং ভাগবতীং তনুন্ । প্রারন্ধকর্ম্মনির্বাণং ত্বগতং পাঞ্চভৌতিকম্ ॥” (ভাঃ ১১।২৮)—আমাতে শুক্লা ভাগবতী তনু সংযুক্ত হইলে আমার প্রারন্ধ-কর্ম্মসকলের ভোগক্ষয় হেতু আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পতিত হইয়া গেল । এই উক্তি অনুসারে ঝাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধিনী তনু অর্থাৎ অপ্রাকৃত (ভগবৎ-সেবোপযোগী) দেহ ধারণ করেন, তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যুরূপ চেষ্টা কেবল শ্রীকৃষ্ণের মায়া-বিড়ম্বনা মাত্র । যেমন কোন ইন্দ্রজালবেতা নট জীবিত কোন প্রানীকে কাটিয়া পোড়াইয়া পুনরায় সেই দেহকে জীবন্ত করিয়া দেখায়, এস্থলেও তাদৃশ বুদ্ধিতে হইবে । বিশ্বশ্রষ্টা ও বিশ্বের স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে ।

রাবণ-কর্তৃক সীতা-অপহরণ ও ঐরূপ অর্থাৎ রাবণ মায়া-সীতাকে হরণ করিয়াছিল—

সীতয়া রাধিতো বহি ছায়াসীতামজীজনং ।

তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহিপুরং গতা ॥ (বৃঃ অগ্নিপুরাণ)

সীতা-কর্তৃক আরাধিত অগ্নিদেব ছায়াসীতার আবির্ভাব করাইয়াছিলেন, দশানন রাবণ তাহাকেই অপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু সীতাদেবী অগ্নিপু্রে গমন করেন । রাবণবধের পর অগ্নি পরীক্ষার কালে যথার্থ সীতা উপস্থিত হন ।

মৌষল-লীলার মায়িকত্ব শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে জানা যায় । তিনি দারুককে বলিয়াছিলেন—

ত্বস্ত মদ্বর্ম্মমাশ্বায় জ্ঞাননিষ্ঠঃ উপেক্ষকঃ ।

মনমায়া-রচনামেতাং বিজ্ঞাযোপশমং ব্রজ ॥ (ভাঃ ১১।৩০।৪৯)

তুমি আমার ধর্ম্মে আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ ও উপেক্ষক হইয়া এসকল আমার মায়া-রচিত জানিয়া শান্তিলভ কর ।

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্ ।

যোগধারণয়াগ্ধেয়া দম্বা ধামাবিশং স্বকম্ ॥ (ভাঃ ১১।৩১।৬)

যোগিগণ আগ্ধেয়ী যোগধারণায় দেহ দম্ব করেন । শ্রীকৃষ্ণ লোকাভিরাম

ধারণাধ্যানের মঙ্গলস্বরূপ নিজতনু দন্ধ না করিয়া নিজধামে প্রবেশ করিয়া-
ছিলেন। আগ্নেয়া + অদন্ধা—শ্রীস্বামিপাদ টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চত্যাগকালে দেবগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তদ্বিশেষে
শ্রীভাগবতোক্তি—

সৌদামন্য যথাকালে যান্ত্য হি স্বাভ্রমণ্ডলম্।

গতিন লক্ষ্যতে মর্ত্তৈস্তথা কৃষ্ণস্ত দৈবতৈঃ ॥ (ভাঃ ১১।৩১।৯)

যেমন আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইয়া লোকচক্ষুর অগোচরে চলিয়া যায়—
কেহই তাহা দেখিতে পায় না, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ আকাশমার্গে উখিত
হইয়া কোন্‌দিকে অন্তর্দান করিলেন তাহা ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও অলক্ষ্য
হইয়াছিল।

অপ্রাকৃত-তনু যাদবগণের দেহত্যাগাদি ত অসম্ভবই হইবে। ষাঁহার।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপালিত, তাঁহাদেরও দেহনাশ অসম্ভব। যথা—

মর্ত্তোন্ যো গুরুত্বং যমলোকনীতং

ত্বাঞ্ছানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্তদন্ধম্।

জিগ্যেহস্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ

কিং স্বাবনে স্বরনয়ন মৃগয়ং সদেহম্ ॥ (ভাঃ ১১।৩১।১২)

যিনি যমলোকগত গুরুপুত্রকে পঞ্চজন-কর্তৃক ভক্ষিত যে দেহ, অবিকল
সেই নরদেহেই আনয়ন করিয়াছিলেন। যদি কেহ বলে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে
ইহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মাশাপগ্রস্ত যহ কুলরক্ষা তাঁহার পক্ষে
সম্ভব নহে, তজ্জন্ত বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্রহ্মতেজও কোন প্রভাব
বিস্তার করিতে পারে না, তাহার সাক্ষী তুমি (পরীক্ষিং)। তিনি ব্রহ্মাস্ত্রে
দন্ধ হইতেছিলেন, তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অধিক কি, তিনি মৃত্যুঞ্জয়
(যমের যম) মহাদেবকেও পরাজিত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে অস্রাঘাত
করিয়া জরা-নামক ব্যাধি অহুতপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সশরীরে বৈকুণ্ঠে
লইয়াছিলেন। তিনি কি নিজের বা নিজজন যাদবগণের রক্ষায় সমর্থ
ছিলেন না?

এস্থলে জিজ্ঞাস্য, যাদবগণ সশরীরে নিজধামে গমন করুন, কিন্তু তাঁহাদের
অন্তর্দানের পর শ্রীকৃষ্ণ কিছুকাল মর্ত্ত্যলোকে থাকিলেন না কেন? উত্তর—
যাদবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর সৌহার্দ্যহেতু কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া
থাকিতে পারেন না। এজন্ত ভাগবত বলিতেছেন—

তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়ে-

স্বনত্নহেতুর্দশেষশক্তিধ্বক্ ।

নৈচ্ছং প্রণেতুং বপুরত্র শেষিতং

মর্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্ ॥ (ভাঃ ১১।৩১।১৩)

যদিও অশেষ শক্তিধারী শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র হেতু, তথাপি নিজাশ্রিত জনগণের গতি প্রদর্শন করিবার জন্ত অবশেষে নিজ বপুও এজগতে রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই; কারণ যাদবগণ ছাড়া মর্ত্যজনের সহিত তাঁহার কি প্রয়োজন? অতএব যাদবগণের নিধনাদি মায়িক লীলাহেতু শ্রীভগবানের মত অন্তর্দ্বন্দ্বই সম্ভবপর। অত্যাধারণ জনের মত নিধন সম্ভাবনা করা যায় না।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ উদ্ধবের উক্তি—

মিথো যদৈষাং ভবিতা বিবাদো

মধ্বামদ্যাত্মবিলোচনানাম্ ।

নৈষাং বধোপায় ইয়ানতোহত্নো

মযুক্ততেহন্তর্দ্বন্দ্বতে স্বয়ং অ ॥ (ভাঃ ৩।৩।১৫)

মধুপানে মত্ত যাদবগণের পরস্পর বিবাদ তাহাদের বধোপায় নহে; যাদবগণের পৃথিবী পরিত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অভিমত,—এই যাদবগণের যদি পরস্পর বিবাদ ঘটে তাহাও ইহাদের পৃথিবী পরিত্যাগ বিষয় বধোপায় হইবে না। ইহারা যদি আমার ইচ্ছানুসারে স্বয়ং অন্তর্দ্বন্দ্ব করে, তবেই পৃথিবী ত্যাগ সম্ভব।

পার্ষদগণের ভগবদিচ্ছাক্রমে জন্মাদি হইয়া থাকে, একথা বিদুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—

অজন্ত জন্মোৎপথনাশনায়

কর্মাণ্যকর্তৃত্বং হণায় পুংসাম্ ।

নবন্তথা কোহহঁতি দেহযোগং

পরো গুণানামুত কর্মতত্ত্বম্ ॥ (ভাঃ ৩।১।৪৪)

প্রাকৃত-জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণের দুর্লভগুণের বিনাশের জন্ত আবির্ভাবরূপ জন্ম, আর সত্ত্বাদি-গুণহেতুক কর্তৃত্বরহিত তাঁহার কেবল লোক সংগ্রহার্থ জন্ম; অত্যা গুণাতীত কোন্ ব্যক্তি দেহ ধারণ করিতে এবং কর্ম বিস্তার করিতে যোগ্য হয়? এতদ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, শ্রীভগবানের প্রাকৃত জন্ম-কর্ম নাই, তাঁহার পার্ষদগণেরও তাদৃশ জন্ম-কর্ম নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের তিরোভাব-তিথিতে অভিভাষণ

প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ-নিরাস ও বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম

তচ্ছুদ্ধান। মুনয়ো জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তয়া ।

পশন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুত-গৃহীতয়া ॥ (ভাঃ ১।২।১২)

ভগবদ্ভক্তির লক্ষণ জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত । শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—“তদেব শ্রুত-গৃহীতয়া মুনয়ঃ শ্রদ্ধান। ইতি পাদত্রয়েণ তস্মা। এব ভক্তেদৌর্লভ্যং দর্শিতম্” । অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি কোন একটা স্থূলত মানসিক বৃত্তি নহে, পরন্তু অপর সাধারণপক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু । ভক্তির সংজ্ঞা প্রকরণে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন—“ভক্তি মোক্ষ-লঘুতাকুং এবং সুদুর্লভ ।” শুদ্ধভক্তগণ মোক্ষ-পদকে বা কৈবল্য-সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—“কৈবল্যং নরকায়তে” ইত্যাদি ।

অপ্রাকৃত “ভক্তি” যখন Sex religion অর্থাৎ প্রাকৃত ‘যৌনধর্ম’ নামে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা জগতে প্রচারিত হয়, তাহাতে শুদ্ধভক্তি-সমাজ কিরূপ দুঃখ অনুভব করেন, তাহা বিবেচনীয় । সর্বধর্ম-সমন্বয়বাদী কোন সাধক বা কল্লিত অবতার ভাগবত-ধর্মের যাজ্ঞন করিয়া নাকি স্ত্রী-ধর্মের দ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছিলেন (৭) । এইভাবে ভাগবত-ধর্মের অনেক অপবাদ এবং প্রাকৃত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে । তাহার কারণ এই যে, ভাগবত-ধর্ম বা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভুর প্রচারিত “প্রেমধর্ম” ভাগবতের নির্দেশানুসারে “শ্রুত-গৃহীতয়া” বিধি-বিষয়ে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন ।

শ্রীল জীব গোস্বামী-প্রভু তাঁহার গুরুবর্গের দ্বারা পরম্পরাস্বত্রে ভাগবত-ধর্মের দার্শনিক বিচার এবং সর্বোৎকর্ষত্ব প্রমাণ করিয়াছেন । “শ্রুত-গৃহীতয়া” বিষয়ে তিনি যে-সকল নির্দেশ দিয়াছেন, তাহার আচার ও প্রচারদ্বারাই শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভু-প্রবর্তিত অমল ভাগবত-ধর্ম সুরক্ষিত হইতে পারে ।

শ্রীল জীব গোস্বামী-প্রভুপাদ বলেন যে, “সদ্গুরোঃ সকাশাৎ বেদান্তাত্ম-খিল-শাস্ত্রার্থবিচার-শ্রবণদ্বারা যদিদিদ্বাবশ্যক-পরমকর্তব্যত্বেন জ্ঞায়তে ।” “সদ্গুরোঃ সকাশাৎ” অর্থাৎ সদ্গুরুর নিকট হইতে বেদান্তাদি অখিল-শাস্ত্রার্থ বিচার শ্রবণদ্বারা যে কর্তব্য নির্ণয় হয় তাহাই ভক্তিমার্গ, অত্থথা কৃষ্ণভক্তির নামে জগজ্জগাল উৎপাতের সৃষ্টি হয় ।

শ্রীল রূপ গোস্বামি-প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—শ্রুতি, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র, পুরাণাদি শাস্ত্রকে বাদ দিয়া ভক্তির নামে যে ছলধর্মের আবাহন করা হয়, তাহা উৎপাত সৃষ্টি করে মাত্র। যद्यপি ভক্তিরাজ্যের অপার মহিমাবশতঃ তত্তৎ-ছলধর্ম বা সহজিয়াবাদও প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদ অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরে, তথাপি সেই ছলধর্ম বা প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ শ্রীল গোস্বামিপাদগণ কখনও অনুমোদন করেন না।

শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুর পদাঙ্কানুসরণে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর আশ্রয় বিনা শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্মের প্রবেশ-অধিকার লাভ হয় না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার শ্রুতিবৎ প্রামাণিক সরল বাঙ্গলা গীতাবলীতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শ্রীল গোস্বামিগণের পদরেণুদ্বারা অভিষিক্ত না হইলে আমরা “রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব” বুঝিতে ভুল করিব। তিনি বলিয়াছেন,—

“এই ছয় গোসাঞি যার, মুই তার দাস।

তা’সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥”

“রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকৃতি।

কবে হাম বুঝব সে যুগল-পীরিতি ॥” ইত্যাদি।

অতএব গোস্বামিপাদগণের বিচার পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া যে প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ ‘রাধাকৃষ্ণ-ভজন’ নামে প্রচলিত, তাহাতে জগতের উৎপাত ভিন্ন কল্যাণ হইতে পারে না। রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতি—ভগবানে হ্লাদিনী-শক্তির লীলাবিশেষ; তাহা কোন প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষের ব্যভিচার নহে। শ্রীল জীবগোস্বামীর আজ্ঞানুসারে ‘সদ্গুরোঃ সকাশাৎ’ বেদান্তাদি অখিলশাস্ত্র-বিচার শ্রবণ না করিলে প্রাকৃত-সহজিয়াবাদই প্রচারিত হয় এবং আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষিত-সমাজ সেইসকল প্রাকৃত-সহজিয়াগণের আচরণ লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব-ধর্মকে ‘Sex religion’ অথবা ‘নেড়া-নেড়ীর’ ধর্ম বলিয়া কদর্থ করে। তাহাতে শ্রীল গোস্বামিপাদগণের সদ্ধর্ম-প্রচার বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ভগবদ্ভক্তি—নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপ্রেম-স্বরূপ। তাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণময় ব্যভিচার নহে। ভগবৎপ্রেম লাভ হইলে প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়তৃপ্তির লালসা কখনও মনে হইবে না। ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলেই আমাদের সংসার-বন্ধন। “কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া

ধরে ॥” যখনই জীব ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণ বাদ দিয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হয়, তখনই সে মায়াদ্বারা কবলিত হইয়া পড়ে। আবার যখনই সে নিজেই-তর্পণ পরিহার করিয়া ভগবদিন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হয়, তখনই সে ‘মুক্তিপদ’ ভগবানের শ্রীচরণ-সেবার অধিকার পায়।—

“আত্মেইন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি ‘কাম’।

কৃষ্ণেইন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা ধরে ‘প্রেম’ নাম ॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ‘মুক্তিপদের’ সংজ্ঞা দিয়াছেন—“মুক্তিহিত্বা অগ্ৰথা-
রূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।” শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও সনাতন-শিক্ষায় বলিয়াছেন—
“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।” সুতরাং ‘কৃষ্ণদাস’ যখন নকল
কৃষ্ণ হইবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করে, তখনই তাহাকে ত্রিশূলবিদ্ধ করিয়া
সংসার কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কৃষ্ণকে অনুকরণ করিয়া যে ইন্দ্রিয়-
তর্পণ বা সাধনসিদ্ধ-অবস্থায় কৃষ্ণের সহিত এক হইয়া যাওয়ার অপচেষ্টা
বা প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ, তাহা শ্রীল গোস্বামিপাদগণের প্রদর্শিত পথ হইতে
ভিন্ন। মায়াবাদ-কল্পিত নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান ভাগবত ধর্মের বিরুদ্ধ আচরণ।
শ্রীমদ্ভাগবত সেইরূপ বিরুদ্ধধর্ম নিরসনপূর্বক “ধর্মঃ প্রোজ্জ্বিতকৈতবোহত্র”
মন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষবাদী বা কর্মি-জ্ঞানি-যোগি-
গণের জ্ঞান ভাগবত-ধর্ম নহে। তাহাদের ধর্মসকল শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্মের
উপদেশক শ্রীল নারদমুনিদ্বারা “জুগুপ্সিত” ধর্ম বা নিন্দনীয় ধর্ম বলিয়া
উপলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীল নারদ-মুনির পদাঙ্কানুসরণপূর্বক শ্রীমদ্ ব্যাসদেব
মহামুনি ভাগবতের প্রথমেই বস্তুনির্দেশ-মঙ্গলাচরণে ধর্মার্থ কাম-মোক্ষবাঞ্ছাকে
প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীল ঐধরষামী ‘প্র’-শব্দে “প্রকৃষ্ট-রূপেন
মোক্ষবাঞ্ছাপি নিরন্তঃ” করিয়াছেন। ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছাযুক্ত ব্যক্তি কখনও
নির্ম্মৎসর হইতে পারে না; কারণ তাহারা সকলেই কামনাযুক্ত।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

“তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দান ॥”

কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করিয়া যাহারা অন্তিমে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্धानে প্রবৃত্ত
হইয়াছেন, তাহাদের বহু পূর্বেই কৃষ্ণভক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।
ঐরূপ অপসিদ্ধান্তদ্বারা চালিত হইয়া বাহ্যিক বৈষ্ণব-বেশ-ধারণই কৈতব-
ধর্ম; তাহা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভু-প্রদর্শিত এবং গোস্বামিপাদগণের বিচার-নৈপুণ্যে
সন্দর্ভ বা ভাগবত-ধর্ম নামে চলিতে পারে না।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ এতৎসম্পর্কে “সালোক্যাদি-সর্বপ্রকার-মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরন্তঃ” বলিয়াছেন। কৃষ্ণভক্ত নিকাম। কারণ ‘ভক্তি’-শব্দের অর্থই কৃষ্ণপ্রেম। প্রেম বিনা সেবা শুদ্ধ হয় না। কর্মি জ্ঞানি-যোগী নিকাম না হওয়ায় তাহারা কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম-লাভে অযোগ্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগৌরহনুরের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

“কৃষ্ণভক্ত—নিকাম, অতএব শান্ত।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ॥”

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত সকল কামনা-বাসনাই ইন্দ্রিয় তর্পণমূলক। ঐক্লপ অগ্ন্যভিলাষ-পরায়ণ কামুক ব্যক্তি কখনই অনুকূলভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না। প্রতিকূল কৃষ্ণচিন্তা কংসেরও ছিল। দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে—এই চিন্তায় অধীর হইয়া কংসের সর্বত্র এবং সকল সময়েই আহার-বিহার, শয়ন স্বপন, ঘরে-বাহিরে কৃষ্ণস্মৃতি হইত। সর্বত্র কৃষ্ণস্মৃতি হওয়া মহাভাগবতের লক্ষণ; কিন্তু প্রতিকূল কৃষ্ণচিন্তার জন্ত কংস কৃষ্ণ-ভক্তির অধিকারীই হন নাই। প্রতিকূল কৃষ্ণচিন্তার দ্বারা মোক্ষও প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু কৃষ্ণভক্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। “মুক্তিং দদাতি কহিচিং স ন ভক্তিয়োগম্”—ইহাই সাত্ত্বত-শাস্ত্রের বিচার।

কৃষ্ণবিদ্বেষী কংস-জরাসন্ধ প্রভৃতিকে কৃষ্ণ সাযুজ্য-মুক্তি পর্যন্ত দিতে পারেন। যে সাযুজ্য-মুক্তি পাইবার আশায় বড় বড় জ্ঞানি-সন্ন্যাসি-ঋষি-মুনিগণ বহু কষ্ট সাধনায় নিযুক্ত হন, সেই সাযুজ্য-মুক্তি কৃষ্ণ-বিদ্বেষী অসুর-গণও কৃষ্ণদ্বারা নিহত হইয়া প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কৃষ্ণ-ভক্তিয়োগদ্বারা, অনুকূল কৃষ্ণ-সেবাদ্বারা যে মোক্ষ-ফলাভিরহিত কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ব্রহ্মারও তুল্য বস্তু; তাহা কৃষ্ণ সকলকে সহজে প্রদান করেন না। “আনুকুল্যে কৃষ্ণানুশীলম্”ই কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়; সুতরাং সেই কৃষ্ণপ্রেম প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ নহে। অপ্রাকৃত পারকীয়-ভাব প্রাকৃত-ভূমিকায় আলোড়ন করিয়া যে কৃষ্ণানুসরণের পরিবর্তে কৃষ্ণানুকরণ-পদ্ধতি, তাহাই প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ ও মূল মৎসরতা। কৃষ্ণের প্রতি মৎসরতা করিয়াই বহুপ্রকার ছলধর্মের সৃষ্টি হইলেও তাহা গোস্বামিপাদগণের প্রবর্তিত নানাশাস্ত্র-বিচারপর সদ্ধর্ম নহে।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ সেই সদ্ধর্ম পালনকারীর সম্বন্ধে এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—

“যত এবাসৌ তদেকতাৎপর্যত্বেন নিষ্ঠংসরাগাং ফলকামুকশ্চৈব পরোৎকর্ষা-সহনং মৎসরতা তদ্রোহিতানামেব তদ্বপলগত্বেন পঞ্চালন্তনে দয়ালুনামেব চ সতাং সধর্মপরাগাং বিদীয়তে ॥”

অর্থাৎ সেই ভাগবত-ধর্ম একমাত্র কৃষ্ণ-সেবানুকূল তাৎপর্যজনিত ফল-কামনায়ুক্ত পরোৎকর্ষ-অসহনশীল মৎসরতা-পরিত্যাগপরায়ণ এবং পশুহিংসা-পর কর্মকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত স্বধর্ম-পরায়ণগণই পালন করেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্ভিমামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত স্বামী মহারাজ

মহাভারতের আবির্ভাব-কাল ও ইতিবৃত্ত

মুখবন্ধ বা সূচনা

মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্বেই রচিত হইয়াছে, ইহা সর্বজনপ্রসিদ্ধি এবং পরীক্ষিৎ-সভায় শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আলোচনা করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা। তথাপি জৈব-জগতের মঙ্গলের জন্ত মহাভারতের পঠন-পাঠন বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে। এমন কি, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকট-কালেও অবস্থার আনুকূল্য-বিচারে মহাভারতাদির পঠন-পাঠন হইত। শ্রীশুকদেব-শৌনকাদি ঋষিসকল শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত সর্বোত্তম অধিকারী মহাপুরুষগণের নিমিত্তই শ্রবণ-কীৰ্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বেদব্যাস স্বয়ং মহাভারত অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতকেই উন্নততম গ্রন্থরাজ বলিয়া বহুক্ষেত্রে বর্ণনা ও প্রমাণ করিয়াছেন।

ভক্তরাজ জনমেজয় তাঁহার পিতা পরীক্ষিৎ মহারাজের সভায় শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা-বিষয়ে সর্বতোভাবে অভিজ্ঞাত থাকিয়াও তিনি সর্প-নিধন-যজ্ঞের সময় মহাভারতের অধ্যয়ন প্রচারই মঙ্গলজনক বিবেচনা করিয়া ইহার পঠন-পাঠন প্রচলন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত হিংসা-দ্বেষণু নিৰ্ম্মংসর পারমহংস-সংহিতা বলিয়াই অনাদিকাল হইতে উপাসক-সম্প্রদায়ে আদৃত হইয়া আসিতেছে। পরমবৈষ্ণব-রাজা জনমেজয়ও জানিতেন যে, সকলেই ইহার অধিকারী নহে এবং উক্ত যজ্ঞেও ইহার আলোচনা সমীচীন নহে। আমরাও এ-স্থলে সর্বোত্তম ইতিহাস ও পঞ্চমবেদ-স্বরূপ মহাভারতের প্রচার-কামনায় নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি।—

শ্রীসূত গোস্বামীর নৈমিষারণ্যে উপস্থিতি

অতি প্রাচীনকালে নৈমিষারণ্য-তীর্থে শৌনকাদি ঋষিগণ দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। একদা দৈনন্দিন কর্ম সমাধানপূর্বক মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে সুখে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে লোমহর্ষণসুত পৌরাণিক সৌতি তথায় উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার নিকট হইতে ভগবৎকথা শ্রবণের নিমিত্ত চতুর্দিকে বস্তু করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। উগ্রশ্রবা সৌতি তাঁহাদিগকে যথোচিত অভিবাদনপূর্বক তপস্শা-কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা মাননীয় অতিথির যথাবিধি পূজার পর বসিবার নিমিত্ত আসন প্রদানান্তে নিজেরাও স্ব-স্ব-স্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সৌতি নির্দিষ্টস্থানে সুখে উপবিষ্ট

হইলে ঋষিগণ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে কোথা হইতে আগমন এবং কোন্ কোন্ তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়াছেন, সে-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীশ্রুত শান্ত-প্রকৃতি ঋষিদিগের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন,—হে মহর্ষিগণ ! আমি মহাত্মা জনমেজয়ের সর্প-নিধন-যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় বৈশম্পায়নমুখে কৃষ্ণদৈশায়ন বেদব্যাসপ্রোক্ত মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করি। তথা হইতে বহির্গত হইয়া বহু তীর্থ দর্শন ও আশ্রমাদিতে ভ্রমণ করত পরিশেষে কুরু-পাণ্ডবের সংগ্রামস্থল স্তমন্তপঞ্চক-তীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথা হইতে আপনাদিগের দর্শনের নিমিত্ত এই পবিত্রক্ষেত্রে আসিয়াছি। সম্প্রতি ধর্ম্মনস্বদ্বীয় পৌরাণিকী কথা, অথবা ঋষিগণের ইতিহাস, ইহার মধ্যে কোন্ বিষয় বর্ণনা করিব, অনুমতি করুন। ঋষিগণ কহিলেন,—ভগবান্ বেদব্যাস-মুনি যে মহাভারতীয় ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন, সুর ও ব্রহ্মর্ষিগণ যাহার শ্রবণে অশেষ প্রশংসা করেন, আমাদের সেই বিষয় শ্রবণ করিতে সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে ; কারণ যাহা সকল উপাখ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ ও বেদাদি নানাশাস্ত্রের সার-সঙ্কলন করিয়া রচিত এবং যাহাতে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক সম্যক্ মীমাংসা আছে, তাহা শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিলে অবশ্যই মৃত্যুভয় নিবারিত হইবে।

মহাভারতের আলোচ্য বিষয়

শ্রীশ্রুত গোস্বামী কহিতে লাগিলেন,—যিনি অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি স্বাবয়ব-জঙ্গমাত্মক নিখিল জীবের স্রষ্টা ও পালয়িতা, শাস্ত্র যাহাকে একমাত্র পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করেন, যাহার প্রীতির নিমিত্ত যাজ্ঞিকগণ প্রজ্জ্বলিত হতাশনে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতেছেন, যাহার সাক্ষাৎকার লাভাশায় যোগি-তপস্বি-মুনিগণ শতসহস্রবর্ষ একান্তমনে ধ্যান, মনন, তপস্যা, কঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠানে তৎপর, বিরক্তগণ মায়াপ্রপঞ্চ-স্বরূপ সংসারে বিরক্তিতাব প্রকাশ-পূর্ব্বক যাহার উপাসনার নিমিত্ত প্রিয় আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগান্তর অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন—এইরূপে সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা, পরমধন সেই পরতত্ত্ব লাভের জগু লোকে অতি দুষ্কর কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হইতেছে, সেই অনাদি অনন্ত চরাচরগুরু শ্রীহরির চরণে প্রণতি জানাইয়া বেদব্যাস-প্রণীত পরম-পবিত্র বিচিত্র ইতিহাস বর্ণন করিতেছি। এই বিশাল বিশ্বে মহাত্মগণ ঐ ইতিহাস বলিয়া গিয়াছেন, বলিতেছেন ও ভবিষ্যতেও বলিবেন। জ্ঞানের

পরিসীমা বেদশাস্ত্রের অনুগত করিয়া এই ইতিহাস মহামুনি কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস-কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে লৌকিক আচার ব্যবহারের রীতি নীতি ও নিখিল শাস্ত্রের অভিমত স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ; ইহা ভগবদ্-গুণগাথাসূচক সূচাক শব্দ ও রমণীয় বাক্যাবলীতে পরিপূর্ণ এবং বিবিধ ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ ও অলঙ্কৃত। এজন্ত তত্ত্বদর্শিগণ মহাভারতের বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন।

শ্রীবেদব্যাসের ত্রিকালজ্ঞত্ব

সৃষ্টির আদিতে এই বিশ্ব সংসার ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল ; অনাদি-অনন্ত, অনির্কচনীয় সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিকরূপে অবস্থিত থাকিয়া প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তৎপর স্বায়ম্ভুব মনু, প্রচেতা, দক্ষ, সপ্তর্ষি, চতুর্দশ মনু, দশ বিশ্বদেব, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যক্ষ, পিশাচ, গুহক, পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন ; পরে পৃথিবী, বসু, আকাশ, দশদিক, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি ও অপরাপর সকল বস্তু সৃষ্ট হইল। প্রলয়-কাল উপস্থিত হইলে এই বিশাল বিশ্ব সেই পরব্রহ্মে স্ফুল্ভভাবে অবস্থিত হয়, আবার যুগ-প্রারম্ভে জীব-জন্তু সকল পদার্থই স্ব-স্ব আকার ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ প্রলয়, উৎপত্তি ও স্থিতিদ্বারা সংসারচক্র নির্দিষ্টপথে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। এই যে জীবাদি সৃষ্ট হইল ইহাদিগের অবস্থিতি রহস্য, চারিবেদ, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্রাদি—এ সকলই মহাত্মা বেদব্যাস ত্রিকালজ্ঞবিধায় যোগবলে বিশেষ অবগত ছিলেন। এই মহাভারতে অশেষ ইতিহাস, বেদ-প্রতিপাদ্য সনাতনধর্ম্ম এবং তত্ত্বজ্ঞান বিস্তৃত ও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কৃতবিদ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ মহাভারতের একটি পর্ক, আবার কেহ বা ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম অনুধাবনপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে ইহার প্রচারে ব্রতী হন ; কেহ ইহার ব্যাখ্যায় স্ননিপুণ, আবার কেহ বা ইহার ধারণায় বিশেষ পারঙ্গত। শ্রীবেদব্যাস তপোবলে সনাতন বেদশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া এই পবিত্র ইতিহাস রচনা করেন।

শ্রীব্যাসের মহাভারতের লেখক অনুসন্ধান

রচনা করিবার পর কি-প্রকারে শিষ্যদিগকে ইহা অধ্যয়ন করাইবেন—মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীব্যাসের প্রীতিবর্দ্ধন ও লোকহিত-সাধনের নিমিত্ত তথায় আবিভূত হইলেন। ব্যাস-দেব তাঁহার দর্শনমাত্র অতীব বিস্মিত হইয়া সমস্ত্রমে তাঁহাকে বসিবার

নিমিত্ত আসন প্রদান করিয়া অতি বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অতঃপর প্রজাপতির আদেশে বেদব্যাস তৎসন্নিধানে প্রীতমনে উপবেশনপূর্বক সবিনয়ে নিবেদন করিলেন,—আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি ; তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদের সারসঙ্কলন, ইতিহাস-পুরাণের অনুসরণ এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছি ; জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব, বিবিধ ধর্ম ও আশ্রম-লক্ষণ, চাতুর্কর্ণ্যবিধান, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদিরও বিবরণ প্রদান করিয়াছি ; ভূতভাবন ভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য ও মহুষ্ঠাকারে জন্ম স্বীকার করেন তাহার তত্ত্বানু-সন্ধান, অতি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থানাদির বিবরণ ও মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছি ; নদ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবনাদির সংস্থান, যুদ্ধকৌশল লোকযাত্রাদির বিবরণও প্রসঙ্গক্রমে নিরূপণ করিয়াছি। কিন্তু এই বিশ্বে ইহার একজন উপযুক্ত লেখক অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছি না। তখন ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস ! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহানুভব মুনি আছেন, কিন্তু তুমি বিশেষভাবে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া তাঁহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তুমি জন্মাবধি সত্য ছাড়া কখনও মিথ্যা ব্যবহার কর নাই এবং সর্বদা বৈদিক বাণী উচ্চারণ করিয়া থাক ; এক্ষণে যখন তোমার স্ব-প্রণীত মহাভারতকে কাব্য বলিয়া নির্দেশ করিলে, তখন ইহা কাব্য বলিয়া পরিগণিত ও বিখ্যাত হইবে ; তোমার এই কাব্য অগ্ৰাণ্য কবির কাব্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে গণেশকে স্মরণ কর, তিনি তোমার লেখক হইবেন।

গণেশকে ভারতের লেখকরূপে প্রাপ্তি

ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে ভগবান্ সত্যবতীনন্দন গণেশকে স্মরণ করিলেন। স্মৃতিমাত্রেই গণপতি তথায় উপস্থিত হইলে ব্যাসদেব ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার যথোচিত সৎকার ও আসন প্রদানপূর্বক কহিলেন,—হে গণাধিদেব ! বিশুদ্ধ সমাধিলব্ধ মনঃসঙ্কলিত মহাভারতাত্ম্য গ্রন্থ আমি অবিকল বলিতেছি ; আপনি তাহার লেখক হউন। বিঘ্নবিনাশন গণেশ বেদব্যাসের এই কথা শুনিয়া কহিলেন,—মুনে ! যদি লিখিবার সময় লেখনী ক্ষণমাত্র বিশ্রামলাভ না করে, তাহা হইলে আমি আপনার লেখক হইতে পারি। ব্যাসদেব কহিলেন,—হে বিনায়ক ! কিন্তু আমি যাহা বলিব তাহার যথার্থ অর্থবোধ না করিয়া আপনিও তাহা লিখিতে পারিবেন না। গণপতি তাহাতেই সন্তুষ্টি প্রদান করিলেন। এই কারণে বেদব্যাস স্থানে স্থানে গ্রন্থ গ্রন্থিধরূপ

কুট শ্লোক রচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন যে, এই ভারত-গ্রন্থে অষ্ট-সহস্র অষ্টশত এইরূপ শ্লোক আছে, কেবল শুকদেব ও আমি যাহার ভাবার্থ সঙ্কলন করিতে পারি ; অস্পষ্ট বলিয়া ঐ ব্যাসকুটের অত্মপি কেহ অর্থ করিতে পারেন নাই। অধিক কি, গণেশ সর্বজ্ঞ হইলেও, লিখিবার সময় সেই সকল শ্লোকের অর্থবোধ করিবার নিমিত্ত ক্ষণকাল চিন্তিত হইতেন। ইত্যবসরে ব্যাসদেব বহুতর নূতন শ্লোক রচনা করিতেন।

মহাভারতের মহিমা

প্রথমতঃ সকল লোক অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু মহাভারতরূপ জ্ঞানাজন-শলাকা সেই আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছে এবং ভারত-রূপ দিবাকর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সংক্ষেপ ও সবিস্তরে কীর্তন করিয়া জীবলোকের মোহান্ধকার নিরাকরণ করিয়াছে। পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া ক্ষতিশূন্য জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়াছে ; তদ্বারা লোকের বুদ্ধিরূপ কুমুদ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। মোহ-তিমির নিরাস করিয়া এই ইতিহাস-স্বরূপ উজ্জল প্রদীপ এই বিশাল বিশ্বরূপ বাসগৃহকে আলোকিত ও সুপ্রকাশ করিয়াছে।

মহাভারত-বৃক্ষের বিষময় ও অমৃতফল

এই মহাভারত পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট একটি বৃক্ষস্বরূপ। সংগ্রহাধ্যায় ইহার বীজ, পৌলোম ও আত্মিক ইহার মূল, শল্যপর্ব অগ্রভাগ, সভব পর্ব স্বল্প, সভা ও অরণ্য ইহার কোটর, অরণীপর্ব পর্বস্বরূপ, বিরাট ও উদ্‌যোগপর্ব ইহার সার, ভীষ্মপর্ব শাখা, দ্রোণপর্ব পত্র, কর্ণপর্ব পুষ্পস্বরূপ, শল্যপর্ব স্নগন্ধ, স্ত্রী ও ঐষিকপর্ব ইহার সুশীতল ছায়া, শান্তিপর্ব ইহার মহাফল, অশ্বমেধ অমৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্ব ইহার আশ্রয়স্থান। যেরূপ মেঘ সকলের উপজীব্য, তদ্রূপ এই ভারত-বৃক্ষ উত্তরকালে সকল কবিকুলের উপজীব্য। মহাভারতের দুর্ধ্যোধন—ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ স্বল্প, শকুনি শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন ফল ও পুণ্ড, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জুন স্বল্প, ভীমসেন তাহার শাখা, নকুল-সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল, কৃষ্ণ পরব্রহ্ম ও তত্ত্বত্ব বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।

মহাভারত রচনার সুপ্রাচীন ইতিবৃত্ত

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিহুর লোকান্তরে গমন করিলে মহর্ষি নরলোকে এই পবিত্র ভারত প্রচার করেন। পরে সর্পযজ্ঞকালে রাজা জনমেজয়

ও অপরাপর ঋষিগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ব্যাসদেব বৈশম্পায়নকে মহাভারত বর্ণনার জন্ত অনুমতি করায় তিনি সেই মহতী সভায় উহা কীর্ত্তন করেন। কুরুবংশীয়দিগের ইতিবৃত্ত, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিতুরের বুদ্ধি, কুন্তীর ধৈর্য্য, ভগবান্ বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সরলতা, ধৃতরাষ্ট্রদিগের দুর্বৃত্ততা—কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন এই সকল বিষয় সविশেষ বর্ণন করিয়াছেন। ভারত-সংহিতা প্রথমতঃ চতুর্বিংশতি-সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয়। তাহাতে উপাখ্যান-ভাগ এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরিশেষে মহর্ষি সার্কশত-শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় মহাভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার-সঙ্কলন করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস এই মহাভারত প্রণয়ন করিয়াই সর্বাত্রে তাঁহার প্রিয় শিষ্যমণ্ডলীকে উহা অধ্যয়ন করান। তিনি ষষ্টিলক্ষ শ্লোকায়ুক্ত এক ভারত সংহিতাও রচনা করিয়াছিলেন। ঐ ষষ্টিলক্ষের মধ্যে ত্রিংশৎলক্ষ দেবলোকে, পঞ্চদশ পিতৃলোকে, চতুর্দশ গন্ধর্ব্বলোকে এবং নরলোকে শতসহস্র শ্লোক অত্যাঁপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই মহাভারত অধ্যয়ন করিলে পাপের নাম ও পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। অধিক কি, শ্লোকের এক চরণ উচ্চারণ করিলেও পাপভয়ের নিবারণ হয়। এই গ্রন্থে মনুষ্য, দেবতা, ঋষি প্রভৃতির ধর্ম্মাদি বিশেষভাবে নিরূপিত হইয়াছে। যিনি পরমপবিত্র পরব্রহ্ম, ঐহার তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপাদি সতত অনুষ্ঠিত হয়, সেই ভূতভাবন ভগবান্ বাসুদেবের স্মরণিত এই গ্রন্থে সম্যকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্মপরায়ণ পরমশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক এই ভারত অধ্যয়ন করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হন এবং সত্য ও অনৃত উভয়ই ইহাতে লাভ হয়। যেরূপ দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রহ্মণ্যদেবোপাসক ব্রাহ্মণ, বেদ-চতুষ্ঠয়ের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ ইতিহাসের মধ্যে বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারত উৎকৃষ্ট। সাত্ত্বতগণ মহাপ্রসাদ দ্বারা পিতৃ-পুরুষগণের পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে ভারত-সংহিতা অন্ততঃ এক চরণ পাঠ করিলেও পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হন। যিনি প্রতি পরীাহে পুত্রমনে ইহার কতিপয় অধ্যায় আবৃত্তি করেন, তাহার সমগ্র গ্রন্থপাঠের ফললাভ হয়। যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে এই মহাভারতীয় শ্লোক শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া ভগবন্তক্তি আচরণপূর্ব্বক অন্তিমে তল্লোকে আত্মসংযাম করেন।

— ত্রিদিগ্ভিষ্মু শ্রীভক্তিবেদান্ত রামান

সন্ন্যাসী

দ্বিতীয় সর্গ

(১১)

ক্রোধবশে অসি-করে 'নেলসান' বীর,
কোপেতে অন্তর তার হয়েছে অধীর,
উঠিলা প্রাচীরে তবে; ডাকিলা তখন
সে ছুঁই বিপক্ষ বীরে করিবারে রণ।
ধাইলা ছরন্তু রিপু করিতে সমর,
উলঙ্গিত অসি তার শোভিতেছে কর
যেমতি সে পুরাকালে দ্রোণের নন্দন
চন্দ্রচূড়-সহ করিবারে মাগে রণ,
সেইরূপ এ ছুরাত্মা "নেলসান"-সহ
করিতে আইলা দ্রুত সম্মুখ-বিগ্রহ !
শীঘ্র আসি' মারে তবে খরষান অসি,
'নেলসানের' অঙ্গ-বস্ত্রে গেলা তাহা পশি'।
হাসিয়া সে বীরবর ধরে তার হাত,
বক্ষে তার মারে, যে অশনি-আঘাত !
অচেতন হ'য়ে পড়ে মুষল ইমান,
তুলে তার হস্ত ধরি' বীর 'নেলসান';
নিষ্কপে প্রাচীর হ'তে। ছড় মুড় স্বরে
পড়িলা ছরন্তু বীর ভূমের উপরে
নতশির, ভেদি বায়ু-দৃষ্টি ভয়ঙ্কর !
কাঁপিলা ভয়েতে তবে যতেক পামর।
সেদিনের মত সবে ভঙ্গ দিলা রণে,
রণবার্তা ল'য়ে গেলা 'নানা'র সদনে;
বলিলা ছুর্মতি-'নানা,'—ধিক্ বীরগণে,
ধিক্ তোমাদের অসি ! না পারিলা রণে
মারিতে সে কয়জন ইংরাজ-সন্তান,
বিদেশে আসিয়া তারা এত বলবান ?
কালি প্রাতে পুনরায় কর আক্রমণ
সে ছুঁই প্রফুল্ল-মনে, করি প্রাণপণ।
নীরবিলা 'নানা' ক্রুর তখনি ঘোষিলা
সর্বদিকে—এই কথা ছুঁইতে পশিলা।

শুনিয়া এ সব বার্তা দুর্গবাসিগণ,
ভয়েতে কাতর হ'য়ে করিলা রোদন ॥

(১২)

দিবাকর চলি' গেলা পশ্চিম-অচলে
কাটাইতে নিশাকাল । অতি কোলাহলে
দক্ষিণ বিভাগ কম্প হইলা তখন,
পুনরায় যেন তথা আরম্ভিলা রণ
ভুরন্ত বিদ্রোহীগণে ; চমকি অমনি
উঠিলা সেনানী সব, শুনি রণ-ধ্বনি !
যেমতি বিবরে শুয়ে থাকে পশুপতি,
শুনিয়া ব্যাধের বাঁশি ধায় বায়ুগতি
সচকিত ক্রোধভরে, তেমতি তখন
উঠে সেনাপতি বীর করিবারে রণ !
অবলা স্ত্রীলোকগণ দেখিলা আবার
চতুর্দিকে সীমাহীন দুঃখ পারাবার !
কাঁদিলা মনেতে পুনঃ হায়রে ! কি লাগি
আইলু আমরা হেথা হ'য়ে দেশত্যাগী !
পাইব এতেক দুঃখ জানিতাম যদি
তবে কি হইয়া পার এত নদ-নদী,
সমুদ্র-মহানা, আর দেশ কতশত—
আসিতাম হিন্দুস্থানে হইবারে হত !
যবে মম প্রাণনাথ कहিলেন আসি,—
“চল প্রিয়ে ! হ'ব মোরা পূর্বদেশবাসী,
সদাই সুখের মুখ দেখিব তথায় ;
শুনেছি সে-দেশে লোক দুঃখ নাহি পায়,
না জানে অভাব-জ্বালা ; নাহিক শীতল
সমীরণ প্রহরণ, আকাশ নির্মল
থাকে সদা মেঘহীন, রহিত তুষার,
কুজাটিকা নাহি করে দেশ অন্ধকার ।”
তখনি कहিহু তাঁরে করিয়া বিনয়,—
“মৃগতৃষ্ণা মাত্র ইচ্ছা বিদেশে নিশ্চয় !

বিদেশে কেবল, নাথ ! পাইবে অসুখ,
 ভাগ্যদেব কভু কভু হইবে বিমুখ” ;
 কত যে বুঝানু তাঁরে কথার ছলনে,
 রহিতে সাধিনু দেশে সুমিষ্ট বচনে ;
 তবু না বুঝিলা নাথ, লইয়া আমাদের
 আসিলেন দেশান্তরে কৃতান্ত-আগারে ;
 কহিতে নারিলা আর শোকে বদ্ধস্বর,
 অমনি নয়নে বারি ঝরে ঝর ঝর ॥

(১৩)

“রোদন না কর আর দুর্গবাসিগণ”—
 উচ্চারিলা দৈববাণী ; নিশীথে স্বপন
 জাগায় নিদ্রিতে যেন, সেইরূপে তবে
 সচকিত করিলেক দুর্গবাসী সবে ।
 কতক্ষণ পরে তবে প্রকাশ হইল,
 মানসিংহ দলবলে তথায় আসিল
 রাখিতে সে দুর্গবরে ; উদিল তখনি
 দুর্গবাসিগণ-মনে আশা-দিনমণি—
 নাশি’ ত্রাস-অঙ্ককারে । যেন পুরাকালে
 [যবে সত্যব্রত (নোয়া *) দেখিলা অকালে
 প্রলয়ের ভীম মুখ] জল-কুলেশ্বর
 ডুবাইলা ধরা, আর অচল বিস্তর !
 তবে মৎস্যরূপী দেব মেঘে আদেশিলা
 বিশ্রামিতে কিছুকাল, সাগর ফিরিলা
 আপন সীমার মাঝে, উচ্চাচলে যারা
 আছিল। প্রাণের ভয়ে, দেখিলেক তারা
 প্রলয়ের নিবারণ ; আনন্দে মাতিলা
 তবে যে যাহার স্থানে, গৃহ আরস্তিলা
 তেমতি এ দুর্গবাসী, গুনিলা যখন
 আসিয়াছে মানসিংহ করিতে রক্ষণ

* হিন্দুশাস্ত্রে যিনি সত্যব্রত নামে বিদিত
 বাইবেল-গ্রন্থে তিনিই নোয়া বলিয়া কথিত আছেন ।

সে-সবারে ; সেইরূপ উপজিলা সুখ
সে-সবার অন্তরেতে, পলাইলা দুঃখ ।
হায়রে ! বিভূর কিবা মহিমা অপার,
সুখ হয় চতুর্গুণ দুঃখ হলে পার !!

(১৪)

ওই দেখ, পলাইছে বিদ্রোহী সেনানী
ছাড়িয়া এ দুর্গ-আশা ; কেন নাহি জানি,
বুঝি মানসিংহ-ডরে পলাইছে সবে,
শৃগাল পালায় যেন সিংহ দেখে যবে ।
কত ব্যস্ত উঠাইছে বৃহৎ শিবির
কত ব্যস্ত অস্ত্র ল'য়ে সরে যত বীর !
কেনরে নির্বোধ 'নানা' পালাবি এখন,
কেন তুই আরস্তিলি এ প্রকার রণ ?
না জান সত্যের কভু ধ্বংস নাহি হয়,
অধর্ম্যে সকল নষ্ট,—সর্বশাস্ত্রে কয় ;
ধিক্ তোরে নরাদম ছরন্তু পামর,
ধিক্ তোরে বংশ, আর জননী-জঠর !
তোরে কার্য্য মনে হ'লে শোণিত শুকায়,
অবলা-বালক মারি' কি হইল হায় !
সেই কুন্তীপাক ঘোর কৃতান্ত-নগরে—
রহিয়াছে মুখ মেলি,' ছুট ! তোরে তরে !!

(১৫)

দেখিয়া রণের শেষ সন্ন্যাসী চলিলা,
ত্যজি'কত দেশ হিমালয়ে উত্তরিলা —
ধবল-বরণ-গিরি তুষারে ভূষিত,
দেবতা-নিবাস সদা জগতে বিদিত ;
শত শত শৃঙ্গ শোভে তারকা যেমতি,
নির্ম্মল আকাশে শোভে সহ নিশাপতি ।
এমন নির্জ্জন স্থানে ঈশ্বরের ভাব,
ভাবুকের অন্তরেতে হয় আবির্ভাব !
ভক্তির সলিলে চিত্ত ডুবে একেবারে,
বাহু বোধ নাহি থাকে মানস-আধারে ।

কিছুকাল গ্রাসীবর রহিলা তথায়,
মন তার মগ্ন সদা দীপ্ত-চিত্তায় ॥

(১৬)

তোমার চরণে নমি সন্ধ্যাসী-প্রবর !
বিদায় মাগিছে এবে ক্ষুদ্র কবির ;
তব সহ এতকাল করিয়া ভ্রমণ
ক্ষমা মাগি, দোষ যদি পেয়েছ কখন ;
থাক এই হিমাচলে থাক কিছুদিন,
চলিলাম দেশে ফিরে আমি বলহীন ।
বঙ্গদেশবাসী আমি—অতি ক্ষীণবল,
থাকিলে তুমার-মাঝে হইব অচল ।
যদি অবকাশ পুনঃ হইবে আমার,
অবশ্য তোমার সঙ্গ লইব আবার ;
নতুবা এ নমস্কার জানিবে হে শেষ,
এইমাত্র নিবেদন জানিবে বিশেষ ॥

সমাপ্ত

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

প্রচারকের ডায়েরী

ভক্তজন-প্রাণে চিরাচরিত দোলোৎসবের সাড়া জাগিল । তাই তত্ক্ষণে
মাদৃশ অযোগ্য অনভিজ্ঞের উপর প্রচারের গুরু দায়িত্বের ভার অর্পিত হইল ।
শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি সঞ্চল করিয়া সুদূর সুন্দরবনের পথ ধরিলাম । কৈশোরের
স্বপ্নরচিত বনটি বর্তমানে বাস্তবতায় রূপায়িত করিবার আশায় বুক বাঁধিলাম ।
ভূগোলের পাতায় আঁকা 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারের' ছবি দেখিয়া একদিন
ভয়ে-আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম । কিন্তু আজ আর সে ভীতির
ভাব নাই, আকুল-আগ্রহে উদ্দীপনায় অন্তর স্ফীত হইয়া উঠিল । বিপুল
আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলাম ।

সীমান্তে প্রথম পদক্ষেপে নয়নগোচর হইল এক বিরাট নদী । কপোতাক্ষের
শ্রায় স্বচ্ছজলরাশি কুল কুল রবে বহিয়া চলিয়াছে । দিগন্তে কাল
সীমারেখা বনভূমির সাক্ষ্য দিতেছে । নদীগর্ভে লঞ্চ-নৌকা দুইই চলে ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন লক্ষ প্রাপ্তি ভাগ্যে ঘটিল না, নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। শ্রোতের অনুকূলে দাঁড়ি-মাঝিরা দাঁড় হাঁকাইয়া চলিল। একখানি জীর্ণশীর্ণ পালও অগ্রগমনে সহায়তা করিতে লাগিল। নৌকায় যাত্রীর অসম্ভব ভীড়, কোনরূপে বসিবার মত একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া লইলাম। তৃষ্ণায় বুদ্ধের ছাতি শুষ্ক হইবার উপক্রম হইল। জলের উপর বসিয়া থাকিলেও উহা দ্বারা পিপাসার শান্তি হইল না, কারণ উহা তীব্র লবণাক্ত। অতিক্রমে জীবন ধারণ করিয়া দিনান্তে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে উপনীত হইলাম। নৌকাকূলে পৌঁছাইলেও তীরের নাগাল মিলিল না। তট হইতে তীরের ভীতিপ্রদ ব্যবধান। কূলে নামিতেই জানুযুগল ধীরে ধীরে পক্ষে প্রবেশ করিল। ব্যাঘ্রের স্তবর্ণ-কঙ্কণের লোভে পক্ষ-নিমগ্ন পথিকের যেমন দুর্দশা ঘটিয়াছিল, আমারও তেমনই দশা প্রাপ্তি হইল, মনের কোণে উঁকি মারিতে লাগিল—“এখনই বুঝি সেই পাঠ্যপুস্তকের ‘রয়েল বেঙ্গল টাইগারের’ আবির্ভাব হইবে! হায়, একি নিয়তির নির্ভুর পরিহাস!”—ভয়ে বক্ষ দুৰু দুৰু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। যখন দেখিলাম—তীরে অসংখ্য মনুষ্যের সমাগম, নক্ষত্রপঞ্জের স্থায় অগণিত সন্ধ্যাদীপ জলিয়া উঠিল ;—কোন নরখাদকের সন্ধান পাওয়া গেলনা, তখন যেন একপ্রকার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল। কোনক্রমে বহু পরিশ্রম-সহকারে তীরে উঠিলাম :

কোন গুরুভ্রাতার গৃহে অবস্থানের জন্ত উদ্যোগপূর্বক শুরু হইল। সঙ্গে নান বিধ আসবাবপত্রাদি থাকায় বড়ই বিপদাপন্ন হইলাম। অর্থের বিনিময়ে বাহকের স্বেযোগ ভাগ্যে জুটিল না। দুইজন ব্রহ্মচারী কেবলমাত্র আমার অজানা-পথের সঙ্গী। তাহাদের সাহায্যে কিয়দূর অগ্রসর হইতেই অযাচিত-ভাবে জৈনৈক পথচারী সাহায্যদানের আবেদন জানাইল। তন্মুহুর্তে হৃদিস্থিত অন্তর্যামীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ভগবৎ-সেবায় য দি আমরা জীবনপণ করিয়া অখিলচেষ্ঠাবিশিষ্ট হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি দয়াপরবশ হন—ইহার তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে সক্ষম হইলাম। নির্ঝিন্বে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলাম। গৃহস্থামীও অভ্যাগতের সম্বন্ধনার্থ কিঞ্চিন্নাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। পথক্রান্তি অপনোদনের জন্ত কয়েকদিনের বিশ্রামের প্রয়োজন হইল। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে মনোনিবেশ করিলাম।

জনবিরল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে কোন কোন শ্রদ্ধালু ব্যক্তির নিকট

হইতে ডাক আসিতে লাগিল। সেখানে এমন পল্লীও নজরে পড়িল, যেখানে ‘ভাগবত’ বলিতে কি বুঝায় তাহা তাহারা জানে না। এমনি এক ‘ভাগবত’-শব্দানভিজ্ঞের গৃহে পাঠের আয়োজন হইল। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের স্মরণান্তর শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ প্রসঙ্গে সর্বাত্রে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্য ভাগবতের বচন উদ্ধৃত করিলাম,—“ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্ত-জনে। চতুর্দ্বা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥” শ্রীমদ্ভাগবত যে সামান্য পাঠ্য-পুস্তক নহে—ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীভগবানের অর্চাবতারজ্ঞানে গ্রন্থ-রাজের সম্মান না করিলে অনন্ত-নিরয়গামী হইতে হয়, পক্ষান্তরে কৃষ্ণপ্রাপ্তিও সুদূর-পরাহত। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

“স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যদ্বাত্মা সম্প্রসীদতি ॥”

* * * *

“যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপান্না হ্যাত্মনরুয়ে।

অঞ্জঃ পুংসামবিহুষণং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥”

অর্থাৎ যাহা হইতে অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি জন্মে ও আত্মা সুপ্রসন্ন হয় তাহার নাম পরোধর্ম বা ভাগবত ধর্ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎস্বরূপপ্রাপ্তির জন্ত স্বয়ং যে-সকল উপায় উপদেশ করিয়াছেন, হে সৌম্য! অজ্ঞানী জীবের পক্ষে সেই সমস্ত উপায়ই ভাগবত ধর্ম বলিয়া অবধারণ কর। এই ভাগবত ধর্মের বিবরণ যে-গ্রন্থে কৃপাপূর্বক বিশদভাবে বর্ণিত, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত। অনন্তর নবযোগেন্দ্র-সংবাদে কিয়দংশ পরিবেশন করিলাম।

একদা বিদেহরাজ নিমির যজ্ঞস্থলে ঋষভদেব-পুত্র নবযোগেন্দ্র উপস্থিত হইলেন। রাজা যথাযোগ্য সম্মানপুরঃসরঃ কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই প্রশ্ন নয়টি যথা,—প্রথম আত্যন্তিক ক্ষেমপ্রদ ভগবদ্বর্ষ, দ্বিতীয় ভক্তের স্বরূপ, তৃতীয় মায়া-র স্বরূপ, চতুর্থ মায়া-উত্তরণের উপায়, পঞ্চম ব্রহ্মস্বরূপ, ষষ্ঠ কর্ম, সপ্তম অবতারলীলা, অষ্টম ভক্তের প্রাপ্তব্য নির্ণয় এবং নবম দুর্গধর্ম কাহাকে বলে। ইহা অন্ন-বিস্তর আলোচনার পর পাট-কীর্তন স্বগিত হইল। গৃহস্থামী শ্রীমদ্ভাগবত যে কি বস্তু, এতদিনে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিলেন। পুনরায় বৎসরান্তে তাহার পর্ণকুটিরে পদার্পণের নিমন্ত্রণ দিয়া রাখিলেন এবং সাতিশয় কুল্লমনে যথাযোগ্যোপহারে আমাদিগকে বিদায় জানাইলেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমুখী মহারাজ

গৌড়ীয়ের ষোড়শ বর্ষ

‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ বিত্ত্ব গৌড়ীয়। ‘গৌড়ীয়’-শব্দের দ্বারা পঞ্চগৌড় বুঝাইলেও বাংলাদেশই তাহার ঋটি। তথাপি বাংলাদেশ বলিতেও যাহা আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি, গৌড়ীয় বলিতে তাহার শীর্ষদেশকে লক্ষ্য করে। ‘গৌড়ীয়’ বলিতে গৌড়-দেশীয় কোন বস্তু বা ব্যাপারকে বুঝায়। কিন্তু ‘গৌড়ীয়’-শব্দটি কোন দেশ, কাল বা পাত্রকে না বুঝাইয়া তাহার অতীত কোন এক বিত্ত্বসম্বন্ধ তত্ত্বকে লক্ষ্য করে। ভ্রান্তগণকে বিত্ত্বসম্বন্ধ-তত্ত্বকে বুঝাইতে হইলে নিগূর্ণ-শব্দ্যতীত অত্য়কোন শব্দ বেদ বা বেদানুগ শব্দশাস্ত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণ অপ্রাকৃত বিশেষত্বপূর্ণ নির্বিশেষ বিচারকে নৈগূর্ণ্য বা ব্যতিরেক ধারণায় বস্তুজ্ঞান করা যাইতে পারে। নিগূর্ণ্য বলিতে প্রাকৃত-গুণাতীত বা গুণসাম্য অথবা প্রকৃত সর্বগুণসমষ্টি বুঝাইয়া থাকে। ‘গৌড়ীয়’-শব্দ সেইপ্রকার পার্থিব ভাষা-মল অতিক্রম করিয়া নিগূর্ণ্য-স্বরূপ গুণের চরম অবস্থাকেই লক্ষ্য করে। তাই শ্রীবৈদ্যন্ত সমিতির মুখপত্র ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ বিত্ত্ব গৌড়ীয়।

স্বায়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর সমগ্র অবতারের অবতারিস্বরূপে বর্তমান গঙ্গার পূর্ব পারে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অনুগত জনগণের দ্বারা জানাইয়াছেন,— “ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিকৃতং কিল কুরু” (দাসগোস্বামিকৃত মনঃশিক্ষা); সুতরাং গৌড়ীয়ের অপ্রাকৃত শিক্ষা শ্রুতিগণনিকৃত ধর্ম্মশিক্ষায় আবদ্ধ নহে। এমন কি, ভক্তরাজ কুলশেখরও উক্ত শ্রৌতধর্ম্মে অনাস্থা স্থাপন করিয়া বলিয়াছেন,— “নাস্থা ধর্ম্মে ন বস্তুনিচয়ে”। যাহারা বৈদিক ধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, বিত্ত্ব গৌড়ীয়গণ তাহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত গৌড়ীয়-ধর্ম্মের সর্বনিম্নতম স্তরেও অধিষ্ঠিত নহেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। সুতরাং ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ যে বিত্ত্ব গৌড়ীয়, ইহা হইতেও তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উন্নতোজ্জ্বলরসে পরাকাষ্ঠা লাভ না করা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম অধর্ম্ম-পর্য্যয়ে পর্য্যবসিত। সেটরূপ ধর্ম্মের অনুশীলনে পরাংপর মোক্ষের কোন কথা পরিদৃষ্ট হয় না। এই শ্রেণীর ধর্ম্মের ফল মোক্ষ নহে অথবা এইরূপ ধর্ম্ম যে কল্পিত মোক্ষ আনয়ন করিয়া থাকে, সেই মোক্ষ গৌড়ীয়গণের প্রাচার্য্য বা গ্রহণীয় নহে। সমগ্র বিশ্ব যে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে, বিত্ত্ব গৌড়ীয়গণ তাহাদের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া ঝপ্প দিয়া তদপেক্ষা উন্নততম স্থানে অধিরোহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—মোক্ষধিকারকারিণী। মোক্ষের স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা শিক্ষা

দিয়াছেন, শ্রীমদ প্রভৃতি আচার্য্যবর্গ পূর্ব হইতেই তাহার প্রতিধ্বনি করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। চারি সম্প্রদায়ের অগ্রতম ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভু আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ—ব্রহ্মসংহিতায় কৃষ্ণভক্ত ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন—“ধর্ম্মানুষ্ঠানং পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।” (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৬১)—এই উক্তি তাঁহার প্রভু স্বয়ং কৃষ্ণের উক্তিই প্রতিধ্বনি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাঁহার সখা অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন—“সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” (গী: ১৮।৬১)। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতেও নবযোগেন্দ্র-উপাখ্যান-প্রসঙ্গে দেখা যায়,—“ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ” (ভা: ১১।১১।৩২)।—এস্থলে বিচার্য্য এই যে, লোকাচারবশতঃ বেদই একমাত্র প্রমাণ। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া বেদের পূর্বপক্ষ অংশ সাধারণ জীবের লৌকিক মঙ্গলকর হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা প্রমাণ বলিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা স্বীকার করেন নাই। চতুর্ন্থ স্বয়ং তাঁহার মুখচতুষ্টয় হইতে কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে ঋক্-যজু-সাম-অথর্ব্ব—এই চারি-বেদ প্রকাশ করেন। তিনি ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন,—অন্য সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসপূর্ব্বক আমার ভজন কর। বেদের বিভাগকর্ত্তা বেদব্যাস পঞ্চমবেদ মহাভারত রচনা করিয়া তাহার ভীষ্মপুর্বে গীতায় বলিয়াছেন,—সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমারই শরণ গ্রহণ কর এবং শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতও নিমিরাজের বৈদিক যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান বন্ধ করাইয়া শিক্ষা দিয়াছেন,—বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবানের উক্তিস্বরূপ ধর্ম্ম বলিয়া যাহা আদিষ্ট হইয়াছে তাহা বিচারপূর্ব্বক সেইসকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্যাগ্‌রূপে ত্যাগ করিয়া যিনি আমার ভজন করেন, তিনি সমস্ত সং অর্থাৎ সাধুগণের মধ্যে তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মা এবং বেদব্যাস—ঐহাদের দ্বারা বেদ এই ভৌতিক জগতে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বেদের অভিজ্ঞাতা বলিতে তাঁহারাই দুইজন। তাঁহারা বেদ সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে পর্যালোচনা করিয়া তাঁহাদের স্বরচিত বিভিন্ন গ্রন্থে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বেদের সার। তাহা ব্যতীত অন্য অংশ লইয়া চীৎকারকারী বৈদিকগণ অসার বলিয়া গৃহীত হইবেন। একলক্ষ শ্লোকে বেদের পরিসমাপ্তি। তন্মধ্যে অশিতি সহস্র শ্লোকই পূর্ব্বকথিত পূর্ব্বপক্ষ অংশ। বেদের পূর্ব্বপক্ষ অংশকে সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে বৈদিকগণের মঙ্গল কোথায়? বেদের এই গুঢ় রহস্য ব্রহ্মা এবং বেদব্যাসই সকলকে তারত্বরে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা এইজন্তই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া বেদব্যাসের আনুগত্য করিতেছি। এইজন্তই “শ্রীগৌড়ীয়-

পত্রিকা” একমাত্র বিস্তৃত গৌড়ীয়। বেদের মধুপুষ্পিত উজ্জ্বলি লইয়া ধর্ম ও কর্মমার্গে বিচরণশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ষোড়শ বর্ষের গৌড়ীয় কোনরূপ সহায়তা করিবে না।

“পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম-নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে।” শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এই শিক্ষা গৌড়ীয়ে হৃদয়ের ধন। শ্রীমদ্ভাগবতও এই কথাই বলিয়াছেন যে, যদি ধর্ম পালন করিতে হয় তবে সেই ধর্মই পালন করা কর্তব্য যাহা কৈতব বা ছলনাশূন্য—“ধর্মঃ প্রোজ্জিত-কৈতবোহত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্” (ভাঃ ১।১।১)। সুতরাং গৌড়ীয় সর্বোচ্চ-কণ্ঠে নির্ম্মৎসর সাধুগণের উপজীব্য প্রোজ্জিতকৈতব ধর্ম এই ষোড়শ বর্ষে একপাদরূপে আলোচনা করিবেন।

সমগ্র বিশ্বের আচার্যকুল-মুকুটমণি শ্রীল রূপপাদ যে নির্ম্মৎসর সাধুগণের চৌষষ্টি (৬৪) প্রকার ভক্তিবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা গৌড়ীয়ে ষোড়শ বর্ষে ষোল কলায় পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। ভক্তির চৌষষ্টি (৬৪) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচারই বেদের গুহ্যতম উপাসনা তত্ত্ব। ইহা বেদের চরমে বিংশতি সহস্র শ্লোকে ইঙ্গিত করা আছে। ৬৪ প্রকার অঙ্গ ১৬ কলায় পূর্ণ, অঙ্গপক্ষে ৬৪ প্রকার অঙ্গই সংক্ষিপ্ত আকারে একপাদ বিভূতি-স্বরূপ ভক্তির ষোড়শাঙ্গে প্রকাশিত দেখা যায়। ভক্তিবৃত্তি ত্যাজ্য ও গ্রাহ্যভেদে বাহ্যদৃষ্টিতে ভেদ লক্ষিত হইলেও অন্তদৃষ্টিতে উহা একায়ন-পদ্ধতি। অনুকূল-অনুশীলন ও প্রতিকূল-ত্যাগ একই বৃত্তির অন্তর্গত। যে অনুকূল বৃত্তি গ্রহণ করিতে “উৎসাহান্নিচ্ছ্যাকৈর্য্যাং” প্রভৃতি ৬টি বৃত্তি সমাদরের সহিত আলিঙ্গন করিতে হয়, ঠিক সেইপ্রকার অর্থাৎ উক্ত ৬ প্রকারেই ত্যাজ্য বৃত্তিগুলিও পরিত্যাগ করিতে হয়। শ্রীল রূপপাদের গ্রাহ ও ত্যাজ্যবৃত্তি সমপর্য্যায়েই সেবকগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ত্যাজ্য-বৃত্তি যেক্রপ উৎসাহের সহিত পরিত্যাগ করিতে হয়, গ্রাহ-বৃত্তিও তদ্রূপ উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিতে হয়। ৬৪ প্রকার ভক্ত্যাঙ্গ নবধা ভক্তিতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সঙ্কুচিত হয় নাই। আবার নবধা ভক্তি আণবিক বিস্ফোরণ-যন্ত্রের দ্বারা একমাত্র কীর্তনাখ্যা ভক্তিতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে—সঙ্কুচিত হয় নাই। একের মধ্যে বহুত্বের বিস্তৃতি দর্শন শাস্ত্রের সার। ইহার উপলব্ধির অভাবে অপসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার উৎপত্তি হইয়াছে। চৌষষ্টি সংখ্যার একপাদে ষোড়শ সংখ্যা পরিলক্ষিত হইলেও ষোড়শ সংখ্যাই অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার বিস্তৃতি একপাদেই সম্পূর্ণ পরিলক্ষিত হইবে। “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বাক্য অনন্তকোটি সাংখ্য-তত্ত্বের বিস্তৃতি, সঙ্কোচ নহে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এই বৎসর চৌষষ্টি (৬৪) প্রকার ভক্ত্যাঙ্গের বিচার করিয়া সমগ্র বিশ্বে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া গুরু কার্য্য করিবেন। বিশ্বের বর্তমান প্রগতি ক্রমশঃ অন্ধ হইতেও অন্ধ তমসাক্ষর হইতে বসিয়াছে।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER
PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

"SHRI GOUDIYA PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules, 1956]

1. Place of publication—Shri Debananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.
2. Periodicity of its publication—Last day of every
Bengali month i. e., once in a month.
3. Printer's Name—Tridandi-Swami Shrimad Bhakti
Vedanta Baman Maharaj.

Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.

Address—Shri Debananda Goudiya Math, Teghari-
para, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.

4. Publisher's Name— Do
Nationality— Do
Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti
Kushal Narasinha Maharaj.

Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.

Address—Shri Debananda Goudiya Math, Teghari-
para, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.

6. Names and addresses—Paramahansa-Swami S h r i
of individuals who own the Shrimad Bhakti Projnan
newspaper and partners or Keshab Maharaj, Founder-
share-holders holding more Acharya & Controller on
than one percent of the behalf of Shri Goudiya
capital. Vedanta Society.

I, Bhakti Vedanta Baman hereby declare that the
particulars given above are true to the best of my
knowledge and belief.

14. 3. 1964.

Sd/- BHAKTI VEDANTA BAMAN
Signature of publisher.



১৬শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৭০ { ২য় সংখ্যা




শ্রীপিচ্ছলদা গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াহা স্তুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম । অল্প ধর্ম হুইরূপে পালে যেই জন ।
 অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥ হরি-কথায় রক্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১৬শ বর্ষ } সঙ্কর্ষণ, ১৬ বিষ্ণু, ৪৭৮ গৌরাদ
 সোমবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৭০; ইং ১৩৪১৯৬৪ { ২য় সংখ্যা

সান্নিধানং

শ্রীলক্ষ্মীদেবী-কৃতং “শ্রীশ্রীপ্রদ্যুম্ন-স্তোত্রম্”

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে
 অষ্টাদশোহধ্যায়ে—১৮-২৩,)

ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রুং ওঁ নমো ভগবতে হৃষীকেশায় সর্বগুণবিশেষ-
 বিলক্ষিতাত্মনে আকৃतीনাং চিত্তীনাং চেতসাং বিশেষাণাঞ্চাধিপতয়ে
 ষোড়শকলায় ছন্দোময়ায়ানন্ময়ায়ামৃতময়ায় সর্বময়ায় সহস্রে ওজসে
 বলায় কান্তায় কামায় নমস্তে উভয়ত্র ভূয়াং ইতি ॥ ১ ॥

(কেতুমাল-বর্ষে শ্রীলক্ষ্মীদেবী সংবৎসরमध्ये রাত্রি-দিবসাদিষ্ঠাতৃ-
 দেবগণের সহিত পরম-সমাধিযোগে নিম্নলিখিত মন্ত্র-স্তবাদি জপো-
 চ্চারণদ্বারা স্থায়ী আরাধ্য প্রদ্যুম্ন (কামদেব) রূপী ভগবানের কৃপাময়
 রূপের উপাসনা করিয়া থাকেন,—)

ভগবান্ হৃষীকেশকে নমস্কার করি । নিখিল শ্রেষ্ঠবস্তুর দ্বারা
 তাঁহার আত্মা লক্ষিত হইয়া থাকে । তিনি—ক্রিয়া, জ্ঞান, চিত্ত ও

তত্ত্ববিষয়ের অধিপতি । একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়, এই ষোড়শ পদার্থ—তঁাহার অংশ । তিনি—বেদময়, অন্নময়, (পরমানন্দ প্রকাশতত্ত্ব-হেতু) অমৃতময় ও সর্বময় । তিনি—সাহস, তেজঃ ও বলের কারণ ; এইজগৎ এইসকল—তৎস্বরূপ । তিনিই কান্ত এবং তিনিই কামদেব । আমরা তঁাহাকে নমস্কার করি । তিনি আমাদের প্রতি ইহ ও পর, উভয় লোকে অনুকূল হউন ॥ ১ ॥

প্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বা হৃষীকেশ্বরং স্বতো
হারাধ্য লোকে পতিমাশাসতেহন্যম্ ।
তাসাং ন তে বৈ পরিপাস্ত্যপতাং
প্রিয়ং ধনাযুংসি যতোহস্বতত্ত্বাঃ ॥ ২ ॥

হে প্রভো, আপনি স্বতঃই ইন্দ্রিয়-সমূহের পতি ; সংসারে যে-সকল স্ত্রী ব্রত-আদির দ্বারা আপনাকে আরাধনা করিয়া অগ্নিপতি প্রার্থনা করে, তাহাদেরই সেই পতিগণ, তাহাদের প্রিয় পুত্র, ধন ও পরমায়ু নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে পারে না ; কেননা তাহারা পর-তত্ত্ব অর্থাৎ কাল, কর্ম ও গুণাদির অধীন ॥ ২ ॥

স বৈ পতিঃ স্মাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্ ।
স এক এবৈতরথা মিথো ভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্ ॥ ৩ ॥

যিনি নিজে কিছুতেই ভীত হন না এবং ভয়াতুর ব্যক্তিকেও সর্বতোভাবে রক্ষা করেন, তিনিই পতি । অতএব একমাত্র আপনিই সকলের পতি ; আপনি ব্যতীত আর কেহই পতি হইতে পারে না । আপনি যদি পতি না-ই হইবেন, তাহা হইলে অগ্নি হইতে আপনার ভয় হইত । আপনার পরমাত্মস্বরূপের সেবালাভ ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞগণ আর অগ্নি অধিক শ্রেষ্ঠবস্তু আছে বলিয়া মনে করেন না ॥ ৩ ॥

যা তস্ম্য তে পাদসরোরুহাইগং
 নিকাময়েৎ সাখিল-কামলম্পটা ।
 তদেব রাসীপ্সিতমীপ্সিতোহচ্ছিতো
 যদুগ্নযাস্ত্রা ভগবন্ প্রতপ্যতে ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্, যে স্ত্রী ঐকান্তিকভাবে একমাত্র পতিস্বরূপ আপ-
 নার পাদপদ্মের পরিচর্যা-মাত্র কামনা করিয়া আপনার সেবা
 করেন, সেই নারী সত্য সত্য সর্বার্থসিদ্ধিলাভ করেন অর্থাৎ ফলা-
 ভিসন্ধিরহিতা ভবদীয় পরিচর্যালিপ্সু স্ত্রীই সর্বকাম প্রাপ্ত হইয়া
 থাকেন ; পরন্তু যে নারী আপনার ঐকান্তিক পরিচর্যা ব্যতীত ফল-
 বিশেষ কামনা করিয়া আপনার অর্চনা করে, আপনি তাহাকে কেবল
 তাহার বাঞ্ছিত ফলটুকুমাত্র প্রদান করিয়া থাকেন । ভোগাবসানে ঐ
 ফল বিনষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্ম তাহাকে আবার অনুতাপ করিতে হয় ;
 অতএব, ঐরূপ ফল প্রার্থনার কোন সার্থকতাই থাকে না ॥ ৪ ॥

মৎপ্রাপ্তয়েহ্জেশসুরাসুরাদয়-
 স্তপ্যন্ত উগ্রং তপ ঐন্দ্রিয়েধিয়ঃ ।
 ঋতে ভবৎপাদ-পরায়ণান্ন মাং
 বিন্দন্ত্যহং হৃদ্ধৃদয়া যতোহজিত ॥ ৫ ॥

হে অজিত, ইন্দ্রিয়-সুখভোগ-বিষয়ে আবিষ্টচিত্ত ব্রহ্মা, রুদ্র এবং
 অগ্ন্যাগ্নি সুর ও অসুরগণ আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্ম উগ্র তপস্যা করিয়া
 থাকেন ; কিন্তু ভবদীয় পাদানুরক্তি ব্যতীত তাঁহারা আমার কটাক্ষ-
 বিলসিত ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারেন না ; যেহেতু আপনাতেই
 আমার হৃদয় নিহিত রহিয়াছে । অতএব আমি আপনার ভক্তকেই
 অনুগ্রহ করিয়া থাকি, অপরে আমার অনুগ্রহ লাভ করিতে
 পারে না ॥ ৫ ॥

স ত্বং মমাপ্যচ্যুত শীর্ণি বন্দিতং
 করাস্মুজং যৎ হৃদাধায়ি সাত্বতাম্ ।

বিভর্ষি মা লক্ষ্ম বরেণ্য মায়য়া

ক ঈশ্বরশ্চেহিতমুহিতুং বিভুঃ ॥ ৬ ॥

হে অচ্যুত, ভবদীয় করকমল হইতেই নিখিলকাম বর্ষিত হয়, এই জন্মই সাধুগণ উহাকে বন্দনা করেন। আপনি ভক্তগণের শিরে সেই করকমল বিন্যস্ত করিয়া থাকেন। কৃপাপূর্বক আমার মস্তকেও সেই হস্তপদ্ম সংস্থাপন করুন। হে বরেণ্য, আপনি কেবল আমাকে কপটতা দ্বারাই কনকরেখা-চিহ্নরূপে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ আপনি কেবল আমাকে বাহ্যে আদরমাত্র প্রদর্শন করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে পরম কৃপা করেন। আপনি—ঈশ্বর, আপনার আশয় কে-ই বা বুঝিয়া উঠিতে পারে ? ৬ ॥

সাত্ত-শ্রাদ্ধ ও কর্মজড়-মুক্তি

পত্রে প্রশ্ন

কোন কায়স্থ-কুলোদ্ভব শাক্তের সন্তান বিংশবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে অনুরাগ-ভরে কুলধর্ম, কুলাচার, কুলগুরু, কুলদেবতা ছাড়িয়া শ্রীমন্নহাশ্রমের প্রবর্তিত গোড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সদ্গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া বিষ্ণু-দীক্ষাক হইয়া ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উক্ত ধর্মযাজন করিতে থাকেন। এক্ষণে তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটয়াছে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার কতদিন অশৌচ হইবে ? আর কতদিনেই বা তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ বিধেয় ? বলা বাহুল্য, তিনি যখন কুলধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন, তখন তাঁহার লোকাচারে দৃষ্টি নাই।

বৈষ্ণব ও পণ্ডিতগণের কাছে তিনি ব্যবস্থা জানিতে গেলে, শ্রীবৃন্দাবন-বাসী বৈষ্ণব ও পণ্ডিতগণ একমত না হইয়া নানা মত প্রকাশ করেন। কেহ বলেন,—পূর্কপের আচার-দৃষ্টে কার্য্য করাই কর্তব্য, তাহা হইলে ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ বিধেয়। কেহ বলেন,—কর্মীদের মতে বর্ণধর্ম-বিধানানুসারে অশৌচ-গ্রহণ ও শ্রাদ্ধাদি করিলে ভক্তিবিরোধী কার্য্য করা হয়, অতএব মহাদোষ ঘটে। আবার কেহ বলেন,—কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়। শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়ের ১০ দিনে শ্রাদ্ধ বিধেয়, বিশেষতঃ তাঁহার বংশাবলী সকলেই কর্মমার্গের

লোক । কৰ্ম্মকাণ্ড ছাড়িয়া তিনি যখন ভক্তিমার্গে আসিয়াছেন, তখন কৰ্ম্মীদের কোন আচারই তাঁহার পালনীয় নয়। যেহেতু উহা মহাভক্তি-বিরোধী, যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—“ভক্তির বিরোধী যত শুভাশুভ কৰ্ম্ম । সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমোধৰ্ম্ম ॥”

আবার কেহ কেহ ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ করিবার পক্ষেও আপত্তি উঠান। তাঁহারা বলেন,—কায়স্থ উপবীতধারী না হইলে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে অনধিকারী। ইহার উত্তরে কেহ বলেন,—যখন তিনি সৎগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীবিষ্ণু-দীক্ষাক ও ভগবান্নাম-ব্রতাদিপরায়ণ, তখন তিনি বৈষ্ণব, কৃষ্ণদাস, ভক্ত ও ভাগবত প্রভৃতি নামে অভিহিত, স্মরণ্য তাঁহার শূদ্রত্ব কোথায়! শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ইহা দৃষ্ট হয়। শ্রীগোষামিপাদগণ বৈষ্ণবের শূদ্রত্ব-নিরসন সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থে অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩টি এই, যথা—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্তং রসবিধানতঃ ।

তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

ন শূদ্রা ভগবন্তুক্তান্তে তু ভাগবতা মতাঃ ।

সৰ্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনাৰ্দ্দনে ॥

শূদ্রং বা ভগবন্তুক্তং নিষাদং স্বপচং তথা ।

বীক্ষতে জাতিসামান্যং স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥

এক্ষণে “দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্”—এই প্রমাণ-বলে তাঁহার দ্বিজত্ব সিদ্ধ। তাঁহার শূদ্রত্ব একেবারেই নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন জাতিই দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত। শাস্ত্রানুসারে কায়স্থ ক্ষত্রিয়; অতএব কোন কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয়ত্ব হারাইয়া থাকে, পুনঃ সংস্কার দ্বারা তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় হইতেছে। উপবীতধারণই যে মহাসংস্কার—ইহা সৰ্ব্বশাস্ত্রসম্মত নহে। উপবীতধারীর ক্ষত্রিয়ত্ব অপেক্ষা ভগবন্তুক্তের ক্ষত্রিয়ত্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ দীক্ষাপ্রভাবে তাঁহার যখন দ্বিজত্বই সিদ্ধ, তখন তাঁহার ক্ষত্রিয়ের উপরিতন পদ-প্রাপ্তি ঘটিল, কারণ, ‘দ্বিজত্ব’ শব্দে বিপ্রতা লিখিয়াছেন। যথা—“ভগবদ্দীক্ষা-প্রভাবেন শূদ্রাদিনামপি বিপ্র-সাম্যং সিদ্ধমেব।” এমতাবস্থায় তাঁহার শূদ্রত্ব কোনমতেই থাকিতে পারে না। অতএব ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ বিধেয়। অতঃ কেহ বলেন,—শ্রীহরি-

ভক্তিবিলাসে যখন অশৌচ কাল-নিরূপণ-সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নাই তখন বৈষ্ণবের অশৌচ আদৌ নাই। বৈষ্ণব হরিনামবলে সদা পবিত্র। “ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে”।

এই প্রকার নানা মুনির নানা মত উপস্থিত। এক্ষণে এ বিষয়ের মীমাংসা সর্বজনবিদিত ও সর্বত্র প্রচারিত সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয়-পত্রে বাহির হইলে বৈষ্ণব জগতের মহা উপকার হইবে। বহুলোক এই মীমাংসা ধরিয়া কার্য্য করিতে পারিবে। নিবেদনমিতি—

ভক্তজনকিঙ্কর—

শ্রীআশুতোষ বসু, বসিরহাট (২৪ পরগণা)

সদুত্তর

উপরি-উক্ত প্রশ্নটি বিস্তৃত বিচার মীমাংসার জন্য আমরা বসিরহাট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রটির স্থানে স্থানে লৌকিকী ভাষার বিস্তার দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ সেইগুলি নির্দেশ না করিলে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিচারের সম্পূর্ণতা ও সৌষ্ঠব সম্পন্ন হইবে না। কারণ ভাবই ভাষার প্রাণ, এইজন্ত শ্রীমদ্ভাগবত, সাহিত্য পুরাণ ও গোস্বামিগণের ভাষা লৌকিক, অত্যাভিলাষী, কর্মী, কর্মজড় স্মার্ত বা নির্বিশেষ জ্ঞানী প্রভৃতির ভাষা হইতে পৃথক্। ভাষা আমাদের হৃদয়গত ভাব, বৃত্তি এবং আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-নিপুণতার অভি-জ্ঞাপক।

শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু বলিয়াছেন,— জীবমাত্রেরই স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-দাস বা বৈষ্ণব। শুদ্ধ-জীবাত্মাই—বৈষ্ণব। শুদ্ধ জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তিতে কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত অত্যাভিলাষ বা অগ্র বৃত্তি নাই। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম কিংবা মোক্ষাদি অত্যাভিলাষ-রূপ কৈতব হৃদে অধিকার করিলেই আমাদেরকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বিদ্ববৈষ্ণব প্রভৃতি উপাধিক অভিমানে অভিভূত করে। পরন্তু বৈষ্ণব নিরূপাধিক; ঔপাধিক বিচারে আমাদের যে যে অভিমান উপস্থিত হয়, তাহাই ‘অবৈষ্ণবতা’। এই সকল অবৈষ্ণবাবি-মান বা বিরূপাভিমান ছাড়িয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবোত্তমের নিরূপট আনুগত্য স্বীকার করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায়।

জড়বস্তু বা জড়ভিমান কখনও চিহ্নবস্তু বা চেতনাভিমান নহে। ‘কায়স্থ-কুলোদ্ভব শাক্তের সন্তান’ বস্তুটা বা ঐরূপ অভিমানটা ‘বৈষ্ণব’ বা ‘বৈষ্ণবতা’ নহে, ইহা বিরূপের অভিমান বা অবৈষ্ণবতা! সর্বতোভাবে ঐরূপ অভিমান

পরিত্যাগপূর্বক ‘আমি কৃষ্ণদাসানুদাস, কৃষ্ণ ও কাঞ্চনসেবাই আমার ধর্ম’— এইরূপ অভিমান বা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করার নামই—‘বৈষ্ণবদীক্ষা প্রাপ্ত হওয়া’ বা ‘দ্বিতীয়জন্ম লাভ হওয়া’ অথবা ‘বৈষ্ণব হওয়া’।

বিষ্ণুদীক্ষা-দ্বারা ‘দ্বিতীয় জন্ম’ বা ‘দ্বিজত্ব’ লাভ হইবার পর পুরুষের আর পূর্বজন্মের কোন ইতিহাসের পরিচয় থাকিতে পারে না। পূর্বজন্মের পরিচয় বা ইতিহাস বজায় রাখিয়া দ্বিজত্ব লাভ বা বিষ্ণুদীক্ষার অভিনয়—বিপ্রলিপ্সা মাত্র। যাহারা দীক্ষাগ্রহণ করিবার পরও পূর্বজন্মের পরিচয়ে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে ‘অদীক্ষিত’ বা ‘শোককারী’ শূদ্র জানিতে হইবে। তবে যে কোন কোন স্থলে বৈষ্ণবোত্তম বা সহজ-পরমহংসগণ দৈন্ত্যভরে আপনাদিগকে ‘শূদ্র’, ‘অধমচণ্ডাল’, ‘যবন’, ‘নীচজাতি’ প্রভৃতি বলিয়া অভিধান করেন, তাহা তাঁহাদের বিরূপ-ধর্মের বা অদীক্ষিতাবস্থার অভিমান নহে। তাঁহারা নিত্যদীক্ষিত অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ বা নিত্য দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত। যাহাদের পাপ, পাপবীজ, অবিद्या বিশ্বাসিত হয় নাই, তাহাদের পক্ষেই বিরূপগত অভিমান সম্ভব; কিন্তু যাহাদিগের মধ্যে অবিद्याর প্রসক্তিই নাই, তাহাদিগের ঐক্য উক্তি যে বন্ধ-জীবের বিরূপগত উক্তির স্থায় নহে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? অপ্রাকৃতের সহিত প্রাকৃতের, নিত্যসিদ্ধপর্যায়ের সহিত নিত্যবদ্ধপর্যায়ের, ঈশ্বরকোটির সহিত জীবকোটির, সিদ্ধের সহিত সাধকের, গুরুর সহিত শিষ্যের ক্রিয়া, মুদ্রা, আচার, ব্যবহারের একাকার বা চিহ্ন-সম্বন্ধে প্রয়াস করিলে তাহাকে বিন্দুগণ ‘প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ’ এবং ঐক্য প্রয়াসকারীকে ‘প্রাকৃত-সহজিয়া’ বলেন।

সুতরাং সঙ্গুর নিকট বিষ্ণুদীক্ষাক’ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র প্রভৃতি ঔপাধিক কর্মকাণ্ডীয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারেন না; সেই জন্তই শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু দীক্ষিত ব্যক্তির বিপ্র-সাম্যত্ব অর্থাৎ পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব নির্দেশ করিলেন। কেবল ‘বিপ্র’ বলিলে পাছে লোকে বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের স্থায় পুণ্য-কর্মফল-ভোক্তা কর্মকাণ্ডীয় বদ্ধজীববিশেষ জ্ঞান করিয়া সর্ববেদান্তবিৎ কোটি-সদাচারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও অনন্তকোটি গুণে শ্রেষ্ঠ—ব্রাহ্মণ-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করেন, এই জন্ত ‘বিপ্রসাম্য’ শব্দ উল্লেখ করিলেন। আবার ‘যথা কাঞ্চনতাং যাতি’ শ্লোকের টীকায় ‘নৃণাং’ শব্দের অর্থ ‘সর্বেষামেব’ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,

অন্ত্যজ যে কোন কুলে আবির্ভূত হউক না কেন, সকলেরই (‘এব’ শব্দের দ্বারা নিশ্চয় ও নিঃসন্দেহ) ; এবং ‘দ্বিজত্ব’ শব্দের অর্থ ‘বিপ্রতা’ ব্যাখ্যা করিয়া দীক্ষিত ব্যক্তির পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিলেন । আবার দীক্ষালক্ষণধারীর স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিলেন,— “দীক্ষায়াঃ সাবিত্র্যাদি-বিষয়কায়্যা ভগবন্মন্ত্রবিষয়কায়্যাশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেণ যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলু-ধারণাদীনি তথা কুশশৃঙ্গাদি-তুলসীমালা-মুদ্রাদি-ধারণাদীনি তানি ধৰ্ত্তুং শীলমেষামিতি তথা তে ।” পুনরায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণের অপ্রাকৃতত্ব বিষয়ে বলিলেন,— “তেষাং ভৌতিকদেহেহপি সচ্চিদানন্দ-রূপতা” অর্থাৎ ভগবন্তুক্তগণের দেহ প্রাকৃত নহে, দীক্ষাপ্রভাবে পুরুষের পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয় । শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই কথাই বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয় ।

অপ্রাকৃতদেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।

সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় ।

অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৯১-১৯৩)

সুতরাং দীক্ষিত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ প্রভৃতি জাতি-সামায়ে দর্শন করা শাস্ত্র, আচার্য্য ও ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন মাত্র । যাহারা বৈষ্ণবকে জাতি-সামায়ে দর্শন করেন, তাহারা বেদবিরোধি-বৌদ্ধাদির তায় অসম্ভাষ্য । মনে করুন, রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গৃহে কোন একটা হরিসেবোন্মুখ পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তিনি যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত । সেই দীক্ষিত পুরুষকে যদি অক্ষজ জ্ঞানে বিচার করিয়া রমেশ ভট্টাচার্য্যের পুত্র, সুতরাং অত্যাগ্র ব্রাহ্মণবটুর অগ্রতম কিংবা তাঁহাদের অপেক্ষা কিয়ৎ-পরিমাণে শ্রেষ্ঠ,—এরূপ বিচার করা যায়, তাহা হইলে দীক্ষিতব্যক্তির চরণে অপরাধ করা হইবে । কারণ যদি শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের অভ্রান্ত-সিদ্ধান্তকে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে দীক্ষিত ব্যক্তি অশুদ্ধ-শূদ্রকল্প কলি-সম্ভব ব্রাহ্মণগণ (হরিভক্তিবিলাস ৫ম বিলাস দ্রষ্টব্য) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । সামান্য ব্রাহ্মণ পুণ্যফলময় প্রাকৃত জীববিশেষ, আর উক্ত দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষা-মাত্রেই

পাপ-পুণ্যরূপ প্রাকৃত ব্যাপার হইতে নিম্মুক্ত হওয়ায় ‘অপ্রাকৃত’। তিনি ‘ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ’ নহেন, তিনি ‘পারমার্থিক ব্রাহ্মণ’। যাহারা পারমার্থিক ব্যক্তিকেও ব্যবহারিকের সমান করিতে চান, তাঁহারা দীক্ষিত ও অদীক্ষিত, অপ্রাকৃতে ও প্রাকৃতে, শ্রীবিষ্ণুপাদোদকে ও কুপজলে, শ্রীশালগ্রামে ও রাস্তার খোয়ায়, শ্রীমহাপ্রসাদে ও ডাল-ভাতে, শ্রীনামমন্ত্র ও আভিধানিক শব্দে সাম্যবুদ্ধি করিয়া থাকেন। কুপ হইতে জল আনয়ন করিয়া যখন সেই জল দ্বারা শ্রীশালগ্রামের স্নান হয়, তখন সেই বিষ্ণু-স্নান-জলকে যদি কেহ কুপজল জ্ঞান করিয়া তদ্বারা নিষ্ক-পদধৌত কিংবা শৌচ-কার্যাদি করিতে ধাবিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে সাহিত্যগণ পাষণ্ড, নাস্তিক বলিয়া থাকেন। তদ্রূপ কোন অপরকুলোদ্ভূত ব্যক্তি কিংবা প্রাকৃত বরকুলোদ্ভূত ব্যক্তি দীক্ষাদ্বারা বিজহ্ব অর্থাৎ পারমার্থিক বিপ্রত্ব লাভ করিলেও যদি তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব ব্যবহারিক ইতিহাস দ্বারাই বিচার করা হয়, তাহা হইলে সেইরূপ বিচারকারী ব্যক্তিও কি বিষ্ণুপাদোদকে কুপজলবুদ্ধি-কারীর ত্রায় অপরাধী নহে? এইজহ্বই জগদগুরু শ্রীব্যাসদেব বলিলেন,—

“বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যশ বা নারকী সঃ”।

“যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি-বুদ্ধি করে।

জন্ম জন্ম অধম যোনিতে পচি মরে ॥”

অতএব যাহারা দীক্ষিত ব্যক্তিকে প্রাকৃত ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ জ্ঞান করেন, তাহারা শাস্ত্র ও মহাজনগণের বাক্যানুসারে পাষণ্ডী, নারকী। ‘কালাপাহাড়’-প্রকৃতির কোন কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন, তোমরা আমাদিগকে ‘পাষণ্ডী’ ‘নারকী’ যাহাই বল, শাস্ত্র বা গোস্বামিগণ যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু দীক্ষিত ব্যক্তিকে জাতি-সাম্যেই দেখিব; পারমার্থিককে ব্যবহারিকের সহিত সমান জ্ঞান করিব, বিষ্ণুপাদোদকে কুপজলই মনে করিব!

শুনা যায়, প্রশ্নকারী মহাশয়ের গুরুপুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি (প্রশ্নকারী) যখন অব্রাহ্মণ তখন তাহার ৩০ দিনেই মাতৃশ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হওয়া উচিত এবং কর্মজড়-স্মৃতির বিধানানুসারেই তাহা করা কর্তব্য। প্রশ্নকারীর গুরুপুত্রগণের এইরূপ বিচার যদি প্রশ্নকারী মহাশয় গ্রহণ করেন, (কারণ গুরুপুত্র—গোস্বামী-সন্তান—নিত্যানন্দবংশ্য—তাঁহাদের বাক্য গুরুর ত্রায়ই সম্মানযোগ্য, নতুবা একাধারে গুরু ও গোস্বামীর অবমাননা হয়!) তাহা হইলে গুরুপুত্রগণের সহিত প্রশ্নকারী মহাশয়কে স্বীকার করিতে

হইবে যে, হয় তিনি অদীক্ষিত, নয় তিনি অবৈষ্ণব-দীক্ষা-ছলনায় পতিত। আর যদি তিনি গুরুপুত্রগণের বিচার স্বীকার না করিয়া আচার্য্যগোষামিগণের বিচার স্বীকার করেন, তাহা হইলেও তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, গোষামীর পুত্র (?) ‘গোষামী’ হইতে পারে না, গুরুপুত্র (?) সর্বদা ‘গুরু’ হইতে পারে না। অতএব কুলগুরু-প্রথা অগ্রাহ্য ও অশাস্ত্রীয়। কেবল বণিগ্গণের দ্বারা লোকছলনার্থ কল্পিত।

বর্তমানে এইরূপ প্রকৃতির ব্যক্তিগণের হস্তে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও ধর্মকর্মের ব্যবস্থা বলপূর্বক গৃহীত হওয়ায় জগতে নানাবিধ উৎপাতের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে। প্রশ্নকারী যে ‘নানামুনির নানা মতে’র কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও তাহারই একটা বিশেষ কারণ; এইজন্ত শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু এই সকল তথাকথিত নানামুনির নানা মত পরিত্যাগ করিয়া মহাজনের পথে চলিতে আদেশ করিয়াছেন। ঐ সকল তথাকথিত মুনিগণের বিদ্বদনুভব নাই; এই জন্তই তাহাদের শাস্ত্রের বাক্যসমূহ হজম হয় না। তাহারা বিদ্বদনুভবের অভাবে শাস্ত্র-সঙ্গতি এবং আপাতবিরুদ্ধ-বাক্যসমূহের সমন্বয় করিতে অসমর্থ বলিয়াই প্রকৃত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। তাহারা কোন সময় মুখে বলেন, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি—অপরাধ, আবার পর মুহূর্ত্তেই তাহাদের কার্য্য-কলাপ, ভাষা-ব্যবহার প্রভৃতি তদ্বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে; তাহারা কখনও মুখে বলেন, সদৃগুরু গ্রহণ করা কর্তব্য, আবার পর মুহূর্ত্তেই নিজের অসংপ্রবৃত্তি সমর্থনের জন্ত অসদৃগুরুকেই ‘সদৃগুরু’ পদবীতে কল্পনাবলে উঠাইয়া থাকেন। এইরূপ বৃত্তি প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের একটা বিশেষত্ব। যে-দিন তাহারা ঐরূপ কপটতা বা কৈতব হইতে নিৰ্ম্মুক্ত হইতে পারিবেন, সেইদিন তাহাদের মঙ্গল হইবে, তৎপূর্বে নহে। সেইরূপ কপটতা-নিৰ্ম্মুক্ত হইতে পারিলে তাহারা নিরপেক্ষ হইতে পারিবেন, তখন তাহারা গোষামীর পুত্রকে ‘গোষামী’ বলিবেন না, বুঝিতে পারিবেন গোষামী ইন্দ্ৰিয়ের দাস নহে—বুঝিতে পারিবেন গোষামিত্ব শৌক্যপারম্পর্য্যে আবদ্ধ নহে—আত্মার ধর্ম প্রাকৃত রক্ত-মাংস-শোণিত-মধ্যে নাই,—বুঝিতে পারিবেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহার প্রাকৃত বংশ-ধারা থাকিতে পারে না—সচ্ছিয়-পারম্পর্য্যে তাঁহার অপ্রাকৃত বংশধারা—সেই বংশীয়গণ কখনও কর্ণজড়-স্মার্ত্তের অনুগ, অনুগ্রহপ্রার্থী বা পদাবলেহী নহে। তাঁহারা হরিভক্তির প্রতিকূল কার্য্যকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা হরিভক্তির অনুকূল

কার্যকেই স্বীকার করেন, তাঁহারা পতিতকে পতিতাবস্থা হইতে উত্তোলন করিয়া ‘পতিতপাবন,’ নিত্যানন্দ-দাস’ নামের সার্থকতা করেন—তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের অনুগমনে দীক্ষিত উদ্ধারণঠাকুরের জাতি-বুদ্ধি করেন না অথবা অদৈবসমাজে ‘একঘরে’ হইয়া থাকিতে হইবে (অর্থাৎ ছঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে)। এই ভয়ে শ্রীউদ্ধারণঠাকুরের দাসানুদাসগণের হস্ত-পাচিত পরম-পবিত্র, নিগুণ মহাপ্রসাদ-গ্রহণে কুণ্ঠিত হইয়া শাস্ত্র-আজ্ঞা অপেক্ষা বহির্নুখ সমাজকে ‘বড়’ মনে করেন না, তাঁহারা নিত্যানন্দের আচরণকে মহাপ্রভুর আচরণের বিরোধী জানেন না।

বর্তমানে শিষ্য-ব্যবসায়ি-গুরুকৃত্ব সম্প্রদায় ও গোস্বামিকৃত্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যেই যখন বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুযায়ী গুরু শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠানভাব লক্ষিত হয়, তখন কোন্ আদর্শ দেখিয়া তাঁহাদের শিষ্যসম্প্রদায়ের হৃদয়ে সংসাহস থাকবে? প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে “বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ” শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের যে ব্যবস্থা-পত্র উদ্ধার করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

“গুরুবৈষ্ণবানাস্ত শ্রাদ্ধাদিকৰ্মণি শ্রবৃতির্নাস্তি। যতপি বৈষ্ণবশ্রাদ্ধে কাপি বিহিতদিবসসংখ্যা নাস্তি, তথাপি লৌকিকাচারশ্রদ্ধাযুক্তাঃ কৰ্ম্মমিশ্রভক্তিশ্রিতাঃ স্ব স্ব-বর্ণাভিমানানুসারেণ স্মৃতিশাস্ত্রবিহিতমেব শ্রাদ্ধদিবসং নিরূপয়ন্তি। তথা চোক্তং - “বৈষ্ণব-পিতৃগামপি শ্রীবিষ্ণুদিনে শ্রাদ্ধগ্রহণাযোগাদ্”; “একাদশাস্ত প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃত্তেহহনি। দ্বাদশাং তৎপুত্রাতব্যং নোপবাসদিনে কচিৎ ॥” শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্তবশাদেবৈতৎ প্রতিপাদিতং যদুপবাসদিবসং পরিত্যজ্য তৎপরদিনেব শ্রাদ্ধং কুর্যাদেব বিধিঃ। পুনশ্চায়মেব বিশেষ-বিধির্যদু বৈষ্ণবানাস্ত প্রেতত্বং নাস্তীতি; স্ততরাং তেষু প্রেতবুদ্ধং পরিত্যজ্য বৈষ্ণবধিয়া মহাপ্রসাদপিণ্ডেনৈব শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ। তথা চ শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত — “প্রাপ্তে তু শ্রাদ্ধবাসরে” ইত্যাদি গ্রন্থেন প্রতিপন্নং—যদ্বিপ্র একাদশাহেন, ক্ষত্রিয়স্ত্রয়োদশাহেন, বৈশ্যঃ ষোড়শাহেন, শূদ্রশ্বেকত্রিংশাহেন এবমন্ত্যজশ্চ একচত্বারিংশদিবসেন শ্রাদ্ধমনুতিষ্ঠতীতি সমাসঃ।”

নিকিঞ্চন হরিনামৈকপরায়ণ বৈষ্ণবগণের শ্রাদ্ধাদি-অনুষ্ঠানে অবসরই নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণ নিকিঞ্চন হইতে পারেন নাই, তাঁহারাও বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ‘পারমার্থিক ব্রাহ্মণ’ বলিয়া তাঁহাদের বিযুসেবাপরায়ণ

ব্রাহ্মণের স্থায় আচার পালন করা কর্তব্য অর্থাৎ একাদশ দিবসে বিষ্ণুনৈবেদ্য দ্বারা সংকীৰ্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবাদিমুখে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য ; আর যাহারা বিদ্ধ-বৈষ্ণব, তাঁহাদের প্রাকৃত অভিমান প্রবল থাকায় তাহারা স্ব স্ব অভিমানানু-যায়ী বিষ্ণু-নৈবেদ্য দ্বারা শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য সমাপন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাভিমান থাকিলে একাদশ দিবসে, ক্ষত্রিয়াভিमानে ত্রয়োদশ দিবসে, বৈশ্যাভিमानে ষোড়শ দিবসে, শূদ্রাভিमानে একত্রিংশ দিবসে এবং অন্ত্যজাভি-मानে একচত্বারিংশ দিবসে বিষ্ণু-নৈবেদ্য ও বৈষ্ণব-ভোজনাদি দ্বারা শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু সকলের পক্ষেই রাক্ষস-শ্রাদ্ধ বা প্রেত-শ্রাদ্ধ সৰ্ব্বতোভাবে পরিবর্জনীয়।

— জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

শ্রী শ্রীগৌরমুন্দর ও ভক্তহিমা

১। অত্যান্ত লোক-শিক্ষক হইতে শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য কি ?

“মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বিবরণ, উপদেশ ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বিশেষ যত্নসহকারে স্বাধীন বিচারের সহিত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাকে ‘সৰ্ব্বাচার্য্য’ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। যতপ্রকার সাম্প্রদায়িক গুরুর বিষয় লিখিত আছে, সকলেই তাঁহার অধীন,—এরূপ দৃষ্ট হইবে। শ্রীশ্রীমচৈতন্যদেব সৰ্ব্বজীবের চৈতন্য-গুরু হইয়াও পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন ; অতএব জীবসকল সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের স্বাধীনতারূপ পাদপদ্ম মধু পান করিতে থাকুন।”

—তঃ স্মঃ ৪৯ স্মঃ

২। শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে,—না শ্রীচৈতন্য অগ্রে ?

“শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য নিত্য-প্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ, বল যায় না। আগে চৈতন্য ছিলেন, পরে রাধাকৃষ্ণ হইলেন, আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন চৈতন্য হইয়াছেন,—এ কথাই তাৎপর্য্য এই যে, কেহ আগে, কেহ পাছে, এরূপ নয়—দুই প্রকাশই নিত্য।” —জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৩। কৃষ্ণ ও গৌর কি পৃথক্ তত্ত্ব ? উভয়ের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য আছে ?

“কৃষ্ণ ও গৌরিকিশোর ইহারা পৃথক্ তত্ত্ব ন’ন, উভয়ই মধুর রসের আশ্রয়। একটু ভেদ এইমাত্র যে, মাধুর্য্যরসে দুইটি প্রকার আছে অর্থাৎ

মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য ; তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে কৃষ্ণস্বরূপ এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ, সেখানে শ্রীগৌরান্ধস্বরূপ ।” —জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

৪। গৌরাবতার প্রচ্ছন্ন কেন ?

“কলিকালের অবতার কেবল কীর্ত্তনাদি দ্বারা পরম দুর্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন, তাহাতে অল্প তাৎপর্য্য না থাকায়, সেই অবতার সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণের নিকট গোপনীয় ।” —রঃ ভাঃ ৪।৮

৫। অর্চন ও ভজনমার্গে যথাক্রমে গৌরান্ধের যুগল কি কি ?

“গৌরান্ধের যুগল দুইপ্রকার—অর্চনমার্গে এক প্রকার ও ভজনমার্গে অল্পপ্রকার । অর্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন ; ভজনমার্গে শ্রীগৌর-গদাধর ।” —জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৬। শ্রীগৌর কি ‘নাগর’ নহেন ?

“প্রাণনাথ নিম্নানন্দকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বরপতির পুত্র বলিয়া জান—কৃষ্ণ হইতে কোনক্রমেই তাঁহাকে তত্ত্বান্তর মনে করিও না । নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটি পৃথক্ ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপ-নাগর মনে করিয়া ব্রজ-ভজন পরিত্যাগ করিও না ।”

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৭। গৌরানুগ না হইয়া কৃষ্ণভজন ও গৌরানুগ হইয়া কৃষ্ণভজনে পার্থক্য কি ?

“গৌরনাম না লইয়া, যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া,

সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায় ।

গৌরনাম লয় যেই,

সত্ত কৃষ্ণ পায় সেই,

অপরাধ নাহি রহে তায় ॥”

—নঃ মাঃ ৭ম অঃ

৮। শ্রীগৌরানুগ না হইলে যদি শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন স্তম্ভ না হয়, তবে কি পূর্বাচার্য্যগণের ভজন হয় নাই ?

“শ্রীগৌরান্ধদেবের চরণাশ্রয় করতঃ কৃষ্ণভজন না করিলে পরম পুরুষার্থ পাওয়া যায় না । শ্রীগৌরান্ধের উদয়কালের পূর্বে শ্রীমদ্বাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন । তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপ্রদ ছিল । যদিও শ্রীমদগৌরান্ধদেবের বাহ প্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল ।” —‘গৌরকৃষ্ণ অভেদ,’ সঃ তোঃ ১১।৬

৯। কৃষ্ণ ছাড়িয়া গৌর অথবা গৌর ছাড়িয়া কৃষ্ণ-ভজন উৎপাত কেন ?

“দুর্ভাগ্যের বিষয় এই—‘শ্রীগৌরাঙ্গ’ বলিয়া দোহাই দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন পরিত্যাগ করা যাহাদের মত হইয়াছে, তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালন করেন না। গৌর-কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাহারা মনে করেন, গৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাহাদের গৌর-কৃষ্ণে ভেদ জ্ঞান হয়। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলায় কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। কৃষ্ণ-লীলায় ভজন বিষয় প্রতিভাত, গৌরাঙ্গলীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র যত পাঠ করা যায়, কৃষ্ণলীলার ততই প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা যত পাঠ করা যায়, ততই গৌরলীলা মনে পড়ে। কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া গৌর এবং গৌর ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ কখনই ভাল বলিয়া বোধ হয় না। গৌরকে পরোপাশ্রয় বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়। এই সকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে। ‘আমরা গৌর ভজিব, আর কৃষ্ণস্মরণ করিব না’—এ কথা একটি দৌরাভ্যর্থের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ ‘কৃষ্ণ ভজিব, গৌরকে স্মরণ করিব না’—ইহাও মহাদুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।”

—‘গৌর-কৃষ্ণ-অভেদ,’ সং. তোঃ ১:১৬

শ্রীশ্রীগৌর-শক্তি ও অপ্রাকৃত রস-টেনশিয়

১। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীগৌরসুন্দরে প্রীতি কিরূপ ?

“লক্ষ্মী—ভগবানের নিত্যপত্নী ও ভগবান—লক্ষ্মীর নিত্যপতি; অতএব তাহাদের মধ্যে যে নিত্য-প্রীতি আছে, তাহা অপ্রাকৃত সাহজিক।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, আ ১৪১৬৪

২। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কি তত্ত্ব ?

“শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া হ্লাদিনীসার-সমবেত সখিংশক্তি অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপিনী—শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনাম-প্রচারের সহায়-স্বরূপে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম যেরূপ নববিধা ভক্তির স্বরূপ নয়টি দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ নববিধা ভক্তির স্বরূপ।”

—ভৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

৩। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন না করিলে ক্ষতি কি ?

“শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া কোন ব্যক্তিই ভগবদ্ভক্ত (গৌরভক্ত)

বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে পারেন না।”— ‘সমালোচনা,’ সঃ তোঃ ৪।৪

৪। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ঘাঁহারা অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদের লক্ষণ কিরূপ ?

“ঘাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত দলাদলি করেন, তাঁহাদের ভক্তির সহিত দলাদলি। বিভাশূত্র ভট্টাচার্য্যাদিগের যেরূপ সরস্বতীর সহিত দলাদলি, ভক্তিশূত্র বৈষ্ণবনামাভিমानी ব্যক্তিদিগেরও সেইরূপ বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত দলাদলি।” — ‘সমালোচনা,’ সঃ তোঃ ৪।৪

৫। শ্রীভক্তিবিনোদের শ্রীগৌর-গদাধরে শ্রীরাধা-মাধব-দর্শন কিরূপ ?

“হা হা মোর গৌরকিশোর !
কবে দয়া করি’, শ্রীগোক্রম বনে, দেখা দিবে মনচোর ॥
আনন্দ-সুখদ, কুঞ্জের ভিতরে, গদাধরে বামে করি’।
কাঞ্চন বরণ, চাঁচর-চিকুর নটন সুবেশ ধরি’ ॥
দেখিতে দেখিতে, শ্রীরাধা-মাধব, রূপেতে করিবে আলা।
সখীগণ-সঙ্গে, করিবে নটন, গলেতে মোহন মালা ॥
অনঙ্গ মঞ্জরী, সদয় হইয়া এ দাসী-করেতে ধরি’।
হুঁহে নিবেদিবে, হুঁহার মাধুরী, হেরিব নয়ন ভরি’ ॥”
— ‘প্রার্থনা লালসাময়ী,’ কঃ কঃ

৬। শ্রীগৌরশক্তি শ্রীস্বরূপ ও ‘শ্রীস্বরূপের রঘু’র স্বরূপ ও সেবা কি ?

“স্বরূপগোস্বামী—ললিতাদেবী, তাঁহার গণমধ্যে প্রবেশ করত শ্রীদাস-গোস্বামী স্বীয় অন্তরঙ্গ ব্রজ-সেবা করিতেন।” — অঃ প্রঃ ভাঃ অঃ ৬ঃ২৪১

৭। শ্রীস্বরূপ শ্রীগৌরের কি অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন ?

“স্বরূপ গোস্বামী গীত-শাস্ত্রে ও সাধারণ শাস্ত্রে বিশেষ পটু ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে গান-বিদ্যায় পটু দেখিয়া পূর্বেই ‘দামোদর’ নাম দিয়াছিলেন। ‘দামোদর’ নাম-সহ সন্ন্যাস-গুরুর প্রদত্ত ‘স্বরূপ’-নাম সংযুক্ত হইয়া তাঁহার নাম ‘দামোদর স্বরূপ’ হইয়াছিল। ‘সঙ্গীত-দামোদর’ নামে সঙ্গীত-শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।”

— অঃ প্রঃ ভাঃ, মঃ ১০।১১৬

৮। মধুর রসের ঐকান্তিক নামাশ্রিতগণের গুরুপাদপদ্ম কে ?

“হরি হে !

“শ্রীরূপ গৌসাক্রি, শ্রীগুরু-রূপেতে, শিক্ষা দিল মোর কানে।

জান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল; রতি পাবে নাম-গানে ॥”

— ‘ভজনলালসা’ ২, শঃ

৯। শ্রীগৌরশক্তি শ্রীরূপ কি তত্ত্ব ?

“শ্রীরূপ মঞ্জরী-সঙ্গে যাব কবে, রসসেবা-শিক্ষা তরে।

তদনুগা হ’য়ে, রাধাকুণ্ড-তটে, রহিব হর্ষিতান্তরে ॥”

—‘শ্রীরাধা-ভজন-দর্পণ,’ গীঃ

১০। শ্রীগৌরলীলার ও শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিকরণ পরস্পর কোন্ লোকে অবস্থান করেন ?

“মূল বৃন্দাবনে কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ এই দুইটি পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে-সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্শ্বদ মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ ; শ্রীগৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্শ্বদগণই ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য ভোগ করিতেছেন। কোনস্থলে উভয় পীঠে স্বরূপ-ব্যুৎসারী তাঁহারা বক্তমান ; আবার কোনস্থলে এক স্বরূপেই এক পীঠে আছেন, অথ পীঠে থাকেন না। সাধনকালে ঐহারা কেবল গৌর-উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কেবল গৌরপীঠে সেবা করেন ; সাধনকালে ঐহারা কেবল কৃষ্ণোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কৃষ্ণপীঠে অবলম্বন করেন। সাধনকালে ঐহারা কৃষ্ণ ও গৌর উভয়ের উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কায়স্থ অবলম্বন-পূর্ব্বক উভয় পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান—ইহাই গৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদের পরম রহস্য।”

—ভৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

১১। শ্রীমহাপ্রভু কিরূপভাবে নিজ-শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন ?

“শ্রীমহাপ্রভুর লীলা এই যে, যে ভক্ত যে ভক্তি-বিষয়ে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই তিনি সেই বিষয়ে নিজ-শিক্ষা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন।”

—‘প্রবোধিনী কথা,’ হঃ চিঃ

১২। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার কোন্ পার্শ্বদের উপর কি সেবা-ভার অর্পণ করিয়াছেন ?

“শ্রীমহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন ; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুই ভাগে কড়চা রচনা করেন—এক ভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অস্তঃপন্থা রসোপাসনার বহিঃপন্থা লিখিয়াছেন। অন্তঃপন্থা শ্রীদাস গোস্বামীর কণ্ঠে অর্পণ করেন, তাহা শ্রীদাস গোস্বামি-প্রভুর গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বহিঃপন্থা শ্রীমদ্বৈক্যেশ্বর গোস্বামীকে অর্পণ করেন ! * * শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন ; শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি

রসতত্ত্ব প্রকাশ করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন ; শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বৈদী ভক্তি এবং বৈদী ভক্তি ও রাগভক্তির পরস্পর সম্বন্ধ প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন ; গোকুলের প্রকটাপ্রকট-সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জ্ঞাও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আজ্ঞা দেন । শ্রীনিতানন্দ প্রভু ও শ্রীসনাতনের দ্বারা শ্রীজীবকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি দেন ।”

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

১৩। শ্রীগৌরভক্তগণ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-রসের বৈশিষ্ট্য কি অবগত আছেন ?

“ঐশ্বর্য্যমিশ্র শ্রীনारायण-দাস্তরস ও মাধুর্য্য-মূলক কৃষ্ণদাস্ত-রসে যে স্তম্ভ প্রভেদ আছে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন ।”

—‘অর্থপঞ্চক,’ সঃ তোঃ ৭।৩

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের রজক-উদ্ধার

নমো নমঃ শ্রীগুরুদেব অজ্ঞান-নাশন ।

কৃপা করি’ কর মোর অভীষ্ট-পূরণ ॥

তব পদযুগে মোর অসংখ্য প্রণতি ।

জন্মে জন্মে থাকে যেন তব পদে মতি ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥

বন্দিলাম বন্দিলাম সবার চরণ ।

কৃপা করি’ দেহ সবে শ্রীচরণে স্থান ॥

নমো নমঃ শ্রীরাধিকা মদনমোহন ।

সাবধানে বন্দি আমি যুগল-চরণ ॥

কৃপাদৃষ্টি কর প্রভো অধমের প্রতি ।

দৌহা পদযুগে যেন হয় শুদ্ধভক্তি ॥

সবাকার পাদপদ্মে মোর নিবেদন ।

কৃপাবিন্দু দিয়া মোরে এবে কর ত্রাণ ॥

তোমাদের কৃপা পাব এই আশা নিয়ে ।
 সবার চরণপ্রান্তে আছি গো বসিয়ে ॥
 দয়ালের শিরোমণি গৌরানন্দ আমার ।
 কত জনে করিলেন ভব-সিন্ধুপার ॥
 কলিহত জীব-দুঃখে হইয় দুঃখিত ।
 গোলোক ছাড়িয়া এবিধ হ'ল প্রকাশিত ॥
 আচণ্ডালে কোল দিয়ে গৌর-ভগবান ।
 প্রেম দান করি' সবে করিলেন ত্রাণ ॥

কত যে দৃষ্টান্ত তার আছে শাস্ত্রমতে ।
 মো-সম অধমা তার কি পারে গণিতে ॥
 এক যে কাহিনী মোর পড়ে গেল মনে ।
 সে কথা জানাই আমি সবার চরণে ॥
 শান্তিপুর ছাড়ি' সবে নীলাচল-পথে ।
 চলেছেন মহাপ্রভু ভক্তগণ-সাথে ॥
 যারে দেখে তারে বলে—কহ কৃষ্ণনাম ।
 কৃষ্ণনামে পাবে সবে কলিতে এড়ান ॥
 'হা হা কৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ' বলি' গোরারায় ।
 হাসে কঁাদে নাচে গায় পাগলের প্রায় ॥
 নাচিতে নাচিতে চলে মুখে বলে হরি ।
 কিবা অপকৃপ রূপ আহা মরি মরি ॥
 এইরূপে চলে প্রভু নীলাচল-পথে ।
 এক রজকেরে দেখে কাপড় কাচিতে ॥
 অতি দুঃখী রজক সে দুঃখের তাড়নে ।
 রাশিকৃত কাপড় কাচিছে একমনে ॥
 তারে দেখি দয়ালের প্রাণে হৈল দয়া ।
 তরাইতে ইচ্ছিলেন দিয়া পদছায়া ॥
 রজকে দেখিয়া বলে—“ও রজক ভাই ।
 একবার হরি বল তাহা শুনে যাই ॥”

রজক না শুনে কথা, কাজে ব্যস্ত হ'ল ।

একমনে কাপড় সে কাচিতে লাগিল ॥

পুনরায় তারে বলে—“ও রজক ভাই ।

একবার হরি বল শ্রবণ জুড়াই ॥”

এইরূপ বার বার বলে গোরারায় ।

অবজ্ঞা করিয়া ধোপা কান নাহি দেয় ॥

তবুও না ছাড়ে তারে দয়াল ঠাকুর ।

তারে কৃপা করিবার প্রয়াস প্রচুর ॥

আবার কহিল তারে মিনতি করিয়া—

“হরি বোল বল ভাই তৃপ্ত করি' হিয়া ॥”

মিনতি শুনিয়া বলে, “শুনগো গোঁসাই ।

তুমি হরি বল, তোমার কাজ কিছু নাই ॥

কেমনে বলিব আমি ওই হরি নাম ।

অবিশ্রান্ত কাজ মোর নাহিক বিশ্রাম ॥

আমি যদি ক্ষণমাত্র 'নাম' করি ব'সে ।

আমার যে পত্নী-পুত্র সব যাবে ভেসে ॥

রজকের কথা শুনে বলেন গোঁসাই—

“মুখে বল হরি নাম কাজে বাধা নাই ॥”

তথাপি না শুনে কথা কাজে মন দিল ।

একমনে কাপড় সে কাচিতে লাগিল ॥

রজকের মতি-গতি বুঝিয়া গোঁসাই ।

বলে—“মম বাক্য শুন ও রজক ভাই ॥

তোমার কাপড়খানি দিয়া মম করে ।

একবার হরি নাম বল উচ্চস্বরে ॥

এই নামে তব শ্রম হ'য়ে যাবে দূর ।

ভব-জ্বালা ঘুচে যাবে আনন্দ প্রচুর ॥”

প্রভুর এ বাক্য শুনি রজক ভাবিল ।

“অধমের প্রতি এত কা'র দয়া হল ?”

কেবা এই গুণনিধি ধোপা ভাবি' মনে ।

বিস্ময়ে চাহিল তবে বদনের পানে ॥

অত্যাশ্চর্য্য রূপ হেরি শ্রীমুখ-কমলে ।

পাষণ-হৃদয় তার এবে গেল গ'লে ॥

উভয়ের চক্ষু যবে মিলিত হইল ।

প্রভু তারে কৃপা করি' শক্তি সঞ্চারিল ॥

প্রভুর চরণে আসি পড়িল তখন ।

রজক করিল তাঁরে আত্মসমর্পণ ॥

প্রভুর কৃপাতে সে যে হৈল বিমোচন ।

কর্ম্মের বন্ধন টুটে, পেল প্রেমধন ॥

রজকের কর্ম্মবন্ধ সব ঘুচে গেল ।

সাত্ত্বিক ভাবের তথা উদগম হইল ॥

প্রভুর কৃপাতে পেয়ে ভক্তির সন্ধান ।

অজ্ঞানতিমির নাশি পেল দিব্যজ্ঞান ॥

সে কাপড় কাচা তার রহিল কোথায় ।

'হরি হরি' বলি' নাচে বাতুলের প্রায় ॥

কড়ু হাসে কাঁদে কড়ু মুচ্ছ' যায় ।

মুখের ভিতর দিয়া ফেণা বাহিরায় ॥

হেন কালে রজকিনী এল তথাকারে ।

পতির খাওয়াবে বলে খাচ্ছ নিজে করে ॥

পতির এ হেন দশা দেখে হৈল ভয় ।

পিশাচী পাইল তারে ভাবিল নিশ্চয় ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীউষালতা দেবী, ভক্তিব্রতা

কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

সন্দভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দভ-২২)

ব্রজবাসী গোপাদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকর, তাহা এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অপত্ন্যুৎসাহং বর্ষমতিবাতং শিলাময়ম্ ।

স্বযাগে বিহতেহস্মাভিরিন্দ্রো নাশায় বর্ষতি ॥

তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্থাথং মৎপরিগ্রহম্ ।

গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সৌহৃৎ মে ব্রত আহিতঃ ॥

(ভাঃ ১০।২৪।১৫, ১৮)

বর্ষা-ঋতু অতীত হইলেও অতিবাত্যাসহ ও শিলাময় বৃষ্টিহেতু আমি ইন্দ্রের যাগ বন্ধ করিয়াছি বলিয়া আমার পিতাদি ব্রজ-পরিকরগণের নাশের জঙ্ক ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছেন। এই গোষ্ঠ আমার আশ্রিত। আমিই ইহার একমাত্র রক্ষক এবং ইহা আমার একান্ত আপনার বলিয়া গৃহীত। সুতরাং নিজ অসাধারণ প্রভাবে আমি ইহাকে রক্ষা করিব। এই বিষয়ে আমি সতত কৃতসঙ্কল্প।

দশমে অশ্রুত ও ব্যক্ত রহিয়াছে,—

তত আরভ্য নন্দস্ত ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্ ।

হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়নভূমপ ॥ (ভাঃ ১০।৫।৮)

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল হইতে নন্দের ব্রজভূমি সর্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। হরির নিবাসভূত যে আত্মা, তাহার যে গুণ তদ্বারা সর্বসমৃদ্ধিমান অর্থাৎ ‘আত্ম’-শব্দে স্বরূপ; ব্রজের স্বরূপ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তথায় নিত্য অবস্থান করেন। অশ্রুত ভক্তগণের হৃদয়ে কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ স্মৃতি হয়, কিন্তু শ্রীব্রজের সহিত কখনও বিচ্ছেদ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের বিহারভূমির যে-সকল অসাধারণ গুণ থাকা উচিত, সেইসকল গুণে তাহা সর্বসমৃদ্ধিতে পূর্ণ। সেই ব্রজকে বিশেষভাবে পরিচিত করাইবার জঙ্ক বলিলেন,—‘নন্দের ব্রজ’, অর্থাৎ যে-স্থানে সপরিকরে শ্রীব্রজরাজ নন্দ সতত অবস্থান করেন। সেই ব্রজ সর্বদা নিখিল সম্পদে পরিপূর্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা (শ্রীব্রজভূমি) রমার

ক্রীড়াভূমি হইয়াছিল। এস্থলে রমা-শব্দে মহালক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীব্রজদেবীগণ।
তাহারা ব্রহ্মসংহিতায় লক্ষ্মী-শব্দে অভিহিতা হইয়াছেন,—

চিন্তামণিপ্রকরসদৃশ কল্পবৃক্ষ-

লক্ষ্যাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তুম্।

লক্ষ্মীসহস্রশত-সম্ভ্রমসেব্যমানং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রঃ সং ৫।২৯)

অর্থাৎ চিন্তামণিরাশিদ্বারা নির্মিত গৃহসকল এবং লক্ষ লক্ষ উত্তম কল্প-
বৃক্ষে আবৃত শ্রীগোকুলে সুরভি পালন করিতে করিতে সহস্র সহস্র লক্ষ্মীদ্বারা
পরমাদরে সর্বদা যিনি সেবিত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি
ভজন করি !

শ্রীভাগবত দশমের চতুর্দশ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত শ্লোকসকলে গোপাদির
নিত্য-পরিকরত্ব বর্ণিত হইয়াছে,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ-ব্রজোকসাম্।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

অহো, নন্দগোপ ব্রজবাসিগণের এক অনির্বচনীয় সৌভাগ্য, যেহেতু
পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাদের সনাতন মিত্র। এস্থলে ভাগ্য কোন শুভকর্ম-
জন্ম অদৃষ্ট নহে। তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব। তাঁহার কৃপাই তৎপ্রাপ্তির
একমাত্র হেতু। এস্থলে কৃপারই প্রাধান্য। এইজন্ম ভাগ্য—শ্রীকৃষ্ণের
অনির্বচনীয় কৃপা। শ্লোকে ‘ভাগ্য’-শব্দের পুনরুক্তিদ্বারা পরমাদর-সহকারে
সেই ভাগ্যের সর্বপ্রকারে অপরিচ্ছেদ্যত্ব কথিত অর্থাৎ ব্রজবাসিগণের যে
ভাগ্য, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সনাতন মিত্র; দেশ-কাল-পাত্রের কোন বৈলক্ষণ্য-
বশতঃ তাহা খণ্ডিত হয় না। সর্বাবস্থায় তাঁহারা সেই সৌভাগ্যযুক্ত। পূর্ণ,
পরমানন্দ ও ব্রহ্ম—পদত্রয়দ্বারা সনাতনত্ব সিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ণ পরমানন্দ ব্রহ্ম-
বস্তু যে সনাতন, ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র। তবে যে শ্লোকে ‘সনাতন’-
শব্দ প্রযুক্ত, উহা উক্ত মিত্র-পদের বিশেষণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের
মিত্ররূপে নিত্য বিद्यমান। অথবা বিধেয় মিত্র-পদটিকে বিশেষরূপে বুঝাইবার
জন্ম অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণ-পদের বিশেষ করিতেছে। যেমন, “এই মনোরম সুবর্ণ-
কুণ্ডল” — এই বাক্যে কুণ্ডলেরই মনোরমত্ব সাধ্য অর্থাৎ অনুবাদ্য সুবর্ণ-
পদের ‘মনোরম’ এই বিশেষণটি বিধেয়, কুণ্ডল পদেরই মনোরমত্ব সাধন

করিয়াছে। সুতরাং এই শ্লোকে অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মের পরমানন্দময় পূর্ণত্ব সাধন করিতেছে। এই পদদ্বয়ের তুল্যার্থে প্রযুক্ত ‘সনাতন’-পদও মিত্রতার সনাতনত্ব সাধন করিতেছে অর্থাৎ সনাতন শ্রীকৃষ্ণ মিত্র বলিয়াই ঐ মিত্রতাও সনাতন। তাহা কখনও ধ্বংস হয় না। কোন সময়ের মিত্র, ইহা না বলায় সর্বকাল-ব্যাপী মিত্রত্ব প্রাপ্তি হইতেছে।

অহো ! ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের প্রসঙ্গ আর কি বলিব ? আমাদেরও অনির্বাচনীয় সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, এ অভিপ্রায়ে ব্রজা বলিলেন,—

এষান্ত ভাগ্য-মহিমাচ্যুত ! তাবদাস্তা-

মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ ।

এতদ্ধ্বীক-চৰ্ষকৈরসকুণ্ড পিবামঃ

শৰ্কাদয়োহজ্যুদজ-মধ্বমৃতাসবং তে ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩৩)

হে অচ্যুত ! ব্রজবাসিগণের অনন্ত ভাগ্য-মহিমার কথা দূরে থাকুক, আমরাও মহাভাগ্যশালী ; কারণ ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্রদ্বারা আপনার পাদ-পদ্মের মকরন্দ, যাহা অমৃত ও মদিরাস্বরূপ তাহা নিরন্তর পান করিতেছি।

ব্রজবাসিগণের অখণ্ডিত ভাগ্যমহিমার কথা আর কি বলিব, শর্ক (মহাদেব) প্রভৃতি দশদিক্‌পাল দেবতা আমরাও মহাভাগ্যশালী। দশ-দিক্‌পাল মধ্যে পরম-ভক্ত বলিয়া মহাদেব মুখ্য, এজন্য প্রথমে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। নিজেদের মহাভাগ্যশালিতা দেখাইতেছেন—আমরা এস্থলে আগমন করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্রদ্বারা সাক্ষাৎ-সম্মুখে আপনার পাদপদ্ম-মধু অমৃত ও মদিরা বারংবার পান করি। চরণের সৌন্দর্য্যাদি নিরতিশয় মনোহারী বলিয়া মধ্বাদি ত্রিবিধ বস্তুরূপে তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। শ্লোকস্থ ‘এতৎ’-পদটি ‘অজ্যুদজমধ্বমৃতাসবং’ পদের বিশেষণ অর্থাৎ এই চরণকমল মধ্বামৃত মদিরা—এইরূপ অর্থও হয়।

‘এতদ্ধ্বীকচৰ্ষকৈঃ’ এই পদের কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন,—ব্রজবাসী-দের ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্রদ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ (আমরা) আপনার চরণকমল-মধু অমৃত মদিরা পান করিয়া পরম-সৌভাগ্যশালী। কিন্তু তাহা অসঙ্গত। এই মতে ব্রজবাসিগণের দেহ প্রাকৃত—এই বিচার আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহারা অপ্রাকৃত প্রেমময় বিগ্রহ। তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহের চক্ষুরাদি অবয়বে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতার কর্তৃত্ব নাই। প্রেমই সর্বেন্দ্রিয়ের

প্রবর্তক । যখন যে ইন্দ্রিয়ে যে চেষ্টা প্রকাশ পাইলে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি হয়, তখনই প্রেম তাঁহাদের সেই ইন্দ্রিয়ে সেই চেষ্টা প্রকাশ করেন । কারণ ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা যে ভোগ নিষ্পন্ন হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণের কর্তৃত্বাধীনে সে ভোগ নিষ্পন্ন হইতে পারে না । তাহার কারণ—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ করণ-পক্ষপাতী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের যেমন ভোগ-সাধনতা আছে—ভোগ-কর্তৃত্ব নাই, তদ্রূপ উক্ত দেবগণ ভোগ-সাধন করেন, তাঁহাদের কর্তৃত্ব নাই । দেহগত স্মৃতি-স্মৃতির ভোক্তা আত্মা । অতএব অপ্রাকৃত ব্রজবাসীদের দেহে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণের কোন কর্তৃত্ব নাই বলিয়া ব্রহ্মা পূর্বেও প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

তদ্বিরি-ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যং

যদ্যেকুলেহপি কৃতমাজিঘ্র-রজোভিষেকম্ ।

যজ্জীবিতস্ত নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-

স্বত্বাপি যৎপদরজঃ শ্রুতি-মৃগ্যমেব ॥

(ভাঃ ১০ ১৪।৩৪)

এই গোকুলে কোন গভীর অরণ্যমধ্যে যে কোন তৃণাদি-জন্ম যদি হয়, তবে মহাভাগ্য মনে করি । কারণ, তাহাতে কোন গোকুলবাসীর পদধূলি-দ্বারা অভিষিক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে । তাঁহাদের পদধূলি প্রাপ্ত হইলে ধন্য হইব কেন, তদন্তর,—ঈহাচার শ্রীচরণেণু অত্বাপি শ্রুতিগণ অন্বেষণ করিতেছে, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আপনি গোকুলবাসীর জীবাতু ।

এতদ্বারা ইহা স্মৃতি হইল যে, গোকুলবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর । স্মৃতিরাং শ্রীকৃষ্ণচরণ-নিষেবণ-লক্ষণ যে ভূরিভাগ্য প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহা শ্রীগোকুলে জন্মলাভ হইলে সর্বদা সম্ভব হয় । গোকুলবাসিগণ সর্বদা সেই সেবাস্থখে নিমগ্ন । তাঁহাদের ভক্তিতে আপনিও নিত্যধনী হইয়া তাঁহাদের মধ্যে রুদ্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের তিরোভাব-তিথিতে অভিভাষণ

প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ-নিরাস ও বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম
(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৩ পৃষ্ঠার পর)

আমরা আজ যে পবিত্রতমস্থানে সমবেত হইয়া শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুর তিরোধান-স্মৃতিপূজায় একত্রিত হইয়াছি, সেই অপ্রাকৃত ভূমিতেই শ্রীল গোস্বামিপাদগণ একত্রে অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন করিয়াছিলেন। এই স্থানের মাহাত্ম্য রক্ষা করিবার ভার আপনাদের উপরই হস্ত। অত্যাভিলাষশূন্য, জ্ঞান-কর্মকাণ্ড-বিবর্জিত শুদ্ধভক্তির প্রশস্ত পথ সম্বন্ধে গোস্বামিপাদগণ লোক-মঙ্গলহেতু এইস্থানে শিক্ষা দিয়াছিলেন।—

নানাশাস্ত্র-বিচারনৈকনিপুণো সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপকো
লোকানাং হিতকারিণো ত্রিভুবনে মান্যো শরণ্যাকরো ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকো
বন্দে রূপ-সনাতনো রঘুযুগো শ্রীজীব-গোপালকো ॥

(শ্রীষড়্গোস্বাম্যষ্টকম্—২)

[যাহারা বিবিধ-শাস্ত্রবিচারে পরম-নিপুণ, সদ্ধর্ম্মের স্থাপনকর্তা, মানব-গণের পরম-মঙ্গলকারী, ত্রিভুবনপূজ্য, আশ্রয়দাতা ও শ্রীরাধাগোবিন্দের পদারবিন্দ-ভজনানন্দে প্রমত্ত-মধুকর-সদৃশ, আমি পুনঃ পুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ-ভট্ট, গোপাল-ভট্ট, রঘুনাথদাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের স্তুতিগান করি ।]

শ্রবণ-কীর্ত্তনপর ভাগবত-ধর্ম্মের প্রবর্তকমণ্ডলীর মধ্যমণি শ্রীল জীব গোস্বামি-পাদ এইস্থানেই বিচার করিয়াছিলেন যে, ‘শ্রবণ’ অর্থে অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের শ্রবণ। অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার একটি চিত্র অপরটি হইতে ভিন্ন নহে। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্মের সহিত যে প্রেমময় ধনুর্বাণের তীক্ষ্ণ খরশ্রোত—রক্ত-কাণ্ডের লীলা, তাহা ব্রজবধূগণের উন্নত উজ্জ্বল মাধুর্য্য-রস হইতে ভিন্ন নহে। শ্রীভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করিয়া বীররসে অখিলরসের আকর শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম আশ্বাদন করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ।—

“যুধি তুরগরজে বিধূত্র-বিশ্বন্তঃ
কচলুলিত-শ্রমকার্য্যালঙ্কৃতাস্তে ।
মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্মমান-ত্বচি
বিলসৎ কবচেহস্ত কৃষ্ণ আত্মা ॥”

“কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তত্রস্থ অশ্বের ক্ষুরোখিত-ধূলিদ্বারা ধূসরবর্ণ কুণ্ডলে এবং পরিশ্রমজনিত শ্বেদবিন্দু-কণায় ঝাঁহার মুখারবিন্দ সঙ্কুচিত হইয়াছিল, তথাপি ভক্তবাৎসল্য প্রকাশার্থ তাহাও অলঙ্কৃতির হ্রায় স্বশোভিত হইয়াছিল এবং আমার তীক্ষ্ণশরে ঝাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল অথচ তাঁহার কবচের শোভাবিস্তার করিয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার মন রমণ করুক ।”

শ্রীপাদ জীব গোস্বামি-প্রভু, বীবরসের ভক্ত শ্রীভীষ্মদেবের দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত-বিক্ষত হন নাই, তাহা স্বন্দপুরাণ হইতে প্রমাণবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

“অসুরান্ মোহয়ন্ দেবঃ ক্রীড়ত্বেষ সুরেষপি ।

মানুষান্ মধ্যয়া দৃষ্ট্যা ন যুক্তেষু কথঞ্চনেতি ॥

শ্রীভীষ্মস্য যুদ্ধসময়ে দৈত্যাবিষ্টত্বাতথা ভাণং যুক্তমেব । কিন্তুধুনা দুঃস্বপ্ন-
দুঃখশ্চেব তস্ম নিবেদনং কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্ ।”

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে ভীষ্মদেবের তীক্ষ্ণশরে ক্ষত-বিক্ষত হইবার অতিনয় করিয়াও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জুনকে একা রথে ছাড়িয়া দিয়া ভীষ্মের প্রতি ভক্ত-বাৎসল্য দেখাইবার জ্ঞত উপস্থিত হইয়াছিলেন । শ্রীভীষ্ম-দেবের শরদ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইবার ভাণমাত্রদ্বারা কৃষ্ণের সহিত যে প্রেমের আদান-প্রদান তাহা যদি ভক্ত ও ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমজনিত আদান-প্রদান না হইত, তাহা হইলে তিনি অশ্রুভাবেই ব্যাখ্যা করিতেন । সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেকটি কৃষ্ণ-লীলাই যোগ্যতাসুসারে শুদ্ধভক্তের আশ্বাদনীয় । বাৎসল্য-রসে অভিভূত স্নেহাধার পিতামাতা যেক্রপ তদাশ্রিত শিশুর সমস্ত কার্য্যক্রমেই উত্তম রসাস্বাদন করেন, তদ্রূপ শুদ্ধভক্ত ভাগবতের সকল কৃষ্ণ-লীলাই একভাবে আশ্বাদন করেন ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী যোগ্য শ্রোতার অধিকার ক্রমবর্ধন করিবার মানসে, কৃষ্ণবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ নয়টি সর্গ-বিসর্গাদি তত্ত্ব পৃথক পৃথক স্বন্ধে বিস্তার করিয়াছেন । কৃষ্ণলীলা-অর্থে কেবল রাসলীলাই লক্ষিত

হয় না বা বৃন্দাবন-লীলাই নহে, পরন্তু যেখানে যেখানে কৃষ্ণ-সম্পর্ক আছে, সে-সকলই কৃষ্ণের অপ্ৰাকৃত লীলা। কৃষ্ণের রাসলীলা বা গোপীগণের সহিত যে লীলা, তাহা মুক্তপুরুষগণের আশ্বাদনীয়। পতিতপাবন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর কোনদিনই হাটে-বাজারে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা আশ্বাদন করেন নাই। তিনি গভীরায় স্বজাতীয়ম্লিঞ্চ স্বরূপ-দামোদর, রামানন্দাদি ২৪ জন উচ্চকোটি ভক্তের সহিত কৃষ্ণের মাধুর্য্য-লীলা আশ্বাদন করিতেন; অপর সাধারণের নিকট তিনি হরিকীর্তন-লীলাই প্রকট করিতেন। কৃষ্ণতত্ত্ব না বুঝিয়া গুণময়ী মায়ার লীলাতে মত্ত থাকিয়া সামান্য চা-বিড়ির মায়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগে অসমর্থ হইয়াও, আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের অপ্ৰাকৃত রাসলীলাদি শ্রবণের জন্ত মুক্তাভিমান করি, তাহাই প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ বা অধঃপতনের মূল কারণ-স্বরূপ।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ সেইরূপ প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ-দূষিত শ্রবণ-কীর্তন কোনদিনই অনুমোদন করেন নাই। অপসিদ্ধান্তাশ্রয়িগণ শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুর রূপানুগ সিদ্ধান্তবাদে বিশ্বস্ত হইয়া, শ্রীল রূপ গোস্বামী পরে জীব গোস্বামীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—ঈর্ষান্বিত হইয়া এমন একটা অপবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না; হায়! ধিক্ সহজিয়াদের শ্রীজীব-দ্রোহিতা বা শ্রীগৌর-দ্রোহিতা।

অপ্ৰাকৃত ভগবান্নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ-কীর্তন-সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—“তথাপি নামঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধার্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যত, সম্পদ্যে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম রূপ-গুণ-পরিকরেণ সম্যক্ স্ফুরতেষু লীলানাং স্ফুরণং স্তূৰ্হু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমঃ লিখিতঃ। এবং কীর্তন-শ্রবণয়োঃ জ্ঞেয়ম্। ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমহানুখরিতং স-মাহাত্ম্যং জাতরুচীনাং পরম-সুখদম্।”

অর্থাৎ প্রথমে নাম শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ হয়। বদ্ধজীবের চিন্তা-মালিষ্ঠজনিত নাম-শ্রবণই প্রথম সাধন-ক্রম। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিখিল জীবের ‘চেতদর্পণ মার্জন’ করিবার জন্ত, ভব-মহাদাবাগ্নি বা কামাগ্নিকে দমন করিবার জন্ত শুদ্ধনাম-শ্রবণই উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুও তাহাই বিতরণ করিয়াছেন।

মহাজন বা সাধু-গুরু-শাস্ত্র কখনও এক হইতে অপর পৃথক নহেন। যেখানে অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বা ভগবানের পরিকর-বৈশিষ্ট্যে সিদ্ধান্তগত ভেদ উপলক্ষিত হয়, তথায় দুইটি বস্তু লক্ষ্য করা আবশ্যক। সে-স্থলে হয় বুঝিবার ভ্রম, না হয় ত সেইসকল মহাজন, সাধু, গুরু বা শাস্ত্র নহে। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ আমাদের গুরু, তিনি সাধু, শাস্ত্রজ্ঞ এবং ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়জন; স্ততরাং তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক নহেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর “সাক্ষাৎকরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রেঃ” বিচারদ্বারা এবং “কিন্তু প্রভোঃ প্রিয় এব তন্ত্ৰ” বিচারদ্বারা আমাদেরিগকে এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন যে, মন্ত্রগুরু এবং শিক্ষাগুরুগণ সকলেই ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ। তাঁহারা ভগবানকে প্রকাশ করিয়া আমাদের দেখাইতে পারেন। ইংরাজী-ভাষায় “Transparent via media” বালিয়া একটা কথা আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন সূর্য্যের প্রকাশদ্বারাই আমরা বহুদূরে অবস্থিত সূর্য্যকে দেখিতে পাই, সেই প্রকার ভগবানের প্রকাশবিগ্রহগণের মাধ্যমেই আমরা ভগবানকে বুঝিতে পারি। যেক্রপ সূর্য্যের প্রকাশ সূর্য্য হইতে ভেদাভেদ-তত্ত্ব, সেই প্রকার সাধু-গুরু-শাস্ত্রও ভগবান্ হইতে ভেদাভেদ-তত্ত্ব। গোস্বামিগণ সেবক-ভগবান্ হইলেও আমাদের নিকট সেব্য-ভগবানের সম-তুল্য; তাঁহারা সেব্য-ভগবান্ হইতে অভিন্ন এবং ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়জন। অতএব তাঁহাদের নির্দেশই আমাদের নির্ভয় পথ।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ আমাদের উপদেশ দিয়াছেন যে, ভগবানের লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা আশ্বাদন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জনের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে ভগবানের গুহ্যনামই শ্রবণ করিতে হইবে। গুহ্যনাম শ্রবণফলে ভগবানের অপ্ৰাকৃত রূপের অনুভব হয়। কৃষ্ণ-নাম বাদ দিয়া যে কৃষ্ণ-রূপের দর্শন হয়, তাহা প্রাকৃত,—

“প্রাকৃত করিয়া মানৈ বিষ্ণু-কলেবর।

বিষ্ণু-নিন্দা নাহি আর তাহার উপর ॥”

“অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতন ॥”

গুহ্যনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত ভগবানের রূপ-দর্শন-চেষ্টা—অযোগ্যতা। রূপ সম্যক্ দর্শন হইলে ভগবানের চিদৃগুণের উপলব্ধি হয় এবং চিদৃগুণের উপলব্ধি হইলে তবে ভগবানের অপ্ৰাকৃত মাধুর্য্য-লীলার তাৎপর্য্য বোধগম্য হয়।

অতএব চিত্তদর্শণ মার্জন না করিয়া ভগবানের অপ্রাকৃত রাসলীলাদি শ্রবণ অপরাধজনক। তজ্জন্ত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

“রূপ-রঘুনাথ-পদে হইব আকৃতি।

কবে হাম বুঝব সেই যুগল-পীরিতি ॥”

শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভু ভগবানের নাম-শ্রবণ পক্ষেও বিচার করিয়া বলিয়াছেন,—“যদি অত্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্য। তদা তৎ (নাম) সংযোগে-নৈবেদ্যুক্তঃ। যজ্ঞৈঃ সংকীৰ্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি স্মেধস ইতি। অতএব স্বতন্ত্রমেব নামকীৰ্ত্তনমত্যন্ত-প্রশস্তম্। হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথেষ্ট্যাদৌ। অত্র পান্নোক্তা দশাপরাধাঃ ত্যাজ্যাঃ। অপরাধাশ্চ সংক্ষিপ্য লিখ্যন্তে যথা ‘সতাং নিন্দা’ ইত্যাদি... নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি ইত্যাদি।”

সুতরাং শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের লিখনে নামাপরাধের বিচার আছে। নামাপরাধ করিয়া যে নামের শ্রবণ-কীৰ্ত্তন হয়, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়—“নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়।” নামবলে পাপ-বুদ্ধি সৰ্ব্বাপেক্ষা বড় নামাপরাধ। “নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীবহিংসন”—এই-গুলি সব ভক্তিলতার প্রতিবন্ধক আগাছা-স্বরূপ। এগুলি পরিত্যাগ না করিলে ভক্তিপথ রুদ্ধ হইয়া যায়। নিষিদ্ধাচার-অবজ্ঞাকারী বৈষ্ণব—অসদাচারী। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অসদাচারী বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের সম্মান দিতে বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—অসংসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রী-সঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।” শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু নিজপার্ষদ ছোট হরিদাসকে স্ত্রী-সঙ্গী জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ছোট হরিদাস মহাপ্রভুকে স্ত্রী-সঙ্গী-অভিনয় আমাদের এই শিক্ষার জন্ত যে, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ-বৈষ্ণব কীৰ্ত্তনে অযোগ্য ও অনধিকারী। নাম-বলে পাপবুদ্ধি যাহার রহিয়াছে, তিনি বিশিষ্ট নামাপরাধী। শ্রীপাদ জীব গোস্বামি-প্রভু এইভাবে শ্রবণ কীৰ্ত্তন-অর্চনাদিবিষয়ে আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে শিক্ষা দিয়াছেন। নামাপরাধ, সেবাপরাধাদিরও অনেক বিচার করিয়াছেন।

কথা অনেক, কিন্তু সময় অতি অল্প ; তজ্জন্ত আপনাদের নিকট আমার সান্ন্যয় নিবেদন এই যে, আপনারা সকলেই এখানে বিদ্বজ্জন মহাস্ত গোস্বামী আদি উপস্থিত আছেন। ব্যক্তিগত অপস্বার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনারা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিলে আমরা সকলে একত্রে সম্ভব হইয়া শ্রীল গোস্বামিপাদগণের বিচারধারা জগতে প্রচার করিতে সমর্থ হইব। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করিবার উত্তর-দায়িত্ব ভারতীয় সকলেরই আছে। গোস্বামিপাদগণ সেই গুরু-দায়িত্ব সুগম করিবার মানসে এইস্থানে বসিয়া নিখিল-শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বিচার করিয়াছিলেন। লোকমঙ্গলহেতু তাঁহারা যে বহুশাস্ত্রবিচার করিয়াছিলেন, তাহা এখন এই দুঃসময়ে জগতে দান করা আবশ্যক। সমস্ত জগতের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ দেশ এবং সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন-ধামই আরাধ্যবস্ত। অতএব বৃন্দাবনবাসী সকলেই ধন্য ; তত্রাপি গোস্বামি-বিচার জগতে প্রচার করিলে বৃন্দাবনবাসী সকলেই ধন্যতীর্থ হইয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী প্রচারে সমর্থ হইবেন।

আমি আপনাদের সকলের নিকট সান্ন্যয় নিবেদন করিতেছি যে, আমাদের সকলের সম্ভব হইয়া এইস্থানে রীতিমত গোস্বামি-শাস্ত্র, বিশেষ করিয়া ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি, ক্রমসন্দর্ভ, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ বিশদভাবে আলোচনা করা কর্তব্য। এতদ্বারা বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের এবং জগতের সকলের কল্যাণ সাধিত হইবে।

— ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমন্তভক্তিবেন্দাস্ত স্বামী মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত
নিশুদ্ধ সান্ন্যয়
শ্রীচৈতন্য-পত্রিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি ষাণ্ঠীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।

মূল্য— ১.০০ টাকা, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়ে প্রাপ্য।

বশিষ্ঠা আশ্রম

ইহ জগ-ভরিয়ে যোহি অছু বেয়াপিয়ে

(কভু) ন হেরিনু তহি নয়নে ।

ইহ কানন-ভরি বাজত (যো) বাঁশরী

সো স্বর (কভু) নহি পশিলু শ্রবণে ॥

যো রূপ-মাধুরী অনু-দর্শন করি

বিশ্বমোহন-সাজ সাজে ।

হৃদয়ে লাবণি-ঠাম রাজত অনুপাম

এ চিত তহি নহি মজে ॥

যাঁকর প্রেমবিন্দু পরশিয়ে সুখ-ইন্দু

পাগল মদন-দহন ।

সোহি প্রেম-সাগর বহত হিয়া-পর

তবহুঁ রহল পিপাসন ॥

যাঁকর মধুর হাস নেহারি তড়িৎ-ভাস

সরমে গগনে করু খেলা ।

সোহি প্রেম-শেখর নাচত হৃদি-পর

উজোর ন ভেল চন্চলা ॥

যাঁকর রসকণ পরশিয়ে ত্রিভুবন

আনন্দে করতহি রঙ্গ ।

সোহি আনন্দঘন হৃদয়ে অনুখণ

তবহু ন ভেল তাঁক সঙ্গ ॥

কি মোর করম-গতি ন পেখলু প্রাণপতি

(সদা) মতি ইতি-উতি ধাওয়ে ॥

মগন বিষয়-বিষে উনমত জড়রসে

তবহি তো সুখ নহি পাওয়ে ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব যব মুখে কৃপা করব

তবহি পূরব অভিলাষ ।

জয়তু জয়তু গুরু তঁহু বাঞ্ছা-কল্পতরু

তুয়া পদে রাখু নিজ-দাস ॥

—শ্রীপ্রফুল্লকুমারী দেবী, ভক্তিশাস্ত্রী

(বারাগসী)

প্রচারকের ডায়েরী

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৬ পৃষ্ঠার পর)

এইরূপে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে প্রবেশ করিলাম—কত খাল-বিল, নদী-নালা অতিক্রম করিয়া চলিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু একটাও ‘টাইগার’ অর্থাৎ ত্র্যাদ্র গোচরীভূত হইল না। অবশেষে মইপীঠ-বিনোদপুরের বৃক্ষ-হীন জঙ্গলে এক নর-শাদ্দুলের সম্মুখীন হইলাম। উক্ত গ্রামে কোন গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হওয়ায় গৃহিণী ও গ্রামবাসীর অনুরোধে আতিথ্য স্বীকার করিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম, গৃহস্থানী কোন কার্য-ব্যপদেশে গ্রামের বহির্ভাগে গিয়াছেন এবং কিছুক্ষণ পরেই ফিরিবেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইল, তবুও কোন মূর্তির আবির্ভাব হইল না। মধ্যাহ্ন-আহারাতি-সমাপনান্তে তাহার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

সন্ধ্যার আলো-আঁধারের আবছায়ায় জনৈক পুরুষের গতি নিরীক্ষণ করিলাম। সরাসরি অন্তরমহলে প্রবেশের পর কিসের একটা মৃদুমন্দ গর্জন শোনা গেল। বুঝিলাম—অবলা নারীর উপর সবল পুরুষ-ব্যাঘ্রের প্রথম আক্রমণ! সন্ধ্যের একজন ব্রহ্মচারী উৎকর্ণ হইয়া সমস্তই শুনিলেন এবং আমায় বলিলেন যে,—গৃহিণী গৃহস্থানীকে গৃহাগত সাধু-সন্ন্যাসিগণের সম্বন্ধনার অনুরোধ জানাইলে তদপরাধে অসহায়্য রমণীর প্রতি এই বাক্যদণ্ড ও অশ্রাব্য গালিবর্ষণ। ‘কোথাকার গৌসাই, তাহাদের সহিত আমাদের কি প্রয়োজন—এবম্বিধ কুৎসিৎ মন্তব্য প্রকাশ’ গার্হস্থ-নীতি ও ধর্মবিরুদ্ধ। অনাহারে অনিদ্রায় রাত্র কাটিল।

পর দিবস প্রাতে পুরুষ-ব্যাঘ্রের দ্বিতীয় আক্রমণ চলিল; মাদৃশ পথ-ভ্রান্ত ভিক্ষুককে সম্মুখে পাইয়া নখরতুল্য তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ জর্জরিত করিয়া তুলিল। আমিও মুহূর্তের মধ্যে জলদগন্তীরস্বরে সেই হিংস্র আঘাতের তীব্র প্রতিরোধ করিয়া বলিলাম—“রে দুর্বৃত্ত! রসনা সংযত কর; নরকুলে জন্মিয়া স্থাপদ-স্বভাব ধারণ করিয়াছ। সনাতন হিন্দু-শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে পার নাই। ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—মনুষ্য; সেই নরাকৃতির অভ্যন্তরে দুইটা গুণের একত্র সমাবেশ—পশুত্ব ও দেবত্ব। যে Royal Bengal Tiger (রয়েল বেঙ্গল টাইগার)এর উদ্দেশ্যে আমার স্তম্ভবনে আগমন, আজ তাহার প্রত্যক্ষ দর্শন মিলিল।”

শাস্ত্র বেলন,—

“অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে ।

ছেতুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ ॥

উত্তমস্ত্রাপি বর্ণস্ত নীচোহপি গৃহমাগতঃ ।

পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সৰ্বদেবময়োহতিথিঃ ॥”

অর্থাৎ শত্রুও যদি গৃহে উপস্থিত হয়, তবে তাহার যথোপযুক্ত সংকার করা কর্তব্য। যেমন আমরা দেখিতে পাই—বৃক্ষ কখনও তৎপার্শ্বস্থিত ছেদনকারীকে ছায়াদানে কুণ্ঠিত হয় না। উত্তমবর্ণের গৃহেও যদি নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তির অতিথিরূপে আগমন হয়, তিনিও যথাযোগ্য সম্মাননীয়, যেহেতু অতিথি সৰ্বদেবময়।

অধিষ্ঠাতাহতিথির্গেহে সন্ততং সৰ্বদেবতাঃ ।

তীর্থাশ্চেতানি সর্বাণি পুণ্যানি চ ব্রতানি চ ॥

তপাংসি যজ্ঞাঃ সত্যঞ্চ শীলং ধর্ম্মঃ স্তুত্বঞ্চ চ ।

অপূজিতৈরতিথিভিঃ সার্কং সৰ্বৈ প্রযান্তি তে ॥

অতিথিষ্মন্ত ভগ্নাশো গৃহাং প্রতিনিবর্ততে ।

পিতরন্তস্ত দেবাশ্চ পুণ্যং ধর্ম্মব্রতশনাঃ ॥

যমঃ প্রতিষ্ঠা লক্ষ্মীশ্চাভীষ্টদেবো গুরুস্তথা ।

নিরাশাঃ প্রতিগচ্ছন্তি ত্যক্ত্বা পাপঞ্চ পুরুষম্ ॥

(নারদপঞ্চরাত্র ১৬।৪১-৪৪)

গৃহে অতিথির অধিষ্ঠান হইলে সকল দেবতার অধিষ্ঠান হয়। যিনি অতিথির পূজা না করেন তাহার সমস্ত তীর্থ, সকল পুণ্য, অখিল ব্রত, তপস্তা, যজ্ঞ, সত্য, সদ্বৃতি ও ধর্ম্ম এবং স্তুত্বসকল সেই অতিথির সহিত চলিয়া যায়। যাহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া চলিয়া যান, তাহার পিতৃগণ, দেবগণ, পুণ্য, ধর্ম্ম, ব্রত, ভক্ষ্য-ভোজ্য, সংযম, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, অভীষ্টদেব গুরু—ইহারা নিরাশ হইয়া সেই পাপ পুরুষকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যান।

আমরাও উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্যসকল স্মরণ করিয়া সেই হিংস্র পুরুষের কবলমুক্ত হইলাম।

* * * *

অপর একদিন গ্রীষ্মের প্রথর রৌদ্রে দুর্গম প্রান্তর অতিক্রম করিতেছি, এমন সময়ে বাহক-স্বন্ধাক্রান্ত এক প্রতিমা নয়নগোচর হইল। সবিশেষ

অবগতির জন্ম মনে বড় কোঁতুহল জাগিল, তাই প্রশ্ন করিলাম। উত্তর আসিল—“আমাদের মাঁগা-ঠাকুর”। আমি বিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্রে মূর্তির দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম,—“মাঁগা-ঠাকুরই বটে!” তিনি ক্ষুধার জ্বালায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রতিঘরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাগিয়া খাইয়া ক্ষুণ্ণবৃত্তি করিতেছেন। নিত্য সেবাপূজার অভাবে তিনি জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। বিশ্বস্তর ভগবান যিনি, তাঁহার এই দুর্দশা কেন? তাই অবস্থা দেখিয়া মনে হইল,—ইহাতে সেবার লেশমাত্রও নাই, আছে কেবল বণিগ্‌বৃত্তি। ‘নারায়ণশিলাকে দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার’ ছায়া শ্রীবিগ্রহের দ্বারা সেবাইতের জীবিকানির্ব্বাহের ইহা একটা সুনির্ব্বাচিত কৌশল। এইরূপ প্রথা পৌত্তলিকতার নামান্তর—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ। সনাতন ধর্ম্মে এইরূপ পৌত্তলিকতার আবাহন বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ দ্বিবিধরূপে পূজিত হন, যথা—স্থানু ও বিজয়বিগ্রহ। স্থানু শ্রীমূর্তি শ্রীমন্দিরে নিত্য রাজসেবায় পূজিত হন এবং বিজয়বিগ্রহ স্থানান্তরে শুভবিজয় করিলেও তাঁহার নিয়মিত রাজসেবার কোনরূপ ত্রুটি হয় না। আরও বিশেষ এই যে, তাহাতে সংস্পর্শদায়োচিত নির্দিষ্ট সেবকের সেবা-নিষ্ঠার কোনরূপ ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু হায়! এই যে ধর্ম্মের নামে ব্যবসাদারী সংঘটিত হইতেছে, ইহা চিন্তা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। এস্থলে ‘মাঁগা-ঠাকুরের’ যে সেবা-পরিপাটী অনুভব করিলাম তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ইহা পৌত্তলিকতারই মূর্ত প্রতীক।

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তজিবেদান্ত উদ্ধমহী মহারাজ

শ্রীব্যাসপূজা কাহাকে বলে?

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান বিশেষভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ‘শ্রীব্যাসপূজা’ অর্থে শ্রীব্যাসদেবের পূজাকেই লক্ষ্য করে। আবার শ্রীব্যাসদেবের পূজা বলায় কোন বস্তুটী লক্ষীভূত হয়, তাহা স্পষ্টভাবে অনুভূত না হইলে শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীগুরুপূজার ঐক্য উপলব্ধি হয় না। জ্যামিতি-মতে ‘ব্যাস’ অর্থে পরিধিদ্বারা সীমাবদ্ধ কেন্দ্রে অবস্থিত সরলরেখাকে বুঝায়। এরূপ সরলরেখা অসংখ্য হইতে পারে; কিন্তু অসংখ্য হইলেও প্রত্যেকটিরই একই ধর্ম্ম। সেইরূপ ব্যাসও বহু হইলেও প্রত্যেকেই মূলতঃ একই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত।

গোলোক-মধ্যস্থিত কেন্দ্রকেই কৃষ্ণ কহে। তাহাতে সন্নিহিত রেখাস্বরূপ শক্তিই শ্রীব্যাস। তাঁহাকে কখনও অংশ, কখনও শক্তিরূপে গণনা করা হয়। বেদাদি-বিভাগ কার্য্যদ্বারা বদ্ধজীবকে কৃষ্ণসম্বন্ধ স্বরণ করাইয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই শ্রীব্যাসের কার্য্য। ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবেও তাহাই প্রধানরূপে দৃষ্ট হয়। একারণ শ্রীগুরুদেবই শ্রীব্যাসদেব, শ্রীব্যাসদেবই শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীগুরুপূজাই শ্রীব্যাসপূজা।

“আচার্য্য মাং বিজানীয়াৎ” বাক্যে কৃষ্ণকেই আচার্য্য বলিয়া জানিতে নির্দেশ রহিয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের শিক্ষাদান করিয়াছেন। “গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ রূপা করেন ভক্তগণে ॥” গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণেরই রূপ। শ্রদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের প্রিয়তম-জ্ঞানে অভেদরূপে দর্শন করেন। তজ্জন্ত শ্রীগুরুদেবের সেবাই ভগবৎ-সেবা; শ্রীভগবৎসেবা বলিয়া পৃথক্ আর কি আছে? সেইহেতু গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীগুরুপূজাই করিয়া থাকেন। ইহা কনিষ্ঠাধিকারে বা বন্ধাবস্থায় কখনই ধারণা হইতে পারে না।

‘পূজা’-শব্দদ্বারা কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করা হইবে? পুষ্প-চন্দন-ধূপাদি পঞ্চ বা ষোড়শোপচারদ্বারা অর্চনকেই কেবলমাত্র পূজা বলা হয় না। অর্চনা সাধারণতঃ কনিষ্ঠাধিকারে ব্যবস্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনুধাবন করিতে না পারিলে অর্চনা সার্থক হইতে পারে না। সূতরাং Ontologyকে পরিত্যাগ করত কেবল Morphologyতে নিবদ্ধ না থাকিতে শাস্ত্রে প্রচুর নির্দেশ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীগুরুদেব বা শ্রীব্যাসদেবের প্রীতি কিভাবে সাধিত হয় তাহা যিনি অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত শ্রীব্যাসপূজক বা শ্রীগুরুপূজক।

“নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ” বাক্য হইতে জানা যায়, পূজা বা সেবা—সাক্ষাৎ চিদ্রাজ্যেই সম্ভব। মায়িকাবস্থায় সেই চিদ্বৃত্তির সম্যক্ উদয় না হইলেও তদ্বিশ্বী-ভাবে আশ্রয় করিয়া সাধন কার্য্যে করিতে মায়িকভাব অপনোদিত হয় ও পরিশেষে চিদ্বৃত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। জীবমুক্ত-অবস্থায় জীব তখন হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত হইয়া নিজকে তৎসেবক বলিয়া জ্ঞানলাভ করে। তখন মায়াবৃত্তির কোন প্রভাব তাহাতে কার্য্য করিতে পারে না। যে শক্তি-প্রভাবে বদ্ধজীব সেই চিন্তাব লাভ করিতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। এজন্ত শ্রীগুরুদেবের রূপা ব্যতীত বদ্ধজীবের সেই পরম-ভাব লাভের আর অণু কোন উপায় নাই। শাস্ত্র বলেন,—

“আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ” । (ছাঃ ৬।১৪।২)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।

শাক্তে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ (ভাঃ ১।১।৩।২১)

নৈষাৎ মতিস্তাবদ্বক্ক্রমাজ্জিৎ, স্পৃশ্যত্যানর্থাপগমো যদর্থঃ ।

মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং, নিক্ষিঞ্চনানং ন বৃণীত যাবৎ ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

[আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন ॥ কর্তব্যাকর্তব্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তমশ্রেয় অবগত হইবার জন্ত সৎগুরুকে আশ্রয় করিবেন । যিনি ‘শক্বে’ অর্থাৎ ক্রতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, ‘পরব্রহ্মে’ নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্ত যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সৎগুরু ॥ যাবৎ নিক্ষিঞ্চন ভগবন্তের পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থনাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না ।]

গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় ব্যতীত কাহারও চিদ্রাজ্যে প্রবেশাধিকার সম্ভব হয় না ; কিন্তু কি-প্রকার জীব শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবে ? তদ্বিষয়ে বদ্ধজীবের স্বাভাবিক রুচি কখনই পরিদৃষ্ট হয় না । এক্ষেত্রে জীবের পূর্বসঞ্চিত স্মৃতিই তাহাকে এইরূপ সংসঙ্গলাভের সুযোগ দান করে—

“সংসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ স্মৃতৈঃ পূর্বসঙ্গিতৈঃ ।”

“ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনন্ত তর্হ্যচ্যুত-সংসমাগমঃ ।

সংসঙ্গমো যর্হি তদৈব সঙ্গতো, পরাবরেশে স্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥”

[হে অচ্যুত ! ভব-ভ্রমণ করিতে করিতে অপবর্গ অর্থাৎ তাহার সমাপ্তি হইলে যখন জীবের সংসঙ্গ লাভ হয়, তখনই সঙ্গতি ও পরাবরেশ্বর-স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে ।]

“এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥”

অতএব ভাগ্যবান্ অর্থাৎ স্মৃতিশালী জীব ব্যতীত কেহ কখনও সৎগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারে না ; আবার সৎগুরু আশ্রয় না হইলে কণ্ঠ-জ্ঞানাদি নানামার্গে জীবের ভ্রমণ করিতে হয়, বৈকুণ্ঠরাজ্যে প্রবেশাধিকার ও চিন্ময় সেবাফল প্রেমধনে অধিকার লাভ হয় না ।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীব্যাসপূজায় ভক্তি-অৰ্ঘ্য

অজ্ঞান-তিমিরান্ধশু জ্ঞানাজন-শলাকয়া ।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্জেব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

সনাতনী রীতি-অনুসারে শ্রীমদ্ ব্যাসদেবের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই পরম-ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দ-দেহযুক্ত। গোবিন্দ অনাদি হইলেও আদি-পুরুষ। তিনি সৰ্ব্বকারণের কারণ। আর তাঁহার চিহ্নভক্তি সরস্বতীদেবী নারায়ণী তাঁহার অঙ্কশায়িনী। উভয়ের শ্রীযুগল-প্রণামান্তে শ্রীগুরুদেব-শ্রীব্যাসের জয়গান করাই শিষ্টজনানুমোদিত প্রথা। শ্রীব্যাসপূজায় বৈষ্ণব-জগতে এই সনাতনী রীতিই পালিত হইয়া আসিতেছে।

আজ শুভ শ্রীকৃষ্ণ-তৃতীয়া (১৭ই ফাল্গুন) তিথিতে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যাবৰ্গ্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাবোৎসব উদ্‌যাপিত হইতেছে। এই পুণ্য তিথি আমার নিকট পরম পবিত্র ও কৃপায়ুক্ত। যিনি এই তিথিকে উপলক্ষ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি আমার মত অধম পাপীকে করুণা করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার অধিকার দিয়াছেন। সেই মহাত্মার ভুবনব্যাপী মহিমা-কীর্তন করা আমার হ্রায় অধমের অসাধ্য। আমার মত বহুশত অবহেলিত পাপীজনকে তিনি কৃপাবারি বর্ষণ করিয়া শ্রীগৌরহরির বাণী সার্থক করিয়াছেন—

আপনি আচরে কেহ না করে প্রচার ।

প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥

আচার, প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য ।

তুমি সৰ্ব্বগুরু, তুমি জগতের আৰ্য্য ॥ (চৈঃ চঃ অঃ)

হে গুরুদেব! তোমারই অসীম কৃপায় আজ এই শুভ-আবির্ভাব তিথিতে আমার মত অকাট মুখও কিছু গুরু-মহিমা কীর্তন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। বহু ভুলভ্রান্তিসহ শ্রীগুরুপূজায় ভক্তি-অৰ্ঘ্য নিবেদনের ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। এই আলোচনায় ভাবগ্রাহী জনার্দনের অহৈতুকী করুণার কথাই আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছে—

মুখো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে ।

উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ ॥ (নারদপঞ্চরাত্র)

মদীয় পরম-গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্তুত্বসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাসপূজার “প্রত্যভিভাষণে” জানাইয়াছেন—“শ্রীনিত্যানন্দ-পদানুসরণে আমরা শ্রীব্যাসদেবের পূজার অর্থ্য-প্রদানকার্য্যের আবাহন করিতেছি । এই অর্থ্যপ্রদান আদিগুরু শ্রীব্রহ্মা, তদনুগ শ্রীনারদ এবং তাঁহার অনুগ শ্রীবেদব্যাস এবং বেদব্যাসানুগ শ্রীমদানন্দতীর্থ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও সমগ্র পরিকর গৌড়ীয়গণের পূজা একদিন শ্রীনবদ্বীপে জগদগুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছেন । আশ্রয়-পারম্পর্য্যে তাদৃশ কৃত্য আমাদের ভক্তানুষ্ঠানের একটি মুখ্য ব্যাপার ।”

আচার্য্যগণ শ্রীব্যাস-মুখ-নিঃসৃত বাণীই নিত্যকাল কীর্ত্তন করিয়া থাকেন । আমরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া আজ শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তি-অর্থ্য প্রদান করিতেছি । পূর্ব্বগুরুবর্গ জানাইয়াছেন—

যন্তু দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।

তস্মৈতে কথিতা হৃথ্য প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

এই শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপলব্ধির জন্তই আমাদের শ্রীব্যাসপূজার আবাহন ।

শ্রীব্যাসপূজায় বহুলপারমাণে শ্রীগুরু মহিমাই কীর্ত্তন করিতে হইবে । কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি শ্রীগুরুদেবের আচার্য্যত্ব ও তাঁহার মহিমা তদীয় পারিষদবর্গদ্বারা প্রচার করাইয়া আমাদের মত কলিহত-পাপীগণকে শুদ্ধভক্তি ও আচারে শ্রদ্ধা জাগরিত করিয়াছেন । শ্রদ্ধা না হইলে ভক্তির উদয় হয় না । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

“শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী ।

উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥”

“ভক্তি-শূন্য জনে মুঞি না করি প্রসাদ ।

মোর দরশনসুখ তার হয় বাদ ॥”

অকৃত্রিম ভক্তের আনুগত্যে অধোক্ষজ ভগবানের সম্মুখীন হওয়াই শুদ্ধ-ভক্তি । শ্রীবৈষ্ণব-গুরুদেবই অকৃত্রিম ভগবৎ-ভক্ত । তিনিই আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবান্ । তাঁহার আনুগত্যে আমাদের ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইবে । তাঁহাকে অবহেলা করিয়া কোন মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না । ইহার ব্যতিক্রম হইলে, আমাদেরকেও দেবগুরু বৃহস্পতির প্রতি ঐশ্বর্য্য-অহঙ্কারে

মত্ত দেবরাজ ইন্দের অবহেলার সমুচিত দণ্ড অবশ্য ভোগ করিতে হইবে।
শ্রীগুরুদেব শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ-তত্ত্ব। স্বয়ং ভগবান্
উদ্ধবকে কহিলেন,—

আচার্য্যং মাং বিজ্ঞানীয়ান্নাবমন্তেত কহিচিৎ ।

ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাস্থ্যেত সৰ্বদেবময়ো গুরুঃ ॥

হে উদ্ধব ! গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্যবুদ্ধি করিয়া
তঁাহার অবজ্ঞা করিবে না। গুরু সৰ্বদেবময়।

ভক্তের মহিমা কীর্তন করিয়া স্বয়ং ভগবান্ বলিলেন,—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ।

মত্তজানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ (আদিপুরাণ)

অর্থাৎ যে আমাকে ভক্তি করে অথচ আমার ভক্তের ভজনা করে না, সে
কখনই আমার ভক্ত নহে। কিন্তু যে আমার ভক্তবৃন্দের ভক্ত, সেই আমার
সৰ্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।

সিদ্ধিৰ্ভবতি বা নেতি সংশয়োহচ্যুত-সেবিনাম্ ।

ন সংশয়োহত্র ভক্তভক্তিপরিচর্য্যা-রতান্ননাম্ ॥ (গোবিন্দভাষ্য)

অর্থাৎ ভগবৎ-সেবকগণের সিদ্ধিলাভ হয় কি না হয়, এইরূপ সন্দেহ
থাকিতে পারে; কিন্তু যঁাহারা তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আসক্ত, তঁাহাদের
সিদ্ধিবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়, আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে ভক্তি না থাকিলে বিষয়-
বিগ্রহ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সেবালাভ হইতে পারে না। আজ শ্রীগুরুপূজা-
বাসরে শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্তেরই পূজা করিতে হইবে। তিনি সাক্ষাৎ
“হরিহেন”। শ্রীভগবান্ নিজের আত্মীয়স্বজন, এমন কি, নিজ শ্রীবিগ্রহ
হইতেও ভগবৎভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ-
স্কন্ধে উদ্ধবকে বলিলেন,—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ ।

ন চ সঙ্কৰ্ষণো ন শ্রীনৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

অর্থাৎ হে উদ্ধব ! তুমি—ভক্ত আমার যেকরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও,
শঙ্কর স্বরূপভূত হইয়াও, সঙ্কৰ্ষণ ভ্রাতা হইয়াও এবং লক্ষ্মী ভাৰ্য্যা হইয়াও
সেকরূপ প্রিয়তম নহেন। অধিক কি, মদীয় শ্রীবিগ্রহও সেকরূপ প্রিয়তম নহে।

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর-সমান।

ভক্তস্থানে পরাভব মানে ভগবান্ ॥

মহাজনগণ বলেন,—

“ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নহি পাই।

কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি।”

“কোটি জন্ম যদি যোগ-যজ্ঞ-তপ করে।

“ভক্তি” বিনা কোন কর্মে ফল নাহি ধরে।”

আজ শ্রীগুরুদেবের শুভ-আবির্ভাব-তিথিতে আমি তাঁহারই আশ্রিত শ্রীবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়া রূপা ভিক্ষা করিতেছি। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের বাণী শ্রবণ করিয়া পুনরায় আমি আমার ভক্তি-অর্থ্য প্রদান করিতেছি,—

সখ্যায় তে মম নমোহস্ত নমোহস্ত নিত্যম্।

দাস্তায় তে মম রসোহস্ত রসোহস্ত সত্যম্॥

সার্থক গুরুরূপা ! সার্থক আমার মনুষ্য-জন্ম। আজ এই শুভদিনে শুভক্ষণে বৈষ্ণব-সমক্ষে ক্ষণিকের জগ্ন শ্রীগুরু-মহিমা কীর্তন করিয়া শতকোটি দণ্ডব্রজতি জানাইয়া বিদায় লইতেছি।

বাঙ্গাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, (ভক্তি-ভূষণ)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীন চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে এ বৎসরও ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ, রবিবার হইতে ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ, মঙ্গলবার পর্যন্ত দিবসত্রয় যাবৎ শ্রীব্যাসপূজা সাড়হরে অনুষ্ঠিত হয়।

তন্মধ্যে রবিবার ও মঙ্গলবার উষাকাল হইতেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণব মহিমাশূচক পদাবলী কীর্তন হয়। উভয়দিনে সকালে পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীগুরুতত্ত্ব আলোচিত হয়। রবিবার পূর্ন্যাহ্নে তত্ত্বপঞ্চকের পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয় এবং রবি ও সোমবার পূর্ন্যাহ্নে শ্রীগুরুচরণে অঞ্জলি প্রদান করা হয়। উভয়-দিনে দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবাপূজা ও ভোগরাগের ব্যবস্থা হয় এবং আহুত অনাহুত সমাগত ভক্তবৃন্দ বিচিত্র প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

উভয়দিনই অপরাহ্নে মহতী সভার অধিবেশন হয় এবং শ্রীল আচার্যদেব কৃপাপূর্বক গভীর দার্শনিকতত্ত্ব বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করায় শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। আচার্যদেবের বক্তৃতার পূর্বে বিভিন্নভাষায় লিখিত পুষ্পাঞ্জলি পঠিত হয় এবং শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত্র ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীচিদ্বন্দনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ওজস্বিনীভাষায় শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল আচার্যদেব এই মহতী অনুষ্ঠানে পূর্ন্যাহ্নের উপস্থিত থাকায় ইহা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান সমিতির মূল প্রচারকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ ও শাখামঠ সমূহেও যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। —নিজস্ব সংবাদ

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ଳଗୋରାଦେବୀ ଜୟତଃ



୧୬ଶ ବର୍ଷ } ଚୈତ୍ରମାସ, ୧୩୭୧ { ୩ୟ ସଂଖ୍ୟା




ଶ୍ରୀପିଚ୍ଛଳନା ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀବିଘ୍ନହରୀ

୧ମ କଙ୍କେ ଶ୍ରୀଗୌର-ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ୨ୟ କଙ୍କେ ଶ୍ରୀରାଧା-ବିନୋଦବିହାରୀଜୀଉ

ସମ୍ପାଦକ—ବ୍ରଜଦାସୀଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମତ୍ ଭକ୍ତିକୁଶଳ ନାରସିଂହ ମହାରାଜ

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ—ଶ୍ରୀଦେବୀନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ, ଡେବପାଡ଼ା, ନବଦ୍ୱୀପ (ନଦୀୟା)

ধর্মঃ স্বহৃদিতঃ পুংসাং বিবৃণোত-কথাসু যঃ	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াহ্মা স্প্রসীদতি ॥</p>	নোংপাদয়েদ্যপি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥
<p>সেই ধর্ম প্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অতঃ ধর্ম লুপ্তরূপে পালে যেই জন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥ হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥</p>		

১৬শ বর্ষ } কারণোদশায়ী, ১৮ মধুসূদন, ৪৭৮ গৌরাদ ত্রয় সংখ্যা
 বৃহস্পতিবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৭১ ; ইং ১৪।৫।১৯৬৪ }

সান্নিধানং

মনু-অর্য্যো-কৃতং “শ্রীশ্রীমৎশ্রী-কূর্মদেব-স্তোত্রম্”

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে
 অষ্টাদশোহধ্যায়ে—২৫-২৮, ৩০-৩৩)

ওঁ নমো ভগবতে মুখ্যতমায় নমঃ ; সত্বায় প্রাণায়োজসে সহসে
 বলায় মহামংস্ত্রায় নম ইতি ॥ ১ ॥

(রম্যক-বর্ষে মনু ঐকান্তিক ভক্তি-সহকারে মংস্ত্রাবতার-স্বরূপের
 নিম্নলিখিত মন্ত্ৰ-স্তোত্রাদি জপ-কীর্তন দ্বারা আরাধনা করিয়
 থাকেন,—)

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান্কে নমস্কার করি । যিনি প্রাণ, বল,
 সাহস ও সামর্থ্যাদির নিয়ন্তা বলিয়া তত্ত্বস্বরূপে অভিহিত হন, সেই
 মহামংস্ত্রাবতার ভগবান্কে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

অন্তর্বর্হিশ্চাখিল-লোকপালকৈ-

রদৃষ্টরূপো বিচরন্ত্যরুশ্বনঃ ।

স ঈশ্বরস্ত্বং য ইদং বশেহনয়-

ন্নান্না যথা দারুময়ীং নরঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ১ ॥

হে ভগবন্, যেক্ষপ লোকে কার্ঠময়ী স্ত্রীকে বশে আনয়ন করে, তদ্রূপ যিনি ব্রাহ্মণাদি নাম দ্বারা এই বিশ্বকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছেন, আপনি সেই ঈশ্বর । আপনি নিখিলজীবের বাহ্যভ্যন্তরে বিচরণ করেন, অথচ লোকপালগণও আপনার স্বরূপ সন্দর্শন করিতে পান না ; কিন্তু আপনার বেদাত্মক নাদ—অতীব উচ্চ ॥ ২ ॥

যং লোকপালাঃ কিল মৎসর-জরা

হিহা যতস্তোহপি পৃথক্ সমেত্য চ ।

পাতুং ন শেকুর্দ্বিপদচতুষ্পদঃ

সরীসৃপং স্থাণু যদত্র দৃশ্যতে ॥ ৩ ॥

হে প্রভো, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ—মাৎসর্য্য-জ্বরে অভিভূত । যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা পৃথগ্‌রূপে অথবা সকলে মিলিত হইয়া যত্ন করিলেও দ্বিপদ, চতুষ্পদ অথবা স্থাবর, ভ্রূক্ষম প্রভৃতি পরিদৃশ্যমান কোন বস্তুরই পালন করিতে পারেন না, আপনি—সেই প্রাণরূপী অখিলপালক পরমেশ্বর ॥ ৩ ॥

ভবান্ যুগান্তার্ঘব উন্মিমালিনি

ক্ষৌণিমিমামোষধি-বীরুধাং নিধিম্ ।

ময়া সহোঁরু ক্রমতেহজ ওজসা

তস্মৈ জগৎ-প্রাণগণাত্মনে নমঃ ॥ ৪ ॥

হে প্রভো, এই বসুন্ধরা—ওষধি ও লতাসমূহের আশ্রয় ; এইজন্য যখন প্রলয়কালে এই পৃথিবী উত্তালতরঙ্গমালা-সঙ্কুল সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন আমার (মতুর) এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া প্রবল-বেগে যে অজস্বরূপ আপনি বিচরণ করিতেছিলেন, সেই জগৎস্থ প্রাণিগণের নিয়ন্তৃ-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

অর্য্যমা উবাচ,—

ওঁ নমো ভগবতেহকুপারায় সর্ব্বসত্ত্বগুণ-বিশেষণায় নমোহনু-পলঙ্কিত-স্থানায় নমো বহ্মণে নমো ভূম্নে নমোহবস্থানায় নমস্তে ইতি ॥ ৫ ॥

(হিরণ্য-বর্ষেও পিতৃগণের অধিপতি অর্থ্যমা তদ্বর্ষবাসিগণের সহিত নিম্নলিখিত মন্ত্ৰ-স্তোত্রাদি দ্বারা ভগবান্ কূর্মদেবের প্রিয়তমা শ্রীমূর্তির নিরন্তর উপাসনা করিয়া থাকেন—)

ভগবান্ কূর্মদেবকে নমস্কার ; নিখিল শুদ্ধসত্ত্বগুণই আপনার বিগ্রহ অর্থাৎ আপনি—শুদ্ধসত্ত্বমূর্তি ; (জলচরত্বহেতু) আপনার স্থান কেহ লক্ষ্য করিতে পারেন না, আপনাকে নমস্কার । কালের দ্বারা আপনার অবচ্ছেদ হয় না, আপনাকে নমস্কার । আপনি—সর্বগত ও সকলের আধার আপনাকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

যজ্ঞপমেতন্নিজ-মায়য়াপিত-

মর্থস্বরূপং বহুরূপ-রূপিতম্ ।

সংখ্যা ন যস্ত্যাস্ত্যথোপলভ্যনাং

তস্মৈ নমস্তেহব্যপদেশ-রূপিণে ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্, আপনার স্বীয় মায়-শক্তিপ্রকটিত এই যে পরিদৃশ্য-মান পৃথিব্যাदि নানাবিধ প্রাকৃত রূপ প্রকাশ পাইতেছে, এ সমস্ত আপনার নিজ-রূপ নহে, সুতরাং আপনার এই বিরাট্ রূপ—অলীক অর্থাৎ কল্পিত । আপনার ঐসমস্ত রূপ বহুরূপে নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া উহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসাধ্য । আপনার নিত্য রূপ কেহই সময়গ্রূপে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন না, অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

জরায়ুজং শ্বেদজমঞ্জোদ্ভিদং

চরাচরং দেবষি-পিতৃ-ভূতমৈন্দ্রিয়ম্ ।

ছোঃ খং ক্ষিতিঃ শৈল-সরিং-সমুদ্র-

দ্বীপ-গ্রহক্ষেত্যভিধেয় একঃ ॥ ৭ ॥

হে দেব, জরায়ুজ, অণুজ, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি চরাচর, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত ও ইন্দ্রিয় এবং স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, ভূলোক, শৈল, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, গ্রহ ও নক্ষত্র—এইসকল আপনারই প্রকৃত্যুথ নাম । আপনি—অদ্বয়বস্ত, আপনা হইতে দ্বিতীয়-বস্তু নাই অর্থাৎ

এই বিশ্ব অনিত্য হইলেও মিথ্যা নহে । ইহা আপনারই প্রাকৃত রূপ ।
(এইজন্যই ঋতিতে ‘পরিদৃশ্যমান সমস্তই বিদ্বৎপ্রতীতিতে ব্রহ্ম’
এইরূপ উক্ত হইয়াছে । এই শ্লোকের দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বাপবাদ
খণ্ডিত হইয়াছে) ॥ ৭ ॥

যস্মিন্নসংখ্যেয়-বিশেষনাম-

রূপাকৃতৌ কবিভিঃ কল্লিতেয়ম্ ।

সংখ্যা যয়াতত্ত্বদৃশাপনীয়তে

তস্মৈ নমঃ সাংখ্যনিদর্শনায় তে ॥ ৮ ॥

হে প্রভো, আপনার নাম, রূপ ও আকৃতির প্রভেদ যে কত
প্রকার আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না ; তথাপি কপিলাদি
পণ্ডিতগণ চতুর্বিংশত্যাди তত্ত্বসংখ্যা কল্পনা করিয়াছেন । যে তত্ত্ব-
জ্ঞানদ্বারা সেই সংখ্যা দূরীভূত হয়, আপনি—সেই সাংখ্য-
সিদ্ধান্তস্বরূপ অর্থাৎ আপনিই সাংখ্যজ্ঞানের একমাত্র উদ্দিষ্ট বিষয় ।
নিরীশ্বর কপিলাদি সাংখ্যকার—আপনার স্বরূপ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ
থাকিয়া কেবল সংখ্যাগণনা লইয়াই ব্যস্ত ; আপনাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

আলোচকের আলোচনা

হিতবাদীর (১৬ই ও ২৩শে আষাঢ়, ১৩৩৪) দুইটি প্রকাশে দুইখানি
পুস্তকের সমালোচনা দেখিতে পাইয়াছি । একখানি “গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের
ইতিহাস” আর একখানি গ্রন্থ “আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ” ।

আলোচকের অধিকার-বৈষম্যে আলোচনার প্রকৃত অধিষ্ঠান পরিণতি
হয় । গ্রন্থদ্বয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য, উপকারিতা, মর্যাদা, ঐতিহ্য-যোগ্যতা প্রভৃতি
আলোচকের যোগ্যতা, ঐতিহ্যজ্ঞান, সামাজিক মহত্ব, কামক্রোধ-মাৎসর্যাদির
আতিশয্য বা দুর্ভিক্ষ, প্রতিশোধাকাজ্জ্ব বা উদারতা, ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-
করণাপাটবানুগত্য বা বাস্তববিচার প্রভৃতির উপর নির্ভর করে ।

বাত-কফ-পিত্ত ত্রিধাতুক কুণপাতিমানে আলোচকের মতিগতি সর্বদা
এক না থাকায় বিচার-বৈকল্য অবশ্যসম্ভাবী । আবার স্বার্থানুরোধে ব্যক্তিগত
রুচি-ভারতম্যে গ্রন্থের স্বরূপ-প্রদর্শনে সম্পাদকে যে ভ্রান্তি জগজ্জ্বালের

কারণরূপে পাঠকের ক্ষতি করে, তজ্জগৎ তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারী লেখনী দায়ী নহেন বলিতেও তাঁহারা ব্যস্ত ।

ভদ্রসমাজে বাস করিয়া শিক্ষিত-সমাজের রীতিদর্শনে যাহারা অন্ধ ও অশিষ্টাঙ্গগমনে যাহাদের উদ্ধাম নৃত্য দেখা যায়, তাহাদের ব্যক্তির সম্পাদক হইবার যোগ্যতা ও সাধারণ পাঠকের অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করিবার জগৎ সমালোচকের সজ্জা, নীতিবিগর্হিত বলিয়াই মনে হয় । দীর্ঘদিনে যাহাদের চিত্ত দক্ষ অঙ্গারসদৃশ, তাহারা নিরপেক্ষতা কাহাকে বলে বুঝিয়া উঠিতে পারে না । এই শ্রেণীর লোকের মুখে সংবাদপত্রের পাঠকগণ আশ্বাদ গ্রহণ করিতে গিয়া রুচিবিকারবশতঃ নিজের অমঙ্গল করেন । হিতবাদী-সম্পাদকের খর্বদৃষ্টি, শাস্ত্রজ্ঞানাভাব, সংসমাজে বিচরণাভাববশতঃই ঐ প্রকার দুর্বলতা সমালোচনাপ্রসঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি । সর্বশাস্ত্র-নিষ্ণাত, অসামান্য প্রতিভা-সম্পন্ন সর্বলোক-নমস্কৃত ভগবন্তুক্তগণের নামোল্লেখ-প্রসঙ্গে সাধারণ সৌজগ্গ-বিধি যিনি লঙ্ঘন করেন, তিনি আত্মপরি-মর্যাদানীতি কখনও অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না । পরলোকগত সাহিত্যিক নিবোধো-নিবাসী সাতকড়ি দত্ত মহাশয়-রচিত শিশুপাঠ্য তৃতীয় পাঠ পর্য্যন্ত পড়া থাকিলেও নৈতিকজীবনে “তবে আগে আপনার মুখ মিষ্টি কর” বা ‘মর্যাদা-লঙ্ঘন’ আদর করিবার বিষয় নহে—সম্পাদক জানিতে পারিতেন । ‘ধান-ভানিতে শিবের গীতে’র প্রসঙ্গ আনিয়া তিনি যে সত্যের অমর্যাদা স্থাপনোদ্দেশ্যে তাঁহার মতের ও তাঁহার কুমত-প্রতিকূল আচার্য্যগণের চরণে অপরাধ করিবার দুঃসাহস করিয়াছেন, তাহা কোন সংগ্রহই আদর করিবেন না । তাঁহার ব্যক্তিগত অনভিজ্ঞতা বার্তাবহের মুখে সাধারণ্যে জানাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সাহিত্য-চলনায় সত্য-নিষ্ঠা করিতে গিয়া সম্মানিত জনগণের মর্যাদাহানি কেহই অনুমোদন করিবেন না । তাঁহাকে শিখাইতে হইবে না যে, কোন ভদ্রলোকের নাম লিখিতে গেলে তাঁহার নামের অগ্রে শ্রীযুক্ত, Mr. Herr. M. প্রভৃতি প্রাঙ্গাত্মা লিখা আবশ্যক । যেমন তিনি ‘আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের’ লেখকের নামাগ্রে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ষোষ-প্রণীত লিখিয়াছেন । যাহার সভ্যসমাজের রীতি-জ্ঞানের অভাব থাকে, তাঁহাকে পাঠক ক্ষমা করিতে পারেন কিন্তু এই দুইটি সমালোচনার মধ্যে একটীতে ‘শ্রীযুক্ত’ এবং অপরটীতে বিদ্বেষমূলে তাহা না দেওয়ায় তাঁহার অনভিজ্ঞতার পরিবর্তে তাঁহার হিংসা, ঈর্ষা, নৃশংসতা বা

অথ কোন রিপুবশবর্তিতা জানিতে হইবে; তাঁহাদের সমাজের নিকট হইতে উহার মীমাংসা প্রার্থনা করি।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ-বিচারে যিনি সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়া তাদৃশ রুচিবশে শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, তাঁহার লিপিকৌশলের গুণগ্রাহিতাস্থত্রে হিতবাদী-সম্পাদকের মুক্তহস্ত বাঁধা পড়িয়াছে। ইহা সম্পাদক মহাশয়ের প্রাক্তন গলনেণু, স্ততরাং স্বীয় কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে উহাই সংলগ্ন থাকায় তুলসী মালিকাধ্বক্ রামানুজের আদর করিতে তাঁহার নিরপেক্ষতার অভাব। মায়াবাদীয় সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত হইবার জন্যই শ্রীমদ্রামানুজের সংসম্প্রদায় প্রবর্তন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের উদারতায় বৌদ্ধ, জৈন, নিকির্নিষ্ঠাঈত পঞ্চোপাসনার সমন্বয়বিচারে ঔদাসীন্ত না দেখাইতে পারিলেও তাহাও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার প্রকারভেদ-জনিত দোষদুহ, একথা ঘোষ মহাশয়ের ত্রায় হিতবাদী-সম্পাদকেরও বোধাতীত।

হিতবাদী-সম্পাদক বলেন—মায়াবাদ-প্রচারক আচার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়া “গ্রন্থকার বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন”। মালাবার প্রদেশজাত জ্ঞানাবৃত বিদ্বতক ভক্তানুখ আচার্য্যের জীবনী প্রচারে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল কিরূপে হইল, ইহার একটু বিস্তৃতি জানিতে গেলেই স্বীকার করিতে হইবে—যিনি শাণ্ডিল্য অবজ্ঞা করিয়া বিষ্ণুভক্তির বিরোধস্থত্রে নিত্যাবৃন্তি ভক্তিকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে পরিহার করিবার জন্য আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, যিনি একায়ন শাখা পঞ্চরাত্রের অবৈদিকতা স্থাপনে বিফল-মনোরথ হইয়াছেন এবং ভাবীকালে যাহাতে শ্রীকৃপাগোস্বামি-লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-প্রকটিত “প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্তু কথ্যতে ॥”—শ্রীগৌড়ীয়েশ্বরের এই উপদেশ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া অহং-গ্রহোপাসনারূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের সমর্থন হইতে পারে ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থকার হইতে বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল হয় ইহা কিরূপ বিচার? শ্রীদমোদর স্বরূপ, শ্রীকৃপ-জীবাদি আচার্য্যবর্গের প্রতিকূল সম্প্রদায়ের মালিক হওয়ায় রাজেন্দ্রবাবু শঙ্কর-চরিত লিখিয়া নিত্য ভক্তি হইতে বাঙ্গালী জাতিকে মোহিত করিয়া প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদে নিহিত করায় বাঙ্গালী জাতি বা গৌড়ীয়ে মুখ উজ্জ্বল হয় নাই, ইহা বলিবেন—স্বদেশপ্রেমিক প্রসিদ্ধ গৌরভক্ত ঘোষজ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার। ‘গৌড়ীয়

বৈষ্ণবের ইতিহাস'লেখক হিতবাদী-সম্পাদকের আধুনিক ভ্রান্ত বিচারের আদর না করিয়া নিশ্চয়ই বলিবেন, ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী সম্পাদক 'বৈষ্ণব-বিদ্বেষী', 'গৌড়ীয়-বিদ্বেষী', 'আর্য্যাবর্ত-বিদ্বেষী', 'তত্ত্ববাদানভিজ্ঞ', 'শাস্ত্রদর্শন-রহিত', 'ভগবৎসেবাবঞ্চিত', 'বৈদেশিকপ্রেমোন্মত্ত', এবং আরও কত।

যে ভক্তিবিদ্বেষী হিতবাদী-সম্পাদক মায়াবাদপ্রমত্ত হইয়া ভক্তিবিরোধ-কল্পে তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎপাদাচার্য্যকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক শ্রীমৎ শঙ্করপাদকে তছুপরি আসন দেন এবং দুইজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠের মধ্যে মায়াবাদ-প্রচারকের অতুতরতা প্রচার করেন, তাহার অজ্ঞান অপনোদনকল্পে গৌড়ীয় মঠের যে কোন তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব, হিতবাদী-সম্পাদকের বহুজন্মার্জ্জিত ভক্তি-বিরোধবাদ-রোগের চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ। আজকাল উন্মত্ত সাহিত্যবাদিগণের একটা বিষম রোগ এই যে, বঙ্গভাষায় যে যত নাস্তিক্যবাদ স্পষ্ট করিতে পারিবে, সে ততই পণ্ডিত ও সাহিত্যাচার্য্য এবং ভাষার সমৃদ্ধিকারক।

হিতবাদীর সব্জান্তা বৈষ্ণববিদ্বেষী সম্পাদকের মাৎসর্য্য, বেদান্তজ্ঞানে দরিদ্রতা, জ্ঞানবাদে অমৃতময়তারূপ সোনার-পাথর-বাটীত্বস্থাপন এবং ভক্তিকে "বাদ" বলিয়া অভিধানে সাহিত্যজ্ঞানে সমধিক দারিদ্র্য প্রভৃতি বিষয় প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

— জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

বেদানুগক্রম ও বেদবিরুদ্ধ অপসম্প্রদায়

১। ভারতীয় বেদানুগক্রম বেদ-বিরুদ্ধ মতবাদ, বিদেশীয় তৎসমকক্ষ আধ্যাত্মিক মতবাদ ও ঈশানুগতিবাদ কি কি ?

“অস্বদেশে সিদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ বেদসম্মত বেদান্ত-শাস্ত্র ও তদানুগত্য স্বীকার করিয়াও বেদার্থ-বিপরীত-মত-প্রকাশক ছায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসারূপ শাস্ত্র-নিচয়, তথা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধ-মত, চার্ব্বাক মত ইত্যাদি নানা মত প্রকাশিত হইয়াছে। চীন, গ্রীস, পারস্য, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মেনী ও ইতালী প্রভৃতি দেশে জড়বাদ (Materialism), স্থিরত্ববাদ (Positivism),

নিরীশ্বর কৰ্মবাদ (Secularism), নিৰ্বাণসুখবাদ (Pessimism), সন্দেহবাদ (Scepticism), অদ্বৈত (সৰ্বব্রহ্ম)বাদ (Pantheism), নাস্তিক্যবাদ (Atheism) রূপ নানাপ্রকার বাদ (Ism) প্রচারিত হইয়াছে। যুক্তিধারা ঈশ্বর সংজ্ঞান-পূৰ্বক কতকগুলি মত প্রাচুর্যভূত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু হইয়া ঈশোপাসনা কর্তব্য—এরূপ একটি মতও জগতে অনেক স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ মতটি কোন কোন স্থানে কেবল শ্রদ্ধা-মূলক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; কোন কোন দেশে পরমেশ্বরদত্ত-ধর্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। যেখানে উহা কেবলমাত্র শ্রদ্ধা-মূলক, সেখানে উহার ঈশানুগতিবাদ (বা Theism) বলিয়া সংজ্ঞা হয়। যেখানে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র-মত অর্থাৎ খ্রীষ্টান-ধর্ম (Christianity), মুসলমান-ধর্ম (Mahomedanism) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ৩

২। কোন্ কোন্ ধর্মকে প্রকৃত প্রস্তাবে বিধর্ম, ছলধর্ম, ধর্মভাস বা অধর্ম বলা যায়?

“যে ধর্মে নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্বিশেষবাদরূপ অনর্থ-সকল আছে, ভক্তগণ সে ধর্মকে ‘ধর্ম’ জ্ঞান করিবেন না; সে-ধর্মকে বিধর্ম, ছলধর্ম, ধর্মভাস বা অধর্ম বলিয়া জানিবেন।”

—চৈঃ শিঃ, ১।১

৩। জড়বাদিগণের ধর্ম কিরূপ?

“জড়বাদিগণ যে ধর্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিবিহীন গৃহের ছায় পতনশীল।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ২।১২

৪। ভারতীয় ও অপরদেশীয় স্বার্থ ও নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদ ও তাহাদের স্বরূপ কি?

“জড়ানন্দবাদীরা দুই প্রকার অর্থাৎ (১) স্বার্থজড়ানন্দবাদী ও (২) নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদী। স্বার্থজড়ানন্দবাদীরা এই স্থির করেন,—‘যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কৰ্মফল নাই, তখন কিয়ৎপরিমাণে ঐহিক কৰ্মফল হইতে সাবধান হইয়া আমরা অনবরত ইন্দ্রিয়সুখে কাল যাপন করিব।’

* * * ভারতবর্ষে চার্কাক্ ব্রাহ্মণ, চীনদেশে নাস্তিক ইয়াংচু (Yangchoo), গ্রীসদেশে নাস্তিক লুসিপস্ (Leucippus), মধ্য এসিয়া-খণ্ডে সর্ডনাপেলাস্

(Sardanapalus), রোমদেশে লুক্রেসিয়াস্ (Lucretius), এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য অনেকদেশে অনেকেই এই মতের পুষ্টিজনক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভান্ হলবাখ্ (Von Holbach) বলিয়াছেন যে, নিজ-নিজ সুখ-বর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকে ‘ধর্ম্ম’ বলা যায়। * * * * গ্রীসদেশীয় প্লেটো (Plato) ও আরিস্টটল্ (Aristotle) পরমেশ্বরকে একমাত্র নিত্যবস্তু ও সমস্ত জগতের একমাত্র মূল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কণাদ-মতস্থ দোষ-সমূহই এই সকল পণ্ডিতের মতে লক্ষিত হয়। গেসেণ্ডী (Gassendi) পরমাণুবাদ স্বীকার করত পরমেশ্বরকে পরমাণুগুণের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফ্রান্স দেশে ডিডেরো (Diderot) ও লামেট্রি (La Mettrie) ইঁহারা নিঃস্বার্থজড়ানন্দ প্রচার করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ফ্রান্সদেশের কঁোং (Comte) নামক একজন বিচারকের গ্রন্থে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। * * * তাঁহার অবিভক্ত মতটিকে তিনি স্থিরত্ববাদ (Positivism) নামে সংজ্ঞিত করেন। নামটী নিতান্ত অমূলক, যেহেতু তাঁহার মতে জড়ীয় প্রতীতি ও জড়গত বিধি ব্যতীত আমরা আর কিছু অবগত নই। ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের আর কোন জ্ঞানদ্বার নাই। তাঁহার ধর্ম্ম এই যে, অন্তঃকরণ বৃত্তির আলোচনাক্রমে ঐ বৃত্তির পুষ্টি করা মানবের কর্তব্য। তাহার পুষ্টি করিতে হইলে কাল্পনিক একটা বিষয় অবলম্বন-পূর্ব্বক একটা স্ত্রী-মূর্ত্তি পূজা করা কর্তব্য। বিষয়টি মিথ্যা হইলেও প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবী তাঁহার মহত্ত্ব (Supreme Fetich) ; দেশই তাঁহার কার্য্যাদার (Supreme Medium) ; মানব-প্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্তা (Supreme Being)। হস্তে শিশু, এরূপ একটা স্ত্রী-মূর্ত্তিতে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় পূজা করিবে। * * ইংলণ্ড দেশের পণ্ডিত মিল্ (Mill) জড়বাদকে ভাববাদরূপে বিচার করত অবশেষে অনেক বিষয়ে কঁোংএর সহিত ঐক্যরূপে নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদেই পুষ্টি করিয়াছেন। একপ্রকার নিরীশ্বর সংসারবাদ (Secularism) আপাততঃ ইংলণ্ডের অনেক যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। মিল লুইস্ (Lewis), পেন্ (Paine), কারলাইল্ (Carlyle), বেন্থাম্ (Bentham), কোম (Combe) প্রভৃতি তর্কিকেরাই ঐ মতের প্রবর্ত্তক। ঐ মত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হলিয়ক্ (Holyoake) এক বিভাগের কর্তা বিশেষ। তিনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ক্রিয়ণপরিমাণে ঈশ্বরকে

স্বীকার করিয়াছেন। অপর বিভাগের কর্তা ব্রাড্‌লা (Bradlaugh) সম্পূর্ণ নাস্তিক।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৫-৮

৫। নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদিগণের প্রকৃত স্বরূপ কি?

“স্বার্থ-জড়ানন্দবাদিগণ কেবল নাম দ্বারা ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদীরাও স্বার্থবাদী।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৬। নিঃস্বার্থবাদীর মত কি অপস্বার্থ-রহিত?

“ঈশ্বর-সংশ্রব-চাতুর্য্য-বশতঃ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণের মতে এত প্রবলরূপে ভারতে প্রচলিত আছে। এক ব্যক্তির স্বার্থ অপর ব্যক্তির স্বার্থের ব্যাঘাত করে। অতএব সামান্য-বুদ্ধি-লোক নিঃস্বার্থ নামটি শুনিবা-মাত্র নিজ-স্বার্থের ফলাশায় নিঃস্বার্থবাদীর মতটি আদর করে।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৭। পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতগণের কতটুকু মৌলিক-পাণ্ডিত্য আছে?

“পাশ্চাত্য দেশে অতি অল্পকালই মানবের সভ্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেখা যায়। সেই সব দেশে স্তূতরাং টিগল্‌, হাঙ্গলি, ডারউইন্ প্রভৃতি পণ্ডিত মধ্যে পরিগণিত। পুরাতন কথা নূতন ভাষায় বলিলে যে পাণ্ডিত্যের দাবী করা যায়, তাহাই তাঁহারা করিতে পারেন। চারি সহস্র বৎসর পূর্বে যে ভগবদ্গীতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্য-প্রবৃত্তি-বর্ণনে “জগদাহরনীশ্বরম্”, “অপরস্পরসম্মুতং” ইত্যাদি বাক্যে স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তিবাদ—এই সকল যে আশ্চর্য-প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা কথিত হইয়াছে।”—‘ধর্ম ও বিজ্ঞান’, সঃ তোঃ, ৭।৭

৮। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা কি কপটতা-রহিত?

“কোন স্মার্ত্তপণ্ডিত কোন সময় কোন প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ক জিজ্ঞাসকে চান্দ্রায়ণাদি কার্য্যের উপদেশ করিতেছিলেন। তখন সেই ব্যক্তি কহিল, ‘ভট্টাচার্য্য মহাশয়! মাড়ক বধের জন্ত যদি আমার পক্ষে চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা করিলেন, তবে আমার সহিত আপনার পুত্র ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকায় তাঁহার পক্ষেও ত’ চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা হইতেছে?’ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, বিষম বিপদ; তখন তিনি পুস্তকের আর দুই চারি পাতা উন্টাইয়া কহিলেন,—‘ওহে, আমার ভুল হইয়াছে; আমি দেখিতেছি,—মাকড় মারিলে ধোকড় হয়—এরূপ শাস্ত্রে আছে; তোমার কিছুই করিতে হইবে না।’ নিরীশ্বর স্মার্ত্তদিগের ব্যবস্থা ও কার্য্য এইরূপ লঙ্ঘিত হইবে।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৯। সন্দেহবাদের গতি কি ?

“সন্দেহবাদ আপনাকে আপনি নাশ করে ; যেহেতু তাহাতে অসন্ধি তত্ত্বের স্বীকার আছে।” —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ১৬

১০। নবীন নাস্তিকগণের মৌলিকতা কতটুকু ?

“নবীন নাস্তিকেরা যে-সকল মত প্রচার করিয়া আপনাদিগকে নূতন মত-প্রচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, সে-সকল ভ্রম-মাত্র ; নামাস্তর ও রূপান্তর করিয়া পুরাতন মতকেই প্রকাশ করেন।” —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ১৭

১১। আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণের বিচার কি ?

“অনেক পণ্ডিতাভিমानी লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, বুদ্ধি-বলে ও বিজ্ঞা-বলে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। বস্তুতঃ কেহ বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে, কেহ বা কর্ম-মিশ্রা ভক্তিকেই ভক্তি বলিয়া মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের দম্ভ এতদূর যে, যদি চরিতামৃতের অর্থও গুণেন, তবে বলেন যে, সকলেই আপন আপন মতে ভাল অর্থ করিতে পারেন। চরিতামৃতের অর্থ লইবার প্রয়োজন কি ? এই সকল লোকের সন্ধর্ষ জানিবার ইচ্ছা না থাকায় সন্ধর্ষের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ হয় না। ফল এই হয় যে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কৃত নবীন-প্রণালী-মতে ভজন করিতে গিয়া কখনই গুণভক্তির আশ্বাদন করিতে পারেন না।” —‘তত্ত্বকর্মপ্রবর্তন’, সঃ তোঃ ১১৬

১২। ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত নীতির মূল্য আছে কি ?

“কোন কোন ব্যক্তি নীতিকে স্বীকার করে, কিন্তু ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। তাহারা আল্লরক্ষার জন্ত প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত নীতি সর্বদা ভয়শূন্য ও কর্তব্যপূর্ণ। * * * ঈশ্বর না মানিলে নৈতিক-বিধান-সকল অকর্মণ্য হয়।” —চৈঃ শিঃ, ৩৩

১৩। অক্ষজ মনোবৈজ্ঞানিক বা প্রীতি-বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ জগতের কোন উপকার করিয়াছেন কি ?

“প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া ঐহারা মনোবিজ্ঞান ও প্রীতি-বিজ্ঞান ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভ্রমে ঘূত চালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন, দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র ; জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছেন।” —‘প্রীতি’ সঃ তোঃ, ৮৯

১৪। শঙ্করাচার্য্য কিরূপে কর্মকাণ্ডী ও বৌদ্ধগণকে নিজ-মতান্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন ?

“শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ-দলবল লইয়া অধিক কৃতার্থ না হইতে পারায় গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশবিধ সন্ন্যাসীর পদ সৃষ্টি করিয়া ঐ সকল সন্ন্যাসীর বাহুবলে ও বিচার-বলে কর্মপ্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে আত্মসাৎ করিয়া বৌদ্ধ-বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে বৌদ্ধদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে পারিলেন না, সে-স্থলে নাগা সন্ন্যাসি-দল নিয়োগ-পূর্ব্বক খড়্গাদি অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। অবশেষে বেদান্ত-ভাষ্য রচনা-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের কর্মকাণ্ড ও বৌদ্ধদিগের জ্ঞানকাণ্ড একত্র মিশ্রিত করিয়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণকে একমত করিলেন। তৎপর বৌদ্ধদিগের যে-সকল দেবায়তন ও দেবলিঙ্গ ছিল, সে-সকল নামান্তর করিয়া বৈদিক-ধর্ম্মের অনুগত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা কতকটা প্রহারের ভয়ে ও কতকটা স্বধর্ম্মের কিঞ্চিদবস্থান দৃষ্টি করিয়া অগত্যা ব্রাহ্মণাধীন হইয়া পড়িলেন। যে-সকল বৌদ্ধ এরূপ কার্য্যে ঘৃণা বোধ করিলেন, তাঁহারা বুদ্ধদেবের চিহ্ন সমুদয় লইয়া হয় সিংহল-দ্বীপে, নয় ব্রহ্ম-রাজ্যে পলায়ন করিলেন। বুদ্ধের দন্ত লইয়া ঐ সময়ে বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা শ্রীপুরুষোত্তম হইতে সিংহল-দেশে গমন করেন।” —‘উপক্রমণিকা’, কৃঃ সং

১৫। সন্ন্যাসী বা জীবকে কি ‘নারায়ণ’ মনে করা উচিত ?

“মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মুখে নারায়ণ’, ‘নারায়ণ’ বলিয়া থাকেন। স্মার্ত প্রথা এই যে, গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই সেই সন্ন্যাসীকে দেখিলে নারায়ণ-জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকেন। এই ভ্রমপূর্ণ প্রথার নিবারণের জন্ত শ্রীমন্নহাপ্রভু কহিলেন—সন্ন্যাসী জীবমাত্র, কখনও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হইতে পারেন না। তিনি চিৎকণমাত্র, অতএব জীব কৃষ্ণ-স্বর্ঘ্যের কিরণ-কণ-সম। তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া প্রণাম করা উচিত নয়।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১৮। ১১২-১১৬

১৬। দেবতা কি মায়াবাদীর পূজা গ্রহণ করেন ?

“মায়াবাদী যে দেবতারই পূজা করুন ও যে দেবতাকেই অন্নাদি অর্পণ করুন, মায়াবাদীর মায়াবাদ-নিষ্ঠাদোষে সেই দেবতাটি তাঁহার সেই সেই পূজা ও খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করেন না।” —জৈঃ ধঃ ১ম অঃ

১৭। মায়াবাদীর কৃষ্ণসেবা, শ্রবণ, কীর্তন ও স্তব-স্ততি কি কৃষ্ণের সন্তোষ-জনক ?

‘ভক্তির স্বরূপ আর ‘বিষয়-আশ্রয়’।

মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয় ॥

ধিক্ তার কৃষ্ণ-সেবা, শ্রবণ, কীর্তন।

কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন ॥”-শঃ

১৮। পশুতে দৈশ্বর্যরোপ করিবার মতবাদটী কি উদ্ধৃৎস্বৰ্ণ ?

“যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কোন পশুকে ‘দৈশ্বর্য’ বলিয়া পূজা করে, সেও অদৈতবাদে সাহায্য প্রাপ্ত হয়।” —চৈঃ শিঃ, ৫।৩

১৯। একমাত্র কাহার উপাসনা করা উচিত ?

“শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব—এই পঞ্চপ্রকার ভগবদুপাসনা সাধকের সংস্কারক্রমে হইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রথমে জড়শক্তিমাত্র, তদন্তে জড়শক্তির আধারে যে ক্রিয়াশক্তি উত্পাদকপী সূর্য্য, তদন্তে চেতনাধিষ্ঠান নর-গজ-বিশেষ গণেশ-দেবতা, তদন্তে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাপক আত্মারূপী শিব এবং সর্বাবশেষে জীব ও অজীবের অতীত অতুল্য সচ্চিদানন্দ-রূপ পরমাত্মা বিষ্ণু সেবিত হন। সদ্দিহান ব্যক্তি হইতে পরতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই পরব্রহ্ম-ভজনে অধিকারী। রাগের নিঃশ্রলতা ও উন্নতিই উপাসনার লক্ষণ অতএব সর্বজীবের স্বতন্ত্র সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের উপাসনা করা উচিত। অতঃপ্রকার উপাসনায় আবদ্ধ থাকিলে কখনই শ্রেয়ঃ সাধন হইবে না।”

—তঃ সূঃ, ৪৭ সূঃ

২০। প্রকৃতির কর্তৃত্বটী কিরূপ ?

“অদূরদর্শিগণ প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিয়া নির্দেশ করেন। প্রকৃতির মহিষাসুর-মর্দন, চণ্ডমুণ্ড-বিনাশ ও শুভ-নিশুভ-বধ ইত্যাদি যে কর্তৃত্ব-সূচক বাক্য আছে, তাহার সদর্থ পণ্ডিতেরা এইরূপ করিয়া থাকেন,—যে জড়ের দ্বারা যে-কার্য সাধন হয়, সেই জড়কে জ্বীলিঙ্গে বা পুংলিঙ্গে ব্যাখ্যা করত কর্তৃত্বরোপ করা যায়। গঙ্গাজলকে—পবিত্রকারিণী, কলিকাতাকে উল্লাসিনী, কলিকে—ধর্মোচ্ছেদক এবং বিড়াকে—অর্থদায়িনী বলাতে তাহাদের কর্তৃত্বটী যেরূপ রূপক-বোধক-মাত্র হয়, প্রকৃতির কর্তৃত্বও তদ্রূপ জানিতে হইবে।”

—তঃ সূঃ, ২২ সূঃ

—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিদ্যোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগৌরমুন্দরের রজক-উদ্ধার

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬০ পৃষ্ঠার পর)

কাঁদিয়া আকুল হৈয়া ওঝারে ডাকিল ।

ওঝা আসি 'ঝাড়ু' ক' করিতে লাগিল ॥

তাতে বিপরীত ফল ওঝার ফলিল ।

রজকের স্পর্শে তার মন ফিরি গেল ॥

সে কোথা ছাড়াতে এল পিশাচী ধোপার ।

ধোপার পরশে ছাড়ে পিশাচী তাহার ॥

পরশ-মণির স্পর্শে লোহা সোনা হয় ।

রজকের স্পর্শে হৈল ভক্তির উদয় ॥

পতির এ দশা হেরি রজকিনী সতী ।

অস্থির হইয়া সে যে ধরে গিয়া পতি ॥

পতির পরশে তার হৈল সেই গতি ।

হরি হরি ব'লে নাচে পতি-সহ সতী ॥

তিনের এ দশা শুনি গ্রামবাসিগণ ।

একে একে উপস্থিত হইল তখন ॥

তাদের এ দশা হেরি ভাবে মনে মনে ।

এদের এমন দশা হইল কেমনে ॥

এত ভাবি যারা যায় তাদের ধরিতে ।

তাদের সে দশা হয় প্রভুর কৃপাতে ॥

সকলেই ভাবভরে বিভোর হইল ।

হরি বোল ব'লে সবে নাচিতে লাগিল ॥

ভূভাভদ্র নর-নারী নাহিক বিচার ।

ভাবের রাজ্যেতে সদা এই রীতি হয় ॥

প্রভু যারে কৃপা করি' দেয় প্রেমধন ।

তাদের কি থাকে কভু কুল-শীল-মান ॥

সবে উদ্ধবাহু হই' নাচিতে লাগিল ।
 নামরসে মাতি সবে পাগল হইল ॥
 নামের প্রভাবে সবে বাহু-জ্ঞানশূন্য ।
 প্রভুর কৃপাতে তারা হইল যে ধন্য ॥
 পতিতপাবন প্রভু গৌরাঙ্গ আমার ।
 এইরূপে করি' তথা রজক উদ্ধার ॥
 তথা হ'তে চলে প্রভু নীলাচল-পথে ।
 ভক্তগণ খোঁজে প্রভু যায় কোন্ পথে ॥
 সেখান হইতে প্রভু যায় দেশান্তরে ।
 ভক্তগণ পিছে সদা খুঁজে খুঁজে মরে ॥
 খুঁজিতে খুঁজিতে তারা এল সেই স্থানে ।
 তাদের এ' ভাব দেখি' স্থির কৈল মনে ॥
 প্রভু কৃপাবিনা কভু এ ভাব লভ্য নয় ।
 এই পথে মোর প্রভু চলিলা নিশ্চয় ॥
 এত ভাবি' ভক্ত সব সেই পথ ধরি' ।
 গ্রামান্তরে গেল। সবে খুঁজে গৌরহরি ॥
 কে বুঝিতে পারে বল গৌরাঙ্গের লীলা ।
 এইরূপে কত জীব উদ্ধার করিলা ॥
 দীন-হীন পতিত-পামর যত ছিল ।
 পতিতপাবন গোরা সবে উদ্ধারিল ॥
 তীর্থ-পর্যটন-ছলে ফিরি দেশে দেশে ।
 জগৎ তারিল প্রভু দিয়া কৃপালেশে ॥
 বড় ভাগ্যবান ধোপা প্রভু-কৃপা পেল ।
 আপনি তরিল আর সবে তরাইল ॥
 জন্ম-জন্মান্তরে ধোপা কি সাধনা কৈল ।
 যার ফলে গৌরাঙ্গের এত কৃপা হৈল ??

ব্রহ্মা আদি দেব যারে ধ্যানে নাহি পায় ।

সামান্য রজক তাঁরে পাইল হেলায় ॥

এও কি সম্ভবপর হ'তে পারে কভু ?

অসাধ্য-সাধন-বিনা পায় কভু বিভু ?

আভিজাত্য-গর্বে কভু ভক্তি নাহি মিলে ।

জগতে শিখায় তাহা জন্মি নীচকূলে ॥

ওগো ও রজক ভাই শুন মোর কথা ।

তোমার চরণে আমি বিকাইনু মাথা ॥

তুমি যদি কৃপা করি দাও পদে স্থান ।

তাহ'লে অবশ্য পাব গৌরান্দ-চরণ ॥

দয়ালের শিরোমণি গৌরান্দ আমার ।

তাঁর ভক্তগণ হন দয়ার অবতার ॥

তার এক বিন্দু মোরে করহ গো দান ।

সেই টুকু পেয়ে আমি জুড়াইব প্রাণ ॥

ভক্তকৃপা হ'লে পরে ভগবান চা'বে ।

তাহ'লে ত পাতকীর সব দুঃখ যাবে ॥

তুমি যদি কৃপা কর অধমের প্রতি ।

অবশ্য হইবে মোর গৌরাপদে মতি ॥

তবে ত গাহিব আমি নাম নিরন্তর ।

অপরাধশূন্য হবে শোধিবে অন্তর ॥

কবে সেই শুভদিন হইবে আমার ।

পাতকীর দুঃখে দয়া হইবে তোমার ?

সেই আশা-পথ চেয়ে আছি গো বসিয়া ।

কৃপা কর মোরে প্রভু অধম জানিয়া ॥

—শ্রীউষালতা দেবী, ভক্তিপ্রভা

কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

সন্দভ-সান্নি

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দভ-২৩)

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের নিকট ঋণী হইয়া নিত্যবাস করিতেছেন বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় কি এইজন্য ব্রজা বলিতেছেন,—

এষাং ঘোষ-নিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন-

শ্চেতো বিশ্বফলাং ফলং ত্বদপরং কুত্ৰাপ্যনুহতি ।

সদেষাদিব পুতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা

যদ্বামার্থ-সুহৃৎ-প্রিয়াত্নতনয়-প্রাণাশয়াস্বংকৃতে ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩৫)

হে দেব ! যাহাদের ধাম, অর্থ, সুহৃৎ, প্রিয় আত্মা, তনয়, প্রাণ, আশয় আপনার সুখের জন্ত সমর্পিত, সেই ঘোষ-নিবাসী (ব্রজবাসিগণকে) আপনি কি দান করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া আমার চিন্তা মোহপ্রাপ্ত হইতেছে। যেহেতু সদ্যেশের অনুকরণ করিয়া পাপিষ্ঠা পুতনাও নিজ বন্ধু-বান্ধবের সহিত আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজবাসীদিগকে ইহা হইতে উত্তম কিছু দেওয়া উচিত, কিন্তু তাহা ত নাই।

সং— শুদ্ধচিত্ত ধাত্রাদির যে বেষ, পুতনা তদ্রূপ বেষ ধারণ করিয়াছিল। অবতার-লীলাসময়ে মাত্র সেই বেষ ধারণ করিয়াছিল যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছে। আর ব্রজবাসিগণ অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া আসিতেছেন। অতএব তাহাদের এক এক জনের ভক্তিদ্বারা তিনি অবরুদ্ধ। সুতরাং তাঁহাকে যে ব্রজবাসীদের সনাতন মিত্র বলা হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গত। ব্রজপরিকরগণের প্রেমে অবরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করিতেছেন বলিয়া ব্রজার “তটুরিভাগ্য” শ্লোকে ব্রজবাসিগণের পদরজঃ কামনা।

যদি কেহ বলেন, ব্রজবাসিগণের সাধারণ মনুষ্যের ত্রায় রাগাদি দেখা যায়, তাহারা কিরূপে স্বয়ং ভগবানের নিত্য পরিকর হইবে? তদ্বত্তরে বলিতেছেন,—

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্ ।

তাবম্মোহোহজিহ্বা-নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ! ন তে জনাঃ ॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩৬)

হে কৃষ্ণ ! রাগাদি ততদিন পর্য্যন্তই তঙ্কর, গৃহ ততদিনই কারাগৃহ, মোহ

ততদিনই পদশৃঙ্খল হইয়া থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত জীব তোমাতে আত্মসমর্পণ না করিতে পারে। তৎস্বরূপ—পুরুষের সার ধৈর্য্যাদিহরণকারী। অতঃ প্রাকৃত জন সম্বন্ধেও রাগাদি ততদিনই চোঁরাতির মত কার্য্য করে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা তোমার না হয় অর্থাৎ সর্বতোভাবে ষাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদের রাগাদি শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়েই বিদ্যমান থাকে। সেই রাগাদি অপ্রাকৃত বলিয়া তৎস্বরের দ্বারা জীবের ধৈর্য্যাদি হরণ করে না, কিন্তু তাহা পরমানন্দ-স্বরূপ। তজ্জগৎই প্রজ্ঞাদ তাদৃশ রাগাদির প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী।

স্বাগনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু ॥

অবিবেকি-জনগণের মায়িক বিষয়ে যে অধঃলা প্রীতি, আমার হৃদয় হইতে তোমার স্মরণপরায়ণ তাদৃশ প্রীতি যেন কদাপি তিরোহিত না হয়।

শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণকারী সাধকগণের যখন একরূপ সংবাদ পাওয়া যায়, তখন শ্রীকৃষ্ণ ষাঁহাদের নিরতিশয় প্রিয়রূপে বিরাজমান সেই গোকুলবাসীদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? এজন্ত বলা হইয়াছে,—

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা।

কুর্কন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভব-বেদনাম্ ॥ (ভাঃ ১০।:১৫৮)

যে-স্থানে জীবগণ জন্মগ্রহণ করে, তাহা ‘ভব’ অর্থাৎ প্রপঞ্চ। যদিও নন্দাদি ব্রজবাসিগণ প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা পরমানন্দে কৃষ্ণ-বলরামের কথা আলোচনা করিয়া এবং তাঁহাতে রতিশীল হইয়া ভব-বেদনা জানিতে পারেন নাই।

যদি গোকুল প্রাপঞ্চিক বিষয়-সুখাদির অনুভবশূন্য শ্রীকৃষ্ণসুখে পরিপূর্ণ হয়, তবে জনগণের নিকট তাহা প্রপঞ্চের দ্বারা অনুভূত হয় কেন? তদ্বত্তর,—

প্রপঞ্চং নিস্প্রপঞ্চোহপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।

প্রপন্ন জনতানন্দ-সন্দোহং প্রতিভুং প্রভো ॥ (ভাঃ ১০।:৪৩৭)

হে বিভো, তুমি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও ভূতলস্থ প্রপঞ্চের বিড়ম্বনা করিতেছ। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত গোকুল-রূপের অনুকরণ করিতেছ। বাস্তবিক-পক্ষে গোকুল রূপ তাঁহার নিত্যস্বরূপ, তাহাই প্রপঞ্চের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু উহা প্রপঞ্চ-স্বরূপ নহে।

প্রপঞ্চাতীত গোকুল কেব প্রপঞ্চের ভাণ করে,—প্রপন্ন জন-সমূহে আনন্দরাশি বিস্তারার্থ। শ্রীকৃষ্ণের ঈশলীলা অপেক্ষা নরলীলায় তদীয় পরিকরগণের পরমানন্দ হইয়া থাকে। এইজন্ত অপ্রাকৃত ধামকে নরলোকের স্থানবিশেষের মত প্রকাশ করিয়া নররূপী শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ পরিকরগণের সহিত বিচিত্র লীলা করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-স্তবের উপরিউক্ত শ্লোকসকলের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপাদি ব্রজপরিকরগণের সহিত নিত্য বিহার করেন। অতএব ‘অহো ভাগ্যং’ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দ-গোপাদি ব্রজবাসি-গণের সনাতনমিত্র বলা সুসঙ্গত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ক্বতীনাং স্তুতেক্ষণম্ ।

ন পুনঃ কল্পনে রাজন্ সংসারোহজ্ঞানসম্ভবঃ ॥ (ভাঃ ১০।৬।৪০)

অতএব গোপাদির নিত্যপরিকরত্বহেতু শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—হে রাজন্! যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে অবিরত পুত্রদৃষ্টি করেন, সেই গোপীগণের অজ্ঞান-সম্ভূত সংসার কল্লিত হইতে পারে না।

গোপ-ললনাগণ-মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে পুত্রদৃষ্টিসম্পন্না, জন্মান্তরেও তাঁহাদের সংসার-প্রপঞ্চ ঘটে না, তাঁহাদের অপ্রাপঞ্চিক অবস্থাই চিরকাল থাকে অর্থাৎ প্রকটলীলায় পরিকরত্ব লাভ করিয়াছেন, প্রকটলীলাবসানে তাঁহারা আর সংসারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা তখনও প্রপঞ্চাতীত ধামেই বিরাজ করিবেন। কারণ অজ্ঞান হইতেই জীবের সংসার কল্লিত হয়। শ্রীগোকুল-পুরস্ত্রীগণের তাদৃশ অজ্ঞান স্পর্শলেশেরও সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানতমঃ-বিনাশকারী জ্ঞান-সূর্য্যের উপরিভাগে বিরাজমান যে প্রেম, তদুপরি যে পুত্রদৃষ্টি—বাৎসল্য-প্রেম, আবার সেই প্রেমসহকারে অবিরত নিত্য অনাদিকাল হইতেই যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে পুত্রদৃষ্টিসম্পন্না, তাদৃশী গোপীগণের অজ্ঞান সম্ভূত সংসার কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তৃভূদেব শ্রোতী মহারাজ

প্রচারকের ডায়েরী

(৩)

একদা এক শুভ-মুহূর্তে শান্তিপুরের পূত-ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। তদীয় বিমল রজঃকণা নতশিরে বন্দন করিয়া ধীরে ধীরে পীঠাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সহর পরিত্যাগ করিয়া কিয়দূর গমনানন্তর ধরিত্রীর বুকে ভাগীরথীদেবীর লুপ্তচিহ্ন নয়নগোচর হইল। সহসা স্মরণপথে উদয় হইল,—‘সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই’; সে গৌরও নাই, গৌর-অঙ্গস্বরূপ সে অদ্বৈতাচার্য্যও নাই।’

‘অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাচার্য্যং ভক্তিশঃসনাৎ।

ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥’—

এই বাক্যে মহাবিশ্ণুবতার শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের পাদপদ্মে স্বত্বার্থ্য প্রদান করিলাম।

দয়িতাদর্শনে বিরহ-বিধুরা ললনার স্থায় গঙ্গাদেবীর অদ্বৈতভবন হইতে বহুদূরে অবস্থান দেখিয়া হৃদয় বেদনাপ্লুত হইল। পথিপার্শ্বে উভয়দিকে ম্রিয়মাণ পাদপশ্রেণী অতীতের সাক্ষ্যদান করিতেছে; মধ্যে মধ্যে কচিং স্বল্প সংখ্যক মনুষ্যালয় পথচারীর শঙ্কা দূরীকরণমানসে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এমনভাবে বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। অবশেষে চিরাকাজিত শ্রীমন্দির দর্শনানন্তর উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। কল্লনার বস্ত্র বাস্তবের রূপায়ণে অন্তরে যে আনন্দের সঞ্চার করে, তাহা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা অতীব দুষ্কর। মুহুমন্দ মলয়হিল্লোলে হৃদয়তন্ত্রী অমনি বাজিয়া উঠিল,—

“হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।

হইলাম বঞ্চিত সে সুখ-দরশনে ॥”

“যখন গৌর-নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,

নদীয়া-নগরে অবতার।

তখন না হইল জন্ম, এ দেহের কিবা বর্ষ,

মিছামাত্র বহি ফিরি ভার ॥”

ভগবৎপাদপদ্ম বিস্মরণের ফলে অবিচ্ছিন্ন মানবের হৃদশা বা সংসার-প্রাপ্তি। ‘সা বিদ্যা তন্মতিৰ্ঘরা’ অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রতি মতিই ‘বিদ্যা’ এবং সেই

মতির অভাব হইলেই অবিচ্ছিন্ন হইতে হয়। ঈদৃশ অবিচ্ছিন্নপ্রদীপিত জীবের অবর্ণনীয় ক্লেশ-দর্শনে পরম-করুণাবতার শ্রীঅষ্টৈত প্রভু পতিতপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এই দেবীধামে অবতরণ করাইয়াছিলেন। যিনি সর্বান্তর্যামি-স্বত্রে জীবহৃদয়ে এবং ক্ষীরোদশায়িক্রমে ক্ষীর-সাগরে লুঙ্কায়িত ছিলেন, এই প্রভুই তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে জল-তুলসীদলে অর্ঘ্যদানে হৃদয়ের আন্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কলিহত জীবের অপরিমেয় দুঃখবস্থা আচার্য্যের অন্তর ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাই তাঁহার গভীর হৃদয়ে পূর্ণাবতারী গৌরহরি কালবিলম্ব না করিয়া শচীগর্ভ-সিন্ধুমারে আবির্ভূত হইলেন। ‘ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া’- ভগবান্ ভক্তিবশযোগ্য, বুদ্ধি বা শাস্ত্রের টীকালোচনাদ্বারা লব্ধ নহন। শাস্ত্রে তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—

‘তুলসীদলমাত্রেন জলস্ত চুলুকেন বা।

বিক্রীণীতে স্বমাম্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥’

পরমেশ্বর এত অধিক ভক্তবৎসল যে, তচ্চরণে একটিমাত্র তুলসীদল অথবা একাঞ্জলি জল প্রদান করিলে তিনি স্বয়ং ভক্তের নিকট বিক্রীত হইয়া যান।

শ্রীকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সপার্বদ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ধনী-নির্ধন-নির্বিশেষে আপামর সাধারণে উন্নতোজ্জলরসস্বরূপ নিজপ্রেমভক্তি বিতরণ করিলেন। কিন্তু হায়! বিদ্যাভিমानी পণ্ডিতবর্গ ভগবৎকৃপাবঞ্চিত রহিলেন।

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চনের সাহায্যে যে-ফল প্রাপ্ত হইত, এই কলিযুগে একমাত্র সংকীর্তন বস্ত্রদ্বারা সেই ফল অনায়াসলভ্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সংকীর্তন-যজ্ঞের প্রবর্তক। তদানীন্তন মুসলমান-শাসনকালে বাদসাহ্ হোসেন সাহের কর্মচারী মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজী বাংলা-প্রদেশের গভর্ণর বা শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার অকথ্য অত্যাচারে হিন্দুগণ প্রদীপিত হইয়া কালযাপন করিতেন। এই নির্যাতনের মুখ্যতম কারণ ভবব্যাদি-নির্মূলকারী নামকীর্তন-প্রচার। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কতিপয় স্নেহস্বভাবসম্পন্ন হিন্দুকুলান্ধার তাহাদের সহযোগিতা করিয়া উৎপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্ম-সংরক্ষক ভগবান্ সেই পাষাণগণকে অবলীলায় দমিত করিয়া তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের উজ্জল

দৃষ্টান্ত জগতের সমক্ষে ধরিলেন। পক্ষান্তরে নিরানন্দ নিরসনে প্রেমবন্তায় চতুর্দিক প্রাবিত হইল; শান্তির বিমল ছায়ায় নরকুল চিরসুখ উপভোগ করিল।

এবংবিধ অধর্মের প্রাবল্যে ভগবানের আবির্ভাবের প্রমাণ দৃষ্ট হয়, যথা—

“যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মনং স্বজাম্যহম্ ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হৃঙ্কতাং।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥”

অর্থাৎ হে ভারত! যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় ও অধর্মের অভ্যুত্থানের সূচনা করে, তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্বক আবির্ভূত হই। আমি আমার পরমভক্ত সাধুগণের মদর্শন-লালসোধ হুঃখ হইতে পরিভ্রাণ এবং ভক্তদ্রোহিগণের বিনাশ ও শ্রবণ-কীর্তনাদি নিত্যধর্ম সংস্থাপন-জন্তু প্রতিযুগে অবতীর্ণ হই।

ইংরাজীতে প্রবাদ আছে—Righteousnessexalteth a nation— অর্থাৎ ঋায়পরায়ণতা জাতির অভ্যুদয়ের মূলভিত্তি-স্বরূপ। ধর্মশাস্ত্র মহাভারত হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ঋায়পরায়ণতার একমাত্র নিদর্শন। তাঁহার রাজত্বে অশান্তির লেশমাত্র ছিল না। শ্রীরামচন্দ্র, জনক-ঋষি, অশ্বরীষ মহারাজ প্রভৃতির রাজত্বকালেও ধর্মনিষ্ঠা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল এবং প্রজাবৃন্দ পরমসুখ শান্তিতে কালযাপন করিতেন। ইদানীন্তনকালে আমরা এক সঙ্কটময় রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছি—যেখানে সর্বদা সর্বত্র দুর্ভিক্ষ-দুর্নীতি, দস্যুতা-হানাহানি নাগরিক জীবনকে বিপর্যাস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বশান্তির একটা ধূয়া উঠিয়াছে মাত্র, বাস্তবতার কোন প্রকার লক্ষণই নাই। ধোঁকাবাজীতে কখনও শান্তির সৃষ্টি হয় না—হয় কেবল অশান্তির অনলোৎকীরণ। সত্য ঋায়পরায়ণতা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন রাজ্যই সুখ-শান্তিময় হইতে পারে না; ‘রাম রাজ্য কেবল’ স্বপ্ন বা কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়। তাই বুঝি শান্তিপুরের শান্তিপ্রদাতা শ্রীঅদ্বৈতের অন্তর্ধানে সেই স্থানের নাম ‘বাবলারি’ হইয়াছে। সহরটি নামের অস্তিত্ব রক্ষণ করিলেও তথায় বর্তমানে শান্তির কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। শুধু একস্থানে নয়—বিশ্ব সংসারের সর্বত্রই ঐ একই অবস্থা।

যদি আমরা প্রকৃত শান্তির অধিকারী হইতে অভিলাষ করি, তবে সর্বপ্রায়ে আমাদের স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ‘স্বধর্ম’ বা ‘আত্মধর্ম’ বলিতে আত্মার নিত্য বৃত্তি ভগবদ্ভক্তি বুঝায়। ঐ গুহন, শ্রুতি তারত্বরে ঘোষণা করিতেছেন—

“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

তমান্নস্বং যেহনুপশুন্তি ধীরা-

স্তেবাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্ ॥ (কঠ ২।২।১৩)

যিনি নিত্য বা বাস্তব-বস্তুসমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্যবস্তু, যিনি চেতন জীবসমূহেরও মুখ্যচেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে-সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই আত্মস্ব-ভগবান্কে পরিদর্শন করেন, তাঁহারা ই নিত্যশান্তিলাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

— ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত উদ্ধৃমহী মহারাজ

ভক্তের লক্ষণ

স্বয়ম্ভু, শম্ভু, ভীষ্ম, শ্রীশুক, নারদ ।

কুমার, কপিল, বলি, জনক, প্রহ্লাদ ॥

মনু, যম, ক্রুব, অশ্বরীষ, বিভীষণ ।

বিদুর, উদ্ধব, ব্যাস আদি ভক্ত জন ॥

সবার চরণে মোর প্রণাম অনন্ত ।

নবে কৃপা করিলে সে মুণ্ডি ভাগ্যবন্ত ॥

কৃষ্ণ-প্রতি অহুরাগ ভক্তের লক্ষণ ।

সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা করে তদীয় সেবন ॥

ভক্তি-আচরণ-বিনা ভক্ত কভু নয় ।

ভগবানে ভক্তি যাঁর তাঁরে ভক্ত কয় ॥

সে-জন পরমভক্ত বলে সর্বজন ।

জীবে দয়া, নামে রুচি, যাঁহার ভূষণ ॥

সে হয় উত্তম ভক্ত শাস্ত্রের সম্মত ।
 সকল প্রাণীকে দেখে আপনার মত ॥
 সত্যই ভক্তের বল জীবনে-মরণে ।
 সুখে-দুঃখে অচঞ্চল থাকে সমজ্ঞানে ॥
 কোন দোষে ছুঁষ্ট নয় সদা অপ্রমত্ত ।
 লোক-ব্যবহারে থাকে অকঠিন চিত্ত ॥
 ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু ছয় ।
 করে নাহি অভিভূত যাঁহার হৃদয় ॥
 অসতের সঙ্গ ছাড়ি' থাকে সদাচারে ।
 জীবনের ব্রত যাঁর পরহিত-তরে ॥
 আপনাকে মনে করে তৃণাপেক্ষা হীন ।
 জীবে সম্মান দেয় জানি নিজে বড় দীন ॥
 আত্ম-পর যাঁর নাই ভেদাভেদ-জ্ঞান ।
 লাভ-ক্ষতি-নিন্দা-স্তুতি সকল সমান ॥
 গম্ভীর-ভাবেতে থাকে বিপন্নে করুণ ।
 সেবাকর্ম্মে অতি দক্ষ, কভু নহে উন ॥
 লীলা-বর্ণনায় কবি, তর্কে মোনৌ রয় ।
 তরুসম সহগুণে জীবন যাপয় ॥
 জিহবার লালসে কভু নাহি যাঁর মন ।
 পরিমিত প্রসাদে সন্তুষ্ট অহুক্ষণ ॥
 মমতা ও অহঙ্কার নাহি মনে যাঁর ।
 জ্বিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, মিত্র-ব্যবহার ॥
 গৌরব না করে কভু গুণে আপনার ।
 ধার্মিকের ভাণ সদা করে পরিহার ॥
 রিপুগণ সর্ব্বক্ষণ যাঁর বশীভূত ।
 হৃদয় শ্রীনামে থাকে যুক্ত অবিরত ॥
 গুরু-পদাশ্রয়, দীক্ষা-গুরুর সেবন ।
 সাধুসঙ্গ করে, সাধু-মার্গাভুগমন ॥

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন ।
 পরিচর্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥
 নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি আর দণ্ডবদতি ।
 অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থ-স্থানে গতি ॥
 পরিত্রুমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্তন ।
 ধূপ, মাল্য, গন্ধ, মহাপ্রসাদ-ভোজন ।
 আরাত্রিক, মহোৎসব, শ্রীমূর্তি-দর্শন ।
 নিজপ্রিয় দান, ধ্যান, তদীয় সেবন ॥
 “সর্ব-মহাগুণগণ ভক্তের শরীরে ।
 কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকল সঞ্চারে ॥”
 ভাগবতে নিজমুখে কহে ভগবান্ ।
 হে উদ্ধব ! মোর চেয়ে ভক্তই প্রধান ॥
 ঈশ্বর-স্বরূপ ভক্ত, তাঁর অধিষ্ঠান ।
 ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥
 কেবল ভক্তিতে বশ শ্রীকৃষ্ণ সতত ।
 কৃষ্ণ সেবা তরে ভক্ত সদা অনুরক্ত ॥
 কৃষ্ণ-কথা আলাপনে সর্বদা আসক্তি ।
 কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্বদা বসতি ॥
 আত্ম-সমর্পণ করে কৃষ্ণের চরণে ।
 ‘কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন’ দৃঢ় করি’ মানে ॥
 হেন ভক্ত-পাদপদ্মে রহ’ চিরমতি ।
 তবে সে খণ্ডিবে মোর অশেষ দুর্গতি ।
 সৎগুরু-পদাশ্রয়ে জীবন সফল ।
 তাহা বিনা জীবের হয় সকলি বিফল ॥
 গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ করহ করুণা ।
 হৃদদৌর্বল্য ঘুচে যাক, এ মোর প্রার্থনা ॥

— শ্রীমুরারি মোহন প্রধান

পিছলদা (মেদিনীপুর)

সাধু-সঙ্গ

নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে,—“সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি” অর্থাৎ সংসর্গ হইতে দোষ, আবার সংসর্গ হইতেই গুণের উদ্ভব হয় ।

যে সংসর্গ হইতে হীন প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাকে অসাধু বা অসংসঙ্গ এবং যে সঙ্গক্রমে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহাকে সাধু বা সংসঙ্গ বলে । ‘সং’ অর্থে যাহা চিরকাল স্থায়ী বা বর্তমান রহিয়াছে ও রহিবে এবং পূর্বেও ছিল ; ‘অসং’ যাহা চিরকাল অস্থায়ী ধ্বংসশীল । অতএব সঙ্গ দুই প্রকার—সং ও অসং ; সাধুসঙ্গ নিত্য এবং অসাধুসঙ্গ অনিত্য ।

এই মায়িক অচেতন বহির্জগতে প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে পরস্পরের শক্তিগত একটা আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলিতেছে । শরীরের সঙ্গে শরীরের, মনের সঙ্গে মনের, প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির, প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির, আকাশ, বাতাস, জল, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সকলের মধ্যেই সর্বদা একটা আদান-প্রদান চলিয়াছে । সেই প্রকার আমার প্রকৃতিও সর্বদা অপরের প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতেছে, আবার অপরের প্রকৃতিও আমার প্রকৃতিকে সর্বদা আকর্ষণ করিতেছে, তবে তাহা প্রত্যেক দ্রব্যশক্তির তারতম্যানুযায়ী সজ্জাটিত হইতেছে । কাজেই যেক্রপ প্রকৃতির সঙ্গে আমার আচার-ব্যবহারাদির আদান-প্রদান চলিবে, সেই প্রকৃতিজ দোষ-গুণ সর্বদাই আমাতে প্রবর্তিত হইবে, আবার তাহারাও আমার প্রকৃতিজ দোষ গুণ গ্রহণ করিতে সর্বদা বাধ্য থাকিবে । ইহা নৈসর্গিক শাস্ত্র-বিধি । এই মায়ার সংসারে এইভাবেই ভাল-মন্দ দোষ-গুণের আদান-প্রদান চলিয়া আসিতেছে ।

এইরূপ আদান-প্রদান করিতে করিতে কোন কোন ভাগ্যবান জীব সাধুসঙ্গ-প্রভাবে নিজ প্রকৃতির উন্নতি লাভপূর্ব্বক এই দুর্লভ্য ভদ্র-সাগর অনায়াসে পার হইয়া চিরশান্তিময় ধামে চলিয়া যাইতেছেন । আবার কোন কোন দুর্ভাগা মানব অসাধু-সঙ্গে, চরিত্র-দোষে একেবারে দুর্ভোগরূপ পাপ-পঙ্কিল-গর্ভে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে এবং ভগবদ্ ভজনে বঞ্চিত হইয়া ক্রমে চোরাশীলক্ষ যোনি ভোগের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে । তাই শ্রীমন্তাগবত বলেন,—

ততো হুঃসঙ্গমুৎসজ্য সৎস্ব সজ্জত বুদ্ধিমান্ ।

সন্ত এবাস্ত ছিন্তন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

অতএব হুঃসঙ্গ ছাড়িয়া বুদ্ধিমান জন সর্বদা সাধুসঙ্গ করিবেন। সাধু-জনগণ সর্বদা সাধু উপদেশ দানে তাহার সমস্ত ভক্তিবিরুদ্ধ বাসনার বাঁধন ছেদন করিয়া দিবেন। সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

“নির্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তো দম্বাহঙ্কার-বর্জিতঃ।

নিরপেক্ষো মুনির্কীর্তরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে ॥”

এই সব গৌণ-লক্ষণযুক্ত হইয়া যিনি মুখ্যভাবে সত্যবস্ত শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-সরোজে সম্পূর্ণভাবে নিরুপট-শরণ লইয়াছেন তিনিই প্রকৃত সাধু। সুতরাং ‘সাধু’ শব্দে একমাত্র শ্রীশ্রীভগবানের ভক্তকেই লক্ষ্য করে। কারণ যাহার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐকান্তিকী ভক্তি আছে, তাঁহাতেই সমস্ত সদৃশাবলী বর্তমান রহিয়াছে, জগতের কোন অসদৃশ্যই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যশাস্তি ভক্তিভগবত্যকিঞ্চনা

সর্বৈশ্ব'নৈশ্চত্র সমাসতে সুরাঃ।

হরাবভক্তস্ত কুতো মহদগুণা

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ (ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি যাহার কেবলা ভক্তি বিद्यমান, সকল গুণের সহিত দেবতাগণ তাঁহাতে সম্যকভাবে অবস্থান করেন। সর্বগুণের মূলাধার শ্রীহরির প্রতি ভক্তিশূন্য-জনের মহদগুণ কিরূপে সম্ভব? সে অভক্ত জড় মনোরথে চড়িয়া সর্বদা জড় বিষয়ভোগের লালসায় অশান্তভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে।

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।

নির্দোষ, বদাত্ম, মুহু, শুচি, অকিঞ্চন ॥

সর্বোপকারক, শাস্ত, কৃষ্ণকশরণ।

অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়গুণ ॥

মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।

গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ (চৈঃ চঃ)

ইহার মধ্যে ‘কৃষ্ণকশরণ’-গুণই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অত্যাশ্রয় গুণগুলি গৌণ-লক্ষণ; সুতরাং ‘সাধুসঙ্গ’ বলিলে বৈষ্ণব-সঙ্গকেই বুঝায়।

‘বৈষ্ণব’ বলিলে জানিতে হইবে যে, যিনি নিজেকে নিত্য বিষ্ণুদাস—কৃষ্ণদাস বুঝিয়া সর্বদা একমাত্র নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরই অনুগত ভূত্যরূপে

নিকপট সেবানুরক্ত, কখনও জ্ঞান কর্ম দ্বারা অভিভূত নহেন, সেইরূপ ভক্তিমান ভক্তকেই বৈষ্ণব কহে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,—

অত্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মানুবৃতং ।

অনুকুলোন্ কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূতমা ॥

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্ত যাহা কিছু সেবা আচরণকেই ভক্তি কহে, ঐ প্রীতি-আচরণ বা অনুকূল অনুশীলন জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-লালসা-শূন্য হইলেই তাহাকে উত্তম ভক্তি বলিয়া শাস্ত্রে বলিয়াছেন।

কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান মানবগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় লইয়া অনন্তমনে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ সেবাদ্বারাই নিজ চরম মঙ্গল লাভ করেন। কিন্তু আবার কৃষ্ণপ্রিয় সাধু-ভক্তের সঙ্গ ব্যতিরেকে যখন কৃষ্ণ সেবালাভের দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই, তখন সাধুসঙ্গ—অর্থাৎ শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্গ আশ্রয় করাই বুদ্ধিমান জীবের একমাত্র কর্তব্য।

সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ ভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য-অঙ্গ ॥

মহংকৃপাবিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয় ।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ সংসার নহে ক্ষয় ॥

সাধুসঙ্গ বজ্জনে দৃঢ়তা সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

“বিষয়-বিমুচ আর মায়াবাদী জন ।

ভক্তিশূন্য হুহে প্রাণ ধরে অকারণ ॥

এই দুই সঙ্গ, নাথ ! না হয় আমার ।

প্রার্থনা করিয়ে আমি চরণে তোমার ॥

সে ছয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল ।

মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি মাগি কোনকাল ॥”

দুঃসঙ্গ-বর্জন ও সংসঙ্গ-গ্রহণে সিদ্ধিলাভ বিষয়ে সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য,—

“সঙ্গ ত্যজি’ সাধুবৃত্তি করিলে আশ্রয় ।

ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

অসংসঙ্গ ত্যাগে হয় সঙ্গ-বিবর্জ্জন ।

সদাচার, সাধুবৃত্তি সর্বদা পালন ॥”

অতএব দুঃসঙ্গ বর্জনপূর্বক সংসঙ্গ-গ্রহণেই জীবের সর্বার্থসিদ্ধি লাভ এবং জীবন কৃতকৃত্য হয়।

—শ্রীঅষ্টেত দাস ব্রজবাসী

আদৌ গুরু-পদাশ্রয়

আমরা জাগতিক ব্যাপারে দেখিতে পাই, বালিকা বিবাহের পূর্বেই পতিগৃহের দৈনন্দিন কৃত্যগুলি পালনের জন্ত ব্যস্ত হয় না। পতির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইবে, সর্বাগ্রে বালিকার ও বালিকার অভিভাবকগণের তদ্বিষয়ে অধিক চেষ্টা ও যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বপ্রথমে পতির সহিত সম্বন্ধস্থাপন, পতিগৃহে গমন, অতঃপর পতি ও পতির সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের সেবোপযোগী জীবনযাপনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। পতির সহিত সম্বন্ধস্থাপনের পূর্বে কোন বালিকা উদ্দেশ্যবিহীন গৃহকার্যসকল অতি সময়ে করিতে থাকিলেও সেইরূপ অনুষ্ঠানাবলী মঙ্গলের হেতু না হইয়া ইন্দ্রিয়লালসারূপ পাপ ও অত্যাচারই আবাহন করে। সুতরাং সর্বাগ্রে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ভগবানই আমাদের নিত্যপতি। শ্রীগুরুদেব আমাদের পিতা। সেই পতির সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে “সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা” বলে এবং সম্বন্ধজ্ঞানের নামই ‘দীক্ষা’ বা ‘দিব্যজ্ঞান’।

পতির সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্বে বালিকা যে কিছু গৃহকার্যের অভিনয় করে, তাহা পুতুলখেলা বা লক্ষ্যবিহীন অনুকরণমাত্র। পুতুলখেলার দ্বারা বালিকার সত্য সত্য পতিসেবা হয় না, কেবল সাময়িক মানসিক তৃপ্তিবিধান হয় মাত্র। আবার পতি-সম্বন্ধ-বিমুখিনী ব্যভিচারিণীর গৃহকার্যগুলিও তাহার নিজেদ্রিয়-তর্পণের নিমিত্তই কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর গৃহকর্মের প্রত্যেকটাই পতির প্রীতিবানায় সাধিত হওয়ায় উহা মঙ্গলজনক ও শান্তি-বিধায়ক হয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের (ভাঃ ১১২৩৪) শ্লোকের টীকায় ভগবদ্ভক্তের সেবানুষ্ঠান এবং বিষয়ি-অভক্তের অনুরূপ আচরণের মধ্যে কিরূপ গভীর অন্তর বিদ্যমান তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিষয়িগণ প্রাতঃকালে মূত্র-পুরীষোৎসর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া স্নান-ভোজনাদি বিষয়-স্থখের জন্তই করিয়া থাকেন, ভগবদ্ভক্তগণও সেই সেই কার্য ভগবৎ-সেবোদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন এবং তাহা ভক্ত্যঙ্গরূপেই পর্য্যবসিত হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ভক্তের ও বিষয়ি-কর্মীর বাহানুষ্ঠানে কোন পার্থক্য নাই, কেবলমাত্র অন্তরনিষ্ঠায় ও উদ্দেশ্যে ভেদ। সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ভক্ত সকল কার্যই ভগবৎ-প্রীতি বা সেবার উদ্দেশ্যে করেন, আর বিষয়ী ব্যক্তি স্ব স্ব ঐহিক-পারলৌকিক

সুখ-সুবিধায় জগুই তত্ত্ব কার্য্য করিয়া থাকেন। এস্থলে সম্বন্ধ-জ্ঞানই ভগবৎসেবার অনুকূল এবং সম্বন্ধবিহীন অবস্থাই প্রতিকূল ভাবের সৃষ্টি করে।

অতএব সর্বোপায়ে আমাদের সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সম্বন্ধের পর অভিধেয় অর্থাৎ কর্তব্য নির্ণয় ও তদনুষ্ঠান। ‘সম্বন্ধ’ ও ‘অভিধেয়’ পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্কযুক্ত; একটা ব্যতীত অপরটি সম্ভব হয় না। সম্বন্ধ ব্যতীত অভিধেয় নির্ণয় হয় না, আবার অভিধেয় যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দূচীকৃত হয় না। অভিধেয়ের পরই ‘প্রয়োজন’ সিদ্ধ হয়।

সাম্ব্য পত্নী কখনও অপরের প্রশংসা-প্রাপ্তির জগু পতিসেবা করেন না বা তাঁহার সেবার বিনিময়ে অলঙ্কার, বেশভূষা কিছুই কামনা করেন না। তিনি পতির সুখের জগুই পতিসেবা করেন; পতির প্রীতিই তাহার প্রয়োজন; পতির সুখই তাহার সুখ। সেইরূপ সর্বতোভাবে নিজস্বার্থ বর্জন করিয়া ভগবৎপ্রীতির অনুষ্ঠানই ভক্ত-জীবনের মূলমন্ত্র। ইহাই সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের মূল-প্রয়োজন।

সাদু-শাস্ত্র বলেন,—“আদৌ গুরুপদাশ্রয়ঃ।” ভক্তি-লাভেচ্ছুর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য—সদগুরু পদাশ্রয়; তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি অত্যান্তিক মঙ্গল জানিবার জগু শব্দব্রক্ষে সুনিপুণ, পরব্রক্ষে নিষ্কাত পারমাধিক সদগুরুর পদাশ্রয় করিবেন। পারমাধিক গুরু-বরণকালে ব্যবহারিক বিচার আনিলে বাস্তব সত্য লাভ করা যায় না। ভক্তিসন্দর্ভ বলেন,—ব্যবহারিক, লৌকিক ও কৌলিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমাধিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। হরিভক্তিবিলাস বলেন,—কেহ যদি শাস্ত্রের আদেশ না জানিয়া কৌলিক বা লৌকিক প্রথানুসারে কোন অ-গুরুকেই ‘গুরু’ বলিয়া বরণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি ঐরূপ গুরুপদিষ্ট মন্তব্য দ্বারা নরকলাভ হয় জানিয়া পুনরায় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। ইহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা অত্যন্ত কম তাঁহারা অনেক সময়ে মনে করেন, অসদগুরু ত্যাগ করিয়া সদগুরু গ্রহণ করিলে গুরুত্যাগরূপ অপরাধে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু নিখিল সাস্ত্রত স্মৃতিশাস্ত্র বলেন, এরূপ অসদগুরু পরিত্যাগই বিধি। পূর্বাচার্য্যগণের আচরণও এই সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে। অনেকে আবার বলিয়া থাকেন,—‘তুচ্ছ যেক্ষেপেই হউক না কেন বা গুরু যাহাই থাকুন না কেন, দূষিত তুচ্ছবিক্রেতা বা গুরুরূপ হইতে তুচ্ছ বা লব্ধমন্ত্র ত আর কিছু খারাপ হয় নাই? আর শিষ্যের যদি ভক্তি থাকে, তাহা হইলে

শিষ্যের গুণে অসদগুরুও শিষ্যের নিকট ‘সৎ’ বলিয়া প্রতিপাত হইবে’। এই সকল কথার সমর্থনে বাজারে বহু মনঃকল্লিত সহজিয়া-গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ঋতি-স্মৃতিশাস্ত্র এইসকল স্বার্থপর মনোবৈজ্ঞানিক কথার সমর্থন করেন না। পরমার্থ-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যের আদর্শে পরিচালিত হইয়া ক্রমশঃ ভজনরাজ্যে অগ্রসর হন। যিনি শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করিয়া শিষ্যবৃন্দকে আচারে স্থাপন করেন, তিনিই প্রকৃত আচার্য্য; উৎপথগামী, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কখনও আচার্য্য-পদবাচ্য নহেন।

শিষ্যের পরম ভক্তিবলে গুরুর দোষও গুণে পরিণত হয়—একরূপ কথা নিতান্ত অপসিদ্ধান্তপর। ষাঁহার দোষ আছে, তিনি লঘু; তিনি গুরু-পদ-বাচ্যই নহেন। সদগুরুর কোনই দোষ থাকিতে পারে না। যিনি শাসিত হন, তিনি—‘শিষ্য’ এবং যিনি শাসন করেন, তিনি—‘গুরু’। অতএব প্রাকৃত জাতি-কুল-পাণ্ডিত্য বা লৌকিক আচার অপেক্ষা না করিয়া পরমার্থ-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক সদগুরু-পাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয় করা কর্তব্য।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ‘অবৈষ্ণব কখনও গুরু হইতে পারেন না’ হরিভক্তিবিলাস এইরূপ বলিয়া সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছেন। একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই ইহার যাথার্থ্য বোধগম্য হইবে। একমাত্র শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহই ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। কর্মি জ্ঞানি-যোগি-সম্প্রদায়ে কখনও ভক্তির নিত্যতা স্বীকৃত হয় নাই; তাহারা ভক্তিকে অভীষ্টলাভের ‘উপায়’ বলিলেও কেহই ‘উপেয়’ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহারা মুক্তিলাভের পূর্বপর্য্যন্তই ভক্তির আবশ্যকতা বলেন। ‘ভক্তি’ স্বীকার করিতে হইলে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের পৃথক্ অবস্থান ও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ‘মুক্তির পরই প্রকৃত ভক্তি আরম্ভ হয়’—ইহাই ভক্তিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। শ্রীভাগবত বলেন—আত্মরাম মুনিগণও শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তিবিশদান করেন। মুক্ত পুরুষ নিত্য স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহপূর্বক ভগবানের ভজনা করেন। তাহারা মুক্তির পরও ভগবান, তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের নিত্যত্ব, ভগবদ্ধাম নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির নিত্যত্ব স্বীকার করেন। নিত্য পদার্থকে আশ্রয় করিলে নিত্যবস্তুই লাভ হয়, অনিত্য

বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কেহ নিত্যবস্তু লাভ করিতে পারে না। তাই বৈষ্ণবগণ নিত্য-সত্য-আশ্রয়ী।

শ্রীগুরুদেব নিত্য পদার্থ, তিনি নিত্যকাল ভগবানের প্রেষ্ঠ-নিগ্রহরূপে অবস্থান করেন, শিষ্য নিত্যকাল তাঁহার আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। অতএব এইরূপ নিত্যপদার্থ বা বৈষ্ণব-গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করাই সকলের একান্ত কর্তব্য। আবার ‘বৈষ্ণব’ বলিতে কেহ যেন বৈষ্ণবের বাহুবেশকেই ‘বৈষ্ণব’ মনে না করেন। অমানী মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত বাস্তব হরিকীর্তন-কারীই নিকপট গুরুভক্ত এবং তিনিই যথার্থ ‘বৈষ্ণব’।

ভক্তিসাধক আমরা সর্বপ্রথমে সৎগুরু-পদাশ্রয়ের জন্ত ভগবৎসমীপে ব্যাকুলভাবে কাতর প্রার্থনা জানাইব। ভগবান্ আমার প্রবল আশ্রিত দেখিয়া আমাকে গুরুপথে চালিত করিবার জন্ত মহাস্ত-গুরু প্রেরণ করিবেন। নতুবা আমরা নিজেদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা কখনও অপ্রাকৃত সৎগুরুর দর্শন লাভ করিতে পারিব না। যে গুরু আমার মন যোগাইয়া চলিতে পারেন, প্রচলিত জনমত যাহাকে ‘ধর্ম্ম-কর্ম্ম’ বলে—সেইরূপ ব্যাপারে যিনি ইচ্ছন প্রদান করেন, তাহাকে ‘গুরু’ বলিয়া মনে করিলে জীবন বৃথাই বিপথে পরিচালিত হইবে। ভগবৎসেবার পরিবর্তে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণ খুঁজিতে গিয়া কোন বৈষ্ণব-বিদ্বেষ্টী প্রাকৃত-সহজিয়ার কৃত্রিম হাব-ভাব, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লোক-বঞ্চনাকর বাহ্যবিষয় দেখিয়াই তাহাকে মহাভাগবত পরম-বৈষ্ণব মনে করিয়া ঐরূপ প্রচ্ছন্ন অবৈষ্ণবকে গুরুপদে বরণ করিয়া গুরু-ভক্তিপথ হইতে চিরতরে বিচ্যুত হইব। যিনি নিকপটে হরি গুরু-বৈষ্ণব-সেবা চাহেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট মহাস্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণকনিষ্ঠাই মহাস্তগুরুর স্বরূপ-লক্ষণ। এইরূপ সৎগুরু-পদাশ্রয়েই ভক্তি-সাধকের অতীষ্টসিদ্ধি হয়।

—ত্রিদিগ্ভিষ্মু শ্রীভক্তিবাদান্ত বামন

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত
নিশুদ্ধ সান্ন্যাস

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি ষা বতীয় দিন ‘শ্রীহরিভক্তি-বিলাস’-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রণীত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।

মূল্য—১.০০ টাকা, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়ে প্রাপ্য।

ভারত-তীর্থ দর্শন

(পূর্বপ্রকাশিত ১৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৭২ পৃষ্ঠার পর)

শিবকাঞ্চী দর্শন

অগ্ৰ ইং ২৫।১০।৬১ তাং অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম। ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিবকাঞ্চী দর্শনের জন্ত বাহির হইলাম। শাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী প্রথমে শিবকাঞ্চী ও পরে বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শন করিতে হয়। শিবকাঞ্চী ষ্টেশন হইতে মাইল খানেক দূরে। আমরা সংকীৰ্ত্তনমুখে পরিক্রমা করিতে করিতে শিব মন্দিরে পৌঁছিলাম। প্রকাণ্ড গোপুরম্ পার হইয়া বিশাল মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। গোপুরম্গুলি মাদ্রাজ প্রদেশের একটা বিশেষত্ব। এইগুলি মন্দিরের বহিঃস্থিত তোরণদ্বার। মন্দির অপেক্ষা গোপুরম্গুলি সাধারণতঃ উচ্চতর। ব্রহ্মচারীদের স্তললিত কীৰ্ত্তন শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় শিবভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে প্রণতি জানাইলেন। তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গে থাকিয়া আমাদের মন্দির দর্শনের সহায়তা করিলেন। শিবালঙ্গ দর্শন করিয়া আমরা মন্দির-সংলগ্ন অস্ত্রাচ্ছ দেবদেবী দর্শন করিলাম। মন্দিরগাত্রে বহু পৌরাণিক দৃশ্য ও দেবমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। শিবমন্দিরের পিছনে একটি পুরাতন আম্রবৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল। এক শিবভক্তের মুখে শুনিলাম যে, এই বৃক্ষ প্রায় ৫০০ শত বৎসরেরও পুরাতন। দেশবিদেশ হইতে যাত্রীগণ মন্দির দর্শনে আসিলেই এই প্রাচীন আম্রবৃক্ষ স্পর্শ করিয়া নিজেদের কামনা-বাসনা জানাইয়া যায়। আমাকেও বৃক্ষে ইটের টুকরা বাঁধিয়া মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করা হইল। আমি বলিলাম, “বিষ্ণুভক্তদের ভগবৎসেবা বা ভক্তি ব্যতীত অগ্ৰ কোন ইতর কামনা-বাসনা নাই। তুচ্ছ কামনা-বাসনাদ্বারা সাধন ও সাধ্য বিঘ্নিত হয়”। তিনি আমার কথাতে নিবৃত্ত হইয়া আর উচ্চ-বাচ্য করিলেন না। শিবমন্দির হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে কামাখ্যাদেবীর মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। মন্দিরের চারিদিক স্তূউচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। জানিতে পারিলাম, অগ্ৰ মন্দিরের দ্বার খুলিবে না।

অতঃপর আমরা শ্রীবামনদেবের মন্দিরে গেলাম। এখানে বামনদেবের বিস্তৃত শ্রীচরণ ছ'খানি দেখা যায়; অপর শ্রীচরণ বহু উর্দ্ধে দৃষ্টির অন্তরালে। শিবকাঞ্চি হইতে আমরা ক্রমশঃ বিষ্ণুকাঞ্চির দিকে অগ্রসর হইলাম।

শিবকাঞ্চী হইতে বিষ্ণুকাঞ্চীর দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। আমাদের পথ-প্রদর্শক এতদঞ্চলের অধিবাসী জনৈক ভক্ত শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরে লইয়া গেলেন। আমরাও তাঁহার অনুরোধে মন্দিরে গেলাম। তিনি আমাদের প্রত্যেককে মন্দির-প্রাঙ্গণে আসন দান করিয়া দুগ্ধ বিতরণ করিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে ও আপ্যায়নে আমরা প্রীতলাভ করিলাম। বিষ্ণুকাঞ্চীর অধিবাসিগণ আমাদের বিরাট শোভাযাত্রা দর্শন করিয়া আচার্য্যদেবকে মালা ও হর্ষধ্বনির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। বিষ্ণুকাঞ্চীতে আসিয়া আমাদের বহু বিষ্ণুভক্তের দর্শন লাভ হইল। বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শন করিয়া যাত্রিগণ ১০ ঘটিকার মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন।

স্থানীয় পথ-প্রদর্শক ভদ্রলোকটি সমিতির সুব্যবস্থা ও পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিভাবে এই বিরাট পরিক্রমের ব্যবস্থা করা হয় তাহার নিয়ম পদ্ধতি ও কাগজপত্র দেখিয়া তিনি অতীব আনন্দলাভ করিলেন। তিনিও ভবিষ্যতে এইরূপ তীর্থযাত্রার আয়োজন করিবেন বলিয়া আচার্য্যদেবের সকাশে আশা প্রকাশ করিয়া তাঁহার কৃপা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিলেন। আমরা তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গী দুইজন ভদ্রলোককে প্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করিলাম। বাংলাদেশের মিষ্টাদি খাণ্ডে অনভ্যস্ত হইলেও তাঁহারা আনন্দ-সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন।

কাঞ্চীভরম্ হইতে তিরুপতি

বালাজী দর্শনে আমরা তিরুপতি যাত্রা করিলাম। আমাদের প্রসাদ গ্রহণের পরই অতি অল্পসময়ের মধ্যে আমরা কাঞ্চীভরম্ হইতে আরকোন্ম রেল জংসনে পৌঁছিলাম। এখন বেলা একটা বাজিয়াছে। এইস্থানে আমাদের বর্তমান রিজার্ভ গাড়ী (নং ৩৭১৯) ত্যাগ করিলাম এবং মাদ্রাজ হইতে ছাড়িয়া দেওয়া ইষ্টার্ন রেলওয়ের পূর্ববর্তী রিজার্ভ টুরিষ্ট কারে (নং ৭৭০৭) নিজ নিজ বিছানা পত্র লইয়া উঠিলাম। কর্তৃপক্ষ নিয়ম করিয়া দিলেন যে, হাওড়া হইতে যাত্রিগণ গাড়ীতে যাহারা যে স্থান দখল করিয়া ছিলেন তাহারা সেই সেই স্থানেই নিজের জায়গা করিয়া লইবেন। ইহাতে সুবিধা এই যে, সাধারণ গাড়ীর মত ভীড় ঠেলিয়া জায়গা দখল করিবার প্রবৃত্তি থাকে না এবং অনর্থক হৈ-হুল্লোড় হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া চলা যায়। এই নিয়ম মন্দের ভাল।

আরকোন্‌-এ আমরা রাত্রির আহাৰ সমাপন করিলাম। সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ সময় আমাদের গাড়ী ছাড়িয়া রাত্র সাড়ে দশ ঘটিকার সময় রেনি-গুণ্টাতে আসিয়া পৌঁছিল। রাত্র তিন ঘটিকার সময় পুনরায় রওয়ানা হইতে হইবে। কয়েকঘণ্টা নিদ্রাষাপনের পর আমরা রাত্র সাড়ে তিন ঘটিকার সময় ট্রেন ও বাসযোগে রওয়ানা হইয়া একঘণ্টার মধ্যে তিরুপতি আসিলাম। প্রাতে ৭টা পর্য্যন্ত মন্দির খোলা থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে দর্শনাদি সারিয়া আসিতে হইবে। সেইজন্ত এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমরা তিরুপতিতে পৌঁছিলাম। এখানে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম।

বহুদূরদেশ হইতে আগত তীর্থ-যাত্রীদের বালাজী দর্শনের জন্ত বাস-কর্তৃপক্ষ যাতায়াতের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানে ক্রমিক সংখ্যানুসারে কাঠ দিয়া ঘেরাও করা রিজার্ভ কম্পাটমেন্টে বসিয়া থাকিতে হয়। বাসের কন্ট্রাক্টর যথাসময়ে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী টিকিট কাটিয়া একে একে যাত্রী সকলকে বাসে তোলে। এখানে একটি বিরাট ধর্মশালা আছে, দেশবিদেশ হইতে আগত যাত্রীরা এই ধর্মশালায় বিশ্রাম করেন এবং সুবিধামত নিজ নিজ রন্ধনাদি কার্য সমাপন করিয়া বালাজী দর্শনে বহির্গত হন।

বালাজী দর্শন

সকাল ৬ ঘটিকার সময় (তাং ২৬/১০/৬১) আমরা বাসে উঠিয়া শ্রীবালাজীর দর্শনের জন্ত যাত্রা করিলাম। প্রথম দুই মাইল সমতল রাস্তা চলিবার পর পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। চড়াইর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে উৎরাইও আছে অর্থাৎ একবার পাহাড় আরোহণ এবং পুনরায় অবতরণ। এইরূপে সুদীর্ঘ এগার মাইল পথ উঠা-নামা করিয়া আমরা প্রায় একঘণ্টা পরে বহু আকাজক্ষিত তিরুমলাই হিল্‌স (ত্রিমল্ল পর্বতে) উপস্থিত হইলাম। আমাদের পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় এই বিগ্রহ দর্শন হইল না। বেলা বারটার পর পুনরায় দর্শন লাভ হইবে। ইত্যবসরে আমরা মন্দির-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আমাদের যাত্রী সংখ্যানুযায়ী বিশ্রামের জন্ত কয়েক খানা বড় বড় কোঠা পাইলাম। এখানে ব্রহ্মচারিগণ তাঁহাদের স্তুললিত কণ্ঠে শ্রীহরি-নাম কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে আনন্দ দান করিলেন।

সুউচ্চ পাহাড়ের উপর এই মন্দিরটি অবস্থিত। আমরা বাসে করিয়া

পাহাড়ে উঠিবার সময় ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। তবে শ্রীভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া ভয়ের ভাব বিদূরিত হয়। প্রকৃতিদেবী কি-ভাবে তাঁহার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন না করিতে পারিলে অনুভবের বিষয় হয় না। মেঘের স্তর পার হইয়া চড়াই-উৎরাই করিয়া পাহাড়ে উঠিতে যে কি আনন্দ তাহা আমার মত ক্ষুদ্র জীবের বর্ণনা করার সাধ্য নাই। তিরুমালাই পৌঁছিতে দুইটি গোপুরম্ পার হইতে হইয়াছে। প্রথম গোপুরমে শ্রীনারসিংহ স্বামী ও দ্বিতীয়টিতে শ্রীরামানুজা-চার্য্যের মন্দির। এই পাহাড়ের উপরিভাগে বহু ছোটবড় ধর্ম্মশালা আছে। বহুদূরদেশ হইতে আগত যাত্রীদের কেনই অসুবিধা হয় না। এই তীর্থক্ষেত্রটি প্রায় ২৮০০ ফিট উচ্চ। ইহার দর্শন অতীব সুন্দর এবং স্থানটি স্বাস্থ্যপ্রদ। প্রতিদিন ৩৪ হাজার যাত্রী পায়ে হাটিয়া অথবা বাসে করিয়া এখানে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে আসেন। এই তীর্থক্ষেত্রে হাট বাজার, স্কুল-কলেজ, হাস-পাতাল সবই আছে। স্থানটি পাহাড়ের উপর হইলেও শহরের তুল্য। সব জিনিষই পাওয়া যায়। বিজলী বাতি জলের কল কোনটীরই অভাব নাই। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসও আছে। বালাজীর সেবাপূজা বিশেষ জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হয়। বহু সম্পত্তিও মন্দিরের নামে আছে। যাত্রীরা নারায়ণকে যাহা উপহার দিবেন, তাহা বস্তাবৃত খোলামুখ ‘হুণ্ডি’ নামে একটি আধার আছে, তাহাতে নিক্ষেপ করিতে পারেন।

অন্য শ্রীমন্দিরে একটি উৎসব আছে। তিরুপতি বালাজী একসহস্র কলসীপূর্ণ গঙ্গার জলদ্বারা স্নান করলেন। আমি সঙ্গীক বালাজীর স্নান দর্শন করিয়া মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিলাম। দক্ষিণ দেশে তিরুপতি বালাজী শ্রীভৈষ্ণবের নামে পরিচিত। মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ দর্শনের সুব্যবস্থাও আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছে।

বেলা ১২-৩০ মিঃ সময় আমরা শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া একের পর এক বহু আকাজক্ষিত শ্রীভৈষ্ণবের নারায়ণ মূর্তি দর্শন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। এই চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি বৃহৎকায় ও সুন্দর দর্শন। এইস্থানে অল্প কোন দেবতার মূর্তি নাই।

এখানেও পুরীর আনন্দবাজারের তায় প্রসাদ বিক্রয়ের হাট বসিয়াছে। আমরা কিছু প্রসাদ সংগ্রহ করিলাম। শ্রীল আচার্য্যদেব এখানকার প্রসাদ

আমাদের মধ্যে বিতরণ করিলেন। নানাবিধ প্রসাদই এখানে পাওয়া যায় ; এখানে প্রসাদে কোন উচ্ছিষ্ট-দোষ নাই।

বৈকাল ৪-৩০ মি সময় পুনরায় বাসযোগে সুউচ্চ পাহাড়ের ভয়ঙ্কর আঁকাবাঁকা পথ পার হইয়া সমতলভূমি তিরুপতিতে ফিরিয়া আসিলাম। সময়ভাবে আমরা তিরুপতি শহরস্থিত শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির দর্শন করিতে পারিলাম না। এখান হইতে বাসযোগে অপরাহ্ন ৫-৫০ মিঃ সময় রেনিগুণ্টা রেলষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম এবং প্রসাদ গ্রহণান্তে বিশ্রাম করিলাম।

প্রায় বিশদিন আমরা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ও মন্দির দর্শন করিলাম। শ্রীমন্ মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারতে যে-সমস্ত মন্দির দর্শন করিয়াছেন, আমরাও সেইসমস্ত মন্দির দর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আগামীকল্য ভোর বেলা আমরা পশ্চিম-ভারতের তীর্থ-দর্শনে যাত্রা করিব। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তভূষণ

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রীধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য

অগ্ন্যায় বৎসরের আয় এবং সরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বিনোদ-বাণীর বিশেষ সেবকস্বত্রে ৯ই চৈত্র ১৩৭০, ইং ২৩শে মার্চ ১৯৬৪, সোমবার হইতে ১৫ই চৈত্র, ২৯শে মার্চ, রবিবার পর্যন্ত সপ্তাহকাল শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত ৯টী দ্বীপ পরিক্রমায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্থাপনপূর্বক গুরুত্যাগি-দলের স্বরূপটী লোক-সমাজে উদ্ঘাটিত করেন। ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ, কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীচীনন্দনের ভুবনমঙ্গলময়ী এই আবির্ভাব তীর্থ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী মহামহোৎসব অনুষ্ঠানের মূলপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট সমগ্র বিশ্বই চিরঞ্চী। নবধা-ভক্তির প্রত্যেকটি অঙ্গের পূর্ণযাজনদ্বারা কীর্তনাখ্যা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন ও সমগ্র বিশ্বকে হরিকথায় মুখরিত করানোর এই অভূতপূর্ব প্রয়াসই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মহোৎসব।

পরিক্রমাকালে সমিতির দায়িত্ব

এই উৎসব উপলক্ষে বাংলার সকল স্থান হইতে, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, আসাম প্রভৃতি ভারতের অগ্ন্যায় অঞ্চল হইতে পক্ষসহশ্রেরও অধিক যাত্রীর সমাগম হয়। উৎসবারন্তের ২১৩ দিবস পূর্ব হইতেই যাত্রীবৃন্দের সমাবেশ হইতে থাকে। সমিতির পক্ষ হইতে এই সকল যাত্রিগণের এক প্রাতঃকৃত্য

হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন প্রাতঃকৃত্যের পূর্বক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি ক্রিয়ার সূচুতা-সাধনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। প্রাকৃত শব্দের মল আছে; কারণ সে পূর্ণবস্তুর পূর্ণধরূপকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। তাই কিরূপ সূশৃঙ্খলতা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়া এই উৎসব উদ্‌যাপিত বা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা দেখিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়—ভাষা তাহার সূচু প্রকাশে পরাজয় স্বীকার করে।

শ্রীগৌরহরির অশেষ করুণা

এবংসর চৈত্রের দ্বিতীয় সপ্তাহে পরিক্রমা আরম্ভ হওয়ায় যাত্রীদের কিছু কষ্ট ও দুর্ভোগ হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করা হয়। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় পরিক্রমার ২৩ দিন পূর্বে প্রচুর বারিবর্ষণে ধরিত্রী-দেবী শীতলতা প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার রুদ্ধ-রূপ প্রকটিত হইতে পারে নাই। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একটা যাত্রীও কোনরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই, যদিও ঔষধাদিসহ সূচিকিৎসকগণ পরিক্রমাকালে চিকিৎসার জন্ত সর্বদাই মোতায়ন ছিলেন। উৎসবের মধ্যেও একদিন সন্ধ্যায় (১২ই চৈত্র) কিছু বৃষ্টি হইলে গ্রীষ্মের প্রখরতা আরও কমিয়া যায়। এসকল কারণে উৎসবকাল মধ্যে যাত্রীগণ কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করেন নাই।

ধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ

৮ই চৈত্র, রবিবার সন্ধ্যায় অধিবাস-বাসরে শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব এই দিন বক্তৃতার মাধ্যমে বলেন যে, ভগবৎ-প্রীতি কামনা—কামনা নহে, যেহেতু ঈশ্বরর সূখ-চেষ্টাই নিখিল জীবের একমাত্র কাম্য এবং ইহাধারাই জীব কৃতকৃত্য হয়। কিন্তু মানবের প্রাণি-গণের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। এজন্ত ভগবৎপ্রীতিমূলক যে-কোনও প্রকার সঙ্কল্পগ্রহণই—মনুষ্য-পরিচায়ক; ভগবৎসেবাবিহীন হইয়া অশ্রাভিলাষীর সঙ্কল্পগ্রহণই—আত্ম-মনোবৃত্তির পরিচায়ক। শ্রীধাম-মায়াপুর পরিক্রমার পূর্বদিবসেও শ্রীল আচার্য্যদেব নবদ্বীপ মঠে বিষ্ণুজ্ঞানমণ্ডলীর নিকট “মায়াপুর কোন্টা”-শীর্ষক এক গবেষণামূলক বক্তৃতা দান করেন (উহা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)।

পরিক্রমা-বিধি ও বৈশিষ্ট্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ “পরিক্রমা-বিধি”তে প্রথমেই গৌরাশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া ঐ

স্থানেই সমাপ্ত করিবার বিধি দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি পরিক্রমার ১ম দিনে সৰ্ব্বাদৌ শ্রীমায়াপুর-উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া কীর্তনাখ্যা ভক্তিবাজনক্ষেত্র শ্রীগোক্রমদ্বীপ হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করেন এবং আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীমায়াপুরে পরিক্রমা সমাপ্ত করেন। ইহাতে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার আছে :—(১) শ্রীগোক্রমদ্বীপের স্থানন্দ-সুখদকুঞ্জে সাক্ষাৎ নদীয়াপ্রকাশ-স্বরূপ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শেষ জীবন ইষ্ট-ভজনে অতিবাহিত করেন এবং তিনিই এই পরিক্রমার আদি উদ্যোক্তা। অতএব সৰ্ব্বাগ্রে তাঁহার কৃপাভিক্ষাই প্রয়োজন। (২) তৎপার্শ্ববর্তী স্থানেই শ্রীনৃসিংহ-দেবপল্লী। শ্রীনৃসিংহদেবই ভজনরাজ্যের সকলপ্রকার বিঘ্ন হইতে ভক্ত-বৈষ্ণবগণকে রক্ষা করেন; অতএব পরিক্রমাকালে হরিভক্তি-বিরোধী সকল বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিতে হইলে তাঁহার আশীর্বাদই ভক্তগণের একমাত্র জীবাত্ম। এজন্ত প্রতিবৎসর শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র পারমাথিক মাসিক বৈকুণ্ঠ বার্তাবহ “শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা”র নববর্ষের ১ম সংখ্যা, শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা ও অপরাপর নব-প্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থাদি অঞ্জলি প্রদান করা হয়। (৩) নবধা ভক্তির মধ্যে কীর্তনই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ। এজন্ত “যতপ্যত্না ভক্তিঃ কলৌ কৰ্ত্তব্য্যা তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব”—শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদের এই বিচার অবলম্বনপূর্বক কীর্তনাখ্যা ভক্তির পীঠস্থান হইতেই শ্রীল ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থনা করিয়া পরিক্রমার শুভারম্ভ হয়। (৪) শেষ রক্ষাই উত্তম। শ্রীগীতা-ভাগবতাদি নিখিল শাস্ত্র তারতম্যে নবধাভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদনই চরম বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন।—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্।

অৰ্চনং বলনং নাস্তং দধ্যমান্ননিবেদনম্ ॥ (ভাঃ ৭ ৫।২৩)

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তনে

প্রহ্লাদঃ শ্রবণে তদা জঘু ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।

অক্রুরস্বদভি বন্দনে কপিপতিদ্যাস্যেহথ সখেহজ্জুনঃ

সৰ্ব্বধাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।৭।১২২)

দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যা ।

মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে । (গীঃ ৭।১৪)

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং স্বাং সর্বপাপেভ্যো মৈক্ষ্যিষ্যামি মা শুচঃ ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

[শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ গুণ-লীলাদি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন দাস্ত্র, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধ ভক্তির অঙ্গ ॥ পরীক্ষিত রাজা শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে, শুকদেব কীর্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষ্মী পাদসেবনে, পৃথুরাজ পূজনে, অক্রুর অভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান্ দাস্ত্রে, অর্জুন সখ্যে এবং বলিরাজ তচ্চরণে সর্বস্বদান ও আত্মনিবেদনদ্বারা ভগবানকে শ্রেষ্ঠরূপে পাইয়াছেন ॥ আমার গুণময়ী অলৌকিকী মায়া দুর্বল জীবের পক্ষে দুর্ভতিক্রমণীয়া । যাহারা কেবল আমার শরণাগত হয়, তাহারাই মায়া-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয় ॥ হে অর্জুন ! তুমি লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর । ঐসকল ধর্ম্মত্যাগের জন্ত অনুশোচনা করিও না, আমি সকল পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব ॥]

অতএব অন্তে আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র গৌরজন্মভূমি দর্শনান্তে ধামধূলি-বিলুপ্তিত হইয়া প্রত্যাবর্তনই উত্তম বিচার । আজকাল অদৃষ্ট অনেক মিশনই তাহা করেন না—ইহাই দুঃখের বিষয় ।

ধামমহাদ্ব্য-বর্ণন

৯টী দ্বীপই ৬৪ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবধাভক্তির নয়টী অঙ্গ ।

৯ই চৈত্র **শ্রীগোক্রমদ্বীপ** (কীর্তনাখ্য)—ইন্দ্রের অপরাধক্ষালনের জন্ত সুরভিগাভী ইন্দ্রসহ স্বর্গ হইতে এখানে আসিয়া একটী অশ্বখক্রমের তলে বিশ্রাম করেন । তজ্জন্ত নাম- গোক্রমদ্বীপ । দেবপল্লীতে শ্রীনৃসিংহদেব ভক্তগণকে নিত্যকাল অভয় প্রদান করিতেছেন ।

শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য)—সপ্তর্ষিগণ এখানে মধ্যাহ্নকালে পঞ্চতন্ত্রস্বরূপ গৌরহরির দর্শন পান । এজন্ত নাম মধ্যদ্বীপ । সত্যযুগে নিবদাস নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আকুলার্তিতে শ্রীগোরাঙ্গের রূপায় এখানেই পুন্ডরীক প্রকটিত হন । (ক্রমশঃ)

—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, B. E (cal)

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়ত:



১৬শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ { ৪র্থ সংখ্যা



শ্রীপিছলদা গোড়ায় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদিগুিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গোড়ায় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়ান্না স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম । অত ধর্ম স্মৃৎরূপে পালে যেই জন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥ হরি-কথার রক্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রব ॥

১৬শ বর্ষ } বাসুদেব, ১৯ ত্রিবিক্রম, ৪৭৮ গৌরান্দ { ৪র্থ সংখ্যা
রবিবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১; ইং ১৪/৬/১৯৬৪

সান্নিধানং

শ্রীপৃথ্বীদেবী-কৃতং “শ্রীশ্রীবরাহদেব-স্তোত্রম্”

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে
অষ্টাদশোহধ্যায়ে—৩৫-৩৯)

ওঁ নমো ভগবতে মন্ত্রতত্ত্বলিঙ্গায় যজ্ঞ-ক্রুতবে মহাম্বরবয়বায় মহা-
পুরুষায় নমঃ কৰ্ম্মশুক্লায় ত্রিযুগায় নমস্তে ইতি ॥ ১ ॥

(উত্তর-কুরুবর্ষে পৃথ্বীদেবী অবিচলিত-ভক্তিযোগে এই স্তোত্র
আবৃন্তিপূর্বক ভগবান্ যজ্ঞ-বরাহদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন,—)

আমরা ভগবান্ মহাপুরুষকে নমস্কার করি । মন্ত্রদ্বারাই আপনার
যাথাক্রম অবগত হওয়া যায় ; আপনি—যজ্ঞ, আপনি—ক্রুত, অতএব
মহামহাযজ্ঞ-সকল আপনারই অবয়বস্বরূপ ; আপনি—যজ্ঞাধিষ্ঠাতা
শুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপ ; কলিযুগে আপনি ছন্নাবতারী বলিয়া ‘ত্রিযুগ’-নামে
অভিহিত ; অথবা আপনি ত্রি-যুগল ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী
বলিয়া আপনার নাম—‘ত্রিযুগ’ । আপনাকে নমস্কার ॥ ১ ॥

যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো

গুণেষু দারুণিব জাতবেদসম্ ।

মথ্যাস্তি মথৌ। মনসা দিদৃক্ষবো

গূঢ়ং ক্রিয়াতৈর্নাম ঈরিতাত্মনে ॥ ২ ॥

যে রূপ কাষ্ঠাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট অগ্নি অপ্রকাশিত থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞগণের মন্বনপ্রভাবে সেই অপ্রকাশিত অগ্নি প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ তত্ত্ববিৎ ও নিপুণ ব্যক্তিগণ আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আপনাকে অন্বেষণ করেন, কিন্তু বিবেক-সাধন, মন, কর্ম ও কর্মফলদ্বারা আপনার স্বরূপ অপ্রকাশিতই থাকে। আপনি—স্বপ্রকাশ-বস্তু; আপনার স্বরূপ-দর্শনাভিলাষী ব্যক্তিগণের সাধন-প্রযত্ন অর্থাৎ অন্বেষণ প্রবৃত্তি-দর্শনে আপনি আপনার পরমাত্ম-স্বরূপকে স্বয়ং প্রকাশিত করিয়া থাকেন; আপনাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

দ্রব্য-ক্রিয়া-হেতুয়নেশ-কর্তৃভি-

র্মায়াগুণৈর্ববস্তু-নিরীক্ষিতাত্মনে ।

অদ্বীক্ষয়াঙ্গাতিশয়ত্ববুদ্ধিভি-

নিরস্তমায়াকৃতয়ে নমো নমঃ ॥ ৩ ॥

শব্দাদি বিষয়, ইন্দ্রিয়-ব্যাপার, বাগাদি ইন্দ্রিয়-দেবতা, দেহ, কাল ও অহঙ্কার—এই সমস্ত মায়ার কার্য্য। এই মায়িক-কার্য্য দর্শনে কার্য্যের করণরূপে যে বস্তু লক্ষিত হইতেছেন, আপনিই সেই পরমাত্মা। আপনার সেই স্বরূপ—মায়া-সম্বন্ধশূন্য। তত্ত্ববিচার ও যম-নিয়মাদি দ্বারা যাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা ই আপনার সেই রূপ প্রত্যক্ষ করেন; আপনাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

করোতি বিশ্বস্থিতি-সংযমোদয়ং

যশ্চোপ্সিতং নেপ্সিতমীক্ষিতুগুণৈঃ ।

মায়া যথায়ো ভ্রমতে তদাশ্রয়ং

গ্রাবৌ নমস্তে গুণ-কর্ম্ম-সাক্ষিণে ॥ ৪ ॥

(হে ভগবন্,) জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস আপনার বাঞ্ছিত নহে ; কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও জীবের নিমিত্ত আপনি সে-সকল কার্য্য করিয়া থাকেন । প্রকৃতি জড়রূপা হইলেও আপনারই ঈক্ষণচালিতা হইয়া স্বীয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য করিয়া থাকে । জড়রূপা প্রকৃতি দ্বারা কিরূপে সৃষ্টি হইতে পারে ? তত্ত্বতরে বলিতেছেন ;—লৌহ যেরূপ অয়স্কান্তদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উহারই অভিমুখে অগ্রসর হয়, মায়াও সেইরূপ আপনার ঈক্ষণ-প্রভাবে সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য করিয়া থাকে ; অতএব গুণকর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ আপনাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

প্রমথ্য দৈত্যং প্রতিবারণং যুধে

যো মাং রসায় জগদাদিশূকরঃ ।

কৃত্বা গ্রন্থে নিরগাত্তদন্ততঃ

কৌড়ম্ভিবেভঃ প্রণতাস্মি তং বিভূম্ ॥ ৫ ॥

হস্তি যেরূপ দংষ্ট্রাগ্রে পদ্যনাশ লইয়া কৌড়া করিতে করিতে জলাশয় হইতে বহির্গত হয়, আপনিও সেইরূপ আদিবরাহরূপে প্রতিদ্বন্দ্বি-গজতুল্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া দংষ্ট্রাগ্রে রসাতলগত পৃথিবীকে ধারণপূর্ব্বক প্রলয়পয়োধি হইতে নির্গত হইয়াছিলেন ; হে বিভো ! আপনাকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-বোকার স্বরূপ*

—বলিতে গেলেই লোকে আমাকে চিনিয়া ফেলে । আমার জিভের জড়তা এখনও যায় নাই । তথাপি আমাকে বাচাল বলিয়া জানাইতেই হইবে । আমি শুভঙ্করীর ধারাপাত কড়া'কে শোট'কে ভাল করিয়া শিখি নাই ; কিন্তু খপরের কাগজের সম্পাদন-কার্য্যে ওস্তাদ বলিয়া লোককে ধাঁধা দিয়াছি । সেজন্ত আমি একখান 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ মুরুক্সিয়ানার জন্ত পাইয়াছি । আমি শূন্যগুণবিহীন বালকের মত, কিন্তু

* 'হিতবাদী'-পত্রিকায় প্রকাশিত 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থের সমালোচনার দ্বিতীয় প্রতিবাদ — প্রকাশক

আমার বয়স বেশ হইয়াছে। এরই মধ্যে দাঁত উঠিয়াছিল। সেই দাঁত দিয়া বাহাদুরী করিয়া লোহা চিবাইতে গিয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। এখন আর চিবনোর ক্ষমতা নাই।

পুরুষানুক্রমে আমি কাগজের সম্পাদক, কিন্তু পরের মুখে ঝাল খাই ও খাণ্ড চিবাইয়া লই। এই সুযোগ পাইয়া আমাকে ‘গ্রাক্যাবোকা’ সাজিতে হয়। ‘হয়কে নয় করা’ আর ‘নয়কে হয় করা’ স্বার্থপর দল আমাকে ‘ফুটবল’ করিয়া ফেলিয়াছে। সেইজন্ত তা’দের শিং পরিয়া আমি ‘চু’ মারিতে যাই, পরিশেষে পরচুলো ও সাজানো শিং যে খসিয়া পড়বে, তার চিন্তা করি না। নেকীদের কথাগুলো ধার ক’রে নিয়ে আমার ওয়াকিফ্ হান্ দেখান’ একটা কাজ। কা’কে ‘সং’ বলে, কা’কে ‘অসং’ বলে—এ’কথা বুঝতে গিয়ে আমি ‘গ্রাক্যাবোকা’ সাজি। সয়তানেরা আমাকে শিখণ্ডী সাজিয়ে বোকা বানায়। আমিও তা’দের খেলার পুতুল হ’য়ে গ্যাংটিওয়ালা মতলুবে বর্গীর মত ঢেউ গুন্টে থাকি।

কখনও বা কেনেডি সাহেবের ‘চৈতন্য-মুভমেন্টের’ লেখার ‘পলিসি’ নিয়ে কতকগুলো অপদার্থ অদূরদর্শীর নিকট মিথ্যা সংবাদকে ‘সত্য’ বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার দোষ দেখাইবার জন্ত চৈতন্যমহাপ্রভুর নীতি-বিষয়ক উপলব্ধি যৌক্তিক অপেক্ষা কম ছিল বলি। সে সুযোগ লইয়া আরও বলি যে—তাহার দলের লোকেরা বেশার অর্থে আচার্য্য হইয়া জীবন ধারণ করে। একটা অনভিজ্ঞ সর্বজ্ঞাতাকে সাহিত্য-দর্শনাদিতে পণ্ডিত খেতাব দিয়া, তাহার মুখ হইতে তুর্নীতির বাক্যগুলি আদর্শচরিত্র-বৈষ্ণবের বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্মকে নিন্দা করি, কৃষ্ণকে নিন্দা করি, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠজনকে গর্হণ করি। আমার সাফাই—“আমি গ্রাক্যাবোকা”, আর বৈষ্ণবেরা আমাকে আদালতে লইয়া গিয়া কষ্ট দিতে ঘৃণা বোধ করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণা-ইচ্ছা গালি দিয়া সৌজতের সীমা অতিক্রম করি।

আমি ‘গ্রাক্যাবোকা’ সাজিয়া বর্ণধর্মের শাস্ত্রীয় বিচার নিজে বুঝিতে পারি না। ঢং দেখাই আর আমার গ্রাক্যামির সাহায্যে আমারই মত লোকদিগকে বোকা বানাই। আমি ‘নগ্নমাতৃক গ্রায়’ বুঝিতে না পারার ভাণ করিয়া মূর্খ-লোকচক্ষে বৈষ্ণবের প্রাগ্‌বর্ণ ও প্রাগাশ্রমের পূর্ব পরিচয় দিয়া তাঁহাকে লোকসমাজে আমারই মত দ্যুত-পান-স্ত্রী-স্বনারত ও গোলাকার চক্র বিনিময়ের প্রাপ্য বস্তু মনে করি। কখনও বা রামখাঁর

পদযুগল ধ্যান করিয়া নিতাই-সদৃশ বৈষ্ণবকে গোয়াল বাড়ীতে জায়গা দিই। কখনও বা বলি, কাজীর বেটা আবার হরিনাম ক'রে তিরপুণীর গোপাল বামুনের নাক-কাণ খসিয়েছিল, এ সব কথা মানি না। কখনও বলি, শচী পিসির ছেলে যা'দের উপাস্ত, তা'রা আবার বেদ-বেদান্তের কি ধার ধারে? কখনও শ্রাকামি করিয়া বলি, বৈষ্ণবেরা আমারই মতন ভোগী, ত্যাগী গোছের। সুতরাং তা'রা আমারই মত যমের বাড়ী যাবে না কেন? কখনও বলি, ভাগবতের অজামিলোপাখ্যান অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। আমরাও যমের বাড়ী যাবো, নারায়ণ-নামোচ্চারণকারীও যমের বাড়ী যাবে। কৃষ্ণকে নমস্কার করলে যমের বাড়ী যেতে হয় না, বৈষ্ণবের নিকট কথা শুনলে জীবন্মুক্তি ঘটে, ও সব কথা আমার মত শ্রাক-বোকারা বুঝতে চায় না।

আমার শ্রাকামি-বোকামি দেখিয়ে ছু'পয়সা চাই। আমার বড় জাত হুওয়া চাই। কিন্তু আমি ভিথিরীর বংশ—একথা মনে থাকে না। আমার পূর্বপুরুষেরা কাঁচকলানন্দ ছিলেন। সেজন্ত আমিও মাঝে মাঝে কাঁচকলানন্দ শব্দ হ'য়ে ডিঙ্গিয়ে চলি। আমাকে যখন ভার্গবীয় মনুসংহিতার “যোহনধীত্য বিজো বেদান্” দেখাইয়া আমার উদ্ধ চৌদ্দপুরুষের নাবি চৌদ্দ পুরুষকে যজ্ঞস্থল পরাইবার অধিকার নাই দেখি, ও আমার নেওয়া যজ্ঞস্থত্রটা কলিকালে ছিঁড়ে যায় এবং একায়ন শাখা বেদের তাৎপর্য গ্রহণে উহা পুনরায় ধারণ করিতে পারি না বুঝি, তখনই আমি শ্রাকামি জুড়ি ও লোক-গুলিকে বোকামির জোঙালে জুড়ে দিবার ব্যবস্থা করি। আমি বলি, আমি যখন রেলগাড়ীতে উঠতে পেরেছি ও আমার মত লোকেরা রেলগাড়ীর মধ্যে বসে আছে, তখন আর কাউকে গাড়ীতে উঠতে দেবো না। আবার মধ্যে মধ্যে বোকা সাজি। ‘কাঠের বেড়াল ইঁদুর ধরতে পারে না’ এ কথা শুনেও কাঠের বেড়াল সাজতে দৌড়াই। কখনও মনে করি, ইঁদুরের দলে জুটে জ্যান্ত বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিলে আমাদের ইঁদুরের ব্যবসাটা ভাল চলতে পারবে। আমার শ্রাকামী পদে পদে ধ'রে ফেলে, তাই আমি বোকা বনতে যাই।

বৈষ্ণবধর্ম অবৈদিক এবং বেদবিরুদ্ধ—এই কথা শঙ্করের ‘উৎপত্ত্য-সম্ভবাধিকরণে’ পড়তে গিয়ে শাণ্ডিল্য-ঋষিকে অপমান ক'রে বসি। আবার শ্রীঅপ্যদীক্ষিতের জুতোর ফিতে বাঁধতে গিয়ে, যামুনাচারীর আগম-প্রামাণ্যের দোষ দেখাইতে গিয়া বোকামি করি। কখনও শ্রাক-বোকা

সাজিয়া ‘সংক্রিয়াসারদীপিকা’র নিন্দা করিয়া বসি। ঐ পুঁথিখানাকে অন্য জাল পুঁথির সহিত সমান বলিয়া মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া কেলা জয় করিব মনে করি। কখনও বা বাট্‌পেড়ে সেজে আশ্রমকুলগুলিকে আস্‌সেওড়ার ফল ব’লে প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত হই। কখনও বা আশ্রমকুল খেলাইয়া বা দোলাইয়া সেওড়ার বাগানকে আমের বাগান বলিয়া বোকা বুঝাই। সেওড়া বাগানে আমের গাছ আছে বলিয়া লোককে ধোঁকা দি। কখনও বা শ্রৌত-পণ্ডিত বলিয়া লকব লইয়া ‘চাহারাম’ জমিকে ‘আউল’ জমি সাজাই।

কখনও বা ভাগবতের ‘যশ্ত যল্লক্ষণং’ শ্লোকটী বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণোত্তমতার অদ্বিতীয় নিদর্শন বলিয়া ধোঁকা দি। আবার যখন ভারতে দেখি, ভারতের নানা স্থানে বৃত্তবর্ণেরই বিচারের স্তূৰ্ণতা দেখান হইয়াছে, তখন চম্পট দেওয়া ছাড়া আর ত্বাকামির নাচ দেখাইতে পারি না। যখন হরিভক্তি-বিলাসের “অগুহাঃ শূদ্র-কল্লা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষাং আগমমার্গেণ শুদ্ধিন্ শ্রৌতবত্ননা ॥” পাঠ করি, তখনই আমার এক গালে চূণ, একগালে কালি দেওয়া মুখখানা দেখিবার জন্ত যে-সকল আয়না আমার সম্মুখে আছে, সেই গুলিকে লুকাইয়া ফেলিয়া মনে করি, আমার চূণ-কালি গাল হইতে পুঁছিয়া গেল; কপটযুক্তি ও গুমোর ফাঁক হইয়া গেল। আমি যে-সকল পুঁথিকে প্রমাণ বলিয়া ব্যবহারিক স্মার্তের পেছন পেছন চলি, তখনই বৈষ্ণবস্মৃতি আমাকে পিছু হটাইয়া দেয়। আমি ত্বাকাবোকা সাজিয়া শ্রীরামানুজের ‘বেদান্ততত্ত্ব-সারের’ বিচারের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক’রে ‘দে চম্পট’ পলিসি গ্রহণ করি।

বালিবাই সভায় যখন আমার ত্বাকামি-বোকামি ধরা পড়িয়াছিল, তখন আমি ভিন্‌গাঁয়ে থাকিয়া পালিয়ে আসি ও দপ্তরীর বাড়ী হইতে “ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্যের” ফর্ম্মাগুলি গোপনে সংগ্রহ করি। বাগবাজারের আখড়ায় সেইগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া ভীমরুলের চাকু ঘাটাইতে নাই,—পলিসি নেই। ভাগবতের নবমস্কন্ধ, হরিবংশ, মহাভারত, সংহিতা, উপনিষৎ, বৃশ্চিক-তাণ্ডুলিক গ্রায় প্রভৃতি বৃত্তবর্ণবিচারগুলি আলোচনা করিবার সময় আমার চক্ষু চড়ক্‌গাছ হয়। আমি যে ত্বাকাবোকা সাজেই নিজস্বরূপ দেখাই, তখনই সাতখুন মাপ। যেকাল পর্যন্ত আমরা নিজেরা বৈষ্ণবদিগের নিকট “প্রায়েণ বেদ তদিদং” বিচার শ্রবণ করি, সেই সময়ই আমাদের ‘খোলাকেটে-বামুন মরে’ প্রবাদটী হ’তেও আমাদের আচার্য্যকে

সেয়ানা বলতে ইচ্ছা হয় না। ক'খানা সংক্রিয়াসার-দীপিকা ও তত্ত্বসাগর বাতিল করে আঙ্গুল দিয়ে স্বর্ঘ্য ঢাকার মত শ্রাকামি ক'রতে পার, এখন সে ভাবনায় অস্থির হ'য়েছি।

উর্ধ্বশীতে বশিষ্ঠ, মৎস্যকথায় ব্যাস উৎপন্ন হ'য়েছেন ব'ল্লেও তাঁর বিভক্ত ঋক্, সাম, যজুঃ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ, মহাভারতগুলির শাণিত ছুরিকা বা উদ্ভগু কষায় আমার শ্রাকামি ছাড়িয়ে দেবে ভাবি, তখন বোকামিই আমার একমাত্র সম্বল হয়। যখন শৌক-সাবিত্র্য-দৈক্ষ্য বিচার ত্রিশির কণ্টকের হায়ে আমাকে যন্ত্রণা দিতে থাকে, তখন ভার্গবীয় মনুর শ্লোক— “মাতুরগ্রেহধিজননং” পুছে ফেলতে ইচ্ছা করে। আর বাক্ দণ্ডের শ্লোকটা ভুলে গিয়ে ত্রিদণ্ড বিধির উপর ঝাল ঝাড়তে ইচ্ছে হয়। শ্রাকাবোকার নাচুর্নীতে অধিকারী বাচস্পতি মহাশয়ের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে বৈদিকত্ব নষ্ট হ'বে না। আর তা'তেই “শ্রাপাকমিব নৈক্ষ্যেত লোকে বিশ্রমবৈষ্ণবম্” শ্লোকের স্মৃতিবিধান বৈষ্ণব-বিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্তের পুঁথি হইতে উঠিয়া যাইবে না।

শ্রাকাবোকা আমি মায়াদেবীর হায়ে বহুধর্মপিনী হইয়া অনেক ঘটেই শ্রাকামি-বোকামি ক'রে অচিৎ হইতেই চিৎ প্রসব করিয়াছে—এইরূপ বেদ-বিদ্বেষী, বিষ্ণুবিদ্বেষী, বেদান্তবিদ্বেষী মত প্রচার করি। শ্রীআনন্দতীর্থের শাক্তের মতবাদ-খণ্ডন ছু'টা চক্ষু খুলিয়া দেখিব না। শ্রীজীব গোস্বামীর সন্দর্ভ পড়িব না, শ্রাকামি করিব কেবল অধিকারীর পুস্তক লইয়া। বোকামি করিব, যেহেতু ‘সংক্রিয়াসারদীপিকা’ ও ‘সংস্কার-দীপিকা’ বৈষ্ণবের প্রামাণ্য গ্রন্থ, সুতরাং তাহার মূলোৎপাটন করিবার গল্প সৃষ্টি করিব। যত কেনই না, শ্রাকামি করি, “যেইজন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর”—তাহারা শ্রাকামি-বোকামি ধরিয়া ফেলিবে! বাদীর ঘট হইতে আমার কার্শ্ণা ত্যাগ করাইবে। তবে আমার একটা ভরসাও আছে, যে-সকল অনভিজ্ঞ পাঠক গ্রাম্যবার্তাবহের সম্পাদকগুলিকে বুদ্ধিমান মনে করে, তাহাদের নিকটই আমি curtain lecture দিই। তাহারা আমার শ্রাকামি ধরিতে পারিবে না।

কিন্তু গোড়ীয় আমার বিষম শত্রু। আমি যে ঘটাই আশ্রয় করি না, সেই ঘটকেই লৌহমুদগরের দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলে। আমার শ্রাকামি-বোকামি ধরিয়া দেয়। তাই আজ আমি গোড়ীয়কে হাত করিবার জন্ত কয়েক বৎসর ধরিয়াই চেষ্টা করিতেছি। কখনও শ্রাকামি করিয়া গ্রাম্যবার্তাবহগুলিতে

প্রচার করি যে, * বাগানের তৌর্যাত্রিক মন্দিরে গৌড়ীয় যান না কেন ? তাহাদিগকে বহু যোজন দূরে রাখেন কেন ? তারাও ত' ছড়া গান করে । রাইকানুর গানের ফোয়ারা ছড়াইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ করে । তাহাদিগের হইতে কি গৌড়ীয় ভিন্নমত, না তাহাদেরই বাস্তব ভাগবত-সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন মত ? গৌড়ীয় বিলাস-সহচর তাবুল চর্চণ করেন না, গৌড়ীয় অসরলতা-কপটতাকে প্রশ্রয় দেন না, গৌড়ীয় দুশ্চরিত্রতাকে ভক্তিবর্ষ বলেন না, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঙ্গারূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণকে সাধনভক্তি বলেন না, তাঁহারা আত্মহিংসা, দ্বিপাদ-চতুষ্পাদ পক্ষী-পশুহিংসা করেন না, স্তুরাং বীরভোগ্য বসুন্ধরায় তাঁহাদের স্থান নাই । বেদবিরুদ্ধ উপাসনা-প্রণালী গৌড়ীয় মঠ স্বীকার করেন না । মায়াবাদীকে শ্রোতমতাবলম্বী বলেন না । কন্নী আর্ন্ত-ভট্টাচার্য্যকে 'বৈষ্ণব' বলেন না ।

কিন্তু বেদবিরোধী দলের ঘটেই আমার নিত্য অবস্থান । আমি খপরের কাগজের ঘটে, আর্ন্তের ঘটে, প্রজাল্ল-তর্কীর ঘটে, অর্ধাচারীদের ঘটে নিরন্তর চাপিয়া বসিয়া আছি । স্তুরাং গৌড়ীয়কেই আমি ভয় করি । তবে অনভিজ্ঞের সংখ্যা অধিক ও কাল কলি, ইহাই আমার ভরসা । বিবাদ বাধাইয়া ত্রাকাবোকা পাঠকদের নিকট হইতে বার্তাবহের শুদ্ধ আদায়ের নামে কিছু ইন্দ্রিয়-তর্পণের current coin ছোঁ মারিয়া লইব । আমার ত্রাকামি বুঝিতে ভোগি-সম্প্রদায়ের বুদ্ধি নাই । তবে আমি বড়ই দুঃখিত হইতেছি যে, আমাদের গ্রাম্যবার্তাগুলি শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত কোন সাধুই পড়েন না ও আমাকে কল্কে দেন না । আমার কতকগুলি কথা বলিলাম । আরও এই-রূপ হাজার হাজার পত্র লিখিয়া প্রপঞ্চে অবস্থিত সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বৈদিক জনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট উপস্থাপিত করিব । সম্পাদক মহাশয় দয়া করিয়া আমাকে একটু স্থান দিবেন । আপনার পত্রিকার গ্রাহক গৌড়দেশবাসী সকল স্বদেশী মহাত্মগণ ; স্বদেশহিংসক, স্বধর্ম্মহিংসকগণের সহিত আপনারদের মতভেদ আছে, আমি জানি । স্তুরাং আমাকে একটু স্থান দিলে আপনার পাঠক-সংখ্যা গ্রাম্যবার্তাবহদের সকলকে পরাজিত করিবে ।

— ভগদত্তরু ও বিষ্ণুশাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

বেদান্তগুরুত্ব ও বেদবিরুদ্ধ অপসম্প্রদায়

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৩ পৃষ্ঠার পর)

২১। পঞ্চোপাসনার বিষ্ণুপাসনা কি শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম নহে ?

“পঞ্চ উপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণুর উপাসনা আছে, তাহাতে দীক্ষা, পূজাদি—সমস্ত বিষ্ণু-বিষয়ক, কখনও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম নয়।” —জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

২২। কেবল কাশীবাসী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণই কি মায়াবাদী ?

“বারাণসী-নিবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রসিদ্ধ মায়াবাদী। * * তাঁহাদের মতস্থ পঞ্চোপাসক গৃহস্থ-সকলও মায়াবাদী। * * বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও ঐ মতবাদিগণকে মায়াবাদী বলা যায়। এমত কি, মহাপ্রভু-চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক মায়াবাদী আছেন। অনেক বাউল-দরবেশের মতও মায়াবাদ।”

—‘মায়াবাদী কাহাক বলে ?’ সঃ তোঃ ৫।১২

২৩। শঙ্করাচার্য্য মুক্তির পরে জীবের গতি সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন ?

“কেবল-মুক্তি-লাভের পর যে জীবের কি অপূর্ব গতি হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীশঙ্কর নিস্তব্ধ। * * যাঁহারা কেবল তাঁহার শিক্ষার বাহ-অংশ লইয়া কালযাপন করেন, তাঁহারাই কেবল বৈষ্ণবধর্ম হইতে বিদূরিত হন।”

—জৈঃ ধঃ ২য় অঃ

২৪। রামমোহন রায়-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ কি ?

“রামমোহনরায়-প্রচারিত ব্রাহ্ম-ধর্মটি খ্রীষ্টিয়ান্ ও হিন্দুধর্মের জোড় কলম। এরূপ ধর্মে যে, সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টিয়ান্ ও বিলাতী তार्কিকদের নিকট শান্তরসের উত্তমতা শিক্ষা করিয়া তছুছোচ্চ দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত। * * এক্সিয়ম্ ও পষ্টুলেটের জ্ঞান অর্জন না করিয়াই যিনি জিওমেট্রি (জ্যামিতি) শিক্ষা করিতে যান, তাঁহার যেরূপ দুর্গতি, প্রাকৃতাপ্রাকৃত বস্তুর পার্থক্য না বুঝিয়া যিনি রস বিচার করেন, তাঁহার সিদ্ধান্তেরও সেইরূপ দুর্গতি হয়।”

—‘সমালোচনা’, সসজ্জিনী সঃ তোঃ ৮।৪

২৫। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বিগণ গুরুপদাশ্রয়ের বিরোধী কেন ?

“গুরুপদাশ্রয় করিলে পাছে কুশিক্ষা হয়, এই ভয়ে সদগুরু-লাভের যত্ন

এবং তদ্রূপ গুরু পাইলেও তাঁহাকে ভক্তি করেন না। অসৎগুরুগণ শিষ্য-গণকে কুপথগামী করেন বলিয়া সৎগুরু পর্যন্ত ইহাদের পরিত্যাজ্য হয়।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২৮

২৬। জড়ভজন কি ?

“জড়ে যে আকাশ আছে, তাহাও সর্বব্যাপী ও নিরাকার; ইহাদের ঈশ্বরও তদ্রূপ। ইহারই নাম জড়ভজন।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২৮

২৭। আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব কি এক ?

“আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব, এই দুইয়ের বৈজ্ঞানিক স্বপ্ন-ভেদ যতদিন হৃদয়ে উদ্ভিত না হয়, ততদিন উক্ত দুইটি শব্দের ব্যবহারে বিচার থাকে না। শুকবাদীদিগের অপ্রাকৃত ভাবোদয় হওয়া কঠিন। অতিশয় স্মৃতিবলে অপ্রাকৃত তত্ত্বে রতি হয়; নতুবা আধ্যাত্মিক বিতর্করূপ প্রাচীরের এপারে থাকিয়া অপ্রাকৃত-বৈচিত্র্য দর্শন করিতে পারে না।”

—‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ৬১২

২৮। Trinity মতবাদ কিরূপে উৎপন্ন হইল ?

“জরদস্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন পণ্ডিত। ভারতবর্ষে তাঁহার মত আদৃত না হওয়ায় ইরানদেশে তিনি মত-প্রচারে কৃতকার্য হন। তাঁহার মতটি সংক্রামক হইয়া জু (ইহুদি) দিগের ধর্মে এবং শেষে কোরাণমতাবলম্বীদিগের মধ্যে পরমেশ্বরের সমকক্ষ একটি সন্তানের উৎপত্তি করে। যে-সময়ে জরদস্ত্র দুই ঈশ্বর-বিষয়ক-মত প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়েই জুদিগের মধ্যে তিনটি ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইলে Trinity মত উৎপন্ন হইয়া পড়ে।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২১

২৯। Trinity মত-বিস্তারের ইতিহাস কি ?

“আদৌ Trinity মতে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর কল্পিত হয়, পরে যখন পণ্ডিতগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তখন গড্, হোলিঘোষ্ট্, ও ক্রাইষ্ট্—এই তিনটি তত্ত্ব-বিচার-দ্বারা তাহার যুক্ত-মীমাংসা বাহির করিলেন। যে-কালে বা যে-সম্প্রদায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ইহাদিগকে পৃথক্ দেবতা বলিয়া কল্পনা হয়, সে-সময় ভারতেও তিনটি ঈশ্বর-বিশ্বাস-রূপ একটা অনর্থ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতগণ ঐ তিন দেবতার তাত্ত্বিক একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রের অনেক স্থলে ভেদ-নিষেধক উপদেশ করিয়াছেন।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২১

৩০। তান্ত্রিক শক্তিবাদ কোন্ দর্শন হইতে উদ্ভূত ?

“তন্ত্র-সকলের মত নানা প্রকার ; কোন একটি বিশেষ দর্শন হইতে যে তান্ত্রিক শক্তিবাদ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এক স্থলে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, অতঃপর তাহা অস্বীকৃত ও নিরাকৃত হইয়াছে। কোন স্থলে পরব্রহ্মই সর্বকর্তা, কোন স্থলে প্রকৃতি, কোন স্থলে জীব। জীবকে কোন স্থলে ‘মিথ্যা’, কোন স্থলে ‘সত্য’ বলা হইয়াছে। কোন স্থলে ‘নাদবিন্দু’কে, কোন স্থলে ‘প্রকৃতি-পুরুষ’কে ও কোন স্থলে ‘কেবলা প্রকৃতি’কে সমস্ত কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৪

৩১। তান্ত্রিক শক্তিবাদের প্রকৃত স্বরূপ কি ?

“তন্ত্র-সকলে যে-সকল লতা-সাধন, পঞ্চমকার-সাধন, জুরা-সাধন-প্রণালী কথিত হইয়াছে, তাহা যে কোন আস্তিক দর্শন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এরূপ কিছুতেই বোধ হয় না। নিরীশ্বর কৰ্ম্মের অপূৰ্ণ বা মন্ত্রায়ত্ত্ব দেবতা এবং কন্টী (কোঁৎ) প্রভৃতির কায়নিক প্রকৃতি-পূজা ব্যতীত তান্ত্রিক শক্তিবাদকে আর কিছুই বলা যায় না।

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৪

৩২। মায়াবাদের জন্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কি ?

“ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ঐ সময় মায়াবাদরূপ একটি বাদের স্রষ্টি হয়। সেই মত বৌদ্ধধর্মের বৌদ্ধনামেই অবস্থিতি করিল। কিন্তু বৌদ্ধ-মতের অন্ত্যন্ত লোকদিগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতরূপ মায়াবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৪

৩৩। মায়াবাদিগণ কি আস্তিক নহেন ?

“মায়াবাদিগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে নাস্তিক।”

—‘কথাসার’, চৈঃ চঃ মঃ ৬ পঃ

৩৪। শৈব-মত কোথা হইতে উদ্ভূত ?

“আমাদের বিবেচনায় শৈব-মত কপিল-সাংখ্য-নিঃসৃত। কিন্তু ঐ মতে প্রকৃতির বিশেষ সম্মান থাকায় অতঃপুত্র জনগণ কর্তৃক ঐ মতকে তান্ত্রিক-মতের সহিত ভুলক্রমে ঐক্য করা হইয়াছে। তন্ত্র-মতে যদিও কোন কোন স্থলে চনকগত দুইটি বীজের সহিত পুরুষ-প্রকৃতির উপমা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ফল-কালে প্রকৃতিকে চিত্তস্তের অসবিদ্রী বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৪

৩৫। বৌদ্ধ-মত ও জৈন-মত কেন প্রচারিত হইল ?

“ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য ও নিরীশ্বর কর্মবাদ-প্রচারক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণসকল অত্যন্ত উপক্রত হওয়ায় ক্ষত্রিয়েরা দলবদ্ধ হইয়া বৌদ্ধ-মত ও বৈশ্ণবেরা দলবদ্ধ হইয়া জৈন-মত প্রচার করেন।” —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৩

৩৬। বৌদ্ধ ও জৈন মতের সংক্ষিপ্ত কথা কি ?

“বৌদ্ধ-মতে অনেক জন্মে দয়া ও বৈরাগ্য অভ্যাস করত শাক্যসিংহ প্রথমে বোধিসত্ত্ব ও অবশেষে বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে নম্রতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, চিন্তা, বৈরাগ্য ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে করিতে জীব পরিনির্বাণ লাভ করে। পরিনির্বাণে আর অস্তিত্ব থাকে না। সামান্য নির্বাণে দয়াস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি। জৈনগণ বলেন,—অত্র সমস্ত সদৃশ্য দয়া ও বৈরাগ্যানুগত হইয়া অভ্যস্ত হইলে জীবের ক্রমগতি-অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, বাসুদেবত্ব, পরবাসুদেবত্ব, চক্রবর্তিত্ব ও অবশেষে নির্বাণগত ভগবত্ত্ব লাভ হয়। উভয় মতেই জড় জগৎ নিত্য; কর্ম অনাদি, কিন্তু অস্তবিশিষ্ট; অস্তিত্বই ক্লেশ; পরিনির্বাণই মুখ; জৈমিনি-প্রকাশিত বৈদিক কর্মতত্ত্ব জীবের অমঙ্গল; পরিনির্বাণ-প্রাপ্তির বিধিই মঙ্গলজনক; ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্মবাদের প্রভু বটে, কিন্তু নির্বাণ-বাদীর সেবক।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৩

৩৭। পাশ্চাত্যদেশে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের স্থায় কোন নির্বাণবাদ-ধর্ম আছে কি ?

“বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সদৃশ একটা নির্বাণবাদ-ধর্ম ইউরোপ খণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছে। ঐ ধর্মকে লোকে পেসিমিজম (Pessimism) বলে। পেসিমিজম ও বৌদ্ধধর্মে আর কিছুই প্রভেদ নাই, কেবল একটি বিষয়ের প্রভেদ আছে—বৌদ্ধধর্মে জীব জন্ম-জন্মান্তর ক্লেশ স্বীকার করত পরিভ্রমণ করিতেছে; কোন জন্মে নির্বাণ-বিধি অবলম্বন করিয়া নির্বাণ ও ক্রমশঃ পরিনির্বাণ লাভ করিবে; কিন্তু পেসিমিজম-মতে জীবের জন্ম-জন্মান্তর নাই।”

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৩

৩৮। আনুকরণিক অবতারবাদ কি সমর্থনযোগ্য ?

“কতকগুলি লোক স্থানে স্থানে নূতন গৌরঙ্গ হইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। এই কার্যে ধাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায়ই

‘মায়াবাদী’। ছদ্মবেশে হরিকীর্তনাদি (৭) দ্বারা অনেকের মোহ-উৎপত্তি করিয়াছিলেন। কেহ গৌরান্ধ, কেহ নিত্যানন্দ, কেহ বা অদ্বৈত হইয়া দলবল সংগ্রহ করত হরিকীর্তন (৭) করিতে লাগিলেন। লোকের ভ্রমোৎপত্তি করাই তাঁহাদের তাৎপর্য। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা কীর্তন-সময়ে এতদূর হাবভাব প্রকাশ করিতেন যে, অনেকেই তাঁহাদের গতিক দেখিয়া গৌরান্ধ পুনরায় উদয় হইতেছেন, এরূপ মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী-ভাষায় শিক্ষিত এবং থিওসফি প্রভৃতি পাশ্চাত্য শাস্ত্রে বেশ নিপুণ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন,—“যখন গৌরচন্দ্র স্বয়ং উদ্ভিত হইতেছেন, তখন তৎপার্বদ হইয়া আপনারা কেন নিশ্চিন্ত থাকেন?”

—‘নববর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনা,’ সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।১

৩৩। ‘সম্বয়বাদী’ বা ‘খড়-জাঠিয়া’ কি শুদ্ধভক্ত ?

“ভক্ত দেখিলেই অশ্রু-পুলক হয় ; কখনও কখনও কথার আলোচনায় দশা (৭) প্রাপ্ত হন ; আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক-মতের সহায়তা করেন, বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। * * * তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্বনাশ সাধন করিতেছেন।”

—‘ভক্তির ৭টি অপরাধ,’ সঃ তোঃ ৮।১০

৪০। আত্মবঞ্চক কাহারো ?

“ঋাহারা দীক্ষার প্রতিপক্ষ হইয়া কেবল কপট কীর্তনাদির রঙ্গ দেখাইয়া আপনাদিগকে ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত আত্মবঞ্চক।”

—‘তত্ত্বৎকর্ম প্রবর্তন,’ সঃ তোঃ ১।১৬

৪১। বৈড়াল-ব্রতিক কাহারো ?

“বৈড়াল-ব্রতিকগণ বাস্তব ভক্তির নিত্যতা স্বীকার করে না, কিন্তু বাহ্যে তচ্ছিন্ধুকল সর্বদা প্রকাশ করিয়া থাকে ; কোন দূর-উদ্দেশ্য-সাধনই তাহাদের প্রয়োজন।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৪২। মন্ত্রাচার্য্য-পদের ছলনায় কপট পাপী কাহারো ?

“ভগু তপস্বী ও বৈড়াল-ব্রতিগণেরাই মন্ত্রাচার্য্য-পদের ছলে নানাবিধ পাপ-কার্য্য করেন।”

—‘বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্মল হওয়া চাই,’ সঃ তোঃ ৫।১০

৪৩। ধর্মধ্বজী কাহারো ও কয় প্রকার ?

“যাহারা ধর্মের বাহুচিহ্ন-সকল ধারণ করে, অথচ ধর্ম পালন করে না, তাহারাই ধর্মধ্বজী। ধর্মধ্বজী - দুইপ্রকার অর্থাৎ কপট ও মূঢ়, বঞ্চক ও বঞ্চিত।”

—‘জনসঙ্গ’, সং তো: ১০।১১

৪৪। পকযোগীর আনুকরণিক কপট ব্যক্তিগণের স্বভাব কি ?

“কেবল বেশধারিগণ কপট পকযোগীর বেশ ধারণ করিয়া জগদ্বঞ্চনা করে। পকযোগীর দৃষ্টান্তেই তাহারো জীবন-ধারণপূর্বক স্থায় স্থায় মাহাত্ম্য বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সুখ অবেষণ করে। হরি-কীর্তনই কৃষ্ণ-ধর্ম। অতএব কপট-ভাবে কীর্তন-ধর্মের প্রকটন দ্বারা পকযোগীদিগের স্থায় কৃষ্ণ-ধর্মাদির প্রতি স্বেচ্ছাচারী হইয়া সুখ-বিলাস-বিহারাদি প্রকাশ-পূর্বক প্রাকৃত ব্যক্তিদিগের ভ্রম উৎপত্তি করে। তাহাতে ফল এই হয় যে, যে-সকল সুখ-বিলাস-বিনোদ-দ্বারা তাহারো লোকদিগকে ভ্রম উৎপত্তি করে, সেই সকল বিলাস-দ্বারা ঐসকল বেশধারীদিগের অধঃপতন হইতে থাকে। কীর্তনাদিতে কপট রোদন ও মূচ্ছাদি ঐ সকল বিলাস। তদ্বারা তাহারো বিষয়ীদিগের বিষয়ী হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-বেশ ও ভিক্ষুশ্রমাদি লক্ষণের গ্রহণে তাহাদের বৈষ্ণবাভিজাত্য জন্মিয়া যায়। তন্নিবন্ধন তাহারো আর শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট যাইতে পারে না। কুগ্রামবাসী নিতান্ত প্রাকৃত ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রাকৃত জনের সঙ্গ করে। সময়ে সময়ে কৃষ্ণগুণ-মহিমা-শ্রুতি হইয়াও কপট অনুরাগের লক্ষণ নর্তকদিগের স্থায় পুলক প্রেমাди বাহু রসের দ্বারা প্রকাশ করে। দিনে দিনে সেইগুলি তাহাদের বিলাস-স্বরূপ হয়।” - ভজনামৃতম্

৪৫। জগতে সর্বাপেক্ষা কুসঙ্গ কি ?

“বিষয়ী বরং ভাল, কিন্তু ধর্মধ্বজী অপেক্ষা আর কুসঙ্গ জগতে নাই। কপট ধর্মধ্বজিগণ জগৎকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম-লিঙ্গ ধারণ করে, আবার স্থায় ছুষ্ঠাভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য মূঢ় লোককে বঞ্চনা করত সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। ইহারা কেহ ‘গুরু’ হয় এবং অপরকে শিষ্য করিয়া জগতে শাঠ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠা, দ্রব্য ও কনক-কামিনী সংগ্রহ করে। এই সকল কপট, কুটিল-সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে সাধক সরলতার সহিত ভজন করিতে পারেন।”

—‘জনসঙ্গ’, সং তো: ১০।১১

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অকিঞ্চনের অকিঞ্চন

গুরুদেব !

চিরবদ্ধ হৃদি-অর্গল খুলে,

(তোমার) বিশুদ্ধ আসন পাতিব ।

অস্থির সুখের বাসনা ভুলে,

(তোমার) পদসেবা-সুখে মাতিব ॥

জড়ীয় আকাজক্ষা সকল ভুলে,

(মরমে) সচেতন আশা পোষিব ।

ঐ শ্রীচরণে মমতারে ফেলি',

(তোমার) পুতঃ যশ বিশ্বে ঘোষিব ॥

নিজ-স্বাতন্ত্র্য-অভিমান ত্যজি',

(তোমার) দাস বলি' নিজে জানিব ।

তোমার-যুগল-চরণ ভজি',

(আমার) জনম সার্থক মানিব ॥

ভোক্তার স্বভাব সমূলে ছাড়ি',

(তোমার নাম-যশ-সদা) জপিব ।

কু-বিষয় হ'তে মনটী কাড়ি',

(তোমার) অভয়-শ্রীপদে সঁপিব ॥

হেম-কামিনী-লোভ পরিহরি',

(জড়ীয়) প্রতিষ্ঠা আর না মাগিব ।

মায়া-পিশাচীর কবলে না পড়ি',

(ইতর) মোহ-নিদ্রা হ'তে জাগিব ॥

প্রাকৃত-বুদ্ধ্যে তোমাকে না দেখি',

(তোমাতে) অসুয়া ভাবনা ছাড়িব ।

তোমার করম-কলাপ দেখি',

(ভুলেও) মর্ত্য-বুদ্ধি নাহি করিব ॥

শরণাপ্রাপ্তি ও চরণে লভি',

(অশেষ) সংসার-যাতনা নাশিব ।

তব বরাকের বেশেতে শোভি',

(অগাধ) সেবা-সাগরেতে ভাসিব ॥

দেহাত্ম-বুদ্ধি চিরতরে ত্যজি,'

(অভ্যাসে) আচরণ মাত্র বুঝিব ।

প্রাকৃত স্বজন-মোহে না মজি',

(তোমার) নিজ-জন-ভক্তে খুঁজিব ॥

অসৎসঙ্গ দূরে পরিহরি',

(শুদ্ধ) সাধুসঙ্গে রত হইব ।

লোক-ব্যবহার সব দিয়ে ছাড়ি,

(নিত্য) সেবক-শরণ লইব ॥

তব নিরদেশে প্রবুদ্ধ হই',

(উত্তম) মাধুকর-বৃত্তি সাধিব ।

তোমার গৃহের কুকুর রই,

(নিশ্চিন্তে) নির্মল আনন্দে ভাসিব ॥

সেবাধিকার কবে যাবে বাড়ি',

(জাড্যাদি) আলস্য সুদূরে ত্যজিব ।

ভোগবাসনা চিরতরে ছাড়ি',

(সুধাময়) হরে কৃষ্ণ নাম গাহিব ॥

সাধু-উপদেশ শ্রবণ করি,

(প্রজ্ঞা) গ্রাম্যবার্তা-চর্চা ছাড়িব ।

শ্রুত-বিষয়ের কীর্তন করি,

(ক্রমান্বয়ে) শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেমে বাড়িব ॥

তোমার আদেশ পালনহেতু,

(অনন্ত) নরকে নাহিক ডরিব ।

তব পুতঃবাণী মঙ্গল-সেতু,

(জানি) যতনে হৃদয়ে ধরিব

গৌর-নিত্যানন্দ-চরণ ভজি,

(মানব) জনম সার্থক করিব ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রীতিসুখে মজি',

(নিত্য) ব্রজধাম-পথে চলিব ॥

—শ্রীঅদ্বৈতদাস ব্রজবাসী

শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—২৪)

গোপ-গোপীগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর হন, তবে রাস-প্রসঙ্গে প্রেয়সী গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগের কথা উক্ত হইল কেন ? তদন্তর,— ব্রজগোপীগণ দুই প্রকার—নিত্যসিদ্ধা ও সাধকচরী। তন্মধ্যে সাধকচরীগণ অসিদ্ধদেহা। তাঁহাদের কেহ কেহ গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

৭ শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপরূপে স্বয়ং-ভগবান্, ইহারাও তদ্রূপ গোপীরূপে নিত্যপ্রেয়সী। আর ষাঁহারা সাধন-দ্বারা গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধকচরী। দণ্ডকারণ্য-বাসী মুনিগণ ও শ্রুতিগণ সাধকচরী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ঐ গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগের প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—

অন্তর্গৃহগতা কাশ্চিদগোপ্যোহলব্ধবিনির্গমাঃ।

কৃষ্ণং তদ্ভাবনায়ুক্তা দধুমীলিতলোচনাঃ ॥

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধূতাপ্তভাঃ।

ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতান্বেষণ-নিবৃত্ত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।

জহগুণময়ং দেহং সদাঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ (ভাঃ ১০/২২৯-১১)

গোপীগণের মধ্যে কেহ কেহ পতি-গুপ্তফার জহ গৃহে প্রবেশ করার পরেই শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি হয়। তাহা শ্রবণমাত্র তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইবার জহ উৎকণ্ঠিতা, কিন্তু বাধা দিবার জহ দ্বাররোধ করিয়া পতিগণ দণ্ডায়মান। তখন অনন্যোপায় হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করত প্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান-প্রভাবে অশুভ—শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির অন্তরায়-স্বরূপ গুরুজন-ভয়াদি বিদূরিত হইল। আর ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন লাভ করার জহ মঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সখ্যাতির সাহায্য-চিন্তন তিরোহিত হইল। এস্থলে 'অশুভ' ও 'মঙ্গল'-শব্দের এতাদৃশ অর্থ করার হেতু দেখাইতেছেন যে, নিন্দিত কর্ম হইতে অশুভ, আর বিহিত কর্ম হইতে মঙ্গল হয়। ভগবৎ-পরিকরগণের কর্মবন্ধনহেতু জন্ম সম্ভব নহে, তজ্জহ তাঁহাদের অশুভ বা মঙ্গল নাই। তদ্বিষয়ে প্রমাণ—

ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে। (বিষ্ণুপুরাণ)

বৈষ্ণবগণের কর্মবন্ধনহেতু জন্ম নাই। তবে যে তাঁহাদের জন্মাদির কথা শ্রুত হয়, তাহা ভক্ত, ভক্তি বা ভগবদ্ভিচ্ছাতেই হইয়া থাকে। সুতরাং গোপীগণের ‘অশুভ’ বা ‘মঙ্গল’-শব্দের এইপ্রকার অর্থই সম্ভব। তাঁহারা আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা—প্রেমের প্রকট-বিগ্রহ। তাঁহাদের গুণময় দেহস্থিত যে ‘অশুভ’-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থান্তর হইতে পারে।

ভৃগুমুনি শ্রীহরির বক্ষে পদাঘাত করিলে পর শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

অদ্বাহং ভগবৎলক্ষ্ম্যা আসামেকান্তভাজনম্ ।

বৎস্তু্যরসি মে ভূতির্ভবংপাদহতাংহসঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮৯।১১)

হে ভগবন্, অদ্ব আমি লক্ষ্মীর একান্ত আশ্রয় হইলাম। আপনার পদাঘাতে আমার পাপক্ষয় হওয়ায় লক্ষ্মীদেবী সর্বদা আমার বক্ষঃস্থলে বাস করিবেন।

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে অশেষ পাতক নষ্ট হইয়া থাকে, সেই ভগবদ্বিগ্রহে পাপস্পর্শলেশের সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? তবে শ্রীহরির বক্ষে পদাঘাত করার জন্ত ভৃগুমুনির যে অনুতাপ হইয়াছিল, তাহা ঘূচাইবার জন্ত শ্রীহরির ঈদৃশী উক্তি। এস্থলে যেমন ভগবদ্ভাক্যের যাথার্থ্য রক্ষার জন্ত অর্থান্তর করা হইল, রাসপ্রসঙ্গে গোপীগণ-সম্বন্ধে কথিত ‘অশুভ’ ও ‘মঙ্গল’ শব্দেরও উক্তরূপ অর্থান্তর হওয়া উচিত। অতঃপর মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন,—

কৃষ্ণং বিদ্বঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া যুনে ।

গুণপ্রবাহোপরমত্তাশাং গুণধিয়াং কথম্ ॥ (ভাঃ ১০।২৯।১২)

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠকান্ত বলিয়াই জানিতেন, ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না। গুণযুক্ত-বুদ্ধিবিশিষ্টা তাঁহাদের গুণপ্রবাহের বিরতি কি-প্রকারে সম্ভব?

তদ্বত্তরে শ্রীশুকোক্তি,—

উক্তং পুরস্তাদেতন্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ ।

দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষত্ৰপ্রিয়াঃ ॥

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ ।

অব্যয়স্তাপ্রমেয়স্ত নিগুণস্ত গুণাত্মনঃ ॥

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ ।

নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে ।

যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ (ভাঃ ১০।২৯।১৩-১৬)

শুকদেবের উক্তি,—হৃষীকেশকে বিদেষ করিয়া যেরূপ শিশুপাল সিদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহাকে দ্বেষ করিয়াও যখন সিদ্ধিলাভ করা যায়, তখন অধোক্ষজ-প্রিয়াগণের গুণময় দেহত্যাগের কথায় আশ্চর্য্যের বিষয় কি থাকিতে পারে? হে নৃপ! অব্যয়, অপ্রমেয়, নিগুণ, গুণাত্মা ভগবান্ কেবল মানবগণের মঙ্গলের জন্তই আবিভূত হইয়াছেন। শ্রীহরির প্রতি সতত কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য বা সৌলভ্য বিধানদ্বারা তন্ময়তা লাভ করা যায়। অজ ভগবান্ যোগেশ্বরের শ্রীকৃষ্ণে এসম্বন্ধে বিশ্বয় প্রকাশ করা অকর্তব্য। যেহেতু তাঁহা হইতে স্বাবরাদিও মুক্তিলাভ করিতে পারে।

জারবুদ্ধ্যা—জার এই যে বুদ্ধি তদ্বারা সঙ্গতা—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ জাররূপ প্রাপ্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিলেন, এরূপ নহে। অর্থাৎ গোপীগণের বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জার (উপপতি) এই ভাবনা আছে বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি ‘জার’ নহেন। কেহ যদি রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি করে, সেটী তাহার বুদ্ধিগত ভ্রম, কিন্তু বস্তুরূপে কোন পরিবর্তন ঘটে না। সেইপ্রকার গোপীগণের বুদ্ধিতে ‘শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জার’ এই ভাবনা থাকিলেও তিনি তাঁহাদের জার হি ছিলেন না। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ কাহারও জার হইতে পারেন না। তিনি সকলের হৃদয়-বরণ। যোগমায়া-প্রভাবেই তাঁহাতে জারবুদ্ধি হইয়াছিল। সেই বুদ্ধিতেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এস্থলে জার অর্থাৎ উপপতিভাবে ভজনে প্রাবল্য দর্শিত হইয়াছে। জার-শব্দ নির্দেশদ্বারা লোকধর্ম ও লোকমর্যাদা অতিক্রম করিয়া গোপীগণের নির্বাসিত দেখান হইল। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্ত দুস্ত্যাজ্য লোকধর্ম ও লৌকিক মর্যাদাত্যাগে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্ত তাঁহাদের তীব্র উৎকণ্ঠার প্রবল প্রবাহ সমস্ত অন্তরায়কে তৃণের মত ভাসাইয়া দিয়াছিল। যদি এইপ্রকার জার-বুদ্ধি না থাকিত, তবে গোপীভাবের উৎকণ্ঠাতিশয় ও গোপীপ্রেমের মহিমা প্রদর্শনের অন্ত উপায় ছিল না। শ্রীকৃষ্ণভজনে এইরূপ উৎকণ্ঠার প্রয়োজন।

“সতঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ” পদে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির বিরোধী গুরুজন-মধ্যে বাসাদি অন্তরায় বুঝিতে হইবে। গোপীগণের গুণময় দেহত্যাগের কথা বলায় পরীক্ষিৎ মহারাজের হৃদয়ে ঐরূপ প্রশ্ন উদ্ভিত হইয়াছিল।

গোপীগণের প্রাকৃত গুণসম্পর্কের অভাব হইলেও শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবন্ধ

যে-সকল গুণ আছে, তৎসমুদয় পরমপুরুষার্থের অন্তর্গত, সে-সকলের নিবৃত্তি হইতে পারে না। মায়িক গুণসকল পরমপুরুষার্থ সাধনের অন্তরায় বলিয়া সে-সকলের ক্ষয় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ব্রজগোপীগণের যে-সকল গুণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির हेতুভূত, সে-সকলের বিরতি হইতে পারে না। তাঁহাদের স্বরূপানুবন্ধী গুণ ; যতদিন স্বরূপের স্থিতি, ততদিন গুণেরও স্থিতি। স্বরূপের ধ্বংস অসম্ভব বলিয়া গুণক্ষয়ও অসম্ভব। সুতরাং গুণক্ষয় জ্ঞাত মুক্তি তাঁহাদের নাই।

“উক্তং পুরস্তাৎ” শ্লোকের ব্যাখ্যা,—পুরজনের ইতিহাসের মত (স্ত্রীচিন্তা করিয়া মৃত্যুর পর স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি) ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির हेতু নির্ণয় ছরুহ বিষয় বলিয়া শ্রীশুকদেব উক্ত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলেন।

শিশুপাল ও দন্তবক্র পূর্বে বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল ছিলেন। চতুঃসন বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা চিরকুমার ও নর ছিলেন। তাঁহাদের নগ্নভাবে হরি সন্নিধানে যাইতে জয়-বিজয় নিবেদন করায় চতুঃসন ক্রুপিত হইয়া তাহাদিগকে অস্ত্রযোনিতে জন্মগ্রহণের অভিসম্পাত প্রদান করেন। সেই পাপে তাঁহারা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুন্তকর্ণ এবং শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহরির বীর-রসে যুদ্ধ-কৌতুক উপভোগের নিমিত্ত জয়-বিজয়ের প্রপঞ্চে অবতরণ। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যুদ্ধ হয় না। পার্শ্বদৃষ্টা ভগবানের তুলা কেহ নাই। তজ্জন্তু পার্শ্বদগণকে অবতরণ করাইয়াছিলেন। অহরভাব ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বলিয়া অস্ত্র যোনিতে জন্মাইলেন। ভগবান তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—তোমরা মর্ত্যালোকে গমন করিতে ভীত হইও না। আমি অভিষাপ খণ্ডনে সমর্থ হইলেও অভিসম্পাত করাইলাম, উহা আমার অনুমোদিত। এই বচনানুসারে জানা যায় যে, জয়-বিজয় সনকাদির শাপছলে শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীভগবদ-ইচ্ছাতেই তাঁহাদের অপ্রাকৃত দেহের তিনবার পৃথিবীতে দেহে প্রবেশ হইয়াছিল।

শিশুপাল ও দন্তবক্রের বিনাশান্তে শ্রীনারদ-মুখে তাহাদের পূর্ব-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—দেহেন্দ্রিয়-প্রাণহীন বৈকুণ্ঠবাসীদের প্রাকৃত দেহ কিরূপে সম্ভব ? তদুত্তরে শ্রীনারদ-ঋষির উক্তি,—

তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃদ্ব্যঙ্গজৌ তব ।

অধুনা শাপনিম্নুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ ॥ (ভাঃ ৭।১।৪৬)

ইনারদ বলিলেন, সেই জয়-বিজয় তোমার মাতৃদ্ব্যঙ্গের গর্ভে ক্ষত্রিয়-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । কৃষ্ণ-চক্রে তাহাদের পাপ হত হওয়ায় এখন শাপ-নিম্নুক্ত হইল ।

এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—“কৃষ্ণচক্রেণ হতমংহো যযৌস্তৌ । তয়োঃ পাপমের হতং ন তু তৌ ।” “চক্রেব্বারা তাহাদের পাপ হত হইয়াছিল. তাহারা হত হন নাই ।” ব্রজগোপীগণের গুণময় দেহত্যাগ সম্বন্ধেও তদ্রূপ সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে । পত্যাগি যখন বাধা প্রদান করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায় তাৎকালিক কম্পিত গুণময় দেহে অপ্রাকৃত দেহবিশিষ্টা গোপীগণ প্রবেশ করিয়াছিলেন । রাসপ্রসঙ্গে এইরূপ উক্তি,—

নাস্থয়ন্ খলু কৃষ্ণায় নোহিতান্তস্ত মাযয়া ।

মত্মানাঃ স্ব-পার্শ্বস্থান্ স্থান্ স্থান্ দারান্-ব্রজৌকসঃ ॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৭)

গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অস্থয়া প্রকাশ করেন নাই । কারণ তাঁহারা নিজ নিজ পত্নীকে পার্শ্বে অবস্থিতা মনে করিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বস্থিতা গোপীগণের তদিচ্ছায় মায়াবলিত দেহে পতিপার্শ্বে অবস্থান হইয়াছিল । তাঁহারা সেই মায়িক দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমন করিয়াছিলেন । তাঁহারা গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, নিজদেহ ত্যাগ করেন নাই ।

জয়-বিজয়-প্রসঙ্গে যদি তাঁহাদের ঘেঁষাভাসের সহিত নিরন্তর স্মরণ প্রভাবে তাদৃশ অস্তরদেহ ত্যাগের পর পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্বান ঘটে, তবে ব্রজ-রামাগণের প্রীতির সহিত নিরন্তর স্মরণপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না । ‘তন্ময়তা’-শব্দে তৎপ্রচুরতা বুঝিতে হইবে । যেমন স্ত্রীময় কামুক—কামুকের চিন্তে যেমন কেবল স্ত্রী স্মৃতি পায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে কাম-ক্রোধ-স্নেহাদি ভাবদ্বারা তাঁহাতে গাঢ় আসক্তি জন্মে । ‘তন্ময়তা’-শব্দে অনুরক্তাঙ্গতা ও প্রলীনতা ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্মুক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সাধু-সঙ্গ ও শ্রীগুরু-তত্ত্ব

ধীর বা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া চরম-কল্যাণ-লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে,—

লব্ধ্বা স্তুর্নভমিদং বহুসম্ভবান্তে, মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।

তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্তাৎ ॥
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

অর্থাৎ অনেক জন্মের পর এই অত্যন্ত দুর্লভ পরমার্থপ্রদ কিন্তু অনিত্য মানব-জন্ম লাভ করিয়া ধীরব্যক্তি যে-পর্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয় তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম-কল্যাণলাভের চেষ্টা করিবেন।

বহু জন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ স্মৃতিফলে সৎগুরু বা বৈষ্ণব-গুরুর দর্শন লাভ হয়। আমাদের সনাতন শাস্ত্র গ্রন্থগুলি সেইজন্ত তীর্থদর্শন ও তীর্থক্ষেত্রে বাস করিবার মাহাত্ম্য বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কঙ্কি-পুরাণে আছে,—

বহুনাং জন্মনামন্তে তীর্থক্ষেত্রাদি-যোগতঃ ।

দৈবাৎ ভবেৎ সাধুসঙ্গস্তমাদীশ্বরদর্শনম্ ॥

শ্রীমন্নহাপ্রভু গয়াগমনচ্ছলে পুনরায় সেই মাহাত্ম্যই ঘোষণা করিয়া নিখিল জীবকুলের চরম-কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

প্রভু বলে,—“গয়া-যাত্রা সফল আমার।

যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ॥

অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।

তীর্থেরও পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান ॥”

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫০, ৫৩)

শ্রীগুরুতত্ত্ব সাধারণ প্রাকৃত জীবের নিকট চিরকালই অপ্রকটিত থাকেন। তবে বিশেষ বিশেষ মাস্তুলিক অনুষ্ঠানে শ্রীগুরুদেব তাঁহার স্বমুখ-নিঃসৃত বাণীকৃপা কৃপা প্রকটিত করাইয়া জীবের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেন। ভক্ত্যানুষ্ঠানে যোগদানের সার্থকতা—সাক্ষাৎভাবে শ্রীগুরু-দর্শন-জনিত আনন্দ। সাক্ষাৎ দর্শন হইলেই অন্তর-দর্শন হইবে। বাহ্যদর্শনের আনন্দই হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। যেহেতু, হৃদয় বা মনই আনন্দের উৎসস্বরূপ। পারমার্থিক অনুষ্ঠানে যোগদানের পর ভক্তগণ স্ব-স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেও শ্রীগুরুদেবের দর্শনজনিত আনন্দে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উহা বহুপ্রকারে উত্তরোত্তর স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হয়।

শ্রীভাগবতানুতোত্তরখণ্ডে উল্লেখ আছে,—

তৎপ্রসাদোদয়াদ্ যাবৎ স্ত্বং বর্ধিত মানসম্ ।

তাবদ্বর্দ্ধিতুমীশীত ন চাত্তদ্ বাহমিন্দ্রিয়ম্ ॥

অর্থাৎ মন দৃশ্যবস্তু বিষয়ের আকারতা প্রাপ্ত হইলেই তদ্বিষয়ে জ্ঞানের উদয় হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে । অতঃ ইন্দ্রিয়গণের তাহা নাই ; যেহেতু তাহারা বাহ্য, স্থূল ও সীমাবদ্ধ ।

ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের আচরিত ও প্রচারিত ধর্মের পুনঃ সংস্থাপন করিবার জন্তই সদৃশগুরু এই প্রপঞ্চে কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হন । এই নিখিল বিক্ষে কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত হইয়া বিষয়ভোগের দুর্কাসনা হৃদয়ে পোষণ করেন । ভক্ত-বৎসল ভগবান্ জীবের সুপ্ত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি উদয় করাইবার জন্তই ভক্তবেশ অঙ্গীকার করেন ।

গুরু কৃষ্ণ-রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে ॥

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)

অতএব, সেই জগৎপিতা কৃষ্ণকে লাভ করিতে হইলে বা তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে, সম্বন্ধজ্ঞানদাতা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইতেই হইবে । শ্রীগুরুদেবে ভক্তিভাবে আত্মসমর্পণ না করিলে সেই তত্ত্ববস্তু জানিবার কোন উপায়ই নাই ।

কৃষ্ণ-ভজনহীন জীবের দুর্গতি সম্বন্ধে বৈষ্ণবকুল-তিলক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু ভক্তিরসের আকর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অপূর্বভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ।

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় ।

দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥

(চৈ চঃ মঃ ২০।১১৭-১১৮)

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুও তাঁহার “প্রেমবিবর্ত্ত” গ্রন্থে কৃষ্ণ-বহির্মুখের দুঃখ ও তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় বর্ণনা করিয়াছেন—

“কৃষ্ণ-বহির্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে ।

নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয় ।

মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥

অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয় ।

নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয় ॥

একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন ।

তবেত' পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥”

এই সংসার-দুঃখ-সাগর উত্তীর্ণ হইতে হইলে, আচার্য্যের নিকট আশ্রয় লইতেই হইবে এবং গুরু-সেবা-রূপ পাথেয়দ্বারা ভব-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অগতির গতি, অনাদির আদি, সর্বকারণকারণ, সচ্চিদানন্দ-রসঘন-বিগ্রহ ভক্ত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপাদপদ্ম-সেবালাভ হইবে ।

তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েদ্ ।

প্রসাদস্বমুখো বিষ্ণুশ্চেনৈব জ্ঞান সংশয়ঃ ॥ (ইতিহাস-সমুচ্চয়)

অর্থাৎ, এইহেতু শ্রীহরির অনুগ্রহ লাভার্থ বৈষ্ণবগণের তুষ্টিবিধান করিবে, তাহা হইলেই শ্রীহরি প্রসন্নমুখ হইবেন ।

হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রজ্ঞাদ মহারাজের উক্তি এস্থলে প্রণিধান-যোগ্য,—

নৈষাং মতিস্তাবহুক্ক্রমাভিঃ স্বর্শত্যানর্থাপগমো যদর্থঃ ।

মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

(ভাঃ ৭।৫।২৫)

অর্থাৎ, যে-কাল পর্য্যন্ত গৃহব্রত মানবগণের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পদরজে অভিষিক্ত না হয় সে-কাল পর্য্যন্ত উহা কখনই উরুক্রম কৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না ; যেহেতু কৃষ্ণপাদপদ্ম-স্পর্শই জীবের সমস্ত অনর্থ-নাশের একমাত্র হেতু ।

শ্রীগীতাশাস্ত্রে অর্জুনের শরণাগত অবস্থা ও তাঁহার উক্তি হৃদয়ঙ্গম করিলেই আমাদের অঙ্গকটি বৃত্তিরদ্বারা উপার্জিত যে জ্ঞান, তাহা মনুষ্যের মধ্যে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে ।

কার্পণ্য-দোষপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসমুচ্চৈতাঃ ।

যচ্ছেদ্রুং শ্রামিচ্চিতং ক্রহি তন্মে শিষ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥

(গীঃ ২।৭)

আত্ম-নিবেদন

(প্রবাসে অবস্থানকালে)

এইবার প্রভু উদ্ধারহ মোরে
আর না রাখিহ গুহার ভিতরে
এ সকল স্থানে থেকে থেকে মোর
চিন্ত হয়েছে বিকল ।

মরণ আমার অতি সন্নিধানে
তাই তোমা আজি ডাকি প্রাণপণে
আমারে লইতে তোমার করুণা
হারিয়েছে নাকি বল ॥ ১ ॥

তোমার বাণীর কবে আসে ডাক
তাই ত সতত রয়েছি সজাগ
তোমার স্বপন ছাড়ায়েছে ঘুম
নিদ্রাহারা যে আমি ।

আর ত কাটেনা বিনিদ্র রজনী
কেমনে বাহিব দিবস যামিনী
হাসিতেছে শুধু ঘোর ঘনকাল
দুঃখের স্রবাস চুমি ॥ ২ ॥

গৃহেতে যাদেরে বলেছিছু ছায়া
সেইগুলি হেথা ধরিয়েছে কায়া
প্রাণের সজোর উজোরে তাদের
ভাসিতেছে মন আজ ।

বৃথা শুনেছিছু তব উপদেশ
শ্রীহরি-ভজনে ছেড়েছি স্বদেশ
এই বনমাঝে তোমায় ছাড়িতে
শুধু মোর মুখে লাজ ॥ ৩ ॥

বাণীর বৈভবে কত না দূষেছি
মঠবাসী জনে সদাই নিষেছি,
বুঝিনিকো কভু গুরুর সেবক
সদা মাগু আপনার ।

পাইতে শ্রীহরি গৃহ ছাড়ি দিয়া
তব শ্রীচরণে সকলি সঁপিয়া
পলে পলে আমি বুঝিতেছি আজ
ত্যাগের বিপদভার ॥ ৪ ॥

যত দোষ সব রয়েছে আমায়
দোষের গরল জ্বলিছে হিয়ায়
পাগল হয়েছে চিন্তা যে মোর
সকলি যে বিষময় ।

হায় হায় হায় কি করিব আর
নাহি কোন পথ আজ পলাবার
মায়ার চিন্তা যে ঘোরে মোর পিছে
সবই দেখি মায়াময় ॥ ৫ ॥

ঘোর মায়াকাল ঘিরিয়াছে মোরে
মায়ার চিন্তা মোরে জারি মারে
এবে গুরুদেব তুমি মোর প্রভু
শ্রাণ মোর হরি' লও ।

প্রাণবায়ু কেন এখনো গেল না
কি দোষ আমার খুলেই বলনা
পাহাড়ে মাথাটি কুটিয়া মরিব
করিতে দোষের ক্ষয় ॥ ৬ ॥

আর ত চাহিনা রহিতে বাঁচিয়া
কতকাল আর রহিব বসিয়া
তোমার বিরহে যাতনা যে কত
বুঝিবে তুমি তা কিসে ?

ঘুচাবে কে মোর এ বিষম জ্বালা
জনম আমার মরণের মালা
সেই মালাখানি দাও মোর গলে
ধূলিতলে যাই মিশে ॥ ৭ ॥

আঁখি অপলক নিমেষ হারায়ে
রহিয়াছে বুথা এই পথ চেয়ে
চিত্রগুপ্ত হারায়েছে মোর
জনমের ঠিকানা ।

ষমরাজও লয় ভাল ছেলেটিরে
কে করিবে দয়া এই অভাগারে
দারুণ পাষণ হয়েছি বলিয়া
লাথিটাও কেউ মারে না ॥৮॥

কত জন্ম এল কত জন্ম গেল
কেহ এ পামরে রাখিতে নারিল
অধম পশুর যেই প্রভুভক্তি
তাহাও যে মোর নাই ।

কমিয়াছে তাই অন্ন ও জল
প্রতিদিন যাতে হই দুর্বল
গুরুপাপে সদা লিপ্ত রহিব
যদি মৃত্যু এসে যায় ॥ ৯ ॥

হাহা গুরুদেব কোথা তুমি আজ
কোথায় পামর এই বনমাঝ
এ শ্রাণ-চাতক তুষায় মরিছে
তব পাদসীধু বিনা ।

তোমার চরণ চাতক কাতরে
ডাকিছে কেবল বলি বারেবারে
“আমি নরাধম কাঙ্গাল দুর্জন
বলেকি চরণ পাবনা ?? ১০ ॥

কতকাল আর থাকিব এরূপ !
অনাদি হইতে ভুলিয়া স্বরূপ
ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতি দ্বারে দ্বারে
ব্যর্থ হয়েছি আমি ।

আজও কাণে বাজে সে করুণস্বর
দূর হতে তাহা আরও বহুদূর
করে বিদীর্ণ এ পাষণ বুক
জান তুমি অন্তর্যামী ॥ ১১ ॥

মিছা ভাষি শুধু সেই কালরাত
যবে ছাড়াছাড়ি তোমায় আমাত
আর কি জীবনে আসিবে সেদিন
পাইব (তোমার) চরণ-সেবা ।

যদি একান্তই বিধি হয় বাম
যামুনের ছায় ছাড়হ পরাণ
কি লাভ হইবে এ ছার জীবনে
লউক আমারে যেবা ॥ ১২ ॥

এথা নাহি গুনি তব গালাগালি
আহা সে মধুর অমৃতের ডালি
মাঝে মাঝে তাহা স্মরণে আসিলে
মন যে পাগল হয় ।

অন্ততঃ এক পত্র-ভিতরে
মোর দোষ যত একত্রিত করে’
প্রাণভরে মোরে দেহ গালাগালি
যাতে তব জ্বালা যায় ॥ ১৩ ॥

পুরাও তোমার হৃদয়ের আশ
আমি প্রভু তব চির ক্রোতদাস
লাথের কুকুর করিয়া আমারে
দেহ তব কাছে ঠাই ।

ব্যাসপূজার এক পুণ্য বাসরে
বলেছিলে নাকি সভার মাঝারে
“সেবকে ছাড়িয়া জন্ম-জন্মান্তরে
এক পা-ও নাহি যাই” ॥ ১৪ ॥

তাই তো তোমার চরণে মিনতি
রাখিতেছি তবে করিয়া প্রণতি
লৌকিকী তনু গ্রহণের কালে
আবার আসি যেন ফিরে ।

কীট-জন্ম যেন হয় মোর তথা
পামরে লইতে জনমিবে যেথা
মানুষ হবার বহু জ্বালা আছে
তিলে তিলে জারি মারে ॥ ১৫ ॥

—শ্রীবিষ্ণুনাথ রায় (বি.ই.)

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

ধাম-মাহাত্ম্য-বর্ণন

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১২০ পৃষ্ঠার পর)

১০ই চৈত্র **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাথ্য) — ইহা অপরাধভঞ্জনের পাট। শ্রীমন্নহাপ্রভু এখানে দ্বাদশ গোপালের অগ্রতম শ্রীবাস-চরণে অপরাধিহীন চাপালগোপাল ও দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ফালন করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যরত্ন, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের একমাত্র “অন্তরঙ্গ সেবক” (স্বয়ং শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরেরই উক্তি) এখানে “শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ” স্থাপন করেন। সত্যযুগে এখানে বাসুদেব নামক এক ভক্তকে ভগবান কোলরূপে দর্শন দান করেন। সেজন্ত এ স্থানের নাম “কোলদ্বীপ”। অশ্রদ্ধীয় আচার্য্যদেব গত বৎসর নবনির্মিত সুবিশাল মন্দিরে এখানে ‘কোলদেব’ প্রকটিত করিয়া ধর্ম ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক বিরাট যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন।

শ্রীখতুদ্বীপ (অর্চনাথ্য) — ষড়্‌ঋতুরাজগণ এই স্থানেই শ্রীগৌর-ভগবানের অবতার সম্বন্ধে চিন্তা করেন। তজ্জন্ত এই নাম।

১১ই চৈত্র **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাথ্য) — জহ্নুমুনি এখানে শ্রীশ্রীগৌরদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীমোদক্রমদ্বীপ (দাস্তাথ্য) — শ্রীরামচন্দ্রদেব বনবাসকালে এক মহাবট-বৃক্ষতলে এখানে অবস্থান করিয়া বৃক্ষাদির শোভাদর্শনে অতীব আনন্দিত হন এবং ভক্তগণের এখানে বৃন্দাবন-স্মৃতি হয়। তজ্জন্ত এইরূপ নাম।
মোদ—আনন্দ, ক্রম—গাছ।

১২ই চৈত্র **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাথ্য) — একাদশ রুদ্র এইস্থলেই শ্রীগৌরান্ধ দেবের আরাধনা করিয়াছিলেন।

শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাথ্য) — বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীশঙ্কর কৃপায় পার্বতীদেবী শ্রীগৌরপাদপদ্ম দর্শন করিয়া এখানে তাঁহার পদধূলি স্থায়ী সীমন্তে ধারণ করেন।

১৩ই চৈত্র **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাথ্য) — শ্রীগৌরান্ধরূপে এখানে আপনার অবতার ও তৎকালে ব্রহ্মার হরিদাস ঠাকুররূপে আবির্ভাব—এই অন্তরবাহী স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মাকে এখানে লেন। তজ্জন্ত নাম অন্তর্দ্বীপ।

জগদগুরু শ্রীমন্তক্ৰিবিনোদ ঠাকুর এই মায়াপুর যোগপীঠেই এক বিশাল মন্দিরে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-লক্ষ্মীপ্রিয়ার শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন।

শ্রীঅন্তর্য্যাপ দর্শন শেষে যাত্রিবৃন্দ শ্রীমন্তক্ৰিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ভুবন-বিখ্যাত শ্রীচৈতন্যমঠ ও ভক্ত চাঁদকাজির সমাধিস্থল দর্শনের পর জয়দেবের পাটে মাধ্যাহ্নিক প্রসাদসেবান্তে নবদ্বীপধামান্তর্গত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

পরিক্রমা উৎসবের বৈশিষ্ট্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর “কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” এই উক্তির অনুসরণে সর্বক্ষণ হরিকীর্তনই এই উৎসবের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। ধাম পরিক্রমাকালে, মহাপ্রসাদসেবনকালে, বিশ্রাম-সময়ে সর্বদাই হরিকীর্তনে যাত্রী-সাধারণ মগ্ন থাকিবার সুযোগ লাভ করেন।

যাত্রী ব্যতীত আহূত, অনাহূত, রবাহূত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবার অধিকার দেওয়া হইত। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের কঠোর নির্দেশ ছিল, যেন একজনও মঠস্থায়ী হইতে বিনা মহাপ্রসাদ সেবনে চলিয়া না যায়। ষষ্ঠ সহস্রেরও অধিক লোক প্রত্যেক বেলাতেই আকর্ষিত মহাপ্রসাদ পাইতেন। মঠের চতুষ্পার্শ্বস্থ বহু লোকজন ও শহরের অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণও উৎসবের কয়দিনই ২ বেলায়ই মহাপ্রসাদ পাইতেন।

পরিক্রমান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীপাদ মোহিনীমোহন রাগভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, সাঁওতাল-পরগণার কুমড়াবাদ গ্রাম-নিবাসী শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী ও মেদিনীপুরের সতীশ দাস মহাশয়গণের সুললিত উচ্চ কীর্তনে যাত্রী-ভক্তগণ বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতেন। বিভিন্ন ত্রিদণ্ডিপাদগণ—শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজ, শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ, মশীভক্তিবোদান্ত রাধাকান্তী মহারাজ, শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত শান্ত মহারাজ, শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত যুনি মহারাজ, শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত শুদ্ধাঈতী মহারাজ, শ্রীমন্তক্ৰিবাবিধি পুরী মহারাজ ও মঠস্থ ব্রহ্মচারিবৃন্দ,—গৌড়ীয়গণই যে সনাতনধর্ম-যাজনকারী একমাত্র শুদ্ধভক্ত, কীর্তনাখ্যা ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ, এবং বঙ্গের অন্যান্য মিশন-সংঘগুলির বেশীরভাগই যে প্রচ্ছন্ন খৃষ্টান, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন ইসলাম-ধর্মের প্রচারক, তাহা তেজস্বীকণ্ঠে অখণ্ড যুক্তিধারা স্থাপনপূর্বক যাত্রি-

দিগের নিকট দিব্যজ্ঞানের পথ উন্মোচন করিয়া দেন। প্রতিটি দ্বীপেই তত্ত্ব-ধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-শ্রবণে যাত্রিবৃন্দ পথশ্রম ভুলিয়া হরিগুণ-গানেই মত্ত থাকিতেন।

জয়দেবের পাটে মাধ্যাহ্নিক প্রসাদ সেবনের দিন হাজার হাজার লোক (আনুমানিক ১২০০০) অকাতরে প্রসাদ পাইয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাস-লীলা গ্রহণের পূর্বে “ম্যানেজার বিনোদ বাবু” নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি মায়াপুর এষ্টেটের ম্যানেজার ও নদীয়া-জেলাবোর্ডের একরোখা সদস্য ছিলেন। তাঁহার সুশাসন ও দাপটে সমগ্র নদীয়া জিলা স্তব্ধ ছিল। “ম্যানেজার বিনোদ বাবু আসিয়াছেন”—এই সংবাদটাই এত জনসমাগমের একমাত্র কারণ। মধ্যাহ্ন ১২-৪৫টা হইতে অপরাহ্ন ৫টা প্রসাদ-বিতরণ পর্যন্ত চলিতে থাকে। জয়দেবের পাট হইতে মায়াপুরের হলের ঘাট (গঙ্গাঘাট) পর্য্যন্ত পথ (প্রায় ২ মাইল) মহাপ্রসাদ-সেবান্তে-বহির্গামী জনশ্রোতের একটি শ্রেণী সন্ধ্যা ৬-৩০টা পর্য্যন্ত সর্সঙ্কণ বর্ত্তমান ছিল। কোন নবাগত পথিকের ভ্রম হইবে, যেন একটি মেলা বসিয়াছে এবং মেলাশেষে যাত্রিবৃন্দ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে এবং অনেক নূতন ব্যক্তি মেলা-মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বহু পুরাতন প্রজা শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট দেখা করিতে আসিয়া আর্জি-সহকারে বলিতে থাকেন, “বাবু, আপনার আমলে আমরা যে কত সুখে ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আপনি আর এখানে নাই, আমাদেরও দুঃখের অন্ত নাই।” এই সকল কথা বলিতে বলিতে অঝোর নয়নে তাহারা ক্রন্দন করিতে থাকেন। শ্রীল আচার্য্যদেবও তাহাদিগকে বহুপ্রকারে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সবই বিফল। তাহাদের ঐ এক কথা, “আপনি এখানে আবার চলিয়া আসুন।” উৎসবের শেষ দিবস অর্থাৎ গৌরপূর্ণিমার পর দিবস কত হাজার লোক যে মহাপ্রসাদ পাইয়াছে (বেলা ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত) তাহার হিসাব নাই। আনুমানিক ৩০।৩৫ হাজার ব্যক্তি এইদিন মহাপ্রসাদ সেবন করেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগমন

নবদ্বীপ Govt. Sanskrit College এর প্রফেসর সুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ বি. এ. মহোদয় ‘শ্রীগৌরতত্ত্ব’ সম্বন্ধে একদিন সংস্কৃত-ভাষণ দান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিম্বিত করিয়া দেন।

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিকান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিষ্ঠাবান্

গৃহস্থভক্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় ধাম পরিক্রমা এক সংক্ষিপ্ত ও মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ সম্বন্ধে করেন।

পাড়ার লোকজনদের মন্তব্য

মহাপ্রসাদ-বিতরণেএরূপ উল্লুঙছয়ারের সংবাদে পাড়ায় বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়। পাড়ার বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের নিকট বলেন, “অত্যাচ্ছ হানে টিকিটদ্বারা কেবল যাত্রীদের জন্ত মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা। কিন্তু এখানে সকলের অবাধ অধিকার সত্যই আপনার উদারতা ও অতিমর্ত্য শক্তির পরিচায়ক।”

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এরূপ বিরাট যাত্রী-সমাবেশে অত্যাচ্ছ বৎসরের স্থায় এবংসরও মনিপুর-রাজবাটী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ কৰ্ম্মকার এবং মঠের চতুর্পার্শ্বস্থ গৃহস্থগণ বাসস্থানদানে সহযোগিতা দ্বারা সমিতিতে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিয়াছেন। পাড়ার বহু বালক স্বেচ্ছাসেবকের কাজে পরমাশ্রুতি অর্জন করিয়াছেন। সমিতি ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। পাড়ার সকলেই এই উৎসবের সুসাক্ষ্যে যত্নাগ্রহ করায় তাঁহাদের নিকটও সমিতি কৃতজ্ঞ।

শ্রীধাম-পরিক্রমার এই মহাযজ্ঞের বিরাট ব্যয়ভার বহনে মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলের সজ্জনবৃন্দের সহানুভূতি উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে তণ্ডুলাদি সংগ্রহ ব্যাপারে মেদিনীপুর জিলার ভক্তগণ অগ্রগণ্য। বিশেষতঃ তত্রস্থ কল্যাণপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোক্ষদাসাধিকারী প্রভুর দান উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে সমস্ত যাত্রীর নিকট নিবেদন,—তাঁহারা যেন বন্ধুসহ প্রতি-বৎসর এরূপ আগমন করিয়া সমিতিতে ভক্ত-ভগবানের সেবাধিকার দান-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিপাদপদ্মে নিত্যাশ্রুতি অর্জন করেন।

—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, B. E. (Cal.)

প্রচার-প্রসঙ্গ

ছুমকা জেলার প্রচার

প্রচারের উদ্দেশ্য

“আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।

প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥

আচার-প্রচার-নামের করহ দুই কার্য।

তুমি সর্ব গুরু, তুমি জগতের আৰ্য্য॥”

এই চৈতন্য-বাণীর মূর্তিবিগ্রহ, পরমকারুণিক, জীবহিতৈষণৈকব্রত, পরম-হংসস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ—জগদ্বন্ধনামূলক, নিত্যধারাবিচ্ছিন্ন, কালান্তর্গত, অসনাতনী ধর্মগুলির হেয়ত্ব প্রদর্শন অপেক্ষা সনাতন বৈষ্ণবধর্মই যে একমাত্র চেতনধর্ম এবং পৌর-রিনোদ-বাণীই যে তাহার একমাত্র পরিবেশক, ইহা জানাইবার জন্ত গত ৮ই এপ্রিল বুধবার (একাদশী দিবস) সঙ্গে ষোড়শ মূর্তি মঠবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী লইয়া রাত্রি ১১টার সময় শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ হইতে ছুমকা জিলাস্তর্গত সারসাজোল গ্রাম-নিবাসী শ্রীপাদ মধুসূদন বিত্তানিধি, বিঃএ, মহোদয়ের বাটীর উদ্দেশে রূপাপূর্বক শুভবিজয় করেন।

প্রচার-সঙ্ঘের সদস্যগণ

(ক) মঠবাসী

১। পরমহংসস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তি বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ। ৪। শ্রীপাদ চিদ্বনানন্দ ব্রহ্মচারী। ৫। শ্রীপাদ বৃষভালু ব্রহ্মচারী। ৬। শ্রীপাদ ভগবান-দাস ব্রহ্মচারী। ৭। শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী। ৮। শ্রীপাদ হরিহর ব্রহ্মচারী। ৯। শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী। ১০। শ্রীপাদ বৃন্দাবনবিহারী-দাস ব্রহ্মচারী। ১১। শ্রীপাদ মাধবদাস ব্রহ্মচারী। ১২। শ্রীপাদ শেষশায়ী ব্রহ্মচারী। ১৩। শ্রীপাদ নিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী। ১৪। শ্রীপাদ রোহিণীনন্দন ব্রজবাসী। ১৫। শ্রীপাদ সনৎ কুমার ব্রহ্মচারী। ১৬। শ্রীপাদ গজেন্দ্র মোচন ব্রহ্মচারী। ১৭। শ্রীপাদ গোপীনাথ ব্রহ্মচারী।

(খ) গৃহস্থ

১৮। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী। ১৯। শ্রীপাদ মধুসূদন

বিদ্বানিধি, বি-এ। ২০। শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী। ২১। শ্রীপাদ
উরুক্রম দাসাধিকারী। ২২। শ্রীপাদ নবীনমদন দাসাধিকারী।
২৩। শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মণ্ডল। ২৪। শ্রীযুক্ত রত্নাকর দাস।

যাত্রারন্ত

নবদ্বীপ হইতে প্রচার-সঙ্ঘ কাটোয়া-আহমদপুর-সাঁইথিয়া হইয়া তৎ-
পরদিবস (২ই এপ্রিল) বেলা ১১-৩৫ মিঃ সারসার পথে আসনবনি পৌঁছেন।
সাঁইথিয়া রেল-স্টেশনে শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীল আচার্য্য-
দেবের অভ্যর্থনার জন্ত পূর্ব হইতে অবস্থান করিতেছিলেন। আসনবনিতে
পূর্ব হইতে অগণিত জনসমুদ্র পুষ্প, মালা, চন্দন, পতাকা, মৃদঙ্গ, করতাল ও
শঙ্খ লইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমন প্রতীক্ষায় চৈত্রেয় নিদাঘদগ্ধ দিবসে
উন্মুক্ত প্রান্তরে চাতকের ছায়া অবস্থান করিতেছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবকে
লইয়া যাত্রিপরিবাহক মোটর বাসটী আসনবনি পৌঁছিলে জনতার উচ্চ
করতালি, হর্ষধ্বনি এবং আচার্য্যদেবসহ গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির জয়-
ধ্বনিতে পবনদেব মুখরিত হইয়া উঠেন। জনতার ভীড় ঠেলিয়া কোনক্রমে
বিদ্বানিধি প্রভু কর্তৃক পূর্বস্থিরীকৃত তাঁহার আসনবনিস্থ অট্টালিকায় শ্রীল
আচার্য্যদেবকে লইয়া যাওয়া হয়। অসংখ্য জনতার চাপকে কোনওপ্রকারে
শাস্ত করিয়া একটি পাত্রে জল লইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম স্পর্শ-
পূর্বক তাহা জনতাকে দিয়া বিশ্রামকক্ষটী বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। প্রায়
দেড় ঘণ্টা পরে জনতার চাপ কিছু কমিয়া আসিলে আমরা স্নানাদি সমাপন-
পূর্বক দ্বাদশী-তিথির মাধ্যাহ্নিক প্রসাদ গ্রহণ করি। গ্রামটী ম্যাসাজোর
বাঁধের জলবিদ্যুৎদ্বারা আলোকিত।

স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট শ্রীল গুরুদেবের হরিকথা

পৌঁছানোর দিবসে অপরাহ্ন হইতেই স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শ্রীল
আচার্য্যপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ
নলিনীরঞ্জন মণ্ডল ও শ্রীযুত ভোলানাথ দত্ত মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে
উল্লেখযোগ্য।

বক্তৃতাবলী

প্রথম দিবস :— একসজ্জন মণ্ডলীর বৈঠকে সমিতির তেজস্বী বক্তা
ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ “সতাং প্রসঙ্গান্নম বীৰ্য্য-
সংবিদঃ” শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়া সৎ কি ও অসৎ কি, সে সম্বন্ধে এক গভীর

দার্শনিক বিচার-সুশ্লীলিত বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ শ্রদ্ধেয় হইয়াছেন।

দ্বিতীয় দিবস :— সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে যথাক্রমে নিম্নলিখিতগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রতিদিন সভাশেষে বক্তৃতা করিতেন। বলা বাহুল্য, সকলেই বিশাল সভার মধ্যে মাইকযোগে বক্তৃতা-দান করেন :—

শ্রীবৃন্দাবনবিহারী দাস ব্রহ্মচারী—সনাতন ধর্ম্ম।

ত্রিদিগুিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদ্য নারায়ণ মহারাজ— মানব জীবনের কর্তব্য (হিন্দীতে)।

শ্রীল আচার্য্যদেব—হিন্দু শব্দের ব্যাখ্যা।

বক্তৃতাশেষে পূজাপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা আলোচনামুখে কসরৎভাঁজা সাহজিয়াদের কপট-ভক্তির সহিত গুরু ভক্তের তফাৎ সুন্দররূপে পরিস্ফুট করেন।

তৃতীয় দিবস :—শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহারই আদেশক্রমে নিম্নলিখিতগণ মাইকযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী—শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের গুঢ় উদ্দেশ্য।

শ্রীপাদ চিদ্বনানন্দ ব্রহ্মচারী—ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা।

পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ—গুরুভক্তি কাহাকে বলে (হিন্দীতে)।

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ—ধর্ম্মযাজনে অনিচ্ছুকগণের মনের কথা।

শ্রীল আচার্য্যদেব—বর্তমান সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও তন্নিরোধ উপায়।

আসনবনিতে প্রচারে জাগরণ

তৃতীয় দিবসে বক্তৃতাদানে রাত্রি অধিক হওয়ায় শ্রীল গুরুদেব সেদিনকার মত বিদায় চাহিলে, শ্রোতৃবৃন্দ সম্বরে অনুরোধ জানান, “আপনার ছায় মহাতেজস্বী বক্তা ও প্রচারক আমরা জীবনে দেখি নাই, শুনিও নাই। লোকে যত সব হাবিজাবি কথার মাধ্যমে আমাদের নিকট ধর্ম্মস্থাপন করিবার চেষ্টা করে। আমরা আরও কিছু শ্রবণের ইচ্ছা পোষণ করি।”

সভার প্রথম দিবসে প্রায় দেড় হাজার শ্রোতা হইয়াছিল। ঐদিন শ্রীল আচার্য্যদেবের তেজোদ্দগু ভাষণের সংবাদ পরদিবসই চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া যায়। ফলস্বরূপ, শেষ দিবসে আরও বহু লোকের সমাগম হয়।

পার্শ্ববর্তী বহু অঞ্চল হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সভায় যোগদানের জন্ত স্থানীয় ভক্তগণ নিমন্ত্রণ লিপি প্রেরণ করেন। শ্রীপাদ মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি, এ, মহোদয় এই সকল ব্যক্তিবর্গের জন্ত রাত্রিতে প্রসাদাদির বন্দোবস্ত করেন। এক্রপ সেবা-প্রবৃত্তিতে তাঁহার মধ্যে আদর্শ গৃহী-বৈষ্ণবের বৃত্তিই পরিলক্ষিত হয়।

সারসাজোলে উপস্থিতি

পরদিবস ১২ই এপ্রিল শিবিকাযোগে শ্রীল গুরুদেব সারসাজোল গ্রামে শুভবিজয় করেন। আসনবনি হইতে সারসাজোল ছয় মাইল। গ্রামে পৌঁছিলে পথিপার্শ্বে অপেক্ষমান জনতা শঙ্খধ্বনিসহ শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভিনন্দন জানান। গ্রামের মধ্যে দিয়া চলিতে থাকাকালীন শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের পাকীর উপর অসংখ্য পুষ্প বর্ষিত হইতে থাকে। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের উপস্থিতিতে সমস্ত গ্রামেই বিশেষ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। এখানে শ্রীপাদ বিদ্যানিধি প্রভুর বাটীতে আমাদের বাসস্থান হয়। এখানে আমরা সাতদিন অবস্থান করি। ধনীর গ্রাম হইলেও গ্রামবাসী প্রত্যেকের আচার-ব্যবহার ও বৈষ্ণব-সেবাগ্রহ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমস্ত গ্রামটী হরিকথায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অসমোদ্ধ ব্যক্তিত্ব দর্শনে, তাঁহার হৃদয়ভেদী মাধুর্য্যময়ী তীব্র-বাণী ও অকাট্য যুক্তি-শ্রবণে গ্রামবাসিগণ এতই অভিভূত হইয়া পড়েন যে, অসমীয়া গুরুপাদপদ্মকেই তাঁহাদের একমাত্র পরমারাধ্যদেব জ্ঞান করেন। বিদ্যানিধি প্রভুর অগাধ ভ্রাতৃবৃন্দসহ গ্রামের অধিকাংশ উন্নত পরিবারবর্গই শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত হইয়াছেন।

গ্রামটীর বৈশিষ্ট্য

এক্রপ গ্রাম জগতে এই দ্বিতীয়। শ্রীমন্নহাগ্রভূর সময় কুলীনগ্রামের সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন। আজ পৌনে পাঁচ শতবর্ষ পরে এই সারসাজোল-গ্রামে ভারতের সর্বাপেক্ষা তেজস্বী ও শক্তিশালী আচার্য্য শ্রীমন্তকৃতিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের একমাত্র অন্তরঙ্গ প্রিয়তম ভক্তের শুভাগমনে গ্রামটীর এইরূপ পরিবর্তনে কুলীনগ্রামের সেই পূর্বস্মৃতিই আমাদের হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়াছিল। ধন্য সারসাজোল! ধন্য সারসাজোলের ভক্তবৃন্দ!! ধন্য সারসাজোল গ্রামে আকর্ষণকারী ভক্তাগ্রগণ্যদ্বয়—শ্রীপাদ মধুসূদন বিদ্যানিধি মহোদয় ও শ্রীপাদ নবীনমদন প্রভু!!! সারসায় আর যাহাদের সেবা বিশেষ-

ভাষে শ্রীল গুরুদেবকে অতিভূত করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরতন চন্দ্র মণ্ডল, শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মণ্ডল, শ্রীনদীয়ানন্দন মণ্ডল, শ্রীপ্রমথ নাথ মণ্ডল, শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মণ্ডল, শ্রীবরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীহরিপদ মণ্ডল ও শ্রীসুস্থির মণ্ডলের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রতিদিবসের সভা-সমিতির বিবরণ

সভার প্রতিদিবসই শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহারই আদেশক্রমে কে কোন্‌দিন বক্তৃতাদান করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রতিদিন সভার শেষে ভাষণ প্রদান করেন।

১১ই এপ্রিল :—

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ—ইনি প্রায় চার বৎসর পূর্বে এই গ্রামে শ্রীগৌড়ীয়বেদান্ত সমিতির পক্ষে সর্বপ্রথম প্রচারোদ্দেশে আসিয়াছিলেন। তদানীন্তন অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীপাদ রোহিণীনন্দন ব্রজবাসী—বক্তৃতামুখে কীর্তনাদি দ্বারা ভাগবত কথা আলোচনা করায় শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃৎকর্ণসায়ন হইয়াছে।

শ্রীল গুরুদেব—শাস্ত্র কাহাকে মানব বলেন? —এই বক্তৃতার পরদিবসই গ্রামের অধিকাংশ লোক মৎস্য, মাংস ও ধূমপান পরিত্যাগ করত শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্ব আশ্রয় করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন।

১৩ই এপ্রিল :—

শ্রীপাদ মধুসূদন বিজ্ঞানিধি, বি, এ,—মধুসূদন প্রভু বলেন, “আমার পূর্বে বৈষ্ণবধর্ম্য় সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা ছিল। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়বেদান্ত সমিতির সংস্পর্শে এসে সে ভ্রান্তি দূর হয়েছে। বৈষ্ণবগণই পৃথিবীর উচ্চতম শিক্ষিত ও ভদ্র। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—“যন্তাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈর্ভগ্নৈস্তত্র সমাসতে হুয়াঃ। হরাবভক্তস্ত কুতো মহদগুণাঃ, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।” অর্থাৎ ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তিবিশিষ্ট জনেই সকল গুণেরই বিশ্রাম। অসংকার্য্যে মনোরথ-চালক কৃষ্ণভক্তের আর মহৎগুণ কি? ‘তীর্থঙ্কল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে, সে সব ভক্তির প্রবন্ধন। বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এইসব, যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।”—এই মহাজন পদটির বারংবার উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণবসেবার সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত

করেন। বিধানিধি মহোদয় আরও বলেন, “আজকাল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আহা-বিহার, পোষাক পরিচ্ছদে (লুঙ্গি ইত্যাদি মুসলমানী পোষাক পরিধান) বিশেষ কিছু প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় না। এমন কোন অনাচার নাই যাহা কেবল মুসলমানরাই করে কিন্তু হিন্দুরা করে না। গোমাংস অভক্ষণের দিক দিয়া হিন্দুদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করাও চলবে না। কারণ গোমাংস অভক্ষণের আদেশ বা বিধি কোন মুসলমান ধর্মগ্রন্থে নাই। যাহারা তাহা গ্রহণ করে, সে কেবল নিজরুচি অনুযায়ী। সে দিক দিয়া বিচার করলে দেখা যায় যে, শতকরা ৯৮ জন মুসলমানই এই অমেধ্য বস্তুটী গ্রহণ করে না। খাওয়া সম্বন্ধে বিচারই ধর্মের একটি বিশেষ অঙ্গ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, “আহা-শুক্লী স্বত্বত্বিঃ, স্বত্বত্বকৌ ক্র্যাস্মৃতিঃ”—এ বিচার না করলে ধর্মযাজনই বুঝা।” এতৎপ্রসঙ্গে ঐ অঞ্চলে বকাপাহাড়ী, শিংবাহিনী ইত্যাদি কল্লিত গ্রাম্য দেবতার পূজায় পূজকের মধ্যে যে আদিম প্রকৃতিরই পরিচয় প্রকাশিত হয়—তাহা বলেন। তিনি আরও বলেন, “সাঁওতালগণ যেমন পাথরকে ঠাকুর বলিয়া পূজা করে ইহারও তদ্রূপ ভূতপূজক। গীতার ‘ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যঃ’ শ্লোকটীই ইহার সাক্ষ্য প্রমাণ।”

শ্রীপাদ হরিহর ব্রহ্মচারী—শ্রীবন্ মগাপ্রভুই স্বয়ং ভগবান।

শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী—মনুষ্যজন্মের সার্থকতা।

শ্রীপাদ চিদ্বনানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ না করিলে কি হয়?

পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ—মুন্সীর আদর্শ কি হওয়া উচিত? আদর্শ কাহাকে বলে?

শ্রীল আচার্য্যদেব—স্বর ও অস্বরের পার্থক্য।

১৩ই এপ্রিল :—

শ্রীপাদ ভগবানদাস ব্রহ্মচারী—‘জীব প্রেম’ ও ‘জীবসেবা’ শব্দবয়ের (অব্যোক্তিকতা) সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন।

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ—বর্ত্তমান শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত।

শ্রীল আচার্য্যদেব—‘কীর্ত্তন সাধন’ সম্বন্ধে এক ঐতিহ্যপূর্ণ শাস্ত্রীয় বিচার (সম্বলিত ভাষণ-দান করেন।)

১৫ই এপ্রিল :—

শ্রীপাদ চিদ্বনানন্দ ব্রহ্মচারী—হরিবিমুখ জনগণই মুক্ত।

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ—ভগবৎসেবা কি?

পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ—কৃষ্ণই একমাত্র পরতত্ত্ব (হিন্দীতে)

শ্রীল আচার্য্যদেব—ব্রহ্মে লীন হ’য়ে যাওয়া বা ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া (ব্যাপারটী শাস্ত্র-যুক্তিসঙ্গত নয়।)

১৬ই এপ্রিল :—

শ্রীপাদ বৃন্দাবনবিহারী দাস ব্রহ্মচারী—সারসাজোল গ্রামের মনস্তত্ত্ব
(বিশ্লেষণ ও তৎপ্রতিকার উপায় নির্দেশ ।)

শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী—শাস্ত্রীয় ৪টি সংসম্প্রদায়ের বিচার-পার্থক্য ।

শ্রীল আচার্য্যদেব—ঈশ্বর সাকার বস্তু, নিরাকার নহে ।

১৭ই এপ্রিল :—

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ‘অজামিল-উপাখ্যান’
পাঠ করেন ।

১৮ই এপ্রিল :—

শ্রীপাদ রোহিণীনন্দন ব্রজবাসী— শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করার
প্রয়োজনীয়তা ।

শ্রীপাদ ভগবানদাস ব্রহ্মচারী—জীবের বন্ধদশা হইতে মুক্তির উপায় ।

শ্রীল আচার্য্যদেব—নিরাকারবাদই নাস্তিক্য-শাযণ-বাদ ।

বক্তৃত্তা শেষ হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট উপসংহার-স্বরূপ
নিম্নলিখিত বাণীটি স্থাপন পূর্বক বিদায় গ্রহণ করেন । এই দিবসই
সারসাজোল গ্রামে অবস্থিতির শেষ দিবস ।

“এখানে বহু অল্পগত ও শুশ্রূষ শ্রোতা পেয়েছি । আপনারা সকলেই
ভাগ্যবান । আজ পর্য্যন্ত কোন গ্রামে ধর্ম্মপ্রচারার্থ আমি সাতদিন থাকি
নাই । কিন্তু আপনারা আমাকে আকর্ষণ করে এখানে এতদিন রাখতে
পেরেছেন । আগামীকাল শ্রীযুক্ত গোপাল বাবু (মণ্ডল) তাঁর গ্রাম ‘রাজবন্ধে’
আমাদিগকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছেন । আপনারা সকলেই শাস্ত্রকথা
সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করবেন । হরিকীর্ত্তনই মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া
উচিত । যদি কাহারও মনে কোন ব্যথা দিবে থাকি তবে সেটী কৃষ্ণসেবার
জন্ত । নিরূপটে শাস্ত্রকথা কীর্ত্তন করাই আমাদের ধর্ম্ম । সত্য অপ্রিয়
হইলেও তাহা গোপন করা আমাদের ধর্ম্ম নহে ।” (ক্রমশঃ)

—নিজস্ব সংবাদদাতা

নির্য্যাতন-সংবাদ

সমিতির মেদিনীপুরস্থ হরিখালিবাজারে “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোড়ীয় আশ্রম”-
রক্ষক শ্রীপাদ ভক্তসেবক ব্রজবাসীপ্রভু প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে গত ৬ই বৈশাখ
১৩৭১, আমাদিগকে শোক-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন ।
বৎসর দশেক পূর্বে কৃষ্ণার্থে ত্যক্তসংসার-তিনি সমিতিতে যোগদান করিলে
প্রথমে “শ্রীসিদ্ধবাটী গোড়ীয় মঠে” প্রেরিত হন । পরে বিশেষ সেবাকুশলতার
জন্ত শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে আশ্রম-রক্ষক নিযুক্ত করেন । শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোক্ষণ

প্রভু-প্রদত্ত সমিতির তত্রস্থ জমিগুলির চাষাবাদ পরিচালনার ভার তাঁহার উপর ছাড়া ছিল।

এত বৃদ্ধ-বয়সেও তাঁহার একরূপ গুরুত্বপূর্ণ সেবাদায়িত্ব, ৪৫ ঘণ্টা বিশ্রাম ব্যতীত দিবারাত্রই অবিশ্রাম সেবা-লিপ্ততা, ব্যবহারে “অক্ৰোধ-পরমানন্দ” এবং ঐকান্তিক গুরু-বৈষ্ণবানুগত্য কী মঠবাসী ও গৃহস্থ সকলেরই আদর্শস্থানীয়।

বিগত বর্ষদ্বয় তিনি অসুস্থের অভিনয় করেন। দেহরক্ষার মাসখানেক পূর্বে ধামে তনুত্যাগের সংকল্প করিয়া তিনি নবদ্বীপে আসেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় ৬ই বৈশাখ মধ্যাহ্নকালে সজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-স্মরণপূর্বক ইহধাম ত্যাগ করেন।

তাঁহার পূর্বাশ্রম শ্যামরায়পুর হইতে অত্র ভ্রাতাসহ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অনন্ত কুমার দাস বৈষ্ণব-স্বতন্ত্র্যনুসারে সমিতির নবদ্বীপস্থ মঠে পিতার পারলৌকিক-উৎসব সম্পন্ন করেন। তাঁহার পুত্রগণ পিতার আদর্শ গ্রহণ করিলে সমিতির সভ্যগণ বিশেষ আনন্দিত হইবেন। —প্রকাশক

সাধু-সঙ্গ ও শ্রীগুরু-তত্ত্ব

(১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

কার্পণ্য অর্থাৎ চিত্তের নীনতা এবং কুলক্ষয় কৃত দোষ এই দুইটির আলোচনায় আমার স্বভাব অতিভূত হইয়াছে ; আমি ধর্মাধর্ম্য সম্বন্ধে বিমূঢ়-ছন্দ্র হইয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যাহাতে আমার শ্রেয়ঃ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল ; আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত আমারে শিক্ষা দাও।

গীতা-শাস্ত্রের এই শিক্ষাই আমাদের ভক্তিপথের প্রথম ও প্রধান সোপান।

কলিযুগে শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু সেই শিক্ষাই প্রেমারুরুক্ষ লোকগণের শিক্ষার্থ স্বয়ং শিষ্যাভিমাণে লীলাভিনয় করিয়াছেন—

“সংসারসমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।

এই আমি দেহ সমপিলাও তোমাতে ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।

আমারে করাও তুমি”—এই চাহি দান ॥ (১৫: ভা: আ:)

“সাধু শাস্ত্র-গুরু-বাক্য” পুনরায় শিরে ধারণ করিয়া শ্রীগুরুচরণে প্রার্থনা জানাইতেছি,— “যে-সব অধম লোক কীর্তনেরে হাঙ্গ।

তোমা হৈতে তাহারা ডুবুক কক্ষরসে ॥

তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল।

সুখে কৃষ্ণ গাই নাচি হইয়া বিহ্বল ॥” (১৫: ভা: ম: ২৬২৬৪)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিশূষণ

বালুরঘাট (পঃ দিনাজপুর)

শ্রীশ্রীরথযাত্রার আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়ত:

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১; ইং ৩১।৫।৬৪

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোত্তাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে আগামী ২৫শে আষাঢ় ১৩৭১, ইং ৯ই জুলাই ১৯৬৪ বৃহস্পতিবার হইতে ৩রা শ্রাবণ ১৩৭১, ইং ১৯শে জুলাই ১৯৬৪ রবিবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীৰ্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাট্রিক, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবামুখী শ্রুতি অর্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কুপালেশ-প্রার্থী —

সত্যেন্দ্র,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরমহংসস্বামী শ্রীমদভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

- ১। ২৫শে আষাঢ়, ২ই জুলাই, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৯টা পর্যন্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্তন।
- ২। ২৬শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই, শুক্রবার—পূর্নহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত নগর-সংকীৰ্ত্তন-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও গুণ্ডিচা-মার্জ্জন, গঙ্গা-স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন।
- ৩। ২৭শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, শনিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। পূর্নহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত সংকীৰ্ত্তন-শোভাযাত্রা-যোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন। পরে শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ ও কীর্তন।
- ৪। ২৮শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই, রবিবার হইতে ৩০শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই, মঙ্গলবার পর্যন্ত দিবসত্রয়—অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাজ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৫। ৩১শে আষাঢ়, ১৫ই জুলাই, বুধবার—হেরাপঞ্চমী দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্নহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও নগর-সংকীৰ্ত্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন।
- ৬। ৩২শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই, বৃহস্পতিবার হইতে ২রা শ্রাবণ, ১৮ই জুলাই, শনিবার পর্যন্ত তিন দিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমদ্ব্যাহ্নপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৭। ৩রা শ্রাবণ, ১৯শে জুলাই, রবিবার—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৭টা পর্যন্ত সংকীৰ্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা, পরে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন; রাত্রে সৰ্বসাধারণে মহা-প্রসাদ বিতরণ।

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

গোড়ীয়-পত্রিকা

১৬শ বর্ষ } আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৭১ { ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা




শ্রীপিছলদা গোড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্নহরণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

* ধর্ম: ব্রহ্মজিত: পুংসাং বিবর্তসেন-কথাসু য:	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">গৌড়ীয়-পট্টিকা</p> </div> <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা ধন্যাত্মা সুপ্রসীদতি ॥</p>	* নোংপাদরেদেদি রক্তিং শ্রমএব হি কেবলম্
<p>সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম । অল্প ধর্ম মুহূর্ত্তপে পালে বেই জন । অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন । হরি-কথার বস্তু নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥</p>		

১৬শ বর্ষ } কারণোদশায়ী, ২১ বামন, ৪৭৮ গৌরাক্ষ } ৫ম সংখ্যা
 বৃহস্পতিবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১; ইং ১৬/৭/১৯৬৪

সান্নিধ্যাদং শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোষ্ঠামিপাদ-বিরচিতং শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরট-রুচিরং ভাব-বলিতং
 মৃদঙ্গাঈষ্ঠৈঃ স্বজন সহিতং কীর্তনপরম্ ।
 সদোপাস্ত্রং সর্বৈঃ কলিমল-হরণ ভক্ত-সুখদং
 ভজ্যামন্তং নিত্যং শ্রবণ-মননাদর্চন-বিধৌ ॥১॥

যিনি রাধা-ভাব-বিভাবিত, পুরটসুন্দর-দ্যুতি-সুবালিত, নবদ্বীপে মৃদঙ্গাদি
 যন্ত্র-সহযোগে-স্বগণসহ কীর্তনপরায়ণ। যিনি সকল জীবের নিত্যোপাস্ত্র, সেই
 কলিমলবিনাশী, ভক্তসুখপ্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকে মননাদি অর্চন-বিধিক্রমে
 (নবদ্বীপ ভক্তিদ্বারা) আমরা ভজন করি ॥১॥

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
 স্মৃতিবৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণু-সদনম্ ।
 সিতদ্বীপঞ্চাশে বিরল-রসিকোহয়ং ব্রজবনং
 নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিত্তদিতম্ ॥২॥

‘ছানোগ্য’ নামক উপনিষদে যাহা ‘পরব্রহ্মপুর’ নামে উক্ত, স্মৃতি যাহাকে ‘বিষ্ণুসদন-বৈকুণ্ঠ’ বলিয়া কীর্তন করেন, অপরাপর মহাজন যাহাকে ‘স্বৈতদ্বীপ’ এবং বিরল-রসিক-ভক্ত যাহাকে ‘ব্রজবন’ নামে অভিহিত করেন, সেই চিহ্ন-প্রকটিত পরম-সুখদ শ্রীনবদ্বীপধামকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

(১) অন্তর্দ্বীপ—শ্রীধাম মায়াপুর

কদা নবদ্বীপ-বনাস্তুরেহহং

পরিভ্রমন্ গৌরকিশোরমদ্ভুতম্ ।

মুদা নটন্তং নিতরাং সপার্ষদং

পরিস্কুরন্ বীক্ষ্য পতামি মুচ্ছিতঃ ॥ ৩ ॥

কবে আমি শ্রীনবদ্বীপের বনের অন্তর-ভাগে অর্থাৎ শ্রীঅন্তর্দ্বীপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অদ্ভুত শ্রীগৌরকিশোরকে পার্শ্বদগণসহ অতিশয় প্রেমভরে নৃত্য করিতে দেখিয়া আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া পড়িব ? ৩ ॥

তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণমূলমপি ন স্বপ্নেহপি যাযাদহো

শ্রীগৌরাজপুরস্ত যত্র মহিমা নাত্যদ্ভুতঃ শ্রয়তে ।

তে মে দৃষ্টিপথং ন যাস্তু নিতরাং সন্ত্যজ্যতামাপু যু-

র্ষে মায়াপুর বৈভবে শ্রুতিগতেহপ্যুল্লাসিনো নো খলাঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীগৌরধামের অত্যদ্ভুত মহিমা যে শাস্ত্রে ক্রুত হয় না, অহো ! সেই অসং-শাস্ত্র স্বপ্নেও যেন আমার শ্রুতিপথে আগমন না করে ; যে-সকল খল-ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়াও উল্লসিত হয় না, তাহারা যেন কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত কিংবা সন্ত্যজনের বিষয় না হয় ॥ ৪ ॥

অলমলমিহ যোষিদ্গর্দভী সঙ্গরঙ্গৈ-

রলমলমিহ বিস্তাপত্য-বিদ্যা-যশোভিঃ ।

অলমলমিহ নানা-সাধনায়াস-দুঃখৈ-

র্ভবতু ভবতু চান্তর্দ্বীপমাশ্রিত্য ধন্যঃ ॥ ৫ ॥

এই প্রপক্ষে যোষিদ্-গর্দভী-সঙ্গরঙ্গৈ আর প্রয়োজন কি ? প্রাকৃত-সম্পৎ, সন্তান, বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠাদির আর আবশ্যকতা কি ? আর নানাবিধ প্রাকৃত সাধনায়াসজনিত ক্লেশেরই বা প্রয়োজন কি ? মানব শ্রীঅন্তর্দ্বীপ আশ্রয় করিয়া ধন্য হউক ॥ ৫ ॥

ভূমির্ঘট্র সুকোমলা বহুবিধ-প্রত্যোতিরত্বচ্ছটা

নানা-চিত্রমনোহরং খগ-মৃগাত্যাশ্চর্য্য-রাগাঘিতম্ ।

বল্লীভুরুহজাতয়োহদ্বুততমা যত্র প্রসূনাভিভ-

স্তন্মে গৌরকিশোর-কেলিভবনং মায়াপুরং জীবনম্ ॥৬॥

যে-স্থানে ভূমি সুকোমলা এবং বিবিধ উজ্জলরত্নের প্রভায় দীপ্তিমতী, যে-ধাম বিচিত্র মনোহর শোভাযুক্ত, যেখানে পশু-পক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্য-প্রীতিতে আবদ্ধ, অথবা যে-ধাম পশুপক্ষিকুলের আশ্চর্য্য-নিনাদে মুখরিত, যে-স্থানে ফুলফলে তরুলতারাজি পরমাদ্বুতা শোভা ধারণ করিয়াছে, সেই গৌরকিশোরের ক্রীড়া-বিলাসভূমি শ্রীমায়াপুরই আমার জীবন ॥ ৬ ॥

(২) গোত্রমদ্বীপ

মিলন্ত চিন্তামণিকোটী-কোটয়ঃ

স্বয়ং বহির্দৃষ্টিমুপৈতু বা হরিঃ ।

তথাপি তদগোত্রম-ধূলি-ধূসরং

ন দেহমণ্ডত্র কদাপিযাতু মে ॥ ৭ ॥

অপরে কোটি কোটি চিন্তামণি লাভ করুক আর যাহাই করুক, অথবা বহির্দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তির নিকট স্বয়ং শ্রীহরির আগমন হউক আর যাহাই হউক (অর্থাৎ বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত অক্ষজ-জ্ঞানী স্বয়ং শ্রীহরিকে পাইয়াছে বলিয়া মনে করুক আর যাহাই করুক), কিন্তু তথাপি শ্রীগোত্রম-ধামধূলি-ধূসরিত আমার দেহ যেন কখনও সেই শ্রীধাম ছাড়িয়া অত্র কোথায়ও না যায় ॥ ৭ ॥

(৩) মধ্যদ্বীপ

কৃপয়তু ময়ি মধ্যদ্বীপ-লীলা বিচিত্রা

কৃপয়তু ময়ি মূঢ়ে ব্রহ্মকুণ্ডাদি-তীর্থম্ ।

ফলতু তদনুকম্পা-কল্পবল্লী তথৈব

বিহরতি জনবন্ধুর্যত্র মধ্যাহ্নকালে ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্নহাপ্রভুর বিচিত্রা মধ্যদ্বীপ-লীলা আমার উপর কৃপা বর্ষণ করুন। আমার মত মূঢ়ের প্রতি ব্রহ্মকুণ্ডাদি-তীর্থ কৃপা বিতরণ করুন। যথায় বিশ্বজনবন্ধু শ্রীবিষ্মন্তর মধ্যাহ্নকালে বিহার করেন, সেই পরমতীর্থের কৃপা-কল্পলতিকা আমাতে তেমনই ফলবতী হউন ॥ ৮ ॥

(৪) কোলদ্বীপ

জয়তি জয়তি কোলদ্বীপ-কান্তাররাজী

সুরসরিছপকণ্ঠে দেবদেব-প্রণম্যা ।

খগ-মৃগ-তরুবল্লী-কুঞ্জ-বাপী-তড়াগ-

স্থল-গিরি-হুদিনী নামদ্রুতৈঃ সৌভগাভ্যৈঃ ॥ ৯ ॥

পশু, পক্ষী, তরুলতাকুঞ্জ, দীর্ঘিকা, সরোবর, উপত্যকা, পর্বত এবং
হৃদসমূহের অদ্ভুত সৌন্দর্যাদিগুণে উদ্ভাসিত গঙ্গার উপকণ্ঠস্থ সর্বদেব-প্রণম্যা
শ্রীকোলদ্বীপ-কান্তার-রাজি জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন ॥ ৯ ॥

(৫) ও (৬) রুদ্রদ্বীপ ও মোদক্রমদ্বীপ

রুদ্রদ্বীপে চর চরণ ! দৃক্ ! পশ্য মোদক্রমশ্রী-

জিহ্বে ! গৌরস্থল-গুণগগান্ কীর্তয় শ্রোত্রগৃহান্ ।

গৌরাটব্য ভজ পরিমলং ভ্রাণ ! গাত্র ! হুমস্মিন্

গোড়ারণ্যে লুঠ পুলকিতং গৌর-কেলিস্থলীষু ॥ ১০ ॥

হে চরণ ! তুমি রুদ্রদ্বীপে বিচরণ কর ; হে লোচন ! তুমি মোদক্রম-
দ্বীপের সৌন্দর্য দর্শন কর ; হে রসনে ! তুমি শ্রুতিপথগত শ্রীগৌরধাম-
গুণাবলী অনুকীর্ণন কর ; হে নাসিকে ! তুমি শ্রীগৌর-বনের সুরাভ আভ্রাণ
কর ; হে গাত্র ! তুমি এই গোড়ারণ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের ক্রীড়াস্থলীসমূহে
পুলকিত হইয়া বিলুপ্তিত হও ॥ ১০ ॥

ইহ ভ্রামং ভ্রামং জগতি নহি গন্ধোহপি কলিতো

যদীয়ন্ত্রৈবাতিলনিগম-তুল্লক্ষ্য-সরণৌ ।

নবদ্বীপারণ্যে বত মহিম-পীযুষ-জলধৌ

মহাশচর্যোন্মীলন মধুরিমণি চিন্তং লগতু মে ॥ ১১ ॥

এই জগতে ভ্রমণ করিতে করিতে যাহার গন্ধলেশও পাওয়া যায় না,
যাহার পথ নিখিল-বেদ-তুল্লক্ষ্য, যাহার মধুরিমা মহাশচর্য্যবিকাপী, অহো !
যাহা অমিত মহিমার অমিয়-সিন্ধুস্বরূপ, সেই নবদ্বীপ-বনেই আমার চিন্তা
সংলগ্ন হউক ॥ ১১ ॥

মহোজ্জ্বল-রসোন্মদ-প্রণয়-সিন্ধু-নিশ্চলিনী

মহামধুর-রাধিকারমণ-খেলনানন্দিনী ।

রসেন সমধিষ্ঠিতা ভুবনবন্দ্যয়া রাধয়া

চকাস্তু হৃদি মে হরেঃ পরমধাম গৌড়াটবী ॥ ১২ ॥

পরমোজ্জ্বল রসোদ্বোলত-প্রণয়জলধির প্রসবগন্ধরূপ শ্রীরাধারমণের পরম-মধুর ক্রীড়ারঙ্গে আনন্দদায়ক, রসে সম্যক্ অধিষ্ঠিতা (রসপীঠ) শ্রীহরির পরমধাম গৌড়কানন ভুবনপূজ্যা শ্রীমতী রাধাসহ আমার হৃদয়ে প্রোক্তাসিত হউন ॥ ১২ ॥

(৭) জহ্মদ্বীপ

জন্মনি জন্মনি জহ্মাশ্রমভূবি বৃন্দারকেন্দ্র-বন্দ্যায়াম্ ।

অপি তৃণ-গুল্মকভাবে ভবতু মমাশাসমুদ্রাসঃ ॥ ১৩ ॥

নবদ্বীপের যে-স্থানে জহ্মুনির আশ্রম বিরাজিত, সেই দেবেন্দ্র-বন্দিতা পবিত্রভূমি শ্রীজহ্মদ্বীপে জন্ম-জন্ম তৃণ-গুল্মভাবেও আমার আশার সমুদ্রাস হউক ॥ ১৩ ॥

(৮) সীমন্তদ্বীপ

রাধাবল্লভ-পাদপল্লবজুষাং সন্ধর্ম্মনীতাযুষাং

নিত্যং সেবিত-বৈষ্ণবাজিঘ্ররজসাং বৈরাগ্যসীম-স্পৃশাম্ ।

হন্তেকান্তরসপ্রবিষ্ট-মনসামপ্যস্তি যদদূরত-

স্তদ্রাধা করুণাবলোকমচিরাহিন্দন্ত সীমন্তকে ॥ ১৪ ॥

শ্রীরাধাবল্লভ-পাদপল্লব সেবারত থাকিয়া, আজীবন শুদ্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, বৈষ্ণব-চরণ-রজের নিত্য সেবা করিয়া, বৈরাগ্যের পারগামী (চরম-সীমা প্রাপ্ত) হইয়া, এবং একান্ত প্রেমরসে চিত্ত নিমগ্ন করিয়াও হয়! শ্রীরাধার যে করুণা লাভ হয় না, আজ নবদ্বীপান্ত সীমন্তদ্বীপের সেবা করিয়া (সৌভাগ্যবান্ জীবের) সেই স্নহল্লভ রাধাকৃপা-কটাক্ষ সত্ত্বর লাভ হউক ॥ ১৪ ॥

বিগুদ্বাঈতৈকপ্রণয়-রস-পীষুষ-জলধেঃ

শচীশূনোদ্বীপে সমুদয়তি বৃন্দাবনমহো ।

মিথঃ প্রেমোদযুর্গুদ্রসিক-মিথুনাক্রীড়মনিশং

তদেবাধ্যাসীনং প্রবিশতি পদে ক্বাপি মধুরে ॥ ১৫ ॥

বিগুদ্বাঈত অর্থাৎ (শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবন-নায়ক) শ্রীরাধা-গোবিন্দের একান্ত-স্বরূপে যে অপূর্ব সন্মিলন (বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত)

তাহাই এবার একমাত্র মূর্তবিগ্রহরূপে প্রণয়-রসামৃত-সিন্ধু শ্রীশচীনন্দন কৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! তিনি কোনও এক মধুর দ্বীপাধিষ্ঠানে স্থায়ধামে শ্রীবৃন্দাবনকেও কৃপাপূর্ব্বক প্রকটিত করাইলেন! সেই অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনধাম পরস্পর প্রেমবশে নিরন্তর প্রমত্ত (পরশক্তি ও শক্তিমদ্ বিগ্রহ) শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিল্লীলা-সন্তোগ-ক্রীড়াভূমি। উহা (তদভিন্ন-স্বরূপ) শ্রীনবদ্বীপেই অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাহাতেই এবার প্রবিষ্ট (মিলিত) হইল ॥ ১৫॥

নাহং বেদ্বি কথং নু মাধব-পদান্তোজ্জ্বলী ধ্যায়তে
কা বা শ্রীশুক-নারদাদি-কলিতে মার্গেহন্তি মে যোগ্যতা ।
তস্মাস্তদ্রমভদ্রমেব যদি নামান্তাং মমৈকঃ পরো
রাধা-কেলিনিবুঞ্জ-মঞ্জুলতরঃ শ্রীগোক্রমো জীবনম্ ॥১৬॥

কিরূপে শ্রীমাধবের পাদপদ্মযুগল ধ্যান করিতে হয়, তাহা আমি জানি না; শ্রীশুক-নারদাদি মহাভাগবতগণ-সেবিত মার্গে ভজন করিবার আমার যোগ্যতাই বা কোথায়! অতএব, আমার শুভাশুভ যাহাই হউক, শ্রীরাধিকার কেলি-নিবুঞ্জদ্বারা অতি রমণীয় একমাত্র পরমধাম “শ্রীগোক্রম”ই আমার জীবন ॥১৬॥

যৎসীমানমপি স্পৃশেন্ন নিগমো দূরাং পরং লক্ষ্যতে
কিঞ্চিদ্ গূঢ়তয়া যদেব পরমানন্দোৎসবৈকাবধিঃ ।
যন্মাধুর্য্যকলাপ্যবেদি ন শিব-স্বয়ম্ভুবাঐরহং
তচ্ছ্রীমন্নবখণ্ডধাম-রসদং বিন্দামি রাধাপতেঃ ॥১৭॥

বেদ যাহার সীমাও স্পর্শ করিতে পারেন না, পরন্তু দূর হইতে তাঁহাকে নির্দেশ করেন মাত্র, যে-স্থানে অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ-মহোৎসবের একান্ত অবধি নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত, শিব-স্বয়ম্ভু প্রভৃতি দেবগণ যাহার মাধুর্য্যের কণামাত্রও অবগত নহেন, শ্রীরাধিকা-রমণের সেই প্রেমপ্রদ নবদ্বীপধাম কবে আমি লাভ করিব ? ১৭॥

সাময়িক-প্রদঙ্গ

“অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ ।

দ্যুতং পানং স্ত্রিয়ঃ স্নানা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ ॥

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ ।

ততোহনৃতং মদং কামং রজো বৈবরঞ্চ পঞ্চমম্ ॥

অমুনি পঞ্চস্থানানি হৃদয়প্রভবঃ কলিঃ ।

উত্তরেণেণ দত্তানি হ্রবসৎ তন্নিদেশকৃৎ ॥

অথৈতানি ন সেবেত বুভুযুঃ পুরুষঃ কচিৎ ।

বিশেষতো ধর্মশীলো রাজা লোকপতিগুরুঃ ॥

(ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১)

[রাজা পরীক্ষিৎ কলির প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, তাহাকে বাসোপযোগী যে যে স্থানে দ্যুত (অর্থাৎ অবৈধক্রিয়া), পান (মদ্যাদি সেবন), স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি), স্নানা (জীবহিংসা)—এই চতুর্বিধ অধর্ম আছে সেই চারি প্রকার স্থান প্রদান করিলেন। ৩৮। (উক্ত চতুর্বিধ স্থান পাইয়াও) কলি পুনরায় স্থানপ্রার্থী হইলে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ পরীক্ষিৎ সেই কলিকে স্বর্ণ প্রদান করিলেন। সেই স্বর্ণ দানেই কলিকে মিথ্যা, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গজ্ঞ কাম, রজোমূলা হিংসা এই—চারিটি স্থান ও পঞ্চম শত্রুতারূপ স্থানটি প্রদত্ত হইল। ৩৯। অধর্মের উৎপাদক কলি, উত্তরাসুত পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎপ্রদত্ত ঐ পাঁচটি স্থানে গমনপূর্বক বাস করিতে লাগিল। ৪০। অতএব যে পুরুষ আপনার উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা কখনও উচিত নহে। বিশেষতঃ ধার্মিক ব্যক্তি, রাজা, লোকনেতা, গুরুর পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা সর্বথা অতুচিত। ৪১।]

কলির নানাপ্রকার দোষ থাকিলেও একটি মহদগুণ আছে। সেটি নাম-কীর্তন। সুতরাং নাম-কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দোষগুলিও গুণ হইয়া পড়ে মনে করিয়া কোন কোন ভক্তাভিমানী কলির অবস্থিতি পাঁচটীকেও ‘ভজনাঙ্গ’ মনে করেন।

কলি যেখানে অবস্থান করে, তথায় পাপ মুর্তিমান্। যেখানে পাপ, সেখানে নামকীর্তন প্রবল হইতে পারে নাই। কীর্তনের সজ্জায় পাপাচরণ

নামাপরাধের অল্পতম। পাশাখেলা, নেশাকরা, অবৈধ ঘোষিতসঙ্গ, মৎস্ত-মাংসভোজন এবং ঐসকল ইন্দ্রিয়তর্পণের মানসে অর্থসংগ্রহ—এই পাঁচটি কলিজানোচিত পাপ। নামবলে এই পাঁচটি পাপ হজম করিবার চেষ্টাই ‘নামবলে পাপাচরণ’ নামক অপরাধ। উহা নাম-কীর্তন নহে।

‘নামে রুচি’ থাকিলে নাম ও নামীতে ভেদ বুদ্ধি থাকে না। কল্পনা-প্রভাবে ‘আমি নাম রচনা করিতে পারি’ মনে করা অহঙ্কারের পরিচয়। ষাঁহার অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা তাঁহারাই প্রতিষ্ঠাশালাভের বশবর্তী হইয়া নাম-ভজন-প্রণালী কল্পনা করেন। সাধু-গুরুবর্গ তাহা আদর করেন না। এজন্ত আচার্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোষামিপাদ বলেন, সাধুগুরু-নির্দেশ ব্যতীত নামের রচনাকারী হওয়া উচিত নহে।

— — —

গুরুর উপদেশক্রমেই জীবের অনুগ্রহ বা দীক্ষালাভ ঘটে। স্বয়ং কল্পনা করিয়া স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র প্রভৃতির রচনা গুরুবজ্জার অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণবের উহা ধর্ম হইতে পারে না। ভুঁইফোড় বিশৃঙ্খল অভক্ত গুরুপরিহার করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠাশা কামনা করে। উহা তর্কপন্থা বা ব্যতিরেকপন্থা, স্তূতরাং ভক্তির প্রতিকূল বিচার। বৈষ্ণবের বেশধারণ করিয়া, ভগবনামাদিতে বিভূষিত হইয়া হরিভজনের পরিবর্তে অল্প কিছুকে কৃত্যবোধ করা উচিত নহে।

— — —

বৈষ্ণবের দীনবেশের সহিত পাশকক্রীড়া শোভা পায় না। দাবা, তাস-পাশা পরমার্থীর ভজনের উপকরণ নহে। তাণ্ডুল-চর্ষণ ও নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ বৈষ্ণবজীবনে শোভা পায় না। মৃদঙ্গ, করতাল, জপমালিকা, কণ্ঠমালিকা, উর্দ্ধপুণ্ড্র, শরীরে ভগবনামাঙ্কনাদি শীতল-মুদ্রাধারণহলে জয়-পরাজয়মুখে আখড়ার পাশক্রীড়া ভজনের অনুকূল নহে।

— — —

হাঁটুর উপর বহির্বাসাদি পরিধান করিয়া পথিহিত গোময়-সংগ্রহকার্য্য লোকচক্ষে দৈত্বের ও সরলতার জ্ঞাপক হইতে পারে কিন্তু উহা শুকাইয়া নিজেদ্রিয় তর্পণোদ্দেশে নেশা করিবার জন্ত তাহাদিগকে ধূত্রপানের উপকরণরূপে পরিণত করিলে উহা শাস্ত্রানুসারে ভজনানুকূল বিষয় হয় না। স্নগন্ধি তৈল ও সাবানাদি অঙ্গমার্জনী বিলাসানুকূল বস্তু। বিরক্তাভিমানী

ভজনগুণ্ডায় উহা স্থান পাইলে এবং ভোগীর সঙ্গে স্থান পাইলে তাহার কেহই আদর করেন না।

রাধাকুণ্ড, কুম্ভসরোবর, গোবর্দ্ধন, যাবট, নন্দীগ্রামাদি ব্রজবীথিসমূহ যাহাদের নয়নপথ আকর্ষণ করেন তাহারা কখনই জড় স্নগন্ধি তৈল ব্যবহারাদিতে মুগ্ধ হন না। তাহাদিগকে পাশকক্ৰীড়া ও বৃহদ্ধুম্রযাত্রাদিতে মত্ত হইতে দেখা যায় না। যেখানে সেরূপ ভজনবিরোধী চেষ্টাসমূহ চলকীর্তনকারীকে গ্রাস করে, তাহাদিগকে বঞ্চক ইন্দ্রিয়াসক্ত সহজিয়াগণ গুরুপদে স্থাপিত করিয়া তাহাদের পদাবলেহন, গঞ্জিকা সমীকরণাদির সাহায্য করেন কিন্তু তাহারা কখনই হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপালাভে সমর্থ হন না।

অর্কাচীন, কপট, মূর্থ, অজ্ঞগণ এইরূপ ক্রীড়োন্মত্ত বিলাসপর নেশাখোর-দিগকে ধর্মপরায়ণ বলিয়া আদর্শ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের মুখোচ্চারিত নামাপরাধকে 'নামকীর্তন' বলিয়া চালাইতে চাহিলে উহা ভগবানের ও ভক্তের প্রীতি উৎপন্ন করিতে কখনই সমর্থ হয় না। গোড়ীয়গণ কখনই দ্যুতক্রীড়াসক্ত, আমিষভোজী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, মৎস্যমাংসাসী, জিহ্বালোভী, যক্ষনামধারী, মুদ্রাহেষী, মর্কটবৈরাগিগণকে 'গোড়ীয়' বলিয়া স্বীকার করেন না। পাপাসক্ত গৃহমেধিগণও 'গোড়ীয়' শব্দবাচ্য হইতে পারেন না।

গৃহমেধের বাক্তিক, কপট, আচার্য্যবংশাভিমানিগণ নিজ নিজ দৌর্ভল্য ও মূর্ত্যাহারা চালিত হইয়া লোকসংগ্রহ মানসে ভ্রষ্টাচারিগণকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া আপনাদিগকেও শৈশব, নেশাখোর, লাকবঞ্চনাপটু, অর্থগৃধ্রু ও জিহ্বাদাস করিয়া ফেলেন। কোন আচার্য্যবংশ্যক্রম স্বীয় প্রতিষ্ঠাশা-সংরক্ষণমানসে পাপাচারিগণকে 'গোড়ীয়' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া তাহাদের মঙ্গলাকাজ্জ্বল্য করা দূরে থাকুক তাহাদিগের চাটুকারস্বত্রে পাপাদির প্রশ্রয় দেন মাত্র। আবার কেহ কেহ তাহাদিগের পাপকার্য্যে সাহায্য করিবার উদ্দেশে তাহাদিগকে 'পরমার্থী' বলিয়া পক্ষ সমর্থন করেন।

পাপাচারী ও ভগবন্তভিত্তিহীনের সঙ্গবর্জননীতি উপেক্ষা করিয়া যাহারা

তাদৃশ ছঃসঙ্গবর্জনকে বৈষ্ণববিন্দা বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহাদের সত্য-নিষ্ঠার প্রতি সাধুগণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। ধর্মের ছলনায় যে ‘কৈতব’, ধর্ম নামে চলিতেছে তাহা উপেক্ষা করাষ্ট সত্যনিষ্ঠের ধর্ম। কিন্তু তাহা গোপন করিবার উদ্দেশে বৈষ্ণববিন্দা বা পরচর্চা করা নীতি-বিরুদ্ধ—এই ছলনা যাহারা বিস্তার করেন তাঁহাদের কাপট্য সকলেই অনায়াসে ধরিয়া ফেলিতে পারেন। সমন্বয়বাদী নিজের বুঝ মালকে ‘খাঁজী’ বলিয়া চালাইতে গিয়াই সমন্বয়ের ছলনা বিস্তার করেন।

মানব নিজের দোষ আবরণ করিতে গিয়া যে ছলনা করেন, তাহা চতুর পরমার্থী ব্যতীত অপরে বুঝিতে সমর্থ হয় না। পরচর্চা করা পাপের অন্তর্গত, কিন্তু চিকিৎসক রোগীর রোগের কারণ নিরূপণ করিতে গিয়া তাহার পাপের পূর্ব ইতিহাস সংগ্রহ করেন বা সমাজহিতৈষী সামাজিক অসুবিধা অপনোদন করিতে গিয়া যে পাপের প্রশমনোদ্দেশে পরচর্চাপ্রতিম আলোচনা করেন, তাহাকে কেহ পরচর্চা বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

বেদান্তসূত্রের ও বেদবিরুদ্ধ অপসম্প্রদায়

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪ পৃষ্ঠার পর)

৪৬। অনর্থযুক্ত জীবের বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ চেষ্টা কি হিতকর ?

“ভাক্ত সন্ন্যাসীদিগের বর্ণাশ্রম লোপরূপ ধর্মপ্রবর্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্তাভজা, দরবেশ, কুস্তপটিয়া, অতিবাড়ী, খেচ্ছাচারী ভাক্ত ও ব্রহ্মবাদী-দিগের বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ চেষ্টাসকল—অত্যন্ত অহিতকর।” —চৈঃ শিঃ, ২।৫

৪৭। উপধন্যশ্রিত ব্যক্তিগণের ‘ব্রহ্মচারী’ ‘সন্ন্যাসী’, ‘পরমহংস’দি পরিচয়-প্রদান দ্বারা কি অপকার হয় ?

“আজকাল নানাপ্রকার উপধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া বহুতর ব্যক্তি আপনাদিগকে ‘ব্রহ্মচারী’, ‘সন্ন্যাসী’, ‘পরমহংস’ পরিচয় দিয়া প্রকৃত আর্য্য-ধর্মের উৎসাদন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।”

—‘ব্রহ্মচারী আশ্রম’, সং: তো: ১০।৭

৪৮। যে-কোন মতকে ‘মহাপ্রভুর মত’ বলিলেই কি প্রভুর শিক্ষা লাভ হইবে ?

“অনেক স্থলে বিধর্ম, ছলধর্ম প্রভৃতি দুষ্টমতকে দুষ্টগণ কর্ম-বিপাকে ত্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন এবং বিচারশক্তি-রহিত বিষয়াবিষ্ট অনেকেই সেই সকল দুষ্ট মতকে প্রকৃত-প্রস্তাবে মহাপ্রভুর মত বলিয়া মানিয়া প্রকৃত উপদেশ হইতে বঞ্চিত থাকেন।”

—‘বিবোধন’, চৈঃ শিঃ

৪৯। বাউলাদির মত কি বৈষ্ণব-মত ?

“বাউল, সাঁই, নেড়া, দরবেশ, কর্ত্তাভজা, অতিবাড়ী প্রভৃতি যে-সকল মত আছে, সে-সমুদায়ই অবৈষ্ণব-মত। তাঁহাদের উপদেশ ও কার্য্য অত্যন্ত অসংলগ্ন। অনেকেই তাঁহাদের মতের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব-ধর্মে অশ্রদ্ধা করেন। কিন্তু বাস্তবিক বৈষ্ণবধর্ম ঐ সকল ধর্ম-ধ্বজীদিগের দোষের জন্ত দায়ী হইতে পারে না।”

—প্রেঃ প্রঃ, ৬ষ্ঠ প্রঃ

৫০। বাউল-মত কি শ্রীসনাতন গোস্বামী বা শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামীর প্রবর্তিত ?

“বাউল-ধর্ম যে আকারে বর্ত্তমান সময়ে দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। শাস্ত্রে বৈধী ও রাগানুগা—দুই প্রকার ভক্তির উপদেশ দেখা যায়। বাউলেরা কোন প্রকার বৈধী ভক্তি আচরণ করে না; রাগানুগা ভক্তির ছলে নানাবিধ অসদাচরণ করিয়া থাকে। * * ঐ প্রথার প্রবর্তক যে কে, তাহা বলা যায় না। বাউলেরা কখনও শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং কখনও শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভুকে তাহাদের প্রবর্তক বলিয়া প্রচার করে। বস্তুতঃ তাঁহারা কখনই বাউলদিগের কু-প্রথা শিক্ষা দেন নাই।”

—‘বাউল-মতের বিচার’, সঃ তোঃ ৪।৪

৫১। অভদ্রবেশ কি শ্রীমহাপ্রভুর অনুমোদিত ?

“মহাপ্রভুর প্রসাদাকাজ্ঞী শ্রীসনাতন যখন মহাপ্রভুর মধুর মূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন তাঁহার দাড়ি-গোঁফ ছিল। সেই দাড়ি-গোঁফই বাউল বৈষ্ণবগণের গোঁফ-দাড়ির একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গন করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষৌরকার্য্য করাইয়া দিলেন। অতএব বাউল বৈষ্ণবদিগের অচ্ছেদ্য প্রমাণ সেই কালেই নরনৃন্দরের ক্ষুরে কাটা গিয়াছে।”

—‘শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু’, সঃ তোঃ ২।৭

৫২। বাউলগণ কি শ্রীচৈতন্যানুগ সম্প্রদায় ?

“বাউলেরা কখনই শ্রীচৈতন্যানুগ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।” —‘শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু’, সঃ তোঃ ২।৭

৫৩। সাঁই, দরবেশাদি সম্প্রদায় কি শ্রীচৈতন্যানুগ-সম্প্রদায় ? যদি না হয়, তবে তাহারা কি ?

“সনাতনকে ‘ফকির’ বলিয়া উল্লেখ করাতেই সাঁই, দরবেশ, চরণপালী, ছল্লালচাঁদী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ মুসলমানের ফকির-বেশ ধারণ-পূর্বক তদং আচার-ব্যবহার অধিকাংশই করিয়া থাকে এবং আপনাদিগকে চৈতন্য-সম্প্রদায়ী (?) বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়। যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমরা মুসলমান ফকিরের বেশ-ধারণ ও তাহাদের স্থায় আচার-ব্যবহারও প্রায় করিয়া থাক এবং চৈতন্য সম্প্রদায়ী (?) বৈষ্ণব বলিয়াও পরিচয় দাও, ইহার প্রমাণ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলিয়া থাকে, ‘ইহার প্রমাণ—গৌঁসাঁই সনাতন, তিনি ফকির ছিলেন।’ কিন্তু যখন মহাপ্রভু সনাতনের গৌঁফ-দাড়ি ও মস্তকের কেশ ফেলাইয়া দিয়া বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করাইয়া দিলেন, তখন সেইখানেই সাঁই, দরবেশ, চরণপালী, ছল্লালচাঁদী প্রভৃতির প্রমাণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এ কারণ সাঁই, দরবেশ প্রভৃতিরা চৈতন্য-সম্প্রদায়ী (?) বৈষ্ণব হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাদিগকে একপ্রকার মহান্দী সম্প্রদায়ী বলিতে হইবে।”

—‘শ্রী শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু’, সঃ তোঃ ২।৭

৫৪। ‘বৈষ্ণব-বংশ’, ‘বৈষ্ণব-জাতি’ বা ‘বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ’ প্রভৃতি কথা কি ঠিক ও বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরবজনক ?

“বৈষ্ণব-বংশ বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না। বংশ-পরম্পরায় যে কেহ ‘বৈষ্ণব’ হইবে, ইহার কোন স্থিরতা নাই। আমরা দেখিতেছি যে, অনেক বৈষ্ণব-বংশে বহুতর কুলান্তার জন্মগ্রহণ করিয়া অন্তরের স্থায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার চণ্ডাল ও যবনকুলে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তির বলে ‘বৈষ্ণব’ হইয়াছেন। বৈষ্ণব-আচার্য্যদিগের কুলেও বহুতর অবৈষ্ণবকে দেখা যায়। আবার নিতান্ত অধাশ্বিকদিগের বংশে অনেক ‘বৈষ্ণব’ উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণব-জাতি বা বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ বলিয়া যে সন্মান দেখিতে পাই, তাহাতে

বৈষ্ণবধর্মের গৌরব হয় না, বরং অবৈষ্ণবতার স্পর্শ বাড়িয়া যাইতেছে।”

—‘বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি’, সঃ তোঃ ৯৯

৫৫। ‘সহজিয়া’ধর্ম কি বৈষ্ণবধর্ম?

“বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই ‘সহজিয়া’ বলিয়া একটি ঘৃণিত মত গোপনে গোপনে চলিতেছে, ঐ মতের কার্যসকল অত্যন্ত হেয়। ‘সহজ-ধর্ম’ বলিয়া যাহা শাস্ত্রে উক্ত আছে, তাহা পৃথক্। চিন্ময় জীবের চিন্ময় কৃষ্ণসেবাই সহজধর্ম। যদিও এই ধর্ম আত্মার পক্ষে সহজ অর্থাৎ আত্মার সহিত জাত হইয়াছে, তথাপি জড়বন্ধাবস্থায় তাহা সহজ নয়। সেই বিগত কৃষ্ণরতিকে বঞ্চিত ও বঞ্চকগণ জড়ের সহজ-ধর্ম যে স্ত্রীপুরুষ-সংযোগ, তাহাতেই পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। বস্তুতঃ তাহা সেরূপ নয়। আত্মার সহজধর্মে জড়ীয় স্ত্রীপুরুষ-শরীরের সংযোগ নিতান্ত হেয় ও অনুপযুক্ত। সম্প্রতি যে-ধর্মকে ‘সহজিয়া’-ধর্ম বলে, তাহা সর্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ।”

—‘সহজিয়া মতের হেয়ত্ব’, সঃ তোঃ ৪৬

৫৬। মুষ্টি-ভিক্ষা কি উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়? বর্তমানে তাহার অবস্থা কি?

“আদৌ শুদ্ধবৈষ্ণবের উপকারার্থ মুষ্টি-ভিক্ষার সৃষ্টি হয়। এখন উহা একটা ব্যবসায় হইয়া পড়িয়াছে। * * ধর্মস্বামী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণ জগতের কোন কার্যদ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিবে না মনে করিয়া মুষ্টিভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছে।”

—‘মুষ্টিভিক্ষা’, সঃ তোঃ ৬৩

৫৭। কেন মুষ্টিভিক্ষা-প্রথার ব্যভিচার হইল?

“বৈষ্ণবগণ মুষ্টিভিক্ষা লইতে প্রস্তুত হইলেন না দেখিয়া এই অযোগ্য স্ত্রীপুরুষ-দল মুষ্টিভিক্ষা-প্রথার সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন।”

—‘মুষ্টিভিক্ষা’, সঃ তোঃ ৬৩

৫৮। ব্যবসায়ি-গায়কগণের মুখে হরিকীর্তন-শ্রবণকে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কি আদর করেন?

“ব্যবসায়ি-গায়কগণ প্রকৃত-সাধুসঙ্গ করেন নাই, বৈষ্ণব-সিদ্ধাস্তও ভালরূপ জানেন না। অতএব তাঁহাদের অক্ষরগুলি বৈষ্ণব-কর্ণে বজ্রাঘাতের ন্যায় পড়িয়া থাকে।” —‘ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাতাস’, সঃ তোঃ ৬২

৫৯। আখণ্ডাধারি-মহাস্তম্ভগণের অবৈধ-যোবিৎসঙ্গ কি শ্রীমন্মহাপ্রভু বা বৈষ্ণবধর্মের অনুমোদিত?

“গোবিন্দদাস বাবাজীর স্থায় মহান্তদিগের জন্ম গোড়ভূমির দেবালয়-সকল দূষিত হইয়া গেল। আমাদের প্রাণনাথ শ্রীগৌরানন্দদেব এই প্রকার দোষ আশঙ্কা করিয়াই ছোট হরিদাসকে বৈষ্ণব-সমাজ হইতে চ্যুত করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়াও কি ধর্ম্মধ্বজীদিগের ভয় হয় না?”

—‘শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীর পাট’, বি: পঃ, ১ম বর্ষ

৬০। শ্রীভক্তিবিনোদের সমসাময়িক গোড়মণ্ডলের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল?

“বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ মায়াবাদকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতেছেন, কেহ কেহ শুদ্ধধর্ম্মের একটু অঙ্গ লইয়া তাহাতে মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদ মিশাইয়া একপ্রকার বিকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যাহারা নিরীহ, তাহারা “অর্চয়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্বক্তেষু চাত্রেষু ন ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥”—এই আয়ানুসারে কনিষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধ্যমান শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিতান্ত অভাব। শিক্ষকের অভাব হইলে জীবের যে গতি হয়, তাহাই আজকাল গোড়মণ্ডলের অবস্থা।” —‘ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাতাস’, স: তো: ৬২

৬১। শ্রীভক্তিবিনোদের সময় শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম কিরূপ আদৃত হইয়াছিল?

“কলিকাল একরূপ ভয়ানক যে, সংকার্য্যের বহুদিন স্থিতি করিতে দেয় না। উক্ত আচার্য্যত্রয় ও তাহাদের অনুচর শ্রীগোবিন্দদাসাদি মহাজনগণের অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পরম ধর্ম্ম পুনরায় বিপ্লুত হইতে লাগিল। গোড়ভূমিতে শুদ্ধভক্তির বিচার উঠিয়া যাইতে লাগিল। বৈষ্ণবই হউন, শাক্তই হউন, বা কর্ম্মকাণ্ডী হউন, আচার্য্য-বংশীয়গণ বৈষ্ণবধর্ম্মের স্থায় প্রচারক বলিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই শ্রীগৌরানন্দ ও (?) শ্রীনিত্যানন্দাষ্টেত-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে সূদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। একদিকে এইরূপ আচার্য্য-বিপ্লব; আবার বাউল-সহজিয়া প্রভৃতির উপদ্রব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইল। শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের হ্রদশা এইসব কারণে আজ পর্য্যন্ত প্রতীয়মান।” —‘ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাতাস’, স: তো: ৬২

৬২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতের কিরূপ বিপ্লব ঘটয়াছিল?

“শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতে একটু উপপ্লব হইয়াছিল।

প্রভু-বংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় এবং নানা মতবাদ প্রবেশ করায় গোড়ভূমি আচার্য্য-শাসন-রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু বীরচন্দ্রের স্বতন্ত্র স্বভাববশতঃ সমস্ত গোড়ভূমিকে তিনি আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই। ত্রীল অদ্বৈত-সত্ত্বানের মধ্যে তখন বড় গোলযোগ। মহাপ্রভুর পার্শ্বদ মহান্তগণ ক্রমে ক্রমে অগ্রকট হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কু-পন্থার প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-নামে সর্ব-সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস। স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্ত তাঁহাদের দোহাই দিয়া উহারা তুর্ভাগা জীবদিগকে কুপন্থা শিখাইতে লাগিল। শ্রীজীব গোস্বামী তখন একমাত্র বৈষ্ণব-আচার্য্য। তিনি ব্রজবাসী থাকায় গোড়-মণ্ডলের একরূপ শোচনীয় অবস্থা অবগে স্নেহ-যুক্ত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গোড়ভূমির ধর্ম-সংরক্ষারক আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পরিকরকৃত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থসকল গোড়ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঐ সকল গ্রন্থ পথ-মধ্যে অপহৃত হইল। প্রেরিত প্রচারকগণ নিগ্রহ হইয়া নিজ-নিজ ভজনবলে আপন আপন গীত-পদ্ধতি অবলম্বন-পূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।”

—‘ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসভাস’, সং: তো: ৬২
৬৩। শ্রীমহাপ্রভুর অগ্রকটের পর কাহারো শুদ্ধভক্তির উৎসাদন-চেষ্টা করিয়াছিল?

“শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিন্ময় লীলার অগ্রকটের কিছুকাল পরেই বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়, স্মার্ত্ত-কর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ, জ্ঞানী হেতুবাদি-গণ শ্রীবৈষ্ণবকে যতদূর কলঙ্কিত করিতে পারেন, তৎপক্ষে সহায়তা করিবার চলে তদপেক্ষা কলুষিত করিয়াছেন। এখনও ঐরূপ শ্রেণীর বংশধরগণের অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে ঐরূপ শ্রেণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ‘ব্রাহ্মণ’ করিবার চেষ্টা, শ্রীঈশ্বর পুরীকে ‘শূদ্র’ বা ‘ব্রাহ্মণ’ বর্ণাভিধানে ভূষিত করিবার প্রয়াস, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণব-শিক্ষা প্রদানের অক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপন নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য-বিশেষ। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তি-বুদ্ধির সহায়তা করে নাই। অতএব ভক্ত-বৈষ্ণবের এইসকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে।

—‘শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম’, সং: তো: ১১১০

৬৪। অবতারের অপ্রকট-লীলার পর বঞ্চনার উদয়ে ভজন-প্রয়াসীর কর্তব্য কি ?

“অবতার অপ্রকট হইলে যে-সকল বঞ্চনা জগতে উদিত হইবে, তাহাতে সাধকের নিশ্চয় পতন হইবে। সেই সকল বঞ্চনা হইতে ভজন-প্রয়াসীর সতর্ক হওয়া ভজনাঙ্গ।” —আ: বি: ভা: টী:

৬৫। কলির দাস কে ?

“কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজা বা গৌরমন্ত্রে কৃষ্ণপূজা—সকলই এক। ইহাতে যে ভেদবুদ্ধি করে, সে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও কলির দাস।” —জৈ: ধ: ১৪শ অ:

৬৬। অনেকেই বিদ্ব বৈষ্ণবধর্মকে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম বলেন কেন ?

“কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ব বৈষ্ণব-ধর্মকেই বৈষ্ণবধর্ম বলেন।” — জৈ: ধ: ৪র্থ অ:

৬৭। মহাপ্রভুর ধর্মে কি কোন প্রকার প্রকৃতি সঙ্গের সমর্থন আছে ?

“ছোট হরিদাস স্বয়ং প্রকৃতি হইয়া পুরুষভাবে অপর প্রকৃতির সম্ভাষণ-অপরাধে দূরীকৃত হইয়াছিলেন। ধৃত লোকেণ “প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ”—এই পণ্ডের ছুষ্ট অর্থ করিয়া ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের পন্থা সৃষ্টি করিয়া থাকে। সাধু-বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। গৃহস্থের পক্ষে বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গ কোন ভজনের অঙ্গ নয়। অতএব কেবল সংসার-যাত্রা-নির্বাহের জন্ত তাহা নিষ্পাপ বলিয়া স্বীকৃত হয়।”

—‘সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব’, স: তো: ৫।৬

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত
নিশুদ্ধ সান্ন্যাসত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি ষা বর্তীয় দিন ‘শ্রীহরিভক্তি-বিলাস’-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।

মূল্য—১.০০ টাকা, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

মায়ামুক্ত জীব

চিৎকণ জীব শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ ।
'মুক্ত' আর 'বদ্ধ' ভেদে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥
জীব চিৎস্বরূপে শুদ্ধ-কৃষ্ণদাস ।
ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস্ত বদ্ধ-মায়াপাশ ॥
মায়াରେ তরিয়া শুদ্ধরূপে অবস্থান ।
তাহারেই বলে 'মুক্তজীব' আখ্যান ॥
চিৎকণ জীবের স্বক্ষ্ম স্থূল ঔপাধি ।
বৈরূপ্য অবস্থা তাহার মুক্ত-অবধি ॥
বৈরূপ্য হইতে যদা স্বরূপেতে স্থিতি ।
লভিয়া চিন্ময়-বৃত্তি হয় তার 'মুক্তি' ॥
মায়ামুক্ত জীবের অষ্টবিধ লক্ষণ ।
আত্মা, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোককথন ॥
আর বিজিঘৎস, অপিপাস, সত্যকাম ।
সত্যসঙ্কল্প—এই অষ্টবিধ নাম ॥
আত্মা—অবিজ্ঞা-পাপবৃত্তি-সম্বন্ধশূন্য ।
বিজর—জরাধর্ম্মরহিত, নিত্য নূতন ॥
বিমৃত্যু-শব্দে কহে তিনি মৃত্যুরহিত ।
বিশোক—শোক-দুখ-আশা হইতে মুক্ত ॥
বিজিঘৎস—ভোগ-বাসনা পরিহরি ।
অব্যর্থকাল গা'ন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হারি' ॥
অপিপাস—প্রিয়তমের সেবা ভিন্ন ।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি না মাগে অত্ন ॥
সত্যকাম—কৃষ্ণসেবার যোগ্য কামনা ।
সর্ব্বক্ষণ চিন্তা তা'র নহে অন্তমনা ॥
সত্যসঙ্কল্প—যাহার যেই অভিলাষ ।
মুক্ত হঞা লভি তাহা পায়েন সন্তোষ ॥
বদ্ধজীবে নাহি থাকে এ লক্ষণাষ্টক ।
শুদ্ধসত্ত্বে ইহা মুক্তজীবের প্রাপক ॥

ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি এই মাত্র চাই ।
 কর্ম-যোগ-সাংখ্য-জ্ঞান-ব্রতাদিতে নাই ॥
 সর্বধর্ম ত্যজি কৃষ্ণ-চরণে শরণ ।
 শোক-পাপ-মুক্ত হঞা গোলোকে গমন ॥
 ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণ আছে অবরুদ্ধ ।
 তাঁর পদধূলি লইয়া জীব হয় শুদ্ধ ॥
 শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণের হইলে অধিষ্ঠান ।
 ভক্তি-বিঘ্ন ‘অনর্থাদি’ হয় অন্তর্ধান ॥
 চতুর্বিধ অনর্থ গণে বুধগণ ।
 স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তি অসতৃষ্ণা হন ॥
 আর অপরাধ, হৃদয়দৌর্বল্য যত ।
 চতুর্বিধ এ অনর্থ মুক্তজীবে হত ॥
 স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তি — জীব চিংকণ ।
 ভুলি’ নিত্যকৃষ্ণদাস্ত স্বরূপের ভ্রম ॥
 পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা তিন ।
 অসতৃষ্ণা ইহা ইতে কভু নহে ভিন ॥
 দশবিধ ‘অপরাধ’ আছে হরিনামে ।
 সর্ব ত্যজি’ শ্রীনাম লয়েন বুধজনে ॥
 ‘হৃদয়-দৌর্বল্য’ যা’র, শোকে অভিভূত ।
 কার্পণ্য-দোষে তাহার শুদ্ধনাম হত ॥
 অনর্থমুক্ত যিনি তিনিই শুদ্ধভক্ত ।
 ব্রহ্মাণ্ড-তারণ-ক্ষম, নহে জড়াসক্ত ॥
 সাধন-ভক্তির পরিপক্ক অবস্থায় ।
 ঘনীভূত হইলে ভাব-ভক্তির উদয় ॥
 দৃঢ়ীভূত ভাবভক্তি যাহার যখন ।
 স্থূল-লিঙ্গ আবরণ ত্যজিবে তখন ॥
 চিহ্নরীরে অবস্থান জীব চিংকণ ।
 চিন্ময় বৃত্তি তাহার মায়ামুক্ত হন ॥

মায়ামুক্ত জীব হন দুই ত প্রকার ।

‘নিত্যমুক্ত’ আর ‘বদ্ধমুক্ত’ নাম যার ॥

যে-সকল জীব নাই কভু মায়াগন্ধ ।

‘নিত্যমুক্ত’ তারে কয়, সেই নিত্যশুদ্ধ ॥

মায়াবদ্ধ জীব সাধন-ভক্তিক্রমে ।

মায়ামুক্ত হলে তারে ‘বদ্ধমুক্ত’ গণে ॥

সেইকালে জীব লভে কৃষ্ণ-প্রেমধন ।

স্বরূপেতে সেই প্রেম নিত্য-প্রয়োজন ॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে রমাপতিদাস ।

মুক্ত হ’য়ে যা’ব কবে শ্রীকৃষ্ণের পাশ ॥

—পণ্ডিত শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ (আসাম)

সন্দভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দভ—২৫)

শ্রীগোপগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর সিদ্ধান্তিত হওয়ায় সাধক জীব-বিশেষের নন্দাদিরূপে আবির্ভাব অসম্ভব । বসুদেব ও দেবকী যেমন অংশে জীববিশেষে প্রবিষ্ট হইয়া স্তূতপা ও পুশ্ণিরূপে তপস্তা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ব্রজরাজ নন্দ ও ব্রজেশ্বরী যশোদা দ্রোণ ও ধরাত্রে আবিষ্ট হইয়া অংশে আবিভূত হইয়াছিলেন । ভাগবতে যশোদার মহিমা এইরূপে কীর্তিত হইয়াছে—

ত্বয়া চোপনিষত্তিস্ত সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ ।

উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামগ্র্যতাত্পর্যম্ ॥ (ভাঃ ১০।৮।৪৫)

বেদ, উপনিষদ, সাংখ্যযোগ এবং পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র ধাঁহার মহিমা কীর্তন করেন, সেই শ্রীহরিকে যশোদা নিজ গর্ভজাত সন্তান মনে করেন । এই শ্লোকে যশোদার প্রেমভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অনির্বচনীয় প্রসাদ লাভ হইয়াছে বুঝা যায় ।

নন্দঃ কিমকরোদ্রুক্ষন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।

যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যন্তাঃ স্তনং হরিঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮।৪৬)

পূর্বেকৃত শ্লোকে যশোদার মাহাত্ম্য প্রবর্ণান্তে পরীক্ষিৎ মহারাজ প্রশ্ন করিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! নন্দ পরম শুভজনক কি কার্য্য করিয়াছিলেন এবং

মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা কি শ্রেয় অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেজন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্তন্য পান করিয়াছেন ।

পিতরৌ নান্ববিন্দেতাং কৃষ্ণদারার্ভকেহিতম্ ।

গায়ন্ত্যত্মাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্ ॥ (ভাঃ ১০।৮।৪৭)

শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতা (বসুদেব-দেবকী) শ্রীকৃষ্ণের যে উদার বাল্যলীলা আশ্বাদন করিতে পারেন নাই, তাঁহার জগৎপবিত্রকারী বালচরিত্র মহাবিজ্ঞ কবিগণ কীর্তন করিয়া থাকেন, তাহা নন্দ-যশোদার ভাগ্যে আশ্বাদনের স্মরণযোগ ঘটয়াছিল কি-প্রকারে ?

“পিতরৌ নান্ববিন্দেতাং” শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের অভিপ্রায় এই যে, ঐহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের গৃহে আবিভূত হইয়াছিলেন, সেই বসুদেব-দেবকীর বাল্যলীলা আশ্বাদনের সৌভাগ্য না হইয়া নন্দ-যশোদার ভাগ্যেই তাহা ঘটিল কিরূপে ?

তদন্তরে শ্রীশুকদেবের উত্তর—বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও ধরা ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—আমরা যখন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিব, তখন আমাদের যেন বিশ্বেশ্বর শ্রীহরিতে ভক্তি হয় । ব্রহ্মা তাহাই হইবে বলিয়া বর দিয়াছিলেন । সেই মহাযশাঃ দ্রোণ ব্রজে নন্দ নামে খ্যাত এবং ধরা যশোদারূপে অবতীর্ণ হন ।

ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দনে ।

দম্পত্যোনিতিরামাসীদ্ গোপগোপীষু ভারত ॥ (ভাঃ ১০।৮।৫১)

হে ভারত ! জনার্দন ভগবান তাঁহাদের পুত্রীভূত হইলে এই দম্পতীর তাঁহাতে নিরতিশয় ভাক্ত হইয়াছিল ।

পুত্রীভূত—পুত্র শব্দের উত্তর চিৎ প্রত্যয় যোগে পুত্রী নিষ্পন্ন । তাহার অর্থ—যিনি কখনও অশ্রের পুত্র হন না সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর পুত্রভাব সঙ্গাত হইয়াছিল । কারণ, ভক্তি-বিশেষ মাত্রে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়া থাকে । বাৎসল্য-প্রেমদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে আবিভূত হন, কিন্তু কাহারও দেহ হইতে নির্গত হইয়া কখনও পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন না । তাহা যদি সম্ভব হইত, তবে হিরণ্যকশিপুর সভাস্তম্ব হইতে আবিভূত শ্রীনৃসিংহদেবের ঐ স্তম্ভে এবং ব্রহ্মার নাসা হইতে আবিভূত শ্রীবরাহদেবের ব্রহ্মাতে পিতৃত্ব প্রযুক্ত হইত । যদি বলা যায়, ইঁহারা ত গর্ভ হইতে আবিভূত হন নাই, এজন্ত পুত্র হইতে পারেন না, কিন্তু যিনি গর্ভে প্রবেশ করেন, তিনিই পুত্র হইতে

পারেন। তাহাও হয় না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিতের জননী উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি উত্তরার পুত্র বা উত্তরা তাঁহার মাতা—এ কথা কখনও শুনা যায় না। সুতরাং বাৎসল্য-প্রেমই পুত্ররূপে আবির্ভাবের হেতু। সেই বাৎসল্যপ্রেম শুদ্ধ—ঐশ্বর্য-জ্ঞানাদিবিহীন নন্দ-যশোদাতে উদিত হইয়াছিল। তজ্জন্ম গর্ভ প্রবেশাদি ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণের নন্দযশোদার পুত্ররূপে খ্যাতি।

নন্দস্বাত্নজ উৎপন্নো জাতাহ্লাদো মহামনাঃ । (ভাঃ ১০।৫।১)

এই শ্লোকে আত্নজ উৎপন্ন হইলে মহামনা নন্দের পরমানন্দ হইয়াছিল ; এখানে ‘আত্নজ’ শব্দে শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দনরূপে স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছেন। আবার অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষ্যাদি কথন-প্রসঙ্গে “নন্দতনয়ো দেবতা” বলিয়া মন্ত্রের দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে ‘নন্দতনয়’ বলা হইয়াছে। কিন্তু স্তম্ভাদির পুত্ররূপে শ্রীনৃসিংহদেবাদির কথা কখনও শুনা যায় নাই বা কোন শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত জীব যেমন চরম-ধাতুতে প্রবেশ করিয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাদৃশরূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় নাই। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান বসুদেব-দেবকীর অপ্রাকৃত মনে আবিষ্ট হইয়াই আবির্ভাবলীলা করিয়াছিলেন। তজ্জন্ম বলা হইয়াছে—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ ।

আবিবেশাংশভাগেন মন আনকহুন্দুভেঃ ॥ (ভাঃ ১০।২।১৬)

ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী ।

দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥

(ভাঃ ১০।২।১৮)

বিশ্বাত্মা ভক্তগণের অভয়দাতা ভগবান প্রথমে বসুদেবের অপ্রাকৃত মনে আবিষ্ট হন। তৎপরে বসুদেব কর্তৃক সমাহিত জগন্মঙ্গল অচ্যুতাংশ দেবকীদেবী ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্কদিক যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করে, দেবকীও তদ্রূপ মনদ্বারা সর্বাত্মক আত্মভূত শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছিলেন। বহিঃ প্রাকট্যের পূর্বে মনে শ্রীভগবানের আবেশ কেবল যে দেবকী-বসুদেবে ঘটিয়াছিল তাহা নহে, সর্বত্রই এই নিয়ম দেখা যায়। শ্রীনারদ-কুব-প্রহ্লাদাদি মহাভাগবতগণ সম্বন্ধেও এইরূপ দেখা যায়—প্রথমে তাঁহাদের মনে আবির্ভূত হইয়া পরে বহির্দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান যেমন নারদাদির প্রেমের বিষয়, তদ্রূপ বসুদেব-দেবকীরও। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব কল্পনা করা যায়। ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনাদ্বারা জানা যাইতেছে, যখন দ্রোণ ও ধরা বর প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্মৃতি পাইতেছিলেন। এজন্য অত্র বর প্রার্থনা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই প্রার্থনা করেন। অতএব প্রেমবিশেষই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের হেতু। প্রকটলীলায় উক্ত সিদ্ধান্ত হইল। এক্ষণে অপ্রকটলীলায়ও ব্রজরাজদম্পতির নিত্যসিদ্ধ বিচারিত হইবে। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের অনাদিকাল হইতেই আদি-রসসিদ্ধ দাম্পত্যের ছায় ব্রজরাজদম্পতির ও শ্রীকৃষ্ণের অনাদিকাল হইতেই বাৎসল্যরসসিদ্ধ পিতৃ-পুত্রভাব বিद्यমান। এইজন্য 'পুত্রীভূত' স্থলে কোন কোন স্থানে 'পুত্রভূত' পাঠও দেখা যায়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চিরকালই ব্রজরাজ-দম্পতির পুত্ররূপে বর্তমান।

শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের নন্দরাজপ্রতি উক্তি—

নহৃৎপ্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়োহবাস্ত্যমানিনঃ ।

নোত্তমো নাধমো বাপি সমানস্তাসমোহপি বা ॥

ন মাতা ন পিতা তস্ত ন ভাৰ্য্যা ন স্ত্রুতাদয়ঃ ।

নান্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ ॥

(ভাঃ ১০।৪৬।৩৭-৩৮)

শ্রীকৃষ্ণের নিকট সকলই সমান। তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয়, উত্তম, অধম বা অসমান কেহ নাই, তিনি নিরভিমান। তাঁহার মাতাপিতা, ভাৰ্য্যা, পুত্র, আত্মীয়-অনাত্মীয় দেহ বা জন্মাদি কিছুই নাই।

যুবয়োরব নৈবায়মান্নজো ভগবান্ হরিঃ ।

সর্বেষামাত্নজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ ॥ (ভাঃ ১০।৪৬।৪২)

এই ভগবান্ হরি কেবল আপনাদের পুত্র নহেন, সেই ঈশ্বর সকলেরই পুত্র, আত্মা, পিতামাতা ইত্যাদি। এই শ্লোকের বাহ্যার্থ—কৃষ্ণ-বিরহাতুর ব্রজ-রাজদম্পতীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে তাৎকালিক ঔদাসীন্ম প্রকটদ্বারা সাস্বনা-বিষয়ক তাৎপর্য প্রকাশ করিলেও বাস্তব অর্থ—প্রিয়প্রিয় মাতাপিতা প্রভৃতি রহিত ভগবান্ হরি শ্রীকৃষ্ণরূপে বিশেষভাবে আপনাদেরই পুত্র। তিনি ঈশ্বররূপে অন্তর্ধামিস্ত্রে সকলেরই পুত্রাদিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। কিন্তু অত্ৰ তাহা মায়াময় বলিয়া তাহাতে আমাদের আদর নাই। আর আপনাদের পুত্ররূপ শ্রীকৃষ্ণ মুমুকু, মুক্ত ও ভক্তজনের প্রেমময়

বলিয়া তাঁহাতে আমাদের নিরতিশয় আদর। নন্দযশোদার শ্রীকৃষ্ণে পরমানুরাগ দর্শন করিয়া তিনি পূর্বেই বলিয়াছেন—

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নুনং দেহিনামিহ মানদ ।

নারায়ণেখিল গুরৌ যৎ কৃতা মতিরীদৃশী ॥ (ভাঃ ১০।৪৬।৩০)

আপনারা এ জগতে দেহধারিগণের মধ্যে আবিভূত হইয়া তাহাদিগকে গৌরবাঘ্রিত করিয়াছেন। আপনারাই সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। যেহেতু অখিলগুরু নারায়ণে এইরূপ মতি স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরামের নন্দ মহারাজের প্রতি উক্তি—

স পিতা সা চ জননী যৌ পুষ্টীতাং স্বপুত্রবৎ ।

শিশুন্ বন্ধুভিরুৎসৃষ্টানকল্পৈঃ পোষরক্ষণে ॥ (ভাঃ ১০।৪৫।২২)

তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, যে দম্পতি পোষণ-রক্ষণে অসমর্থ বন্ধুজনতান্ত্র শিশুকে পুত্রবৎ লালন পালন করেন। এই বাক্য ব্রজেশ্বরের সাত্ত্বনার জন্ত উক্ত হইয়াছে। শ্রীবলরামের পরপুত্রত্বহেতু একথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরপুত্রত্ব সূচিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বলিলেন—

যাত যুয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহ-দুঃখিতান্ ।

জাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্ ॥

(ভাঃ ১০।৪৫।২৩)

হে তাত, আপনারা ব্রজে গমন করুন। সুহৃদগণের সুখবিধান করিয়া স্নেহদুঃখিত জ্ঞাতি আপনাদিগের দর্শনার্থ আমরা আসিব। অর্থাৎ আপনাদিগকে দর্শন করিয়া আপনাদের নিকট অবস্থান করিব।

ব্রজবাসিগণের ভক্তিবশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বিহার করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রজরাজ-দম্পতির শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্ত ব্রক্ষার বরদান যথার্থ কারণ নহে—একথা মনে করিয়া শ্রীশুকদেব ব্রক্ষাদি হইতেও তাঁহাদের সৌভাগ্যাতিশয় স্থাপনের জন্ত ব্রক্ষার বরদান প্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই দামবন্ধন-লীলাত্মক অধ্যায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই অধ্যায় প্রসঙ্গে সাক্ষাৎ ভগবানের বন্ধনরূপ মহাবশীকরণের কারণ-স্বরূপ বাৎসল্য-প্রেমের মহিমা দ্বারা জানা যায় যে, ভগবৎপ্রসাদ—যাহা শিব, ব্রক্ষা ও লক্ষ্মীদেবীরও দুর্লভ, যশোদা প্রচুররূপে সেই প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—

নেমং বিরিক্ষো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশয়া ।

প্রসাদং লেভিয়ে গোপী যন্তুং প্রাপ বিমুক্তিদাং ॥ (ভাঃ ১০।১২।২০)

সুতরাং প্রেমই তাঁহাকে বন্ধন করিবার একমাত্র কারণ ।

ব্রহ্মা নারায়ণের নাভিপদ্মে অধিষ্ঠানপূর্বক অনেককাল চিন্তা করিয়াও নিজকর্তব্য-বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে পারেন নাই, পরে শ্রীহরির নিকট মন্ত্র ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কর্তব্য-বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হন । শ্রীব্রহ্মা আদি-দেবের প্রথম শিষ্য বলিয়া তিনি আদর্শ বৈষ্ণব, কিন্তু তদপেক্ষা শত্রুর ভক্ত্যাধিক্যহেতু অধিক মাহাত্ম্য; এজন্ত “বৈষ্ণবানাং যথা শত্রুঃ” বলিয়া ষাটশ্লোকে তাঁহার বৈষ্ণবতা শ্রেষ্ঠ—ইহা জানাইয়াছেন । তদুত্তর অপেক্ষা লক্ষ্মীদেবীর মহিমা অধিক; যেহেতু তিনি অঙ্গ-সংশ্রয়া । কিন্তু তিনিও ব্রজেশ্বরীর মত প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই ।

দ্রোণ-ধরা যদি সাধারণ দেবতা মাত্র হন তবে ব্রহ্মাদির তুল্য ভক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার সৌভাগ্য অসম্ভব । শ্রীকৃষ্ণের মহাভক্তগণের পক্ষে যে তুল্য পুত্রভাব, ব্রহ্মাও তাঁহাদিগকে সেই বর প্রদান করেন নাই । বিশেষতঃ পূর্বোক্ত—“ব্রহ্মা এই প্রসাদ লাভ করেন নাই”—বাক্যে সেই প্রসাদ প্রাপ্তি-বিরহিত ব্রহ্মার পক্ষে তাদৃশ বর প্রদানও অসম্ভব হইয়া পড়ে । তাহা তিনি “তদুরিভাগ্যং” শ্লোকে পূর্বেই উক্তি করিয়াছেন । অতএব শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তার যেমন কোন কারণ নাই, তদ্রূপ নন্দ-যশোদারও শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্তির কোন কারণ নাই । যশোদা-নন্দনরূপেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—একথা চিরপ্রসিদ্ধ । শ্রীভগবানের মত লীলা করিবার জন্ত তাঁহারা দ্রোণ-ধরারূপ অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । গোকুলমধ্যে শ্রীব্রজ-রাজদম্পতি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পরমাশ্রয়-স্বরূপ ।

নায়াং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।

জানি-শঙ্খান্নভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ (ভাঃ ১০:৯২১)

গোপিকাসুত ভগবান্ ভক্তিমান জনের যেমন সুখাপ (সুখে পাওয়া যায়), দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের বা দেহাভিমান-নিবৃত্ত স্ত্রীদিগেরও তদ্রূপ সুখাপ নহেন । সুতরাং ‘গোপিকাসুত’ এই বাক্যে তিনি গোপিকার (যশোদারই) সুখলভ্য—ইহাও স্পষ্ট প্রমাণিত হইল । ‘গোপিকাসুত’ এই বিশেষণ দ্বারা ত্রৈকালিক ভক্তগণের সম্বন্ধে গোপিকাসুতের সুখাপত্তের বিরোধী গোপিকাসুতত্বের অযোগ এবং অসুতত্বের যোগ ব্যবচ্ছিন্ন হইল । মূল শ্লোকে এই ‘গোপিকাসুত’ বিশেষণযুক্ত থাকায় তাঁহার নিত্য যশোদা-নন্দনত্বের বিচ্ছেদ ঘটে না ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তভিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

আরাধ্য, আরাধক ও আরাধনা

(পরম-পূজ্যাস্পদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ
মহারাজের বক্তৃতাবলম্বনে লিখিত)

বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদির একমাত্র উদ্দিষ্ট ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রই সকলের আরাধ্য । শ্বেতাস্বতর উপনিষদ (৫।৪ মন্ত্র) বলেন— “একো দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিষ্ণভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ” অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকলের পূজনীয় ; তিনি জন্ম-স্বভাব-প্রাপ্ত সমস্ততত্ত্বেই অধিষ্ঠানরূপে নিত্য বিরাজমান । কেন তিনি সকলের আরাধনীয়, পূজনীয় ? সে প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলেন,— সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে একমাত্র ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রই সর্বোত্তম তত্ত্ব । প্রমাণ-স্বরূপে গীতায় শ্রীভগবদ্বাক্য, যথা —

মন্তঃ পরতরং নাত্মং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় । (গীঃ ৭।৭)

[হে ধনঞ্জয়, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই ।]

ব্রহ্মসংহিতা বলেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গৌবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ (৫ অঃ ১ শ্লোক)

[সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর ; তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্বকারণের কারণ ।]

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শাস্ত্রিক অবতার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতো পুঙ্খানুপুঙ্খ শ্লোকটির প্রতিধ্বনি রহিয়াছে, যথা—

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বশ্রয় ।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয় ॥ (আঃ ২।১০৬)

শ্রীকৃষ্ণের সমান বা তদূর্দ্ধ কোন বস্তু নাই সেইজন্য শাস্ত্রকারগণ কৃষ্ণতত্ত্বকে অসমোর্দ্ধ তত্ত্বরূপে আখ্যাদান করিয়াছেন ।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ।

তাতে বড়, তার সম কেহ নাহি আন ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২।১।৩৪)

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সঘন্থে কেহ সন্দেহ পোষণ করিলে তন্নিরসনে সিদ্ধান্ত এই যে— “ভগবৎ-শব্দের আত্মকর ভ-কারের সংভর্তা ও

ভর্তা এই দুই অর্থ; গ-কারের অর্থ নেতা, গময়িতা ও অষ্টা; প্রাণিগণ অখিলায়্য ভূতাত্মায়্য বাস করেন, ইহাই ব-কারের অর্থ।

সংভর্তা-শব্দে স্বভক্তগণের পোষক। ভর্তা-অর্থে ধারক ও স্থাপক, নেতা-অর্থে নিজ ভক্তফলের অর্থাৎ প্রেমের প্রাপক। নিজলোকপ্রাপক গময়িতা। অষ্টা-শব্দে নিজভক্তসমূহে তত্ত্বগুণের উদ্যমকারী। যিনি স্বয়ং অহেতু, স্বরূপশক্তিধারা একমাত্র বিলাসবিশিষ্ট, সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও স্বাংশলক্ষণায়িত পুরুষদ্বারা সংসারের জন্ম, স্থিতি প্রভৃতির হেতু সেই তত্ত্বকেই ভগবত্তত্ত্ব বলিয়া মহাজনগণ (চৈঃ চঃ অনুভাষ্য আঃ ২।১০) বলিয়াছেন।” কৃষ্ণচন্দ্রে পূর্বোক্ত সকলগুণই লক্ষিত হইয়াছে। তদতিরিক্ত শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভগবচ্ছন্দের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেই কৃষ্ণচন্দ্রের ভগবত্তা আরও পরিষ্কৃত হইবে।

ঐশ্বর্য্যন্ত সমগ্রন্ত বীর্য্যন্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব যশাং ভগ ই-তীক্ষ্ণনা ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৪৭)

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টির সমাহার ‘ভগ’ নামে খ্যাত; এই ছয়টি অচিন্ত্যগুণ ষাঁহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে হস্ত, তিনিই ভগবান্। এখন দেখা যাউক, পূর্বোক্তগুণগুলি কৃষ্ণচন্দ্রে পরিলক্ষিত হয় কিনা।

প্রথমতঃ ঐশ্বর্য্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার একবিংশ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একবার ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাভিলাষে দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলে দ্বারপাল গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাহা নিবেদন করিলে কৃষ্ণ কহিলেন, কোন্ ব্রহ্মা তাহার নাম কি? দ্বারী আসিয়া ব্রহ্মাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়া দ্বারীকে জানাইলেন যে, সনক-পিতা চতুর্থ ব্রহ্মা আসিয়াছে। (এখানে চতুর্থ ব্রহ্মার বিস্মিত হইবার কাণ্ড এই যে—তিনি ব্যতীত আর কোন ব্রহ্মা থাকিতে পারে ইহা তাহার ধারণার অতীত ছিল।) দ্বারপাল কৃষ্ণকে তাহা জানাইয়া ব্রহ্মাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও ব্রহ্মাকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে —

ব্রহ্মা কহে,—তাহা পাছে করিব নিবেদন।

এক সংশয় মনে হয়, করহ হেদন ॥

‘কোন্ ব্রহ্মা ?’ পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে ?

আমা বই জগতে আর কোন ব্রহ্মা হয়ে ?

ওনি’ হাসি’ কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে ।

অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা ততক্ষণে ॥

দশ-বিশ-শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-বদন ।

কোট্যর্কুদ মুখ কারো, না যায় গণন ॥

রুদ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি বদন ।

ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি নয়ন ॥

দেখি’ চতুর্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা ।

হস্তীগণ-মধ্যে যেন মশক রহিলা ॥

আসি’ সব ব্রহ্মা কৃষ্ণ-পাদপীঠ-আগে ।

দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদপীঠে লাগে ॥

যোড়হাতে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি করয়ে স্তবন ।

“বড় কৃপা করিলা প্রভু, দেখাইলা চরণ ॥

ভাগ্য, মোরে বোলাইলা ‘দাস’ অঙ্গীকরি’ ।

কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি শিরে ধরি ॥” (চৈঃ চঃ)

চতুর্মুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের এই বিরাট, অত্যদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেন ; এবং নিজ ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করত শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রণত হইলেন । শাস্ত্রে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের ত্রিপাদ বিভূতির কথা উল্লেখ আছে । পূর্বোক্ত আখ্যানে যে বিরাট ঐশ্বর্য্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা তাঁহার একপাদ বিভূতির কিঞ্চিৎমাত্র, স্মরণ্য পূর্বোল্লিখিত বিষয়ের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অনন্ত, তাহার পরিমাণ কেহ করিতে পারে না ।

দ্বিতীয়তঃ বীৰ্য্য—বীৰ্য্য অর্থে শক্তি-সামর্থ্য্য বুঝাইয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণের শক্তিসামর্থ্য্যের কথা কি বলিব ; যিনি দ্বাপর যুগীয় লীলায় মাত্র সপ্তমবর্ষ বয়সে স্বীয় বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে বিরাট গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ করত ইন্দ্রকৃত প্লাবন হইতে ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন । স্মরণ্য ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-সামর্থ্য্যের পরিচয় পাই ।

তৃতীয়তঃ যশঃ— শ্রীকৃষ্ণের যশসৌরভে চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত । তিনি

প্রহ্লাদাদি ভক্ত-রক্ষক, ভক্ত পালক; তাঁহার যশঃমহিমা সকলেই কীর্তন করিয়া থাকেন।

চতুর্থতঃ শ্রী— শ্রীকৃষ্ণ-রূপের তুলনা নাই। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুবর লিখিয়াছেন—

পুরুষ, যোষিৎ, কিবা স্বাবয়-জন্ম।

সর্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্থ-মদন ॥

শৃঙ্গার-রসরাজময়-মুর্ত্তিধর।

অতএব আত্মপর্যন্ত সর্ব-চিত্ত-হর ॥

লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।

লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥

(মধ্যলীলা ৮।১৩৮, ১৪২ ও ১৪৪)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ সর্বাকর্ষক, সর্বজন-চিত্তহারী। শ্রীমদ্ভগবতে (১০।১৬।৩৬) শ্লোকে প্রমাণস্বরূপে দেখিতে পাই—

কস্তানুভাবোহস্ত ন দেব বিদ্বহে তবাজ্জিহ্মুরেণুস্পর্শাধিকারঃ ।

যদাজ্জয়া শ্রীর্ললনাচরতপো বিহায় কামান্ সূচিরং ধৃতব্রতা ॥

হে দেব, যাহার চরণেণু লাভ করিবার বাসনায় কমলা বহুকাল সমস্ত-কাম পরিত্যাগপূর্বক ধৃতব্রতা হইয়া তপস্তা করিয়াছিলেন, সেই চরণেণু এই কালীয়সর্প যে কি স্কৃতিদ্বারা লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা জানি না।

ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র ভুবনমোহন, মদনমোহন; স্তব্রাং পূর্বোক্ত প্রমাণাবলী হইতেই শ্রীকৃষ্ণের অপার রূপ-মাধুরীর পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্চমতঃ জ্ঞান—ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সকল জ্ঞানের আকর। বৃহদারণ্যক (২।৪।১০) উপনিষদে লিখিত আছে যে,—

অশ্ব মহতো ভূতশ্চ নিঃস্বসিতমেতদুৎথেনো যজুর্বেদঃ সামবেদার্থবাজ্জিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ স্ত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি সর্বাণি নিঃস্বসিতানি ॥ অর্থাৎ মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃস্বাস হইতে চতুর্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, স্ত্রাণ্য, অনুব্যাখ্যা সমস্তই নিঃস্বত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে বিবৃত আছে যে—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজিতা

ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা যন্তাং ধর্মো মদাত্মকঃ ॥

তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্বজায় সা ।

ততো ভৃথাদয়োহগ্ধনু সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ॥

[ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে—বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালপ্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়া ছলাম । ব্রহ্মা স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মনুকে উহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মর্ষি মনুর নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।]

ইতিহাস অর্থাৎ মহাভারতের অন্তর্গত সর্বজনমাত্রেয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে অতুলনীয় তত্ত্বজ্ঞান তাহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে ।

পূর্বোক্ত প্রমাণগুলির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অসীম জ্ঞানের পরিচয় লাভ করা যাইতেছে ।

ষষ্ঠতঃ বৈরাগ্য—শ্রীকৃষ্ণের বৈরাগ্যের পার পাওয়া যায় না । মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তদীয় লীলা সঙ্গোপনের ক্রিয়ংপূর্বক তদীয় প্রেরণাবশে বিশ্বামিত্র-প্রমুখ মুনিগণ দ্বারকা-সন্নিকটবর্তী পিণ্ডারকতীর্থে গমন করিলে যত্নকুমারগণ শাস্ত্রকে আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীবেষে সজ্জিত করিয়া মুনিগণের নিকট আগমনপূর্বক শাস্ত্রের প্রশংসার ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন । মুনিগণ কুপিত হইয়া শাস্ত্র কুলনাশন-মুষল প্রশংসা করিবেন বলিয়া অভিসম্পাত করেন । যত্নকুমারগণ তৎক্ষণাৎ শাস্ত্রের উদর-মোচনপূর্বক মুষল দেখিতে পাইয়া যত্নরাজ উগ্রসেনের নিকট সম্যক্ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে উগ্রসেন মুষল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন । ঐ মুষলচূর্ণসকল এরকা বনের সৃষ্টি করিল । কোন উপলক্ষে যত্নকুমারগণ এরকা বনে উপস্থিত হইলে পরস্পর এরকা দণ্ডদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া স্বধামে গমন করেন । অন্তর্ধ্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াও বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক আত্মীয়-স্বজনের জন্ত বিন্দুমাত্রও শোক বা ছুঃখ প্রকাশ করিলেন না—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়-পরিবারের প্রতি অনাসক্তি বা বৈরাগ্যের নিদর্শন ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিষ্ণুপুরাণে ভগবানের পূর্বোক্ত যে ছয়টি গুণের কথা উল্লেখ আছে তাহা কৃষ্ণচন্দ্রে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতমভাবে পরিলক্ষিত

হয়। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্রই যে পরতত্ত্ব ভগবান, তাহা প্রমাণিত হইল। শাস্ত্রকার-
গণ ভগবতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন যে—

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্নিতি শব্দ্যতে ॥ (ভাঃ ১।২।১১)

অর্থাৎ তত্ত্ববিদগণ অদ্বয়জ্ঞানকে অর্থাৎ ঐহিক তুল্য দ্বিতীয়বস্তু নাই, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই তত্ত্ববস্তু বলেন। সেই তত্ত্ববস্তুর প্রথম প্রতীতি ‘ব্রহ্ম’, দ্বিতীয় প্রতীতি ‘পরমাত্মা’ এবং তৃতীয় প্রতীতি ‘ভগবান’।

সমস্তশক্তিবিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ আবির্ভাববশতঃ ভগবান অখণ্ডতত্ত্বরূপ। আর তাদৃশ বৈশিষ্ট্যের অপ্রকাশ হেতু ব্রহ্ম—ভগবানের খণ্ড অসম্যক আবির্ভাবমাত্র ; অদ্বয়জ্ঞানের শুক ও নিঃশক্তি-প্রতীতিই ‘ব্রহ্ম’। জড়মধ্য-প্রবিষ্ট স্বল্প আত্মময় প্রতীতিই ‘পরমাত্মা’। অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণ সবিশেষ প্রতীতিই ভগবান।

উপাসনার তারতম্যানুসারে অদ্বয়তত্ত্বের তিনপ্রকার প্রতীতি উপলব্ধি হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদিগণের ‘ব্রহ্ম’, যোগীগণের ‘পরমাত্মা’ এবং ভক্তগণের ‘ভগবান’ প্রতীতি হইয়া থাকে।

শ্রীগোপাল-তাপনীর কারিকায় লিখিত আছে—

কৃষ্ণাংশঃ পরমাত্মা বৈ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতিরেব চ ।

পরব্যোমাদিপশুশৈশ্বর্য্য-মূর্ত্তিন সংশয়ঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্বেশ্বর। পরমাত্মা তাঁহার অংশ। ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতিঃ। পরব্যোমনাথ নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিলাসমূর্ত্তি-বিশেষ। এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণই যে ভগবান তাহা পূর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া প্রমাণ-শিরোমণি গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতে লিপিবদ্ধ আছে যে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ । (১।৩২৮)

[ইহঁারা (রাম-নৃসিংহাদি) পুরুষাবতারের অংশ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্]।

কেহ যদি এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় নারায়ণকে বা অন্য কোন অবতারকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন তাহা হইলে এখানে মহাজনবাক্য (চৈঃ চৈঃ অমৃতপ্রবাহ আঃ ২।৭৪, অনুভাষ্য আঃ ২।৮০-৮৬) এই যে “আলঙ্কারিক-বিচারমতে অপরিজ্ঞাত বিষয়কে ‘বিধেয়’ এবং পরিজ্ঞাত বিষয়কে ‘অনুবাদ’

কহে। অনুবাদ না বলিয়া যিনি বিধেয় অগ্রে বলেন, তাহার বাক্যের আশ্রয় না থাকায় তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। যথা—

অনুবাদমন্তুঃ। তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ ।

ন হুলকাৎস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥

(একাদশীতত্ত্বে ১৩ অঙ্কে ধৃত আলঙ্কারিক শ্রায়)

শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্বোক্ত শ্লোকে সর্বাগ্রে “এতে চাংশকলা” রহিয়াছে। ‘এতে’ শব্দে রাম-নৃসিংহাদি অবতারসকল সকলেরই পরিজ্ঞাত; সুতরাং ‘এতে’ শব্দ অল্পবাদ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যে পুরুষাবতারের অংশ, তাহা পূর্বে অপরিজ্ঞাত ছিল। সুতরাং পূর্বোক্ত শ্রায়ানুসারে ‘পুংস’ বিধেয়-রূপে জানা গেল। ঐ শ্লোকে কৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে জানা গেল, কিন্তু কৃষ্ণের বিশেষ জ্ঞান অবিজ্ঞাত থাকায় বিধেয় সংবাদ উপস্থিত হইল। এই জন্মই কৃষ্ণ-শব্দ আগে অনুবাদ কহিয়া, কৃষ্ণ যে ‘স্বয়ং ভগবান’ ইহাই তাঁহার বিধেয়। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান—ইহাই এ-স্থলের সাধ্যসংবাদ অর্থাৎ বিচার দ্বারা সাধিত হইবে। সুতরাং ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং’ এই কথায় ‘কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান’—এই অর্থই বাধ্য হইল অর্থাৎ এই অর্থ ব্যতীত অত্র অর্থ হইতে পারে না। যদি নারায়ণ স্বয়ং ভগবান এবং কৃষ্ণ যদি অবতার হন, তাহা হইলে স্তবাক্য বিপরীত হইত। অর্থাৎ “স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ” এইরূপ বিপরীত হইত; কিন্তু আর্থ অর্থাৎ ঋষিকৃত বিজ্ঞবাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাতব—এই চারিটি দোষ না থাকায় ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং’ সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, নারায়ণ বা অত্র কোন অবতার স্বয়ং ভগবান হইতে পারেন না।”

ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র অনন্তগুণধ্বক। তন্মধ্যে সুরম্যাঙ্গ, সর্বসল্লক্ষণযুক্ত ইত্যাদি চতুঃষষ্টিগুণ প্রধান। শ্রীকৃষ্ণের ষষ্টিসংখ্যাকগুণ নারায়ণে সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হয়। কিন্তু অবশিষ্ট চারিটি অসাধারণগুণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাতেও লক্ষিত হয় না—যথা (১) লীলা-মাধুর্য্য, (২) প্রেম-মাধুর্য্য (৩) রূপ-মাধুর্য্য ও (৪) বেগু-মাধুর্য্য। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রই কেবল শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসে সেবিত হন। নারায়ণও পঞ্চরসে সেবিত হন না। সে কারণে শাস্ত্রকারগণ সকল দিক দিয়া ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব, সর্বোত্তমত্ব দর্শন করিয়া তাঁহাকেই সর্বারাধ্যত্বরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

অস্মদীয় পূর্বাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তুকাম বৃন্দাবনং
 রম্যা কাচিছুপাসনা ব্রজবধুবর্গেন যা কল্পিতা ।
 শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পূমর্থো মহান্
 শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতিমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

অর্থাৎ ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই
 আরাধ্যবস্তু । ব্রজবধুগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই
 উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ । শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই নিখল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম-
 পুরুষার্থ - ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত । সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম
 আদর, অগ্ৰমতে আদর নাই ।

যাঁহারা আরাধনা করেন তাঁহাদিগকে আরাধক বলা হয় । জীবমাত্রেরই
 কৃষ্ণের আরাধক বা সেবক । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী
 প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুবাক্য, যথা—

জীবের 'স্বরূপ' হয় 'কৃষ্ণের নিত্যদাস' ।

কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥ (মধ্য ২০।১০৮)

জীবনিচয়ের ধর্মই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করা বা আরাধনা করা বা
 সেবা করা । শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি বা জীবশক্তি হইতে নিখিলজীব নিঃসৃত
 হইয়াছে । এই জীবের চিহ্ন-সম্বন্ধে ভগবান কৃষ্ণের সহিত নিত্য অভেদ এবং
 অণুচৈতন্য-ধর্মবশতঃ বৃহৎচৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য ভেদ রহিয়াছে ।

এই জীবদকল 'মুক্ত' ও 'বদ্ধ' ভেদে দুই প্রকার । মুক্তগণ চিন্তামে নিত্য
 কৃষ্ণসেবা-রস উপভোগ করিতেছেন, আর বদ্ধগণ জড়-জগতে নানা ক্লেশে
 ক্লিষ্ট হইতেছেন । বদ্ধজীব আবার দুইশ্রেণীর । উদিত-বিবেক ও অনুদিত-
 বিবেক । যে-সকল মানব বৈষ্ণবপথাবলম্বী, তাঁহারা উদিত-বিবেক, আর
 মানবগণের মধ্যে যাহাদের পরমার্থ চেষ্টা নাই ও পশুপক্ষিগণ, ইহারা
 অনুদিত-বিবেক বদ্ধজীব । কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলা চেষ্টাই আরাধনা বা ভজন ।

জ্ঞান-যোগনার্গে ভগবানের আরাধনাপেক্ষা ভক্তিমার্গে ভগবান অধিক
 প্রীতলাভ করেন । কেননা উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য—

ন সাধ্যতি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।

ন সাধ্যায়স্তুপশ্যাগো যথা ভক্তিশ্রমোজ্জিতা ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।২০)

[হে উদ্ধব ! আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি যেক্রপ আমাকে বাধ্য করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ-যোগ, অভেদ-ব্রহ্মবাদরূপ কেবলাদ্বৈতজ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্বশাখা-অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায়, সৰ্ববিধ তপস্তা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদি দ্বারাও আমি সেক্রপ বাধ্য হই না ।]

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়াত,

ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ॥

(৩৩৫৩ সূত্রের মাধবভাষ্য-ধৃত মাঠর শ্রুতি-বচন)

[ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকটে লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্বর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান একমাত্র ভক্তিরই বশ। ভক্তিই সৰ্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তি কাহাকে বলে ? তদ্বত্তরে শাস্ত্র বলেন—

স। পরানুরক্তিরীশ্বরে ॥ (শাণ্ডিল্য-ভক্তিসূত্র, ১।২)

ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি ।

শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত অথ অভিলাষ, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগদ্বারা অনাবৃত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি ।

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।

‘কৃষ্ণপ্রেম’, ‘কৃষ্ণ’ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তার মধ্যে সৰ্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীৰ্ত্তন ।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ, কীৰ্ত্তন, স্মরণ এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবন, অর্চন, বন্দন তথা দাস্ত, সখ্যাदिভাবে তাঁহার সেবাই শ্রেষ্ঠ আরাধনা বা সাধন ; তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীৰ্ত্তনই সৰ্বশ্রেষ্ঠ ভজন ।

শ্রীভাগবতে আছে—

কলেদৌষনিধেরাজমুগ্ধি হেকো মহানুগুণঃ ।

কীৰ্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্ত মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেন্ ॥

কৃতে যদ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্বরিকীৰ্ত্তনাং ॥ (১২।৩।৫১-৫২)

অর্থাৎ হে রাজন্ ! দৌষনিধি কলির একটি মহৎগুণ আছে ; কলিযুগে কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তন হইতেই জীব অত্যন্তবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। সত্যযুগে

বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের দ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে অর্চনাদি করিয়া যে ফললাভ হইত, কলিকালে হরিকীর্তন হইতে সে সব ফললাভ হয়।

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরত্থা ॥

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৩৮।১২৬)

অর্থাৎ কলিতে হরিনাম বিনা আর গতি নাই; হরিনামই একমাত্র গতি।

দ্বাপরীয়ের্জনৈবিষ্ণুঃ পাঞ্চরাত্রৈশ্চ কেবলম্।

কলৌ তু নামমাত্রাণ পূজাতে ভগবান হরিঃ ॥

(মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীমাধ্বতবচনম্)

এস্থলে বিশেষ কথা এই যে, পূর্বোক্ত সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে বৈধীভক্তি নববিধা। রাগানুগা সাধনভক্তি কেবল ব্রজজনের অনুগত হইয়া তাঁহাদের হায় কৃষ্ণসেবা। রাগানুগা ভক্তের সংখ্যা নিতান্তই দুর্লভ।

ভক্তির তিনটি অবস্থা—সাধন, ভাব ও প্রেম। প্রথমে ‘সাধন’ ভক্তি সাধন করিতে করিতে ভাবোদয় হয়। ভাব সম্পূর্ণ হইলে শ্রীকৃষ্ণে পরমাপ্রীতি উপস্থিত হয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই মায়িক জগৎ জীবের কারাগার। উত্তম বৈষ্ণব-গুরুর নিকট হইতে শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণান্তর সচ্চরিত্রতার সহিত নিরপধায়ে কৃষ্ণনামানুশীলন করিলে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাক্রমে চিহ্নগতে নিজ সিদ্ধ-চিৎস্বরূপে কৃষ্ণ-সেবা-রস অস্বাদন করিতে পারা যায়, অত্থায়া জন্ম-জন্মান্তর সংসারানলে অহরহঃ দক্ষীভূত হইতে হইবে—ইহাই শাস্ত্রবাব্য।

“সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।

সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥”

বাঙ্গা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিদ্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

— শ্রীচিদম্বনানন্দ ব্রহ্মচারী-কর্তৃক সংগৃহীত

প্রচার প্রসঙ্গ

ছুমকা জিলায় প্রচার

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৭ পৃষ্ঠার পর)

রাজবন্দ পলাশী

১৯শে এপ্রিল শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম সগোষ্ঠী প্রাতঃ ৬টায় সারসা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তৎকালে গ্রামস্থ সকলেই অশ্রুপূর্ণলোচনে বিরহজনিত বেদনা ও আন্তি জ্ঞাপন করেন এবং গ্রামের বহু স্ত্রী-পুরুষ আমাদের সহিত রাজবন্দ গ্রাম পর্য্যন্ত (প্রায় দুই মাইল উত্তর পশ্চিমে) অনুগমন করিয়া সেইস্থানে অবস্থান করেন। শ্রীযুক্ত গোপাল বাবুর সেবাচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু সময়ভাবে এখানে তাঁহার নবনির্মিত অটালিকায় মাত্র একদিন অবস্থিতি হয়। আমাদের বক্তৃতাবলী শুনিয়া গোপালবাবু এতই আকৃষ্ট হন যে তাঁহাদের এবং পার্শ্ববর্তী অল্প দুই একটি গ্রাম হইতে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় ছাগবলি-কুপ্রথাটি বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। ইনি গত গৌরপূর্ণিমায় বেদান্ত সমিতি হইতে শ্রীনামাশ্রয় করেন।

বক্তৃতাবলী

শ্রীচিদ্বনানন্দ ব্রহ্মচারী—ধর্মজীবনের প্রয়োজনীয়তা।

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ—ধর্মের লক্ষ্য।

পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ—মানবের অবলম্বনীয় বৃত্তি কি হওয়া উচিত—
তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা (হিন্দীতে)।

শ্রীল আচার্য্যদেব—ধর্মজীবন যাপনের প্রধানতম আবশ্যকতা।

বারমাসিয়া

সারসাজোল রাজবন্দ গ্রামে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারে এতদেশীয় অত্যাগত গ্রামের বহু ব্যক্তি আকৃষ্ট হন। প্রত্যেকেই মদীয় আচার্য্যপাদপদ্মকে সগোষ্ঠী তাঁহাদের গ্রামে পদার্পণ করিয়া শুদ্ধ সনাতন ধর্ম প্রচার করিতে অনুরোধ জানান। শ্রীজগৎ নারায়ণ সাউ নামীয় বারমাসিয়াস্থ এক বিহারী শুদ্ধলোক তাঁহাদের অত্মতম। এই গ্রামে সমিতির শ্রীহরিবোল দাস নামক একজন অনুগত শিষ্যও আছেন। এই দুইজনের আকর্ষণে আমরা ২০শে এপ্রিল সোমবার সকালে বারমাসিয়া (রাজবন্দ হইতে ৭ মাইল উত্তরে) যাত্রা করি। মোটর বাস সার্ভিস থাকা সত্ত্বেও গোয়ানে মালপত্রাদি দিয়া পদব্রজে অত্যাগত বৈষ্ণবগণ যাত্রা করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদকে শিবিকাযেগে লইয়া যাওয়া হয়। গ্রামটি অর্দ্ধ-নগরের স্থায়। এখানে সরকারী হাসপাতাল

এবং কয়েকটি সরকারী অফিস আছে। এইস্থানে সগোষ্ঠী শ্রীল আচার্য্যদেবকে এক বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রায় এক সহস্র লোক পতাকা, পুষ্পমালা, মৃদঙ্গ করতালসহ শ্রীল আচার্য্যদেবের আগমন প্রতীক্ষায় থাকে। নির্দিষ্ট শিবিকা পৌঁছাইবামাত্র সমবেত জনতা জয়ধ্বনি দিতে থাকে। সকলেই শ্রীআচার্য্যদেবের শিবিকা বহন করিতে চায়। কাহাকে নিষেধ করা হইবে? শেষে প্রায় ৩০ ৩৫ জন লোক শিবিকাটি বহন করিতে থাকে। যাহারা সম্পূর্ণরূপে বহনের সুযোগ পায় নাই তাহারা শিবিকাটি স্পর্শ করিয়া চলিতে থাকে। সে বিরাট দৃশ্য ভাষায় বর্ণনাতীত।

বক্তৃতাবলী

আচার্য্যদেবই সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রায় ৩০০০ শ্রোতা সভার গৌরব বর্দ্ধন করেন।

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ—নির্বিশেষবাদ ও শঙ্করের পারমার্থিক কূটনীতি বিশ্লেষণ করিয়া ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীলআচার্য্যদেব—বর্তমানকালে ধর্মের দুর্ভিক্ষ এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম কোনটি—তৎসম্বন্ধে সুদার্শনিকতাপূর্ণ বক্তৃতা।

বক্তৃত্যশেষে পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে হিন্দীতে ‘রামলীলা’ বর্ণনামুখে অত্যাশ্চর্য্য বিম্বুতস্থাপেক্ষা কক্ষের বিশেষত্ব-কীর্ত্তনপূর্ব্বক, কক্ষই যে পরতমতত্ত্ব পরন্তু রামচন্দ্র নহে—তাহা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারে স্থাপন করিয়া সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্মিত করিয়া দেন।

সভার শেষে অনেকে বলিতেছিলেন, আমরা ত এতদিন জানিতাম, রামচন্দ্রই পরতমতত্ত্ব। কিন্তু আজ আমাদের সে ভ্রম দূরীভূত হইল। পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজের শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভার গুণগানে শ্রোতৃগণ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের বক্তৃতা এমনই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল যে পরদিবস সকাল হইতেই স্থানীয় বহু শিক্ষিত, গণ্যমান্ত ব্যক্তি আচার্য্যপাদপদের নিকট শাস্ত্রালোচনা করিতে আসেন।

ধাদিকা

বারমাসিয়াতে একরাত্র অবস্থান করিয়া তৎপরদিবস ২১শে এপ্রিল মঙ্গলবার বেলা ২টার সময় বাসযোগে ধাদিকা গ্রামে যাত্রা করা হয়। এই গ্রামের ভক্তদ্বয় শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী এবং সজ্জনকিঙ্কর শ্রীযুত রত্নাকর দাস মহাশয়গণের আকর্ষণই ধাদিকা গ্রামে

প্রচারের একমাত্র কারণ। ইহাদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় আগ্রহ সত্যই প্রশংসনীয়। শ্রীল গুরুদেবের বজ্রনিঃশ্বনে আকৃষ্ট হইয়া স্কুল-কলেজে পাঠরত এই গ্রামের বহু বালক আমাদের প্রচারকার্যে সেবার অংশ গ্রহণ করায় শ্রীহরিপাদপদ্মে নিত্য স্মৃতি অর্জনের সৌভাগ্য-লাভ করিয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়া গ্রাম হইতে অত্যাশু পাষাণগুলিকে ধ্বংস করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির জয়ডঙ্কা স্থাপন করুন—ঈশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

সভা-সমিতির বিবরণ

অত্রস্থ প্রত্যেকটি সভায় শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং তাঁহারই আদেশক্রমে অত্যাশু বৈষ্ণবগণ বক্তৃতা-দান করেন।

২১শে এপ্রিল :—

শ্রীরোহিণীনন্দন ব্রজবাসী—ভাগবত ধর্ম যাজনের ফল।

শ্রীচিদ্বনানন্দ ব্রহ্মচারী—মানবজীবনের কর্তব্য।

শ্রীল আচার্য্যদেব—অমেধ্যভোজী অভক্তের কল্পিত ঈশ্বর ও ভক্তের ভগবান এক নহে।

২২শে এপ্রিল :— অতঃপুষ্টির জন্ত পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ গ্রামস্থ ‘সরস্বতী-ঘরে’ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

২৩শে এপ্রিল :—

শ্রীযুগভানু ব্রহ্মচারী—ধর্মে আন্তরিক সদাচার ও বাহ্যিক সদাচার সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন।

ইনি শ্রীল গুরুদেবের রক্ষনাদি কার্য্য বরেন। কিন্তু তাঁহার নিকট এইরূপ সুন্দর বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বলিতে থাকেন, “দেখিতেছি এঁদের কেহই কম নহেন। একজন রাধুনিও কি রকম বক্তৃতা দান করেন। ইহা হইতে গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শিক্ষা ও শিক্ষা-প্রণালী যে কিরূপ উন্নত ও সুবৈজ্ঞানিক তাহা আমাদের ধারণাতীত।”

শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী—ভগবৎ পূজায় অধিকার বিচার।

শ্রীল আচার্য্যদেব—বর্তমান সমাজের উন্নতি বিধানে ঈশসেবাবিমুখ দেশ-কর্ণধারগণের ভোগ-বিলাসে ইন্দ্রিয় যোগান নীতি আশু দেশ ও সমাজ-স্বংসকারী।

এইদিন সভায় প্রায় ১৫০০ শ্রোতা হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেবের এই বক্তৃতা সভাস্থ সকলের মনে প্রেরণার সৃষ্টি করে। তাহারা সকলেই শ্রীল গুরু-

দেবের এই বক্তৃতার এবং অত্যাশ্চর্য উপদেশাবলী-মত সাত্বত-সমাজ-গঠনে ত্রতী হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। বক্তৃতাশেষে পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে “কৃষ্ণলীলা” সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

কুমড়াবাদ

কুমড়াবাদের (ধাদিকা হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে) বহু লোক ধাদিকা গ্রামে বক্তৃতা শুনিতে আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী তাহাদের হৃদয় এক্রপ আকর্ষণ করিয়াছিল যে, প্রচারপাটী-সহ ঐ গ্রামে পদার্পণ-করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ইহার মূল উদ্যোক্তা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী প্রভু। ইনি জগৎধরেন্য শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পাদানুকম্পিত। এই বৃদ্ধ বয়সে (৬২ বৎসর) তিনি আমাদের সহিত প্রচারে থাকিয়া যেক্রপ সেবোৎসাহ দেখাইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক কোমলশ্রদ্ধ জনেরই অনুসরণীয়।

আমাদের উপস্থিতির পূর্ব হইতেই ব্যাণ্ড পাট, যুদঙ্গ-করতাল, পুষ্পমালা-সহ গ্রামবাসিগণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই বিরাট সম্বর্ধনার মধ্য দিয়া শ্রীল আচার্য্যপাদের শিবিকা গ্রামের মধ্যে অগ্রসর হইতে থাকে। এখানেও গ্রামস্থ বহু উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের শিবিকা আপনাদের স্বন্ধে বহন করিয়া এই দুর্লভ মানব-জন্ম সার্থক করেন। এই গ্রামে প্রচার কার্য্যে অত্যাশ্চর্য উদ্যোগিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র মণ্ডল ও শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীর (সমিতির আশ্রিতা) নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর একমাত্র পুত্র সন্তান শ্রীযুক্ত গৌরহরি দাস মদীয় গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রীনামাশ্রিত হন।

বক্তৃতাবলী

প্রতিটি সভায় শ্রীল গুরুদেবই সভাপতির আসন ভূষিত করেন। তাঁহারই আদেশক্রমে অত্যাশ্চর্য বৈষ্ণববৃন্দ বক্তৃতাদান করেন। প্রত্যেকের পার্শ্বে বক্তৃতার বিষয়গুলি উল্লিখিত হইল।

২৪শে এপ্রিল :—

শ্রীযুক্ত মধুসূদন বিদ্যানিধি—বর্তমান কালে অধিকাংশ গৃহস্থগণের কয়েকটি প্রাত্যহিক অসদাচার।

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ—বর্তমান সমাজের অধঃপতিত গতির জন্ত ধর্মবিরোধিগণই দায়ী।

পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ—তুর্লভ মানব জীবনের একমাত্র প্রয়োজন
ভগবন্তক্তি-লাভ। (হিন্দীতে)

শ্রীল আচার্য্যদেব—বিষ্ণুতত্ত্ব ব্যতীত অত্যাচ্ছ দেবতার মুক্তিদান
করিতে পারে না।

২৫শে এপ্রিল :—

শ্রীল আচার্য্যদেব—ঈশ-ভক্ত-বিরোধি-দেবগণের স্বরূপ বিশ্লেষণ।

বক্তৃত্তাশেষে পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে শ্রোতৃবৃন্দের
অনুরোধে “কৃষ্ণলীলা” বর্ণনা করেন।

ছুমকা

ছুমকা-নগরী কুমড়াবাদ হইতে ৭মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ২৬শে
এপ্রিল সকাল ৬টায় আমরা ছুমকা যাত্রা করি। মালপত্রাদি গো-শকটে
প্রেরিত হয়। বেলা ৮-৩০ ছুমকা পৌঁছাইয়া পূর্বব্যবস্থিত ‘পুরাতন ধর্মশালায়’
আমরা অবস্থান করি। কুসিদ্ধান্তপর-পরমত-নিরসনে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের
বক্তৃনির্বোধ-বাণী সভার প্রথম দিনেই নগরের সর্বত্রই আধিপত্য স্থাপন করে।
এই স্থানে বহু শ্রেণীর ধার্মিকগণের যাতায়াত ছিল। কিন্তু সে সকল নিস্তরু
হইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তসমিতির বিজয়-বৈওয়ন্তী উদ্ভীন হইয়াছে। বিশেষতঃ
স্থানীয় উকীলগণ, বিভিন্ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকনিচয়, স্থানীয়
কলেজের অধ্যাপকগণ ও স্থানীয় বিশিষ্ট জনগণ মধ্যে এক বিপুল-প্রেরণার
সঞ্চার হয়। আচার্য্যদেবের বৈকুণ্ঠ বাণী তাঁহাদের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ
করে। যখনই আমরা সভা সমিতি স্থিরীকরণের জন্ত তাঁহাদের নিকট গমন
করিয়াছি, কেবল ঐ একটি কথাই শুনিয়াছি, “আপনাদের আচার্য্যপাদপদ্ম
সগোষ্ঠী আগামী বৎসর আবার রূপাপূর্বক এদেশে আগমন করিবেন ত।
তাঁহার দ্বায় তেজস্বী মহাপুরুষের পাদপদ্মাশ্রয়ে আপনাদের জীবন সত্যই ধ্বংস
হইয়াছে। ভোগপ্রবণ বর্তমান বিধে তিনিই একমাত্র সনাতনধর্ম-রক্ষা
করিতে পারেন।”

বক্তৃত্তাবলী

প্রতিটি সভায় শ্রীল আচার্য্যদেবই সভাপতিত্বে বৃণীত হন।

২৭ শে এপ্রিল :—(স্থান—Popular club)

শ্রীল আচার্য্যদেব—যড়-দর্শন ও বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণের মতগুলির
তুলনামূলক আলোচনাধারে বেদান্ত-বিজ্ঞান ব্যতীত
অত্যাচ্ছ মতগুলির অসারতা ও অযৌক্তিকতা

প্রদর্শন করেন। বক্তৃতাশেষে পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্র-
যোগে শ্রীগৌরলীলা সম্বন্ধে স্তুতত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।

২৮শে এপ্রিল :— (স্থান—যতীন বাবুর রাধাকৃষ্ণ-মন্দির)

শ্রীল আচার্য্যদেব—নিরাকারবাদ অসনাতনী ও অগুহ্ম মত—শাস্ত্রযুক্তি
ও প্রমাণ দ্বারাই স্থাপিত।

২৯শে এপ্রিল :— (স্থান—ধর্মস্থান, ছুমকা)

শ্রীল আচার্য্যদেব—নিরাকারবাদ আসুরিক মত। তাহার সনাতন
ধর্মাবলম্বিদের সহিত চিরকালই অপাংক্তেয়
—ঐতিহ্য-প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করেন।

পরে পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে “রামলীলা” প্রদর্শনমুখে
শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব-স্থাপন করিয়া সভাস্থ সকলের ধর্মজগতে পরতমত্ব সম্বন্ধে
ভ্রান্তধারণা নিরসন করেন। সভাশেষে শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান এবং
অতুল্য হিন্দী ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

৩০শে এপ্রিল :— (স্থান—ছুমকা জিলা-পরিষদ ভবন)

পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ—“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য...” শ্লোকটির ব্যাখ্যা-
মূলে সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন।

পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ—“জীবপ্রেম”, ও “জীবসেবা”, শব্দগুলির
অর্থোক্তিকতা এবং “হরিজন কে”—তাহা
বিশদভাবে আলোচনা করেন।


অচ্য সভায় একজন শ্রোতা “দেশসেবা কি ধর্মসেবা নয়”—প্রশ্ন উত্থাপন
করিলে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ উন্নতকণ্ঠে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা জানাইয়া দেন, “ধর্ম-
সেবাই সমাজ-সংস্কার। দেশনেতৃগণ যেদিন ইহা স্বীকার করিবেন সেইদিনই
দেশের মঙ্গল, অস্তিত্ব নহে।”

শ্রোতৃগণ আচার্য্যদেবের এইরূপ উন্নততম বিচার শ্রবণে নির্বাক হইয়া
যান। আরও দুইদিবস অস্থানে অবস্থানপূর্বক সহরের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যেকের
দ্বারে দ্বারে হরিকথা-প্রচার করিয়া ওরা মে সকালে শ্রীল আচার্য্যদেব
প্রচারসঙ্ঘ-সহ সমিতির চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।


—নিজস্ব-সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গে জয়তঃ

● স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরহোকজে । ●



গৌড়ীয়-পত্রিকা



● অহৈতুক্যপ্রতিহতা যন্মাদ্ভা স্তপ্রসীদতি ॥ ●

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥

অন্ত ধর্ম সূর্যরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রসি নৈলে পও সেই শ্রব ॥

১৬শ বর্ষ } বাসুদেব, ২৩ শ্রীধর, ৪৭৮ গোরাঙ্গ
রবিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭১ ; ইং ১৬/৮/১৯৬৪ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সান্নিধ্যাদং

শ্রীল-প্রবোধনন্দ-সরস্বতী-গোষ্ঠামিপাদ-বিরচিতং

শ্রী শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

শ্রীগোক্রম ধাম-সেবা-নিষ্ঠা—

ছিছেত খণ্ডশ ইদং যদি মে শরীরং
ঘোরা বিপদ্বিততয়ো যদি বা পতন্তি ।
হা হন্ত হন্ত ন তথাপি মমেহ ভূয়াং
শ্রীগোক্রমাদিতর-তীর্থপদে পিপাসা ॥১৮॥

যদি আমার এট দেহ খণ্ড খণ্ডরূপে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কিংবা যদি
বিষম বিপত্তিজালও আমার উপর পতিত হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ ; কিন্তু হায় !
তথাপি ইহ-জীবনে শ্রীগোক্রম ভিন্ন অত্র তীর্থপদের জন্ত যেন কদাচ আমার
অভিলাষ না হয় ॥১৮॥

প্রাকৃত-ভোগলালসা পরিত্যাগপূর্বক রাধাগোবিন্দের মধুর লীলা-
দর্শন-বাসনার সহিত শ্রীনবদ্বীপ-বাস-লালসা—

স্বয়ং-পতিত-পত্রকাণ্যমৃতবৎ ক্ষুধা ভক্ষয়ন্
তৃষা ত্রিদিববন্দিনী-শুচিপয়োহঞ্জলীভিঃ পিবন্ ।
কদা মধুর-রাধিকা-রমণ-রাস-কেলিস্থলীং
বিলোক্য রসমগ্নধীরধিবসামি গৌরাটবীম্ ॥১৯॥

কবে বৃক্ষ হইতে স্বয়ং-পতিত পত্ররাজি অমৃতের তায় ভক্ষণ করিয়া
ক্ষুধানিবৃত্তি করিব ? কবে অঞ্জলি অঞ্জলি সুরধুনীর পুতবারি পান করিয়া
পিপাসার শান্তি করিব ? আর কবেই বা শ্রীরাধিকারমণের মধুর রাসকেলি-
স্থান দর্শনপূর্বক প্রেমরসে চিত্ত মগ্ন করিয়া গৌরাটবীতে বাস করিব ? ১৯॥

ব্রহ্মাদিরও প্রণম্য নবদ্বীপবাসীরই পুরুষার্থ-চিন্তামণি করতলগত—

তেনাকারি সমস্ত এব ভগবদ্ধর্মোহপি তেনাদুতঃ
সর্বস্মাং পুরুষার্থতোহপি পরমঃ কশ্চিৎ করস্বীকৃতঃ ।
তেনাধায়ি সমস্তমূর্দ্ধনি পদং ব্রহ্মাদয়স্তং নম-
স্ত্যাদেহান্তমধারি যেন বসতো খণ্ডে নবে নিশ্চয়ঃ ॥২০॥

তিনিই সমস্ত ভগবদ্ধর্মের আচরণ করিয়াছেন, তিনিই নিখিল-পুরুষার্থ
হইতেও শ্রেষ্ঠতম কোন অপূর্ব বস্তু করতলগত করিয়াছেন (অর্থাৎ নিখিল-
পুরুষার্থ-শিরোমণি অনর্পিতচর প্রেমসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন), তিনিই
সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, ব্রহ্মাদি-দেবগণ তাঁহারই নিকট
অবনত হন, যিনি দেহান্তকাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপে বাস-বিষয়ে কৃতনিশ্চয়
হইয়াছেন ॥২০॥

পশুপক্ষীকেও প্রেম-প্রদানকারী নবদ্বীপধামের প্রতি নমস্কার —

খগবৃন্দং পশুবৃন্দং ক্রমবৃন্দমুন্মদপ্রেমঃ ।

প্রীণয়দমৃতরসৈর্নবদ্বীপাখ্যং বনং নমত ॥ ২১ ॥

যে নবদ্বীপ-বন হর্ষগর্ভাধিত প্রেম-পীযুষরস-কদম্বদ্বারা মৃগ-বিহগ-বিটপী-
কুলকে প্রেমোন্মত্ত করিতেছেন, সেই নবদ্বীপ-বনকে নমস্কার কর ॥ ২১ ॥

পণ্ডিতগণের অগ্রতীর্থে অভিলাষ থাকিলেও সুপণ্ডিত ও সুদার্শনিক গৌর-
ভক্তগণের রাধামাধব-প্রিয় নবদ্বীপধামাশ্রয়েই অভিরুচি—

ভক্ত্যৈকয়ান্নত্র কৃতার্থমানিনো ধীরাস্তদেতন্ন বয়স্তত্ত্ব বিদ্বাঃ ।

শ্রীরাধিকামাধববল্লভং নঃ সদা নবদ্বীপবনস্ত সংশ্রয়ঃ ॥ ২২ ॥

অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নবদ্বীপ ব্যতীত অগ্রতীর্থের মানসে আপনাদিগকে
কৃতার্থ মনে করেন, কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে পারি না । অনগ্রভক্তিদ্বারা
শ্রীরাধামাধবপ্রিয় (লীলাশক্তিরূপ-শ্রীধাম) “নবদ্বীপ-বনই” আমাদিগের নিত্য
আশ্রয়স্থল ॥ ২২ ॥

উন্নতোজ্জ্বল-ভক্তিসারবীজ গৌরবন-সেবায়ই জীব পরিপূর্ণকাম—

দোষাকরোহং গুণলেশহীনঃ সর্ববোধমো দুর্লভবস্তুকাঙ্গনী ।

গৌরাটবীমুজ্জ্বল-ভক্তিসারবীজং কদা প্রাপ্য ভবামি পূর্ণঃ ॥ ২৩ ॥

(সর্ব) দোষের আকর, গুণলেশশূন্য, সর্বাপেক্ষা অধম হইয়াও দুর্লভ বস্তু-
লাভে অভিলাষী—আমি কবে উজ্জ্বলভক্তিসারবীজ গৌরাটবী আশ্রয় করিয়া
পূর্ণকাম হইব ? ২৩ ॥

গৌরবনের স্বরূপ—

শুক্লোজ্জ্বল-প্রেমরসামৃতাক্ষেরনস্তপারশ্ব কিমপ্যুদারম্ ।

রাধাপ্রদত্তং যদপূর্বসারং তদেব গৌরাক্ষবনং গতিমে ॥ ২৪ ॥

বিগুহ, উজ্জ্বল ও অনন্তপার প্রেমরস-সুধাসিকুর শ্রীরাধাপ্রদত্ত কোন
অনির্লচনীয় ঔদার্য্য-রসময় অপূর্ব সার শ্রীগৌরাক্ষ-কাননই আমার একমাত্র
গতি (ইউক) ॥ ২৪ ॥

নিরপরাধে একান্তভাবে নবদ্বীপধাম-সেবাফলে সর্বসাধন-

বিহীনেরও পরমপ্রয়োজন লাভ—

সর্বসাধনহীনোহপি নবদ্বীপৈক-সংশ্রয়ঃ ।

যঃ কোহপি প্রাপ্নুন্নাদেব রাধাপ্রিয়-রসোৎসবম্ ॥ ২৫ ॥

সর্বসাধনহীন হইয়াও যে-কোনও ব্যক্তি যদি শ্রীধাম-নবদ্বীপকেই একান্ত-
ভাবে (ধামাপরাধশূন্য হইয়া) আশ্রয় করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি শ্রীবার্ষ-
ভানবীর প্রিয় রাসোৎসব প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

নবদ্বীপাশ্রয়-নিষ্ঠা—

ত্যজন্ত স্বজনাঃ কামং দেহবৃত্তিঞ্চ মাহন্ত বা ।

ন নবদ্বীপ-সীমাতঃ পদং মে চলতু কচিৎ ॥ ২৬ ॥

আমার স্বজনগণ আমাকে পরিত্যাগ করুক, অথবা আমার দেহবৃত্তিই অচল হউক, তথাপি নবদ্বীপ-সীমা হইতে আমার পদ যেন কুত্ৰাপি গমন না করে ॥ ২৬ ॥

নবদ্বীপধাম-সেবার প্রতিকূলাচরণকারী নিজজনও পর, স্তূতরাং

দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাজ্য—

সা মে ন মাতা স চ মে পিতা ন

স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখা ন ।

স মে ন মিত্রং স চ মে গুরুন-

যো মে ন রাধাবনবাসমিচ্ছেৎ ॥ ২৭ ॥

আমার সেই ‘পিতা’ ‘পিতা’ নহে, সেই ‘মাতা’ ‘মাতা’ নহে, সেই ‘বন্ধু’ নহে, সেই ‘সখা’ (হিতৈষী) ‘সখা’ নহে, সেই ‘মিত্র’ (উপকারক) ‘মিত্র’ নহে, সেই ‘গুরু’ ‘গুরু’ নহে, যে আমার “রাধাবন” শ্রীনবদ্বীপ-বাসের প্রতিকূল ॥ ২৭ ॥

জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত শ্রীগোক্রম-বাস-সৌভাগ্য-লালসা—

কিমেতাদৃগ্ ভাগ্যং মম কলুষমূর্ত্তেরপি ভবে-

ন্নিবাসো দেহান্তাবধির্ষদিহ তদ্ গোক্রমভূবি ।

তয়োঃ শ্রীদম্পত্যোন্নব-নব-বিলাসৈব্বিহরতোঃ

পদজ্যোতিঃপূরৈরপি তু মম সঙ্কোহপি ভবিতা ॥ ২৮ ॥

আমার মত পাপ-প্রতিমূর্ত্তির কি এমন ভাগ্য হইবে যে, দেহান্ত পর্য্যন্ত সেই গোক্রমস্থলীতেই বাস করিতে পারিব ? সেই গোক্রমে নবনব-বিলাসে বিহরণ-শীল ব্রজনব-যুবদম্পদের শ্রীচরণজ্যোতিঃ-প্রবাহের সহিত কি আমার সঙ্গ (সম্বন্ধ) ঘটিবে ? ॥ ২৮ ॥

ভাগবত-বিব্রতি

মানবগণের স্বরূপানুভূতিতে যে বৃত্তি নিত্য, তাহাই হরিভক্তি। বাহ্য জগতের ও খণ্ড বস্তুসমূহের অখণ্ড নিত্য আধার বৈকুণ্ঠ বস্তু ভগবান্। সেই ভগবানে ভক্তিই সকল জীবের একমাত্র প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ-ইন্দ্রিয়জ্ঞানে খণ্ড প্রতীতিক্রমে জীবগণ কাল্পনিক মায়াবাদ অথবা ফলভোগবাদে প্রমত্ত হইয়া সত্যবস্তুর ধারণা করিতে অসমর্থ হয়। সেজন্ত প্রত্যক্ষবাদিগণের নিত্য মঙ্গলের জন্ত তদুপযোগী করিয়া হরিলীলা বর্ণন কর, যাহাতে তাহারা জড়ভোগবাদ ও মায়াবাদ হইতে মুক্ত হইয়া নিত্য হরিসেবাপর হইতে পারে। এই জন্ত ভক্তিমান্ বৈষ্ণবের নিকটই ভাগবত পাঠ করা কর্তব্য নতুবা অক্ষজ-জ্ঞান-প্রতারিত মায়াগ্রস্ত ভোগী বা ত্যাগী ভক্তিবর্জিত হওয়ায় ভাগবতবর্ণন বা অধ্যাপন করিতে পারে না। (ভাঃ ২।৭।৫১)

ভগবদ্বৈভব দুই প্রকার—ভক্তিবৈভব বৈকুণ্ঠ ও মায়াবৈভব ব্রহ্মাণ্ড। বৈকুণ্ঠকথার বর্ণন শ্রবণ করিলে জীবের মায়িক-বৈভব-মাহাত্ম্য হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। জীবের অন্তর্ভুক্তিতে বৈকুণ্ঠ-বৈভব-পরিস্ফুট হয় না। তজ্জন্ত মায়িক বৈভবমিশ্র পরমাত্মতত্ত্ব-প্রকটিত মায়াক্রিয়প্রচুর বিরাট প্রভৃতির বর্ণনায় বিপরীতভাবে শুদ্ধ-ভক্তিরাজ্যের উপলব্ধি ঘটে। যাহার ভগবৎ-সেবাপর নিত্যরুচি প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদিগের চিত্তশুদ্ধির জন্ত মায়াময়-বৈভব বর্ণনের উপযোগিতা আছে। ভগবল্লীলা কখনই মায়িকী নহে। উহা গুণাতীত অপ্রাকৃত বলিয়া জীবগণ লীলাশ্রবণে মায়িকবোধে লীলার সহিত নশ্বর ক্রিয়ার সাম্যবোধ করেন না। সেবাপর-ভক্ত মায়ায় মুগ্ধ হন না বলিয়া তাহারা লীলাকে জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগপর অনুষ্ঠান বলিয়া জানেন না। (ভাঃ ২।৭।৫২)

সাধনবিষয়ে পূর্বেই মহাভাগবত পরীক্ষিৎ জানিয়াছেন যে, কৰ্ম ও জ্ঞান-পথে উপায় ও উপেষের ভেদ থাকায় উহা নিত্য নহে, ভক্তিই একমাত্র নিত্য। ভক্তির সাধনকে কৰ্ম-জ্ঞানাদিসাধনের স্থায় অনিত্য জানিয়া ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণলীলাকে ভোগ্য জগতের অচ্ছতম মনে করিতে হইবে না। পরীক্ষিৎ হরিলীলাপ্রবেশকে অপর সাধনজাতীয় জ্ঞানে বলিলেন, আমি নির্জনে সাধুসঙ্গ-বর্জিত হইয়া যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যজগতের অচ্ছতম কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিব, আপনি তাহাই বর্ণন করুন। তদুত্তরে শুকদেব পরীক্ষিতের তাদৃশ স্মরণপদ্ধতির ধারণা সংশোধনমানসে বলিলেন,

স্মরণ-প্রযত্ন ঐক্যরূপ মহে। জড়বস্তু বিষয়ক স্মৃতিতে স্মরণীয় বস্তুর স্বতন্ত্রতা ও চিন্মাত্রতা ও চিহ্নিলাসের অযোগ্যতা থাকায় অনুচিত জীব নিজ চেষ্টায় কল্পনাপূর্বক বস্তুনির্দেশ করে, কিন্তু কৃষ্ণ তাদৃশ মায়িকবস্তু না হওয়ায় মায়িক চেষ্টার ছায়া তাঁহাকে জড়বস্তু মনে করিয়া কল্পনাপূর্বক কৃত্রিমভাবে অষ্টকাল লীলা স্মরণ করিতে হইবে না। তিনি স্বয়ংরূপ এবং স্বয়ংপ্রকাশ-ধর্ম্যবিশিষ্ট।

কৃত্রিম নশ্বর জড়চিন্তার ছায়া তাঁহার রূপ, গুণ, লীলাদির স্মরণের আবশ্যকতা নাই। প্রাকৃত জড়বুদ্ধি বিশিষ্ট প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে যে-প্রকার কৃত্রিম অষ্ট কালীয় লীলা-স্মরণ পদ্ধতি প্রচলিত হইতে পারে সে রূপ অপ্রাকৃত হরি-রূপ-গুণ-লীলা না হওয়ায় তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ভগবান্ নিত্যকাল স্বতন্ত্র চিন্ময়-লীলাবিশিষ্ট, সুতরাং জড়জগতের নশ্বর বস্তু ধ্যানের ছায়া তাঁহার চিন্তা করিবার পদ্ধতি অর্হু নহে। সাধু ও গুরুমুখে সর্বদা ভগবানের নাম শ্রবণ করিলে তাহা সর্বদা গান করিবার চেষ্টা হয়। তাদৃশ নামশ্রবণ ও সেই স্মরণ-প্রভাবে নিত্যকাল কীর্তন-চেষ্টায় অল্পকালের মধ্যেই ভগবান্ রূপা করিয়া স্ব-স্বরূপ নিত্যগুণ ও নিত্যলীলায় মুক্ত পুরুষকে প্রবেশ-অধিকার প্রদান করেন। হরিশ্রবণ-কীর্তনপর ভক্তের কৃত্রিম স্মরণাদি বিহিত নহে। শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণপ্রভাবে নিত্য কীর্তন এবং কীর্তন করিতে করিতে নিত্য স্মরণীয় কৃষ্ণলীলা হৃদয়ে আপনা হইতেই প্রকাশিত হন। কৃত্রিমভাবে নির্জ্ঞানতা সম্ভবপর নহে। অনর্থমুক্তিতে ভোগময় বাহু জগতের সহিত ভোগসঙ্গ আপনা হইতেই বিদূরিত হয়। তাহাকেই নামভজনকারী সাধুগণ নির্জ্ঞানে হরিনাম কীর্তন বলিয়া থাকেন। নামকীর্তন পরিহার করিয়া স্মরণাঙ্গ যাজন করিবার ছলে যে নির্জ্ঞানভজন-প্রয়াস তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের অমুমোদিতনহে।

নির্জ্ঞানে অনেক সময় অনর্থ বৃদ্ধি হইয়া ভগবৎকীর্তনের বাধা উৎপন্ন করে। নিজের কৃত্রিম অনর্থযুক্ত সাধন প্রবল হইয়া শ্রীমহাজন গুরুবর্গের বাক্যাবলীর প্রতিকূল অর্থ সৃষ্ট হয়। শ্রদ্ধাসহ নাম শ্রবণ করিলে অনর্থ নাশ হয়। অনর্থনাশের ফল নামকীর্তন। শ্রদ্ধাসহ নিত্যকালীয় ভজন-জ্ঞানে নামকীর্তন করিলে অনর্থ নাশ হয়। অনর্থ নষ্ট হইলে ভগবান্ স্বয়ং ভক্তের হৃদয়ে নিজরূপ-গুণ-লীলা প্রকট করান। এই প্রকটকার্য জড়ভোগসাধ্য ক্রিয়াবিশেষ নহে। জড়বস্তু ধ্যান কাল্পনিক, কিন্তু অপ্রাকৃত স্বতন্ত্র কৃষ্ণ ধ্যেয় জড়বস্তু মাত্র না হওয়ায় নিত্য কীর্তনকারী ভক্তহৃদয়ে স্বয়ং আবিস্কৃত হন। শ্রবণ-কীর্তনভাবে

অভক্তহৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয় না বলিয়া তাহাদের নামকীর্তনরহিত নম্বর কৃত্রিম নির্জন ভজন ভাণ। তাহাতে অনর্থবৃদ্ধি ব্যতীত কৃষ্ণশ্রুতির সম্ভাবনা নাই। কীর্তনকালে শ্রদ্ধার অভাব হইলেই জনসঙ্গ, তাহা ভজনের ব্যাঘাত মাত্র। সেজন্ত শ্রবণ-কীর্তনকারী ভক্তমান্ জনগণ হৃঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উদ্দেশে বহির্গুহ জনসঙ্গে অনবধানদোষে ছুট্ট হইবেন না। নিঃসঙ্গ বা নির্জনে নাম শ্রবণ ও নাম কীর্তনপ্রভাবে ভগবান্ অনর্থমুক্ত জীবহৃদয়ে অচিরেই প্রবেশ করেন। অশ্রদ্ধাধান জনগণকে নামদান অপরাধ মধ্যে গণ্য। নাম-মহিমা-প্রচার অপরাধ-মোচনের একমাত্র পন্থা। যাহারা নির্জনে হরিভজন না করিয়া অপরাধ প্রবল করেন তাহাদের হৃদয়ে ভগবান্ প্রবেশ করেন না। হৃঃসঙ্গ-পরিহারকার্য্য নামশ্রবণ ও কীর্তনে রুচিবিশিষ্ট হইলেই অবশ্যভাবী। জড়চিত্তাপর নির্জনতা ভক্তের বিহিত নহে, বহু ভক্তসঙ্গে কীর্তনই বিহিত। গুরুমুখশ্রুত নির্জনে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম-গ্রহণে ব্যক্তিবিশেষের উপকার হয় সত্য, তাহাতে জীবদেয়ার দৃষ্টান্তে সঙ্গীর্ণতা আসিয়া পড়ে। “ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা’র। জন্ম সার্থক কর করি’ পর-উপকার।”—এই অমোঘবাণী শুনিয়া নিত্য কৃষ্ণকীর্তন করিলে জীব অনর্থমুক্ত হইয়া পরোপকারফলে ভগবানকে হৃদয়ে অবরোধ করিতে সমর্থ হন। ব্যক্তিগত স্বার্থ নিজাচরণময়। আপনি আচরণশীল হইয়া কীর্তনপ্রচারফলেই জীবের আত্মাত্তিক মঙ্গল হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম শ্রুত না হইয়া থাকিলে জীবের কীর্তনাধিকার হয় না। যাহারা সাধু-গুরু-প্রসাদে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারা ই অনন্তশরণ হইয়া কীর্তন করিয়া জীবের উপকার করেন। তাহাদের বহির্গুহজনসঙ্গ বা অশ্রদ্ধাধান জনগণের বাধ্য হইতে হয় না। তাহারা নৈসর্গিক নির্জনতা সংরক্ষণ করিয়াই ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। (ভাঃ ২।৮।৩)

শ্রবণ ও কীর্তনের বিষয় কৃষ্ণকথা-শব্দাত্মক। উহা করণরূপে প্রবিষ্ট হইলে ভোগপরজীবের অবিচ্ছিন্ন বিনষ্ট হইয়া স্বলগ্ন ভোগবাসনাস্থলে হরিসেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। হরিসেবোন্মুখ হৃদয়ে কোনপ্রকার মলিনতা প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। জীব অপর ভোগাক্ত জীবের নিকট হইতে নম্বর অসংখ্য শিক্ষা করিয়া যে ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হন তাহা শারদীয় মেঘবর্ষণে মলিনতা নষ্ট হইবার স্থায় বিনষ্ট হইয়া নিত্য হরিসেবোন্মুখী চেষ্টায় রুচিলাভ করেন। (ভাঃ ২।৮।৪)

যেমন পথক্লিষ্ট নর গৃহে আগমন করিয়া গৃহস্থ লাভ করিলে ক্লেশের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পান এবং গৃহস্থ পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ হরিকথা শ্রবণে যাবতীয় অভাব বিদূরিত হইয়া সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণপাদপদ্মসেবাস্থ ভক্তিমান জন কেহই ছাড়িতে চান না। (ভাঃ ২।৮।৫)

স্বেচ্ছাবিহারশীল ভগবান্ পুতনাবধাদি যোগমায়াদ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। মৌষললীলায় ভগবানের অপ্রাকট্য প্রভৃতি মুঢ়বিমোহনার্থ প্রদর্শন করিয়াও প্রকৃতপ্রস্তাবে তাদৃশ প্রলয়যোগ্য ক্লিপে হন। (ভাঃ ২।৮।২২)

ব্যাস যেকালে শ্রীগুরুকৃপাবলে শ্রীত ভক্তিপথ গ্রহণ করিয়া সমাধিলাভ করিয়াছিলেন তৎকালে মায়াদ্বারাই জীবের ভগবদ্বিমুখতা ও মোহাদি সম্ভবপরতা জানিয়াছিলেন। জীবাত্মার স্বরূপানুভূতিতে মায়াসম্বন্ধ নাই। ভগবানের সহিতই তাঁহার কেবলানুভব-সম্বন্ধ। মায়াবচিত দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ সংঘটিত হয় না। স্বপ্নকালে যেক্রপ দ্রষ্টা বা অনুভবকারী জ্ঞাতার কর্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠান, কিন্তু দৃশ্যজগতের নশ্বর বাস্তব অধিষ্ঠানের অভাব এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অসত্য চালনাহেতু দৃশ্যের অধিষ্ঠান না থাকা কালেও মিথ্যা প্রতীতি, তদ্রূপ প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি-সহ সম্বন্ধ নশ্বর মাত্র। ভগবানের মায়া ভগবদচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে দুর্ঘটঘটনা-পটীয়সী। তাঁহার দ্বারাই জীবাত্মার দেহসম্বন্ধ ঘটিয়াছে। স্বপ্নোক্ত অসত্য অনুভূতি দৃষ্টান্তের স্থায় জীবের তত্ত্বজ্ঞানাভাব-জনিত প্রতীতি কৃষ্ণোন্মুখ জীবের নশ্বর দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অসমর্থ। যুক্তজীব ভগবদনুভবময়, সেখানে মায়া-সম্বন্ধীয় ভোগপর স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ ঘটে না। (ভাঃ ২।৯।১)

ভগবান্ বাসুদেবে প্রীতি না হওয়া কাল পর্য্যন্ত জীব দেহেন্দ্রিয়াদির ভোগ হইতে বিরত হন না। দৃশ্যজগৎকে ভোগময় বিচার করিয়া হরিসেবাবিমুখ হইয়া মায়িকগুণজাত দেহেন্দ্রিয়াদিতে ‘আমি আমার’ বুকি করেন। কাল ও মায়া ভগবদ্বিমুখের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। পরতত্ত্বাশ্রিত হরিসেবোন্মুখ নিত্য জীব কাল ও মায়া অতিক্রম করিয়া নিত্যবৈকুণ্ঠরাজ্যে নিত্যকাল অবস্থিত হন। (ভাঃ ২।৯।৩)

— জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

কৃষ্ণধাম-স্বরূপ ও তত্ত্ব

১। দেবীধাম হইতে হরিধাম-পর্য্যন্ত ক্রম কি ?

“প্রথমে ‘দেবীধাম’ অর্থাৎ এই জড়-জগৎ; ইহাতেই ‘সত্যলোক’ প্রভৃতি চৌদ্দটি লোক আছে। তত্পরি শিবধাম, সেই ধাম ‘মহাকাল-ধাম’ নামে একাংশে অন্ধকারময়। সেই অংশ ভেদ করিয়া মহা আলোকময় সদাশিব-লোক। তত্পরি হরিধাম অর্থাৎ চিজ্জগৎ বৈকুণ্ঠ-লোক।”

—ব্রঃ সং ৫।৪৩

২। বৈকুণ্ঠে যে বিশেষ-ধর্ম নাই, ইহা কি বেদ বলিয়াছেন ?

“উপনিষদ্গণ পরব্রহ্মকে স্থলে স্থলে নির্বিশেষ বলিয়াছেন। সে-সকল স্থলে ইহাই বুদ্ধিতে হইবে যে, জড়জগতে জলীয় পরমাণু, বায়বীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু,—ইহারা যে জড়ীয় বিশেষধর্ম দ্বারা পার্থক্য লাভ করিয়াছে, সেরূপ জড়ীয়বিশেষ বৈকুণ্ঠে নাই। বৈকুণ্ঠে যে বিশেষ নাই, এরূপও কোন বৈদিক শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই। অস্তিত্ব ও বিশেষ, ইহারা যুগপৎ সর্বত্র অবস্থান করে।”

—প্রঃ প্রঃ ৯ম প্রঃ

৩। চিজ্জগৎ ও জড়জগতের বিশেষ-ধর্মে পার্থক্য কোথায় ?

“চিজ্জগতের বিশেষাদি—সমাহিত; কিন্তু জড়-জগতের বিশেষাদি—অসমাহিত, স্মৃতিরঃ স্মৃৎ-দুঃখ-দায়ক। সমাহিত বিশেষাদি বিশদ ও চিদানন্দময়।”

—ব্রঃ সং ৫।৫৬

৪। গোকুলে কি বৈকুণ্ঠের মোক্ষ ও চতুর্দশ লোকের ধর্মার্থ-কাম আছে ?

“বৈকুণ্ঠের মোক্ষ এবং লোকাদি-গত ধর্ম, অর্থ ও কাম মূল-বীজরূপে গোকুলের যথাস্থানে অবস্থিত। বেদও তথায় গোকুলনাথের গান-তৎপর।”

—ব্রঃ সং ৫।৫

৫। গোলোক ও গোকুলে পার্থক্য কি ?

“গোলোক ও গোকুলে কিছু ভেদ নাই, কেবল এই মাত্র যে, সর্বোচ্চে যাহা গোলোকরূপে বর্তমান, তাহাই প্রপঞ্চে গোকুলরূপে কৃষ্ণলীলা-স্থান।”

—ব্রঃ সং ৫।২

৬। মাথুরমণ্ডল ও গোলোকে পার্থক্য কি ?

“যাহাকে গোলোক বলা যায়, তাহাই প্রকট-লীলায় প্রপঞ্চান্তর্বর্তী মথুরাধাম, অপ্রকট-লীলার গোলোক ।”

—জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

৭। প্রকট ও অপ্রকট-লীলার ব্রজ কিরূপ ?

“নিত্য চিন্ময়ধাম গোলোকের নিত্যান্ত অন্তরঙ্গ প্রকোষ্ঠের নামই ‘ব্রজ’। যেক্রূপ প্রপঞ্চাবতারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা হইয়াছে, নিত্যধাম ব্রজে সেইরূপ লীলা নিত্য বিরাজমান। ব্রজে পারকীয় রসের নিত্যাবস্থান। ক’বরাজ গোস্বামী তৃতীয় পরিচ্ছেদে কহিয়াছেন—“অষ্টাবিংশ চতুষ্টয়ে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে।” ‘ব্রজের সহিতে’ এই শব্দে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ‘ব্রজ’ বলিয়া একটি চিন্ময় ধামের অচিন্ত্য পীঠ আছে। সেই পীঠের সহিত কৃষ্ণ নিজ-চিহ্নক্লি-বলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোলোক-অন্তঃপুর সেই নিত্য ব্রজ ব্যতীত পারকীয় রসের অন্তত্ব স্থিতি নাই; কেন না, তথায় গোলোকাপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট রসের অবস্থান। প্রকট-ব্রজে অপ্রকট-ব্রজেরই বিচিত্রতা জীবের চক্ষে লক্ষিত হইয়াছে, এই মাত্র।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ আঃ ৪৪৬-৫০

৮। গোকুলে গোলোক-দর্শন কিরূপ ?

“কৃষ্ণের চিন্ময়ী লীলা নিত্যা। যাহার শুদ্ধ চিন্ময়বস্ত-দর্শনে অধিকার হইয়াছে, তিনি গোলোক দর্শন করেন; এমত কি, এই গোকুলেই গোলোক দর্শন করেন। যাহার বুদ্ধি প্রপঞ্চপীড়ায়-পীড়িত, তিনি গোলোক দর্শন পান না। গোকুল গোলোক হইলেও গোকুলে প্রাপঞ্চিক-বিশ্ব দর্শন করেন।”

—জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

৯। কৃষ্ণধামের স্বরূপ কি ?

“কৃষ্ণের ধাম আনন্দময়। তথায় ঐশ্বর্য্য পূর্ণরূপে থাকিলেও তাহার প্রভাব নাই, সমস্তই মাধুর্য্যময় ও নিত্যানন্দস্বরূপ; ফল, ফুল, কিশলয়ই তথাকার সম্পত্তি; গোধন-সমূহই প্রজা; রাখালগণ সখা; গোপীগণই সঙ্গিনী; নবনীত, দধি, ছদ্মই খাদ্য-দ্রব্য; সমস্ত কানন ও উপবনই কৃষ্ণ-প্রেমময়; যমুনানদী কৃষ্ণসেবায় অমুরজা; সমস্ত প্রকৃতিই কৃষ্ণ-পরিচারিকা।

যে বস্তু অতীত পরব্রহ্মরূপে সকলের পূজা ও সম্মান গ্রহণ করেন, তিনি সেই ধামের একমাত্র প্রাণধন, কখনও উপাসকের তুল্য, কখনও তদপেক্ষা হীনরূপে পরিজ্ঞাত হন।”

—চৈঃ শিঃ ১।১

১০। গোলোকে কি অস্বর-মারণাদি লীলা আছে ?

“গোলোক—নিত্যসিদ্ধ মায়িক প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ ; স্মৃতির তথায় সেই অভিমান-মাত্রেই রসপ্রবাহ সিদ্ধ হয়।”

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

১১। ধাম-দর্শনে অধিকারী কে ?

“ব্রজই বল, বা নবদ্বীপই বল, বহির্মুখ-চক্ষে উভয়ই প্রপঞ্চময়। ভাগ্যক্রমে ষাঁহাদের চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাঁহারাই ধাম দর্শন করিতে সমর্থ হন।”

—জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অপরাধী

গুরু অপরাধ, গুরুপদে আমি, করেছি যে কত শত।

তে কারণে মোর, না হইল তবে, আসা-যাওয়া স্মরণহত ॥

অজ্ঞ জীব আমি ক্ষুদ্রাধম দীন, অভিজ্ঞে অবজ্ঞা কৈলু।

লঘু সম জ্ঞান গুরুরে করিয়া গর্বশেলে বিঁধি মৈলু ॥

প্রতিষ্ঠাশাকামী, জ্ঞানমদে ক্ষীত, দুর্কৃত ও দয়া পায়।

তাহা হতে হীন, পরছিদ্রে রত (তাই) উপেক্ষিতগুরু হয় !!

গুরুবজ্ঞা আর, বৈষ্ণবে উপেক্ষা, পরমেশ রুষ্ট তায়।

পতিতের গতি, কৃষ্ণপ্রেমদাতা দেহ দাসে পদাশ্রয় ॥

অতি দুরমতি, অধম পামর, আমা-সম ভবে নাই।

দুর্কর্মে লালসা, তারবাহি-গাধা, বৃথা স্মৃতে মত্ত তাই ॥

কতকাল মোর হয়েছে বিগত ভুলিয়া পরম চেতনে।

পরোক্ষে থাকিয়া জানিয়া দেসব, হিতোপদেশ দিলে দীনে ॥

মুরখ চতুর, চোরসাধুসাজে, মর্কট-বৈরাগ্য পেয়া।

স্বকার্য সাধনে, ছলে ভুলাইতে, আসুরিকী বুদ্ধি খাসা ॥

আমি ত লম্পট, কলিগুপ্তচর, উপস্থিত রাজদ্বারে ।
 দুর্কর্মের সাজা, গুরু মহারাজ ! দেহ চোরে কৃপা করে ॥
 পর-অবিশ্বাসী, উত্তমে অশ্রদ্ধ, 'অহং মম' অভিমান ।
 ভূতের বেগারে, দিন বুথা গেল, বিভূতে সামান্য জ্ঞান ॥
 কৃষ্ণকথা-হীন, মিথ্যাভাষপটু, মায়াবাদ সুপ্রমত্ত ।
 গ্রাসিয়াছে মোরে, কিসে হবে মোর এত অপরাধ হতা ॥
 ছলভরা দৈত্য, লালসিত ত্যাগ, কত দ্বন্দ্বময়ী বৃত্তি ।
 রহিয়াছে মোর অন্তর-বাহিরে, নাহি প্রীতি তোমা-প্রতি ॥
 পরের সম্মানে সদা ব্যথী আমি, পরশ্রীকাতর অতি ।
 পর বুখে দুঃখী, পরদুঃখে সুখী, পরোদ্বেগে মহা প্রীতি ॥
 কঁাকিবুদ্ধিজীবী, অলস প্রকৃতি, দেহারামে সদা আশ ।
 এহেন পতিত পাবে কি উদ্ধার, পরিহরি' জড়-বাস ? ॥
 এ পাপিষ্ঠের ইষ্ট অশ্বে নাহি দিবে, তব কৃপামাত্র আশা ।
 অধম তারণ-সম্রাট তুমি, ঘুচাও কামের তৃষা ॥

— ডাক্তার অদ্বৈতদাস ব্রজবাসী

সন্দভ-সাল

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দভ-২৬)

যদি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলে পরিকরগণের সহিত নিত্যবিহার করেন, তবে ব্রহ্মাদির প্রার্থনায় শ্রীনারায়ণ কেন অবতীর্ণ হইয়াছেন ? শ্রীনারায়ণের অবতরণ যদি শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশপূর্বক হইয়া থাকে, তবে নিত্যই দ্বারকায় বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া শ্রীনারায়ণকে নিবেদন করিতে গিয়াছিলেন কেন ? কেনই বা জন্মাদি লীলাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা, দ্বারকা ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন ? এ সকল প্রশ্নের উত্তর—

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাদিতে নিত্যবিহার করেন, তিনি ব্রহ্মাদির নিকট প্রায়ই অপ্রকট থাকেন । আর ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ নামা বিষ্ণু ব্রহ্মাদির নিকট প্রকট হইয়া তাঁহাদের পালনাদি করেন । তজ্জন্ত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ব্রহ্মাদি ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করেন । এজ্জন্তই শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্বে ব্রহ্মাদি কংসের অত্যাচার-পীড়িতা পৃথিবীর তার-হরণ জন্ত শ্রীবিষ্ণুর নিকট

নিবেদন করিয়াছিলেন। সেই পুরুষ ব্রহ্মাদিকে জানাইয়াছিলেন যে, স্বয়ং ভগবানের অবতরণ-সময় উপস্থিত। সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণেই প্রবেশ করিয়া অবতীর্ণ হইবেন। প্রকটলীলাবসানে সেই বিষ্ণুই বৈকুণ্ঠে আরোহণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকাদি ধামে নিগূঢ়ভাবে লীলা করিতে থাকেন। এ বিষয় পূর্বেই উক্ত হইয়াছে—“নিত্যঃ সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ”—ভগবান্ মধুসূদন দ্বারকাতে নিত্য সন্নিহিত আছেন। (ভাঃ ১১শ স্কন্ধ, ৩১ অঃ ২৪)

প্রাচীনগণের উক্তি—সূর্য্য প্রত্যহ প্রাতে জলরাশি হইতে উদিত হন ও অস্তকালে তাহাতেই প্রবেশ করেন। একথা সমুদ্রতীরবাসীদের দৃষ্টিতেই পতিত হয়; কিন্তু উহা বাস্তব ঘটনা নহে। যদি সূর্য্যের স্তম্ভের পরিক্রমণাদি বাক্য প্রমাণে উক্ত শ্রুতির অত্মরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠারোহণ প্রসঙ্গেও অত্মরূপ অর্থ হইতে পারে। বহু বাক্য যখন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাদিতে নিত্য-বিহার সম্বন্ধে প্রমাণ দিতেছে, তখন তাঁহার বৈকুণ্ঠারোহণ বাক্যের অত্ম অর্থ করিতে হইবে। তিনি বিষ্ণুরূপ অংশে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ মথুরাদিতে নিত্যলীলা করেন। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলা দ্বিবিধ। প্রাপঞ্চিক লোকের নিকট যে লীলা অপ্রকাশিত থাকে তাহা অপ্রকট-লীলা। আর তাহাদের নিকট প্রকাশিত লীলা প্রকট-লীলা। অপ্রকট-লীলা আদি মধ্য-অবসানরূপ পরিচ্ছেদরহিত, ইহা অনন্ত কাল চলিতেছে। এই লীলাতেও শ্রীকৃষ্ণ যাদবেন্দ্ররূপে বা ব্রজযুবরাজ-রূপে মহাসভায় উপবেশনাদি বা গোচারণাদি লীলা-বিনোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরাদির ক্রমে বিকাশ প্রাপ্তি হয় এবং ভগবদ্ভিচ্ছাশক্তিদ্বারা আদি, মধ্য, অবসান হইয়া থাকে; কালের কোন শক্তি ইহাতে নাই।

অপ্রকট-লীলা—মন্ত্রোপাসনাময়ী ও স্বারসিকী। মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার উপাসনানুযায়ী একস্থানে নিত্যস্থিতি। স্বারসিকী লীলা বহুস্থান-ব্যাপিনী, নানাপ্রকাশময়ী ও আদি-মধ্যাবসানহীনা। বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকাশে মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা বিद्यমান। স্বারসিকী সে-সকলকে আপনার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া বিবিধ বিচিত্রতার সহিত অনন্তকাল চলিয়া আসিতেছে। মন্ত্রোপাসনাময়ীতে শ্রীরাধাগোবিন্দ যমুনা-তীরবর্তী কুঞ্জে উপবিষ্ট আছেন, আর স্বারসিকীতে অভিসারের পর উভয়ের মিলন, কুঞ্জ-প্রবেশ, তথায় অবস্থানান্তর বন ভ্রমণ ইত্যাদি বহু বিচিত্রতা আছে।

শ্রীউদ্ধব ব্রজরাজদম্পতিকে বলিতেছেন—

মা খিওতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে ।

অন্তর্হৃদি স ভূতানামান্তে জ্যোতিরিবৈধসি ॥ (১০।৪৬।৩৬)

হে মহাভাগবয়! আপনারা খেদ করিবেন না, কৃষ্ণকে সমীপেই দর্শন করিবেন। তিনি কাষ্ঠমধ্যে অগ্নির স্থায় ভূতসমূহের অন্তর্হৃদয়ে বর্তমান। তাঁহাদের নিকট স্থিতির অব্যভিচারী দৃষ্টান্ত—প্রাণিগণের হৃদয়ে পরমাত্মলক্ষণ জ্যোতিসদৃশ, আর কাছে অগ্নিলক্ষণ জ্যোতিসদৃশ; তিনি সতত বিদ্যমান। আপনাদের নিরন্তর স্মৃতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। এস্থলে ‘অপ্রকট লীলা’র নিকটে স্থিতি অর্থ না করিয়া অণু অর্থ করিতে গেলে অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে। কারণ অন্তর্হৃদয়ে আছেন বলিয়াই যে দর্শন হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবদ্বারা গোপীগণের নিকট যে সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহাতেও নিত্যস্থিতির কথা বলিয়াছেন—

ভবতানাং বিয়োগো মে ন হি সর্কাস্তনা কচিৎ । (ভাঃ ১০।৪৭।২২)

আপনাদের সহিত আমার সর্বস্বরূপে কোনরূপ বিচ্ছেদ নাই।

প্রকটলীলায় বিরাজমান এক প্রকাশে বিয়োগ, অপ্রকটলীলায় বিরাজমান অপর প্রকাশে সংযোগ আছে; সুতরাং সর্ব-স্বরূপে বিচ্ছেদ নাই ইহাই তৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে যখন পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির আশ্রয় তখন তদীয় বিভিন্ন প্রকাশে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রকাশ ও ভাবভিজনক নহে। প্রকাশরূপে নানা ক্রিয়ার অধিষ্ঠানহেতু লীলারস পোষণের জন্ত সেই প্রকাশ সকলে অভিমান ভেদ এবং পরস্পরের অনুসন্ধান প্রায় স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণও তাঁহার স্বরূপ-শক্তিপর বলিয়া নিজ নিজ প্রকাশরূপ প্রকল্পে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের মহিষী-বিবাহে দেবকী প্রভৃতিতেও প্রকাশভেদ দেখা গিয়াছিল—দেবর্ষি নারদ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্রীনারদ একস্থানে দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া ও উদ্ধবসহ পাশা খেলিতেছেন, আবার অণুত উদ্ধবাদির সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন। এইরূপ দেবকীদেবীও কোথাও মাস্তুলিক অনুষ্ঠান করিতেছেন। কোথাও বা কৃষ্ণ-অদর্শনে উৎকণ্ঠিত। সুতরাং দ্বারকায় প্রকাশ ভেদ হইলে তজ্জন্ত অভিমানভেদ ক্রিয়াভেদাদি যদি দৃষ্ট হয়, তবে বৃন্দাবনলীলাতেও তদ্রূপ দৃষ্ট হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবদ্বারা গোপীগণকে বলিতেছেন—

যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুর্জ্বলং মহী ।

তথাহঞ্চ মনঃ প্রাণভূতেন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।২২)

আকাশ প্রভৃতি কারণরূপ ভূত সকল নিজ নিজ কার্যরূপ ভূতে বর্তমান আকাশের স্থিতি বায়ুতে, বায়ুর স্থিতি তেজে, তেজের স্থিতি জলে, জলের স্থিতি পৃথিবীতে, তদ্রূপ আমি আপনাদের মন প্রভৃতির আশ্রয়রূপে বিद्यমান আছি। আমি না থাকিলে আপনাদের মনঃ প্রাণাদি আমার বিচ্ছেদে ক্ষণকালও থাকিত না। উদ্ভাসেনকে বিরহসংযোগে যুগপৎস্থিতি বর্ণন করিয়া সেই স্থিতি যাহাতে সম্ভবপর হয় এমন প্রকাশ বৈচিত্র্যের বিষয়ে বলিতেছেন—

আত্মন্তোবাত্মনাত্মনাং স্বজে হন্যানুপালয়ে ।

আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয় গুণাত্মন ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৩০)

আত্মমায়ানুভাব দ্বারা ভূতেন্দ্রিয় গুণাত্মা আমি আত্মাতে আত্মাকে স্থিতি নাশ ও পালন করি।

আত্মাতে—অনন্ত প্রকাশময় শ্রীবিগ্রহ লক্ষণ আপনাতে স্বয়ং আত্মাকে নিজ প্রকাশ বিশেষকে স্থিতি করি—অভিব্যক্ত করি। আত্মানুভাব—অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে স্থিতি করি, ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মাভূত পরমার্থ সত্যস্বরূপ যে আমার ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি যে সকল গুণ এবং তৎসমুদয়ের প্রকাশস্বরূপ—তদ্বারা স্থিতি করি। এইরূপ প্রকাশ মূর্তিতে আবিস্কৃত হইয়া আবার কখনও অহত্ব গমন করি। তৎপশ্চাদ আবার কখনও পালন করি অর্থাৎ স্বয়ং আসিয়া নিজ বিরহব্যথিত জনগণকে রক্ষা করি।

পূর্বশ্লোকে অপ্রকট প্রকাশে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত স্থিতি বর্ণন পূর্বক পক্ষান্তর অবলম্বনপূর্বক বলিতেছেন—

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোহগুণায়ঃ ।

স্বযুপ্ত-স্বপ্নজাগ্রতির্মনোবৃত্তিভিরীযতে ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৩১)

আত্মা আমি শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের স্বযুপ্তাদি লক্ষণবিশিষ্ট মনোবৃত্তিসমূহ দ্বারা অনুভূত হইতেছি। তাহা জ্ঞানময়—নানাবিদ্ভাবিদগ্ধ, শুদ্ধ, ব্যতিরিক্ত (বিগত অতিরিক্ত যাহা হইতে) সর্বোত্তম; গুণায়—সর্বগুণশালী। অতএব সেই স্মৃতিরূপ অনুভব কোন সময়ে সাক্ষাৎকার বলিয়া মনে হইবে।

স্বযুপ্তি অবস্থায় আত্মা ছাড়া অহ কাহারও স্মৃতি হয় না। কিন্তু ব্রজ-

গোপীগণের স্মৃতি অবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি নির্দেশ থাকায় সর্বদা তিনি স্মৃতি প্রাপ্ত হন। জাগ্রৎস্বপ্ন—দুই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অল্প স্মৃতি হয় না। কিন্তু স্মৃতি অন্তরীন্দ্রিয় ব্যাহেন্দ্রিয় কোনটিরই সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু গোপীগণের জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থার অনুভব স্মৃতিতেও বিদ্যমান থাকে। প্রাকৃত লোকের স্মৃতি হইতে গোপীদের স্মৃতির বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহার সমাধিলক্ষণ স্মৃতিতেও শ্রীকৃষ্ণানুভব লাভ করেন। গরুড় পুরাণের উক্তি—

জাগ্রৎস্বপ্নস্মৃতিষু যোগস্বস্ত চ যোগিনঃ ।

যা কাচিন্মনসো বৃত্তিঃ সা ভবেদচ্যুতশ্রয়া ।

জাগ্রৎস্বপ্ন স্মৃতি অবস্থায় যোগস্ব যোগীগণের মনোবৃত্তি যাহা কিছু সকলই অচ্যুতকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

যদি বল—সর্বাবস্থায় আমরা তোমাকে অনুভব করি, কিন্তু আমাদের বিরহই স্মৃতি পাইয়া থাকে, তজ্জন্ম বলিতেছেন আমার বিয়োগিতাভিমাত্রী মনোবৃত্তি কোনরূপে অবরুদ্ধ করিতে পারিলে স্বতঃই নিত্য-সংযোগিতা উদিত হইবে। তজ্জন্ম যোগশাস্ত্রের যুক্তি দিতেছেন—

যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবহুধিতঃ ।

তন্নিকৃদ্ধাদিন্দ্রিয়ানি বিনিদ্রঃ প্রত্যপত্তত ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৩২)

সুপ্তোখিত পুরুষ যেমন মিথ্যাভূত স্বপ্নের চিন্তা করে এবং ইন্দ্রিয়ার্থ প্রভৃতিকে যেমন দ্বারা চিন্তা করে এবং ইন্দ্রিয়গণ যেমন দ্বারা উহা প্রাপ্ত হয় সেই মনকে নিরুদ্ধ করিবে। যদিও ব্রজরমাগণ স্বপ্নাদির মত অজ্ঞান জন্ম অভ্যস্ত নহেন তথাপি প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি হেতু অপ্রকট-লীলায় অনুভবসিদ্ধ নিত্যসংযোগ অনুসন্ধান করাইবার উদ্দেশ্যে উপদেশ দান। মনোনিরোধ ভিন্ন বিক্ষিপ্তচিত্তে নিকটস্থ বিষয়ও উপলব্ধি হয় না। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট প্রকাশে গোপীদের নিকট বিরাজিত থাকিলেও প্রকট-লীলাগত বিরহবিক্ষেপজন্ম তাঁহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। তজ্জন্ম মনোনিরোধের প্রশংসার্থ বলিতেছেন—

এতদন্তঃ সমান্নায়ো যোগঃ সাংখ্যঃ মণীষিণাং ।

ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ ॥ (১০।৪৭।৩৩)

বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত নদীসকল যেমন সাগরে সম্মিলিত হয়,

‘অষ্টাঙ্গঃযোগঃ, সাংখ্যযোগঃ, সম্যাস, স্বধর্ম, ইন্দ্রিয় দমন ও সত্য প্রভৃতি বিভিন্ন সাধন মনোনিরোধেই পর্য্যবসিত হয়। বেদবিদগণ মনোনিরোধের

প্রশংসা করেন ; অতএব তোমরাও আমার বিচ্ছেদাভিমানী মনোবৃত্তির নিরোধ সাধন করিলেই তোমাদের নিত্যসংযোগের উপলব্ধি হইবে ।

যদি একরূপ বল, তোমার বিরহে দুঃখিতা আমাদিগকে নিজপ্রাপ্তি-সাধন উপদেশ না করিয়া নিজে উপস্থিত হইতেছ না কেন ? এই বিতর্কের আশঙ্কায় বলিলেন—

যদ্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্তে প্রিয়ো দৃশাম্ ।

মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যান-কাম্যয়া ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৩৪)

আমি তোমাদের নয়নের প্রিয়, আমার দর্শন ভিন্ন তোমরা আর কিছুতেই সুখলাভ করিতে পার না । সেই আমি দূরে অবস্থান করিতেছি, তাহা কেবল নিয়ত আমার ধ্যানের জ্ঞাত মনের সান্নিধ্য ঘটাইবার নিমিত্ত । প্রিয়জনের প্রতি মনের যত আবেগ ঘটে ততই আনন্দ । যদি আমি নিকট থাকি তাহা হইলে তোমাদের আমার নয়নে আবেশ থাকিবে । আর দূরে থাকিলে মনেই আবেশ থাকিবে । তাহাতে কি হইবে ?

ময্যাবেশে মনঃ কুৎসং বিমুক্তাশেষবাস্ত যৎ ।

অহুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৩৬)

তোমার অশেষ বৃত্তিরহিত মনকে আমাতে আবিষ্ট করিতে, নিয়ত আমার স্মরণ করিতে থাকিলে অচিরে আমাকে প্রাপ্ত হইবে । দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলিতেছেন,—

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্রেণ বনেহস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ ।

অলঙ্করাসাঃ কল্যাণ্যো মাপূর্নদীর্ঘ্য চিন্তয়া ॥ (১০।৪৭।৩৭)

হে কল্যাণীগণ ! বৃন্দাবনে রাসবিহার কালে যে সকল অবলা অবল্লভ হওয়ায় আমার সহিত রাসক্রীড়ায় বঞ্চিতা ছিল, তাহারা আমার বীর্ঘ্য চিন্তা করিতে করিতে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তজিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

সনাতনের বন্ধন-মোচন

(নাটিকা)

—: চরিত্র :—

বাদশা হোসেন শা (গৌড়ের সম্রাট)

সনাতন বা সাকরমল্লিক (প্রধান মন্ত্রী)

কেশব ছত্রী (রাজ-অনুচর)

ঈশান (প্রধান মন্ত্রীর ভৃত্য)

শ্রীকান্ত (প্রধানমন্ত্রী সনাতনের ভগিনীপতি)

ভট্টাচার্য্য (পাঠক)

১ম নাগরিক

২য় নাগরিক

গায়ক

বৈদ্য

চন্দ্রশেখর

সৈন্যধ্যক্ষ

পথিক

ভূইঞা সর্দার

মহাপ্রভু

শ্রীকৃষ্ণপাদ (সনাতনের কনিষ্ঠ সহোদর)

১ম বৈষ্ণব

২য় বৈষ্ণব

পাইক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—গৌড়ের রাজপ্রাসাদ

বাদশাহ হোসেন শা ও প্রধানমন্ত্রী—সাকরমল্লিক—সনাতনের প্রবেশ।

বাদশা— (সিংহাসনে উপবেশনপূর্বক) সাকরমল্লিক, তোমার ত্রায় একজন

অদক্ষ বুদ্ধিমান মন্ত্রী থাকতে আমার রাজ্যে এত অনাচার কেন?

সাকরমল্লিক—কি অনাচার সম্রাট?

বাদশা—শুধু অনাচার নয়,—অত্যাচার !

সাকরমল্লিক—অত্যাচার ?

বাদশা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাদের হিন্দু-ধর্মের এক সন্ন্যাসী লক্ষ্মীকর্কদ লোক সঙ্গে নিয়ে আমার রাজ্যের পল্লী-নগর সব তোলপাড় করে ফেল্লে। দেখলে ভয় হয়,—এ যেন কোন প্রচুর শত্রু দলবল নিয়ে আমার রাজ্য আক্রমণ করেছে। হয়ত এ সিংহাসনও কেড়ে নেবে।

সাকর—(সভয়ে) কি বলছেন সম্রাট !

বাদশা—(অটুহাসি হাসিয়া) কেন, ভয় হচ্ছে ?

সাকর—হজুর, তিনি তো সন্ন্যাসী ! দলবল তাঁর শিষ্যভক্ত।

বাদশা—আমি যদি বলি, ঐ দলবলই তাঁর সৈন্য।

সাকর—জি, না ; তা' কখনই হতে পারে না। উনি সর্বভ্যাগী।

বাদশা—যদি বলি, ঐ সন্ন্যাসী গেরুয়া বসন প'রে সর্বভ্যাগের ধ্যো তুলে রাজ্যের প্রজাদের আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে,—তা'হলে ? (সাকরমল্লিকের দিকে তাকাইয়া) কি, ভয় হচ্ছে ? ভাবছো, সন্ন্যাসীকে আমি হত্যা করবার আদেশ দেবো, নয় ?

সাকর—আজ্ঞে, আপনার মত দয়াবান, শ্রায়কুশলী রাজা আমি দেখি নাই এবং ইতিহাসেও কোন নজির মিলে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি কখনও অশ্রায় আদেশ দেবেন না।

বাদশা—সত্যিই তুমি বড় ভীত হয়েছো ! না, তোমার কথাই রাখবো। তুমি আমায় চিনেছো—সাকর, তুমিই আমাকে চিনেছো। আর কেউ তো আমায় চিনে না। তোমার কেশ যেনন পক হয়েছে তেমনি তোমার বুকিও পক। (সাকরমল্লিকের পিঠ চাপ্ড়াইয়া) ভাই, তোমরা হিন্দু ! তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে সুন্দর। তা'বলে আমি তাকে ঘৃণা করব কেন ভাই ! তোমাদের সন্ন্যাসীকে কি আমি হত্যা করতে পারি ? তোমাদের যেমন ঐ সন্ন্যাসী,—আমাদের তেমনি পীর পয়গম্বর !

সাকর—ঐ সন্ন্যাসীর পর্যটনই কি অত্যাচার বলে ধারণা করেছিলেন, সম্রাট ?

বাদশা—না,—না, মন্ত্রী তা' নয় ! ঐ পর্যটন অত্যাচার নয়, ওটা সু-আচার ও প্রচার। আমি জেনেছি তোমাদের সন্ন্যাসীর কাছে মানুষ হিসাবে

হিন্দু-মোগল কোন ভেদ নেই, ইচ্ছা করলে মুসলমানও হিন্দু হতে পারে এবং হিন্দুও মুসলমান হতে পারে,—সকলেই জাতি ধর্ম-নির্কিশেষে উপাসনানুরূপ ভগবদ্রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে,—এই তাঁর বানী। হিন্দুদের মধ্যে অবশ্য কেহ কেহ হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত ধর্মগুলিকেই সমান বলতে চায়। আমরা কেন, অনেকেই কিন্তু তা আদৌ স্বীকার করেন না। তবে এইটুকু বুঝ, মানুষের জ্ঞান আকার সকলের হলেও প্রত্যেকের চিন্তাধারা কখনই এক নহে। চিন্তাধারার পার্থক্য অনুযায়ী খোদার ছনিয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। সে যা-ই হোক, তোমাদের ঐ নবীন সন্ন্যাসী সম্বন্ধে আমি কিন্তু যা শুনেছি, তাতে তাঁকে জীবন্ত পীর বলেই মনে হয়। ধৃত! ধৃত!! তোমরা এমন মহাপুরুষকে কলিযুগে নিজেদের মধ্যে পেয়েছ।

সাকর—তবে কি উদ্দেশ্যে অত্যাচার বলছেন সম্রাট?

বাদশা—অত্যাচার বলছি কেন জান? আমাদের যবন জাতির অনেকে ঐ সন্ন্যাসীকে হিংসা করে। শুধু হিংসাই নয়, তাঁর প্রচারকার্যে অর্থাৎ তিনি যে জীবগণকে হরিনাম দান করছেন তাতে বাধা দেয়। অবশ্য তাঁর ফলও আল্লা দিয়েছেন,—অনেক পেয়াদা হরিনাম প্রচারে বাধা দিতে গেছেলো; হঠাৎ আঙনের হক্কায় তাদের মুখ পুড়ে গেছে। তবু তাদের চেতনা নাই; মুখপোড়া বাঁদরের মত অবস্থা হয়েও তারা নির্লজ্জ। তারা চায় হিন্দুয়ানী চলবে না, সবাইকে যবন হাতে হবে।
(সাকরমল্লিকের দিকে তাকাইয়া বোধ করি এ খবর তুমি পেয়েছো?)

সাকর—জি, হ্যাঁ সম্রাট! আমি পূর্বেই কোতোয়ালের মুখে সংবাদ পেয়েছি। তবে ইহাও সত্য, অনেক হিন্দু ভাইও সন্ন্যাসীর প্রতি শত্রুতাচরণ করছেন।

বাদশা—তবে তুমি পাঠিয়ে সেই সব নির্লজ্জদের নিষেধ করনি কেন?

সাকর—হজুর, ভুল হ'য়ে গেছে!

বাদশা—এ তোমার ইচ্ছাকৃত ভুল, সাকর! তুমি যেমনি আমার হৃদয় যাচাই করতে পার, আমিও তেমনি তোমাকে চিনি।

সাকর—মাপ করবেন সম্রাট!

বাদশা—তুমি তো জান সাকর, আমার অভিমত ! আমি চাই, যে যে ধর্ম ইচ্ছা করে সে সেই ধর্মই সুখে পালন করুক । কারো ধর্মে কারো কোনদিন বাধা দেওয়া উচিত নয় । তবে স্বেচ্ছায় কেউ অগ্র ধর্ম গ্রহণ করলে কে আর আপত্তি করবে ?

[কেশব ছত্রীর প্রবেশ । ছত্রী জানে না যে প্রাসাদে বাদশা স্বয়ং উপস্থিত আছেন । ছত্রী মহাপ্রভুর আগমন বার্তা প্রধান মন্ত্রী সনাতনকে জানাবার উদ্দেশ্যে চঞ্চলগতিতে দ্রুত প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল]

ছত্রী— (প্রাসাদ দ্বারের কিঞ্চিৎ দূর হইতে) মন্ত্রী মশাই, মন্ত্রী মশাই, একটা বড় আনন্দ-খবর ! (প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া বাদশাকে দেখিয়া হতভম্ব ও ভয়ে পাথরের মূর্তির স্থায় নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান)

বাদশা—কি ছত্রী ! সুসংবাদ জানাতে এসেছো মন্ত্রীর কাছে, কেমন ?

ছত্রী— (আরো ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিল ।)

বাদশা—কি, তথ্য প্রকাশ কর !

ছত্রী— (পূর্বের মত নীরব রহিল ।)

বাদশা— (হাসিতে হাসিতে) এ মোল্লেম রাজার রাজ্যে দেখছি তোমরা সকল হিন্দুই বড় ভীত হয়েছে । শোন ছত্রী, ভয় পরিত্যাগ কর । জেনে রাখ—এ মোল্লেম রাজা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকেই সম্মান কর্তে জানে । ষাঁকে দেখে আজ তোমাদের হিন্দু জাতির আনন্দ, আমি নিজে তাঁকে প্রাসাদের ছাদ হ'তে প্রত্যক্ষ করেছি । আমি দেখেছি তাঁর শ্রীঅঙ্গে সেই নূর,—যা' সাধারণ মানুষে সম্ভব নয় ।

(সাকর মল্লিকের প্রতি)—শোন মন্ত্রী, আমার আদেশ আজ থেকে নগরে নগরে ঢাক বাজিয়ে প্রচার করে দাও গে, যেন কেউ ঐ সাধুর প্রতি অত্যাচার কর্তে না যায়,—যে যাবে তা'কে কঠিন দণ্ড পেতে হবে । (প্রস্থান)

ছত্রী—এঃ, বাদশা তো দেখছি আজকাল ভাল লোক হয়ে গেছে, মন্ত্রীমশাই !

সাকর—হবেই তো, সব কিছু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ।

ছত্রী—ইচ্ছাময় কে ? ইচ্ছাময় তা'হলে কি ঐ সন্ন্যাসী ?

সাকর—হ্যাঁরে, হ্যাঁ—যা ভেবেছি সু তাই ।

ছত্ৰী—উনি ইচ্ছাময় কবে থেকে হ'লেন ?

সাকর—উনি চিরন্তন ইচ্ছাময় । সে এখন জান্‌বি না, যে দিন তাঁর কৃপা হবে সে দিন জান্‌বি ?

“ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে ।

সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥”

ছত্ৰী—ও সব শোলোক টোলোক আমি বুঝি না । কবে তাঁর কৃপা হবে আমার উপর, বলুন দেখি ।

সাকর—সে আমি কি করে জান্‌বো ? ও সব অবাস্তুর প্রশ্ন এখন রেখে দে ।

ছত্ৰী—আমি বলতে গেলেই অবাস্তুর হয়ে যায়, নয় ? বেশ আর বল্‌ব না ; বলুন, আপনার কথাই শুনি ।

সাকর—সেই সন্ন্যাসীকে প্রত্যক্ষ দেখেছি স্ ?

ছত্ৰী—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ।

সাকর—সেই সন্ন্যাসীকে কেমন করে দেখলি, বল্‌ দেখি ?

ছত্ৰী—সুন্দর, —খুব সুন্দর !

সাকর—তবু কি রকম সুন্দর বল্‌ দেখি ?

ছত্ৰী—কি রকম আবার ? যেটা সুন্দর, তা' সুন্দর । আর তেমন সুন্দর কি কিছু আছে নাকি বাপু । পূর্ণিমা-টাঁদের মত যেমন মুখ, তেমনি চোখ ছু'টা টানা টানা—নাকও বাঁশীর মত ; আহা দাঁতগুলি যেন মুক্তো দিয়ে বাঁধানো । গায়ের রং যেন ঠিক কাঁচা সোনার মত । পরণে গেরুয়া রঙের কোঁপীন, গলায় একখানি পীত রঙের ওড়না ছল্ছে । আর কি সুন্দর ফুলের মালা কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে ! চরণ ছু'খানিতে কে যেন আলতা ঢেলে দিয়েছে—এত টক্‌টকে । হাতের ও পায়ের নখগুলি যেন সূর্য্যের কিরণের মত জল্ জল্ করছে । হাত ছু'খানি বড় লম্বা—একেবারে জানু পর্য্যন্ত এসে পড়েছে । দেখুন মন্ত্রী মশাই, আমি যখন তাঁকে দেখি তখন মনে হ'ল,—তিনি ছু'চোখ মেলে আমাকে যেন ইসারা করে ডাকছেন, আর সেই ছুই হাত তুলে এমনি নাচছেন যেন আমাকে হাত নেড়ে নেড়ে ডাকছেন । আমি যতবার তাকিয়েছি ঠিক একভাবেই আমাকে ডেকেছেন । আমি কিন্তু দূর থেকে প্রণাম করে চলে এলাম, ভাবলাম এ খবর আপনাকে দিতেই হবে ।

(মন্ত্রী সাকরমল্লিকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) কি হ'ল মন্ত্রী মশাই,

ওদিকে কি দেখছেন? ... একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন যে। কিছু ভাবছেন?

সাকর—ও কিছু না। আচ্ছা এখন চল। দেখি, রাজার হুকুম তো আবার তামিল করতে হবে!

ছত্রী—আবার কিসের হুকুম হল?

সাকর—ঐ গুলি না বাদশা কি বলে গেলেন? এরই মধ্যে ভুলে গেলি?

ছত্রী—ও! এবার মনে পড়েছে। ও তো ভাল কথা—আমাদেরই ভালোর জন্তে।

সাকর—হ্যাঁ ভাই; এখন চল। (উভয়ের প্রস্থান।) (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

সাধুসঙ্গে তীর্থ-দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ!

“গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥”

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রায় ১৫২০ বৎসর যাবৎ সর্বসাধারণকে তীর্থ দর্শনাদির সুযোগ দিয়া আসিতেছেন। বর্তমান বর্ষেও এই সুযোগ দানের জন্ত আগামী ২রা কান্তিক ১৩৭১, ইং ১৯শে অক্টোবর ১৯৬৪, সোমবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিবেন। সুতরাং যাত্রিগণ ঐ দিবস বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে হাওড়া ষ্টেশনের ৬নং প্লাটফর্মে উপস্থিত হইয়া সমিতির কর্তৃপক্ষগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এই সমস্ত তীর্থস্থানের অধিকাংশই শ্রীমদ্ভাগবত পাদস্পর্শে তীর্থীভূত হইয়াছে। সুতরাং আত্ম-মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ এই অপূর্ণ সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।

এই তীর্থযাত্রার বৈশিষ্ট্য এই যে—যাত্রিগণ প্রত্যহ শ্রীহরি-সঙ্কীর্্তন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-পাঠ ও ব্যাখ্যা, অনুক্ষণ সাধুগুণে হরিকথা ও তীর্থ-মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ এবং দুইবেলা মহাপ্রসাদ-সেবা করিবার অপূর্ণ সুযোগ লাভ করিবেন।

দর্শনীয় স্থানের তালিকা :—

১। হাওড়া হইতে যাত্রা করিয়া, ২। গয়া, ৩। কান্ধী, ৪। প্রয়াগ, (এলাহাবাদ) ৫। অযোধ্যা, ৬। লক্ষ্মী, ৭। হরিদ্বার, ৮। কংখল, ৯। হৃষীকেশ, ১০। লছমনঝোলা, ১১। কুরুক্ষেত্র, ১২। ভদ্রকালী, ১৩। দিল্লী, ১৪। হস্তিনাপুর, ১৫। মথুরা, ১৬। গোকুল, ১৭। ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, ১৮। বৃন্দাবন, ১৯। রাধাকুণ্ড, ২০। গোবর্দ্ধন, ২১। বর্ষাণা, ২২। নন্দগ্রাম, ২৩। সংকেত, ২৪। আগ্রা (ঐতিহাসিক তাজমহল), ২৫। জয়পুর (গোবিন্দ-গোপীনাথ মন্দির, গলুতাপাহাড়), ২৬। আজমীড় (পুকুর, সাবিত্রী), ২৭। চিতোরগড়, ২৮। উজ্জয়িনী (অবন্তিকা), ২৯। নাথদ্বার (গোপালজী), ৩০। ডাকোর (দ্বারকাধীশ), ৩১। বরোদা, ৩২। ব্রোচ (বলিরাজার স্থান), ৩৩। নাসিক (গোদাবরী, পঞ্চবটী বন), ৩৪। বম্বে (মুম্বাই দেবী), ৩৫। পুনা, ৩৬। মঙ্গলগিরি (পানা নৃসিংহ), ৩৭। কভুর (মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ-মিলন-স্থান), ৩৮। সিংহাচলম্ (জিওড় নৃসিংহ), ৩৯। ভুবনেশ্বর, ৪০। সাক্ষীগোপাল, ৪১। পুরীধাম হইয়া হাওড়া প্রত্যাবর্তন।

—ঃ নিম্নমানবনী :—

যাত্রায় রেল ভাড়া, কুলি, ব্রজমণ্ডল ও অগ্ন্যন্ত্র সুদূরবর্তী স্থানের বাসভাড়া, বাল্যভোগ ও ছুইবেলা প্রসাদ প্রভৃতি বাবদ প্রতি যাত্রীকে ৪০০ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে। তন্মধ্যে ২০০ টাকা ১১ই আশ্বিন, ইং ৩১০৬৪ তারিখে বা তৎপূর্বের সমিতির কর্তৃপক্ষের নিকট অগ্রিম দিতে হইবে; বাকী টাকা নিম্ন ঠিকানায় বা হাওড়া ষ্টেশন ৬নং প্ল্যাটফরমে বেলা ২টা হইতে ৬টার মধ্যে দিলেও চলিবে।

যাত্রিগণ শীতবস্ত্র, বিছানা, ১টি ঘটি, ১টি বাটি ও ১টি থালা (হাক্কা) সঙ্গে আনিবেন।

যাত্রিগণ অতি সত্বর নিজ নিজ নাম ও ঠিকানা পত্র দ্বারা নিম্ন ঠিকানায় রেজেস্টারী করিবেন। এই পরিক্রমায় একমাসের কিছু অধিক সময় লাগিবে।

বিশেষ বিবরণ জানিবার ও স্ব স্ব নাম তালিকাভুক্ত করিবার জন্ত টাকা জমা দিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরি-পাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় সাক্ষাৎ বা পত্র ব্যবহার করুন। ইতি—১৫ই ভাদ্র, ১৩৭১; ইং ৩১শে আগষ্ট, ১৯৬৪।

বিঃ নিবেদক—সত্যব্রন্দ,
শ্রী গোড়ীয়বেদান্ত সমিতি

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য কারণে স্থান-কালাদির পরিবর্তন গ্রহণীয়।

জ্ঞান-ই অজ্ঞান

‘জ্ঞান’ বলিতে অদ্বৈতবাদিগণের নির্বিশেষ-জ্ঞান-কেই সাধারণে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাই কি প্রকৃত জ্ঞান? নির্বিশেষ-জ্ঞান যদি প্রকৃত জ্ঞান হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রে বহু স্থানে যে জ্ঞান ধিকৃত হইয়াছে সেই জ্ঞানটী কি প্রকার? শাস্ত্রে আবার বহুস্থানে ‘জ্ঞানে’র প্রশংসাও আছে। অতএব স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, জ্ঞান দ্বিবিধ—ধিকৃত ও প্রশংসিত। এই ধিকৃত জ্ঞানই নির্বিশেষ-জ্ঞান এবং প্রশংসিত জ্ঞানই সবিশেষ-জ্ঞান। প্রকৃত-পক্ষে ‘সম্বন্ধজ্ঞান’, ‘তত্ত্ব-জ্ঞান’, ‘অভিধেয়-জ্ঞান’ ‘প্রয়োজন-জ্ঞান’—এইগুলির সম্যক্ আয়ত্ত না হইলে ‘ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান’ জীবের হৃদয়ে কখনই উদিত হয় না; এই সকল জ্ঞানই বাস্তব জ্ঞান। ভক্তিরাজ্যে চরম ব্যর্থতাই এই সকল জ্ঞানাক্ষগণের একমাত্র গতি।

অদ্বৈতবাদ-সমর্থক জ্ঞানবাদী বেদে ধিকৃতই হইয়াছেন। ঈশোপনিষদে স্পষ্টই লিখিত আছে,—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিজ্ঞামুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিজ্ঞায়াং রতাঃ ॥

অর্থাৎ যিনি অবিজ্ঞার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি ‘উ’ অর্থাৎ নির্বিশেষ-জ্ঞানরূপা বিজ্ঞাতে রত হন, তিনি তদপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন।

শ্রীকৃপ গোস্বমিপাদ-বিরচিত,—

অন্তাভিলাষিতাশুং জ্ঞানকর্মাগ্ণনাবৃতম্ ।

আনুকূল্যেণ কৃষ্ণাত্মশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

—শ্লোকটী হইতে জানা যায়, ‘উত্তমা ভক্ত’ জ্ঞান ও কর্মদ্বারা অনাবৃত। এই জ্ঞান অপরাবিজ্ঞাপ্রিত নির্বিশেষ-জ্ঞানকেই অভিহিত করে; কারণ ‘ভগবজ্-জ্ঞানই জীবের অভিধেয় বলিয়া নিখিল শাস্ত্র তারদ্বরে কীর্তন করিয়াছেন।

গৌড়ীয় গগনোদ্ভাসিত শুদ্ধভক্তি-ভগীরথ সপ্তম গোস্বামী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভগবচ্ছরণাগতির প্রাক্কালেই জানাইয়াছেন,—

“পড়িতে পড়িতে, ভরসা বাড়িল,

জ্ঞানে গতি হবে মানি ।

সে আশা বিফল, সে জ্ঞান দুর্বল

সে-জ্ঞান অজ্ঞান জানি ॥

সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের জ্ঞানই অজ্ঞান—শাস্ত্রীয় যুক্তি-বিচারপ্রণালী অবলম্বনপূর্বক বিজ্ঞানসম্মতভাবে তত্ত্বাণুপর্য্য নির্ণয়ে ব্যাপৃত হইলাম।

‘জ্ঞান’ শব্দ দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুর অনুভূতিকেই লক্ষ্য করা হয়। তদ্বিপরীত ভাবই ‘অজ্ঞান’। অসৎ বস্তুর সম্যক জ্ঞান আহরণ করিয়া তদগ্রহণ বৃত্তিই অজ্ঞানতার পরিচয়। জ্ঞান জীবকে উদ্ধগামী করায়। নিম্নগামী বৃত্তি-বাসনা জ্ঞানীর আরাধিত নহে। দার্শনিক জগতে “দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সংস্রু সজ্জত-ই জ্ঞানীর লক্ষণ। কখন ও ‘দুঃসঙ্গ’ পরিগ্রহ পূর্বক ‘সং’ বস্তুর বিনাশ সাধন বা তরুপেক্ষা নীতি ‘জ্ঞান’ বলিয়া কথিত হয় না। উহাই ‘অজ্ঞান’-শব্দে মায়াযুক্ত জীবের চিত্ত-মলিনতা বৃদ্ধি করে।

জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ ও অতীন্দ্রিয়জ। যাহাই হউক, বিশেষত্বহীনতা জ্ঞানের প্রতিপাত্ত নহে। মূঢ়, অর্কাচীন, মূর্খ ও উচ্ছৃঙ্খলগনই এই প্রকার জ্ঞানের (১) পক্ষপাতী। জ্ঞান আলোক-স্বরূপ, অজ্ঞান তিমির-স্বরূপ। বস্তুর স্ব-স্বরূপ আলোকরশ্মিতেই প্রকাশিত হয়। এজন্ত জ্ঞান-ভাস্কর উপমাটির বহুল প্রচলন আছে। অপরপক্ষে, নির্বিশেষ চিন্তা অজ্ঞান-তিমিরোথ। বস্তুবস্তুর গুণাগুণ বিচার শিশুর নাই। তজ্জন্ত নির্বিশেষে সকল বস্তুকেই তাহার ভক্ষ্যজ্ঞানে, বিষভাণ্ড এবং স্ব-তাক্ত বিষ্ঠাকুণ্ডলীকে ও উদরস্থ করিতে প্রয়াস পায়। অর্কাচীন বালকগণ সর্ববিষয় অবগত নহে। এজন্ত মানাপমান, আত্মীয়-অনাত্মীয়তা, মূর্খতা-পাণ্ডিত্য ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিচার রহিত হইয়া নির্বিশেষ-স্তরে তাহার অবস্থান করে। পরে সুশিক্ষা প্রভাবে তাহার এতাদৃশী বিভীষিকাময়ী নির্বিশেষ-চিন্তা হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্যই হইল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ-প্রণালী জ্ঞাপন। নিম্নোক্ত ব্যক্তির আন্তর ভাবধারা অহুধাবনে মূঢ় সর্বপ্রকারে অপারজত। অতএব নির্বিশেষ-জ্ঞানের সাহায্যে আপনার ত্রায় মায়াগ্রস্তকে মায়াযুক্ত-সম জ্ঞান করিয়া ক্ষণিকের তরে আনন্দ লাভ করে। কিন্তু ইহা যে প্রকৃত আনন্দ নহে—সে বুদ্ধি নির্বিশেষ-চিন্তাধিপত্যে লুপ্ত হয়। হীন, জবহ কৰ্ম্মে লিপ্ত পাপমলিনচিত্তগণ ত্রায় ব্যক্তির কৰ্ম্মধারাকে প্রশংসা করিবার সংসাহসশূন্য-তাকে স্বীয় অত্মায় সমর্থন কল্পে ব্যয় করিবার দুঃসাহসকে “ত্রায় যা অত্মায় ও তাই—কোন ভেদ নাই, সকল বস্তুই ত ব্রহ্ম।”—এই নির্বিশেষ জ্ঞানের (১) সাহায্যে পুষ্ট ও রক্ষা করিয়া জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করে। ইহাতে কাহারও নিকট হাস্যাস্পদ হইলে ও ঐ সকল উপহাসগুলিকে

অপমানজনক মনে না করিয়া “বিষ্ঠা-চন্দনে সমদর্শী জ্ঞানীর ছায় আনন্দ (?) লাভ করে। ইহাই তাহাদের নির্বিশেষ সুখ। ইহাই তাহাদের নির্বিকল্প আনন্দ। পণ্ডিত পাঠকগণ, একটু চিন্তা করিলে এতাদৃশ সুখ ও আনন্দের অসারতা-বোধ হইবে। সুশৃঙ্খলপূর্ণ কর্মকে উচ্ছৃঙ্খলতার সমপর্যায়ভুক্ত করিবার নির্বিশেষ-নীতি ব্যতীত উচ্ছৃঙ্খল জনগণের গতান্তর নাই। এই প্রকারে তিলে তিলে নির্বিশেষ-চিন্তা Rational জীব, মানবের বুদ্ধিবৃত্তি হরণ করিয়া তাহাকে অতিবুদ্ধির সমস্তরে অবতরণ করাইলে জগৎ ভয়াবহ অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। ইহাই নির্বিশেষ-চিন্তার সুদূরগামী বিষময় ফল। অতএব ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, নির্বিশেষ-জ্ঞান, জ্ঞান নহে, উহাই প্রকৃত অজ্ঞান।

অন্ধকারই নির্বিশেষ চিন্তার উৎপত্তি স্থল। অন্ধকার কোনও বস্তুর রূপ গুণ, আকার, বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে পারে না। ঘোর তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে চতুর্দিকের কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয় না। একটি কালো বস্তু সমগ্র জগদ্ব্যাপ্ত করিয়া আছে, মনে হয়। সমগ্র বিশ্বকে শূন্য, শূন্য বোধ হয়। অতএব এই নির্বিশেষ চিন্তা বস্তুর জ্ঞান আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সুতরাং এই নির্বিশেষ-বাদই সত্যের আচ্ছাদনকারী অজ্ঞান। অন্ধকারই ইহার জনক। কিন্তু আলোক জ্বলিলে চতুর্দিকস্থ কোন্ বস্তুর কোথায় কিভাবে কিরূপ অবস্থিতি, তাহার রূপ-গুণ-বৈশিষ্ট্য যাবতীয়াদি দ্রষ্টার নিকট মুহূর্ত্ত-মধ্যে প্রকাশিত হইয়া বাস্তব সত্যটি প্রকাশিত করে। এই সবিশেষ তত্ত্বই মানবমনের শৃঙ্খতা দূর করিয়া তাহাকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, অজ্ঞানতাই নির্বিশেষবাদ। অন্ধকারই উহার উৎপত্তিস্থল। শূন্যবাদ ইহারই অগ্রদিক। অপরপক্ষে, সবিশেষ-তত্ত্বই প্রকৃত জ্ঞান; আলোক হইতেই ইহার উৎপত্তি; শূন্যবাদের ইহা পরিপন্থী।

বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই বস্তু নিরূপিত হইয়া থাকে। নির্বিশেষ বস্তুকে নির্দেশ করা যায় না। যাহার বিশেষত্বই নাই, তন্নির্দেশের আবার প্রয়োজনই বা কি? অদ্বৈতবাদিগণ কিন্তু উপনিষদের “একমেবাদ্বিতীয়কম্” বাক্য-সাহায্যে ব্রহ্মকে নির্দেশ করতঃ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নির্বিশেষে কেবল একটী বস্তুই বিद्यমান, তাহাই ব্রহ্ম; দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই—এইরূপ বিচার-বিভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। নির্বিশেষ ‘১’ যে কোন বস্তুই নহে,—ইহাই সর্বপ্রথমে জ্ঞাতব্য।

“সাংখ্য-বাণী” গ্রন্থের ভূমিকায় মদীয় গুরুপাদপদ্ম আচার্য্যশিরোমণি

শ্রীশ্রীমন্তপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ এ সম্বন্ধে যে বিস্তারিত অশ্রমপাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, পাঠকগণের অবগত্যর্থ্যে এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎসুদ্ধতি দিতেছি,—

“.....গাণিতিক বিচার-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা ‘১’ বলিয়া একটা সংখ্যা লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই সংখ্যাগত ‘১’-এর মৌলিকত্ব অনুশন্ধান করিলে ইহা গণিত-শাস্ত্রবিদগণের ‘কাল্পনিক অর্থ’ বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে-বস্তু বা সংখ্যার উদ্ভবের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাকেই মানস-রাজ্যের ‘কাল্পনিক’ পদার্থ বলা হয়। **পৃথিবীতে ‘১’ বলিয়া কোন বস্তুই নাই**, তথাপি ‘১’ সংখ্যাই গণিত-শাস্ত্রের আদি সংখ্যা এবং ‘১’ হইতে সমস্ত উন্নত সংখ্যা-সমষ্টির উদ্ভব হইয়াছে—ইহা গণিত-শাস্ত্রের মত। কেহ কেহ ‘০’ শূন্যকেও গণিত-শাস্ত্রের আদি সংখ্যা বলিয়া বিচার করিয়া বৌদ্ধপদাবলৌহী হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ ‘১’-এর ধারণা কি, তাহা অনুসন্ধিৎসার বিষয়।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—‘Diversity in Unity’ অর্থাৎ একত্বের চিন্তায় বৈশিষ্ট্যের বিকাশ অবশ্যস্বাভাবী। সুতরাং নির্বিশেষ ‘১’ কোন বস্তু নহে। যে বস্তুর মৌলিকত্ব কাল্পনিক বা শূন্য, তাহা হইতে বাস্তবের আবির্ভাব অলৌক ও অসম্ভব।” অতএব নির্বিশেষ ‘১’ কে স্বীকার করতঃ অদ্বৈতবাদিগণ যে সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন বা করিতে চাহেন,—তাহা দর্শকের পরিত্যাগ্য।

আগামী সংখ্যায় “অদ্বিতীয়” শব্দের বৈয়াকরণিকগণ কি প্রকার অর্থ করেন এবং উপনিষদের “একমেবাদ্বিতীয়কম্” বাক্যের লক্ষ্যীভূত বস্তুর অদ্বিতীয়ত্ব কিরূপ, তাহা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তৎসহ “অন্ধকার” হইতেই যে “নিরাকার-বাদ” সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী

শ্রী শ্রীনবদ্বীপ-শতক

[শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ-বিরচিত
“শ্রী শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্”-এর পঞ্চাশুবাদ]

শ্রীরাধার ভাবে যিনি সুবর্ণ-বরণ ।
সাক্ষোপাঙ্গে নবদ্বীপে যার সংকীৰ্ত্তন ॥
কলিতে উপাস্ত সেই কৃষ্ণ-গৌরহরি ।
নবধা ভক্তিতে তাঁরে উপাসনা করি ॥১॥

(১) অন্তর্দ্বীপ—শ্রীধাম মায়াপুর

নিগম যাহারে ব্রহ্মপুর বলি' গা'ন ।
পরব্যোম, শ্বেতদ্বীপে বর্ণয় পুরাণ ॥
রসিক পণ্ডিত যারে 'ব্রজ' বলি' কয় ।
বন্দি সেই নবদ্বীপে চিদানন্দময় ॥২॥
কবে আমি নবদ্বীপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
অন্তর্দ্বীপ-বন-মাঝে পাইব দেখিতে ॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র-নর্তন-বিলাস ।
দেখি প্রেম-মূৰ্ছাবশে ছাড়িব নিশ্বাস ॥৩॥
নবদ্বীপ-মহিমা যে-শাস্ত্রে নাহি কয় ।
স্বপ্নেও সে-শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয় ॥
এ-ধাম-বৈভবে যার না হয় উল্লাস ।
তারে যেন নাহি দেখি না করি সন্তাষ ॥৪॥
শ্রী-গর্দভী সঙ্গ-রঙ্গে আর কিবা কাজ ।
বিস্ত-পুত্র-বিদ্যা-যশে শীঘ্র পড়ু বাজ ॥
আর দুঃখ কেন বহু সাধনের জন্ম ।
অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধন ॥৫॥
যথা রত্নচ্ছটাময়ী ভূমি স্নকোমল ।
খগ-মৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল ॥
বৃক্ষ-লতা ফুল-ফলে অদ্ভুত দর্শন ।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন ॥৬॥

(২) গোক্রমদ্বীপ

কেটি চিন্তামণি যদি মিলে অল্প স্থানে ।
 শ্রীহরির বহির্দৃষ্টি যদিও সেখানে ॥
 তথাপি গোক্রম-ধূলি ছাড়ি এ শরীর ।
 অস্ত্র না যায় যেন এই বুদ্ধি স্থির ॥৭॥

(৩) মধ্যদ্বীপ

সেই মধ্যদ্বীপে গৌরলীলা মধ্যদিনে ।
 সেই দ্বীপ-লীলা কৃপা কর এই হীনে ॥
 ব্রহ্মকুণ্ড কর মোরে কৃপা বিতরণ ।
 তব কৃপা-কল্ললতা ফল মহাধন ॥৮॥

(৪) কোলদ্বীপ

খগ-মৃগ-তরু-লতা কুঞ্জ-বাপী -নগ ।
 জল-স্থল-হৃদ আদি সমস্ত সৌভগ ॥
 বিশিষ্ট কাননময় দেবতা দুর্লভ ।
 জয় জয় কোলদ্বীপ বৈকুণ্ঠ-বৈভব ॥৯॥

(৫) ও (৬) রুদ্রদ্বীপ ও মোদক্রমদ্বীপ

পদ ! চর রুদ্রদ্বীপ, তুমি মনোলোভা ।
 আখি মোর সদা হের মোদক্রম-শোভা ।
 গুনিয়াছি নবদ্বীপ-গুণগণ যত ।
 জিহ্বা, তুমি সেই সব গাও অবিরত ॥
 গৌরাটবী-পরিমল ভজ মোর ঘ্রাণ ।
 ত্রিভুবনে নাহি নবদ্বীপ হেন স্থান ॥
 সেই ধামে গৌরকেলি-স্থলে দেহ মোর ।
 পুলকিত লুটি ভজ শ্রীগৌরকিশোর ॥ ১০ ॥
 জগদ্ ভ্রমিতে যার গন্ধ নাহি পাই ।
 সর্ববেদাতীত যার পথ হয় ভাই ॥
 সেই সুধাসিন্ধুরূপ নবদ্বীপ-ভূমি ।
 আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, চিত্ত, সদা রম তুমি ॥ ১১ ॥
 উজ্জলরসের প্রেম-সিন্ধু-নিশ্চন্দ্রিনী ।
 অপূর্ণ রাধিকা-ভাব খেলনানন্দিনী ॥

রাধা-প্রকটিত গোড়াটবী গৌরাবাস ।
রস-পীঠ হৃদে মোর হউন্ প্রকাশ ॥১২॥

(৭) জহ্নু দ্বীপ

দেবরাজ-পূজনীয় জহ্নুমুনি-স্থান ।
নবদ্বীপ-জহ্নু দ্বীপ যাহার আখ্যান ॥
সেই গৌরলীলা-স্থলে তৃণ-গুন্নাভাব ।
পাইলে আশার হয় উল্লাস-বিভাব ॥১৩॥

(৮) সীমন্ত দ্বীপ

রাধাকৃষ্ণ সেবা করি, শুদ্ধ ধর্ম সদাচরি,
সেবি সাধু-পদরজঃ, ভাই ।
লভিয়া বৈরাগ্য-পার, পাইয়াও রসসার,
সে রাধা-করুণা নাহি পাই ॥
সীমন্তে করিয়া বাস, যেবা হয় গৌরদাস,
যে করুণা শীঘ্র তার হয় ।
সকল সাধন ত্যজি, অতএব গৌর ভজি,
শ্রীসীমন্ত কর হে আশ্রয় ॥১৪॥

শ্রীশ্রীগৌর-ব্রজ নবদ্বীপ-ভক্তিপীঠভূমি

শ্রীনবদ্বীপধাম-মহিমা

রাধাকৃষ্ণ-সম্মেলন রসের সাগর ।
গৌরাঙ্গের ব্রজ নবদ্বীপ মনোহর ॥
সে ছয়ের প্রেমোদ্বর্ণ রসলীলাপুর ।
নবদ্বীপ হয় ভাই পরম মধুর ॥১৫॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান নাহি আমি জানি ।
শুকাদির আনুগত্যে নহি অভিমানী ॥
অতএব শুভাশুভ যে হউক ফল ।
রাধাকৃষ্ণ শ্রীগোক্রম আমার সম্বল ॥১৬॥
যে ধামের সীমা বেদ স্পর্শিতে না পারে ।
পরানন্দোৎসব গুচরূপে যথা স্মরে ॥
ব্রহ্মা, শিব যাহার মাধুর্য নাহি জানে ।
কবে বা বসিব সেই নবদ্বীপ-স্থানে ॥১৭॥

নবদ্বীপ-ধামে যঁার নিশ্চয় বসতি ।
অবশ্য হয়েছে তাঁর সাধুধর্মে মতি ॥
পুরুষাখ্যাদিকতত্ত্ব তাঁর করতলে ।
ব্রহ্মাদি-প্রণম্য তিনি কৃষ্ণ-রূপাবলে ॥২০॥

নমি আমি নবদ্বীপ নাম গৌরপুর ।
যাঁহার পীযুষ-রস অতীব প্রচুর ॥
খগ-পশু-জন্ম-বল্লীগণকে মাতায় ।
প্রেমমত্ত করি মোর চিত্তকে নাচায় ॥২১॥

অনেক পণ্ডিতগণ একত্র মানসে ।
কৃতার্থ মানয় অথ তীর্থের মানসে ॥
সে সব আমরা নাহি বুঝিবারে পারি ।
নবদ্বীপবন মাত্র আশ্রয় বিচারি ॥২২॥

সর্বদোষাকর আমি গুণলেশহীন ।
তুল্লভ পদার্থ মাগি সর্বধম দীন ॥
কবে সে উজ্জ্বলভক্তি-সার-বীজরূপ ।
গৌড়াটবী লভি হব পূর্ণরসকূপ ॥২৩॥

গুদোজ্জ্বল প্রেমরস অনৃত অপার ।
সাগর অপূর্ব অংশ রাধাদত্ত-সার ॥
গৌরাঙ্গ-কানন হয় অদ্ভুত এ ভবে ।
সেই বন মম গতি কত দিনে হবে ॥২৪॥

সকল সাধনহীন হইয়াও নর ।
করে যদি নবদ্বীপবন-মাঝে ঘর ॥
ধামের বিচিত্র শক্তি হঠাৎ তাহারে ।
রাধাকান্ত-রাসোৎসবে রতি দিতে পারে ॥২৫॥

আমার স্বজনগণ ছাড়ুক আমারে ।
দেহবৃন্তি অচল ইউক একেবারে ॥
তথাপিও চিদানন্দ নবদ্বীপ হ'তে ।
চরণ আমার নাই যাউ অথ পথে ॥২৬॥

শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহাধন ।
তাহাতে বসিতে বাধা করেন যে-জন ॥
মাতাপিতা-বন্ধু-সখা-মিত্র গুরু আর ।
কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাঁহার ॥২৭॥

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুর প্রভুগাদের হুমকি জিলায় বিভিন্নস্থানে প্রচারের সারমর্ম

হিন্দু শব্দের তাৎপর্য (আসনবনিতে বক্তৃতা)

সনাতনমতাবলম্বিগণ কখনও হিন্দু নহেন। ব্রিটিশ সরকার হিন্দুগণকে (বর্তমান সরকার-কথিত) দমনে রাখিবার জন্ত এবং মুসলমান প্রাধাত্যস্থাপন-মানসে ‘মুসলমান’ শব্দের মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব স্বীকারপূর্বক পূর্বোক্তগণকে “অমুসলমান” শব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত করিয়া গোণপরিচয়ভুক্ত করিবার চেষ্টা-ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। ইদানীন্তন সরকারও ‘হিন্দু’-শব্দের দ্বারা ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণকে পরিচিত করায়। ‘হিন্দু’ ও ‘অমুসলমান’ শব্দদ্বয় একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্তমান সরকারের এক্ষেপে প্রচ্ছন্নভাবে পূর্বরাজ্যের অনুবর্তিত্ব সন্দেহজনক। দ্বিতীয়তঃ, ‘হিন্দু’ শব্দ অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয়। ইহার ঐতিহাসিকত্বও অতি নবীন। সিদ্ধু নদের তীরবর্তী স্থানই হিন্দুস্থান নামে মুসলমানগণকর্তৃক কথিত হইয়াছে। ইহা একটী মুসলমানী সংজ্ঞা মাত্র; সুতরাং ইহা পূর্বোল্লিখিত ‘অমুসলমান’ শব্দের প্রতীক। ‘সিদ্ধু’ শব্দের অপভ্রংশই ‘হিন্দু’।

মানব কে?

(সারসাজোলে প্রদত্ত বক্তৃতা)

‘মনু’ শব্দের উত্তর ‘ক’ প্রত্যয়যোগে মানব শব্দটি সাধিত হয়। অতএব যাহারা মনুর অনুগত তাহারাই মানব। অতঃসকলে দানব বা পাশব। মনুসংহিতা বলেন,—

“যো যশ্ত মাংসমশ্রাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।

মংস্তাদঃ সর্বমাংসাদস্তস্মান্মংস্তান্ বিবর্জয়েৎ।”

(মনুসংহিতা ৫ অঃ ২১ শ্লোক)

এই মনুবাক্যের বিরোধী জনগণই দানব, রোরবলাভ ব্যতীত তাহাদের অতঃগতি নাই। পঞ্চস্থনা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাও তাহাদের আত্মার অধিক ক্ষেত্রেই উদ্ধারলাভ হয় না। শাস্ত্রের অন্তর আছে,—

জলজৈরভিশপ্তাণাং নারীনাং বৈধব্যং সদা।

মাংস খাদতি নিত্যং চ সুরথো সদৃশ যথা ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ নারীগণ জলজ জীবজন্তু মারিয়া রন্ধন করে। মৃত্যুকালে সেই-সকল প্রাণিগণের অভিসম্পাতে তাহার সর্বদাই বৈধব্যদশা লাভ করে।

(আমি যাহাকে খাইব) সুরথরাজার দৃষ্টান্তের দ্বায় সে-ও আমাকে নিত্যকাল খাইবে।

পরিসংখ্যান দপ্তরের Report-এ (রিপোর্ট) ও দেখা যায়, মৎস্য-মাংসাদি অমেধ্যভোজন ও ভগবদন্তিত্তে সনেহবৃদ্ধিকারী রং-তামাসাপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ-তৎপর সভ্যতার অত্যাধুনিকতায় শীর্ষস্থানাদিকারী ভোগক্লান্ত পাশ্চাত্যদেশে শতকরা ৯০-৯৫ জন নারীই বিধবা। ভারতবর্ষে এই হার একটু কম। তন্মধ্যে বাংলাদেশেই এই হার সর্বাধিক। কারণ-স্বরূপ আমরা বাংলা-দেশের খাতোচ্ছৃঙ্খলতাই লক্ষ্য করি। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের পরিসংখ্যান হইতেও আমাদের শাস্ত্রের এই মতের প্রতিবনি দেখিতে পাওয়া যায়।

‘মাংস’-শব্দের অর্থ, মাং—আমাকে, সং—সে (খাদ্যিত ভক্ষণ করে); অর্থাৎ আমি যাহাকে, সেও আমাকে ভক্ষণ করিবে। মনে হয় এই বাক্যটী অবলম্বনে ‘মেদ’ শব্দের প্রতিশব্দ ‘মাংস’ শব্দ প্রচলিত হয়। সুরথ রাজা লক্ষ ছাগ-বলিদ্বারা সশরীরে স্বর্গগমন-ব্রত পালন করিয়াছিলেন। পরে স্বর্গ-গমনকালে ঐ লক্ষ ছাগ খড়্গহস্তে সুরথ রাজাকে লক্ষ-বার হত্যা করিয়াছিল।

শাস্ত্রান্তরে,—

“মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্ত মাংসমিহাদ্যাহম্।

এতন্মাংসস্ত মাংসত্বং প্রবদন্তি মনৌষিগঃ॥”

আমি যাহাকে এ-স্থানে ভক্ষণ করিব, সে-ও আমাকে অত্রই ভক্ষণ করিবে; মনৌষিগণ ইহাকেই মাংসের ‘মাংসত্ব’ বলিয়া থাকেন।

সামান্য মৎস্য মাংসের প্রতি যাহারা আসক্তি বা লোভত্যাগ করিতে পারে না, তাহারা আবার বিশ্বমায়াসক্তি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবা করিবে— ইহা নিতান্ত অনুর্বরমস্তিকগণই তাহাদের স্বভাবস্বলভ কষ্টকল্পনা আশ্রয়পূর্বক বলিতে পারে।

বর্তমানে সমাজ উন্নয়ন-চেষ্টার স্বরূপ

(ধাদিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

বর্তমান সমাজে যে উন্নতির চেষ্টা সরকার ও বিভিন্নদলের মধ্যে দেখা যায়, সেটা কেবল “চাচারামের ভালবাসা, মুসলমানের মুগী-পোষা”-নীতির দ্বায়। তারা স্বয়ং অশান্তিতে ভুগছে। অতএব অত্রিও যাতে সেই প্রকার অশান্তি ভোগ করে, তজ্জন্ত কিছু আপাত সুখের ব্যবস্থা করে দেশ-সেবার চক্রা-নির্নাদে জগৎ ভরপুর করিয়া দেয়। এবিষয়ে আমি বহু প্রবন্ধ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছি। তার কিছু ফলও হয়েছে। শুধু মুসলমানের ঘরে কেন, হিন্দুর ঘরেও আজ মুগী-পোষা দেখা যায়। সরকার শেখাচ্ছে,—Poultry Farm কেমন করে করতে হয়। আমাদের দেশের কয়েকটা ধর্মমিশনের তথাকথিত সন্যাসিগণও মুগী-চাষ করছেন। বর্তমানের আনুগতিক বিজ্ঞান-বলে, “ইন্দ্রিয় দমন করার কোন প্রয়োজন নাই। পশুগণ উলঙ্গ থেকে ইচ্ছামত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করে, তাই তারা খুব ক্ষমতাবান।” আক্ষকাল সমাজের দিকেও দেখা যাচ্ছে, মেয়েদের কম পোষাক পরিধানের প্রতিযোগিতা। যারা যত কম পোষাক পরিধান করবে, তারা নাকি ততই ক্ষমতাবান ভদ্রসমাজের (??) উপযোগী !! জাতিকে বলবান করার উদ্দেশ্যে আমেরিকাতে আবার ছেলেমেয়েদের উলঙ্গ রেখে একটা পরীক্ষাও চালানো হয়েছিল। যত সব পশুর দেশ। ব্যভিচারিতা সেজ্ঞ তথায় ভদ্রতা বলে বিবেচিত হয়। এগুলি কলির সভ্যতা। এতে দেশের শান্তি কোনোদিন আসেনি, আসবেও না। ভারতও আজ এই পাশ্চাত্যের মোহে মুগ্ধ !!! (ক্রমশঃ)

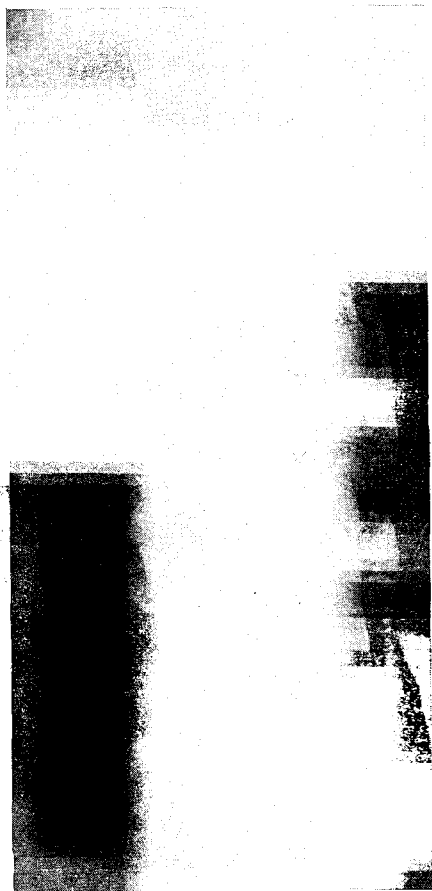
—নিজস্ব সংবাদদাতা

বিরহ বার্তা

শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘপতি, শ্রীশ্রীমদভক্তিসারঙ্গ

গোস্বামী মহারাজের নিশান্তুলীলায় প্রবেশ

কলির প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জড়রসমন্ত, অবিদ্যাগন্ত, কলিহত জীবগণকে শুদ্ধধর্মকথায় স্নাত করাইতে মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে ভক্তিসিদ্ধান্তরাজ্যের সরস্বতী স্বয়ং এই প্রপঞ্চে উদ্ভিত হইলে যে কয়জন নিকপট মহাপুরুষ তাঁহার সেবার্থ এই ধরায় আগমন করিয়াছিলেন, শ্রীমদভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার আত্যন্তিকী সেবাচেষ্টা মুগ্ধ তদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ তাঁহাকে “গৌড়ীয় সঙ্ঘপতি”-উপাধিতে ভূষিত করেন এবং শুদ্ধ ভক্তসমাজে পরিচয় প্রদানকল্পে তাঁহার অপ্রাকৃত-স্বরূপে ভক্তিসারঙ্গ নির্ঘোষ যোজনা করেন। বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুর মহকুমার পাত্রসায়ের গ্রামে ইং ১৮৮৮ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী মাঘী কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে ভক্তিমান বৈষ্ণবকুলে তাঁহার আবির্ভাব হয়। তাঁহার পিতৃ-প্রদত্তনাম শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।



১৯৩৫ সালের নভেম্বর
মাসে বঙ্গদেশের গভর্ণর
শ্রী জন অ্যাণ্ডারসন
শ্রী গো র জ ন্ন স্থা ন শ্রীধাম
মায়াপুর পরিদর্শনান্তর
প্রত্যাবর্তন করিলে ভাক্ত-
বিজয় ভবনের সম্মুখে শ্রীল
গোস্বামী মহারাজের অনু-
রোধে এই প্রতিকৃতি গৃহীত
হয়। জ গ দ্ গুরু শ্রীল
প্রভুপাদ আসনে উপবিষ্ট।
তাঁ হা র দ ক্ষিণ পার্শ্বে
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির
প্রতিষ্ঠাতা অমদীয় শ্রীল
আচার্য্যদেব ও বামপার্শ্বে
শ্রীগৌড়ীয় সজ্জপতি শ্রীল
গোস্বামী মহারাজ।

তাঁহার মঠাগমন ঘটনাটী মদীয় গুরুপাদপদ্মের সহিত বিজ্ঞুত। একদা
গ্রীষ্মের দিন বেলা প্রায় ২ ঘটিকার সময় তিনি অতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের
(Chief Clerk, E. I. Rly, ধানবাদ ; পরে শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত
হইয়া অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী) সহিত মায়াপুরে “শ্রীচৈতন্য মঠ” পরিদর্শনে
আগমন করেন। তখন মঠে বৈষ্ণববৃন্দের মাধ্যাহ্নিক প্রসাদ সেবন হইয়া
গিয়াছে। মদীয় গুরুপাদপদ্ম (তখন শ্রীচৈতন্য মঠের Manager) তৎক্ষণাৎ
তাঁহাদিগকে স্নান করিতে বলিয়া সত্ত্বর রন্ধন করাইয়া প্রসাদাদির স্তুবন্দোবস্ত
করেন। এই যত্নে তিনি এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে প্রত্যাবর্তনকালে মঠে
মাসিক পাঁচ টাকা আনুকূল্য বিধান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। এই

ঘটনার কিয়ৎ মাসান্তর সেই পূর্ণ যৌবনেই গৃহস্থ স্ত্রীর মুখে ভ্রমনিষ্ক্রেপ করতঃ ধানবাদের রেলওয়ে চাকুরী পরিত্যাগপূর্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবামানসে তিনি শ্রীমায়াপুর চলিয়া আসেন। সেই হইতেই তিনি মদীয় গুরুপাদপদ্মের সহিত প্রগাঢ় প্রীতিভরে আবদ্ধ ছিলেন। পূর্বপৃষ্ঠার প্রতিকৃতি ইহা স্পষ্ট করিবে।

অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার প্রচেষ্টাবলে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব-রাজসভা তথা শ্রীচৈতন্যমঠের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের রূপাবলে তিনি ভারতের উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিপুলভাবে হরিকথা প্রচার করিতে থাকেন। পরে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমন্নহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারকল্পে লণ্ডন ও অষ্ট্রাচ্য পাশ্চাত্যদেশে গুণবিজয় করেন। লণ্ডন গমনকালে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকেই তথায় শ্রীনাম প্রদান করিবার অধিকার দেন (মদীয় গুরুদেবের সাক্ষাতে বাগবাজার গোড়ীয় মঠে এই ব্যাপারটা ঘটে)।

ব্রিটেনে তৎপূর্বে আর কোনও হিন্দুধর্ম-প্রচারক মিশন প্রবেশ করিতে পারে নাই; কিন্তু শ্রীল গোস্বামী মহারাজের প্রচার এক্রপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে গোড়ীয় মিশনের পক্ষ হইতে লণ্ডনে যাইয়া সনাতন ধর্ম-প্রচার করিতে কোন বাধা দেয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কর্মকাণ্ডীয় ধর্মমত-প্রচারে লণ্ডনে প্রবেশ করিবার কোন অধিকারই পান নাই; সেজন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে আমেরিকা যাইতে হইয়াছিল। লণ্ডনের বৃক্কে সনাতন ধর্ম প্রচার করিবার ক্ষমতা তৎকালে আর কাহারও ছিল না। জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরই তাঁহার নিজজনে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া সনাতন ধর্মের উচ্চতম চিন্তাস্রোত, ভক্তির বাণী সর্বপ্রথম সর্বসাফল্যের সহিত লণ্ডনে প্রচার করেন। তাঁহার শক্তি-সঞ্চারিতগণমধ্যে শ্রীল গোস্বামী মহারাজই অগ্রণী। তাঁহার প্রচার সমগ্র লণ্ডনে এক্রপ আলোড়ন আনিয়াছিল যে কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি “লণ্ডন গোড়ীয় মঠ”-প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথাকার অধ্যক্ষ ঐ দেশেরই এক বিদুষী মহিলা, Miss C. Bowtell. মঠটি বর্তমানে বাগবাজার গোড়ীয় মঠের অধীনে। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার অপেক্ষা গোস্বামী মহারাজের ধর্ম-প্রচার বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। একমাত্র তিনিই লণ্ডন শহরে খ্রীষ্ট-ধর্মাপেক্ষা গুণ্ড সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন। এই লণ্ডন নগরীতেই তিনি (শ্রীগোস্বামী মহারাজ) অত্যশ্চর্য্যভাবে শ্রীবাহুদেব বিগ্রহ প্রাপ্ত হন।

তদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অলৌকিকী শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাঁহার ভক্তিরাজ্যের একমাত্র পাথয়ে ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের নাম লইয়া একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশুও তাঁহার নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিত এবং তাঁহার বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠিত। ইহাই ছিল তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আহার বিহারাদিতে তাঁহার সরলতা তদীয় সতীর্থগণ উপমা-স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্বন্ধে প্রায়ই “আমার একলা নিতাই পার করে”—উক্তিটী করিতেন।

মদীয় পরমারাধ্যতম গুরুপাদপদ্মকে শ্রীল প্রভুপাদের একমাত্র অন্তরঙ্গ জানিয়া তাঁহাকে তিনি “পাষণ্ড-গজৈকসিংহ”—এই উপাধিতে সম্বোধন করেন। প্রভুপাদের অপ্রকটের পর মদীয় গুরুপাদপদ্মের পরামর্শে সন্ন্যাস গ্রহণান্তর ভারতের সর্বত্র তদীয় গুরুদেবের বাণী-প্রচার-কল্পে “শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘ” নামক এক মিশন স্থাপন করিয়া তিনি বহু মঠ মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করেন। অবশেষে ১২ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব তিথি অঙ্গীকারপূর্বক সমগ্র বিশ্বকে অঙ্গকার করিয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ তালতলার “শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘাশ্রমে” নিশান্ত লীলায় প্রবেশ করেন। ঐনাগ্নে বজ্রপাতের স্থায় এই সংবাদ মদীয় গুরুপাদপদ্মের নিকট পৌঁছাইলে তিনি তাঁহার অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থা লইয়াও তালতলা মঠে গমন করেন। সেইকালে তাঁহার বিরহ-বিচ্ছেদ-সূচক উক্তিসকল উপস্থিত সকলকে অত্যন্ত বিচলিত ও ব্যথিত করে। এই দৃশ্য হইতেই মাদৃশ গুরুপাদপদ্মের সহিত শ্রীল গোস্বামী মহারাজ আজীবন কিরূপ গভীর, অচ্ছেদ্য পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

হা বদান্তবর ভক্তিসারঙ্গ প্রভু! আপনি আপনার নিত্যধাম হইতে মাদৃশ ভক্তিহীন পাষণ্ডের প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ করুন—ইহাই ভবদীয় গুণবৈষ্ণব-জগদ্বিমোহন শ্রীচরণকমলতলে অধর্মের শেষ নিবেদন।

—জনৈক বিরহী

উৎসব-সমীক্ষা

(১) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস

গত ৩১শে বৈশাখ অক্ষয়তৃতীয়া তিথি—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস। সমিতির ইতিহাসে ইহা বিশেষ স্মরণীয়। প্রতিবৎসরই এই দিবসটী সমারোহের সঙ্গিত সমিতির বিভিন্ন শাখামঠে উদ্‌যাপিত হয়। এবংসরও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ সমারোহের সহিত এই উৎসব পালিত হয়। সকাল হইতেই মঠ-মন্দির-প্রাঙ্গণ অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত হন। উক্ত মঠদ্বয়ে মাধ্যাহ্নিক ভোগারতিকালে গৌড়ীয়ের পরমোপাস্ত শ্রীশ্রীগাঙ্কর্ষিকা

গিরিধারীকে চতুর্বিধরস-সমন্বিত বহুবিশদ্রব্য-সামগ্রী নিবেদন করিলে পর আহুত, অমাহুত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এইদিন অপরাহ্নে সমিতির মূলকেন্দ্র নবরৌপহু মঠে এক বিশিষ্ট সজ্জনমণ্ডলীর সভায় “গৌড়ীয় বেদান্ত” শব্দের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা হয়। আজকাল মায়িক বাণী-দাসস্বৈ গুরু-ভক্তিবিনোদবাণী অহুসরণ করিতে পরাঙ্মুখ হওয়ায় অনেকেই ব্যক্তিজজনক ব্যাপার মনে করিতেছেন। তাঁহারা মনে হয়, গৌড়ীয়ের গুরু-পরম্পরায় “গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য”-শব্দদ্বয় লক্ষ্য করিতে চক্ষুহীন হইয়া গিয়াছেন।

(২) শ্রীশ্রীস্নানযাত্রা-উৎসব

গত ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-তিথি সমিতির মূল কেন্দ্র মঠ ও অত্যাশ্রম শাখামঠসমূহে প্রতিপালিত হন। সমিতির শাখামঠত্রয় চুঁচুড়াহু “শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,” কালনাহু “শ্রীঘাট গৌড়ীয় আশ্রম” ও মেদিনীপুরহু “শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ”-এ বিশেষ আড়ম্বরের সহিত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ক) শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

স্নানযাত্রা উৎসব চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের একটি বিশেষ পর্ব। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনহু একমাত্র এই মঠেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হুয়া থাকে। স্নানযাত্রা-দিবস সকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে রৌপ্য কলসের ১০৮ কলস জলে স্নান করান হয়। তৎপর সিদ্ধান্তখনি শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হুইতে স্নানযাত্রা অধ্যায় পঠিত হয়। চুঁচুড়া শহরের আত্মগলেছু বিশিষ্ট গণ্যমাণ ব্যক্তিমাত্রই এই উৎসবে যোগদান করিয়া আপনাদিগের জীবন ধন করেন। বলা বাহুল্য, সমাগত সকলকেই এইদিন মধ্যাহ্নে মঠে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

(খ) শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ

এই স্থানটা শ্রীমহাপ্রভুর পাদস্পর্শে তীর্থীভূত। স্নানযাত্রা তিথিতেই এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হন। বহু ব্যক্তি উৎসবস্থলীতে আগমন করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই মহাপ্রসাদদানে পরিতুষ্ট করা হয়। উৎসব পরিচালনে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ, শ্রীপাদ ভগবানদাস ভক্তিরঞ্জন, শ্রীপাদ রমানাথ ব্রজবাসীর ও উক্ত মঠের অত্যাশ্রম সেবকবৃন্দের নামও সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য।

(গ) শ্রীঘাট গৌড়ীয় আশ্রম

কালনাহু “শ্রীঘাট গৌড়ীয় আশ্রমে” এই দিবস সহস্রাধিক ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনে পরিতুষ্ট হন। সকাল হুইতেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হুইতে স্নানযাত্রা-পর্ব পাঠ এবং বিবিধ কীর্তনাদি গীত হয়। স্থানীয় উচ্চতর

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক, স্থানীয় চিকিৎসকাদি ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহোৎসবে যোগদান করেন। উৎসবের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রীগোরাচাঁদ ব্রহ্মচারী সমিতির সকল সেবকের বিশেষ প্রশংসাজনক হইয়াছেন! এতাদৃশী সেবাচেষ্টায় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের অজস্র আশীর্বাদ যে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

(৩) শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব

গত ২৫শে আষাঢ় লুপ্ততীর্থ শ্রীমায়াপুর-আবিষ্কর্তা, শুদ্ধভক্তি-প্রবাহক, গোস্বামী-ধুরন্ধর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি সমিতির অধীনস্থ প্রত্যেক মঠেই বিশেষ গান্ধীর্ষ্যের সহিত প্রতিপালিত হয়। সমিতির চুঁচুড়া, নবদ্বীপ ও মথুরা মঠত্রয়ে অপরাহ্নে বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী, আসামী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বিবিধ প্রবন্ধাদিতে শ্রীল ঠাকুরের পূত চরিত্র ও অমল-শুদ্ধভক্তি প্রচারকল্পে তাঁহার অলৌকিক দৃঢ়তা ও কৃতিত্ব আলোচিত হয়। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট জনগণকে ঠাকুরের পূত চরিত্র শ্রবণে বিশেষ অভিভূত হইতে দেখা যায়।

(৪) শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরথযাত্রা

গত ২৫শে আষাঢ় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব তিথি ও অব্যবহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে চুঁচুড়া মঠে একাদশ দিবসব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হয়। সকাল ও সন্ধ্যায় ভাগবতাদি শাস্ত্রপাঠ ও মহাজন পদাবলী কীর্তন সমিতির প্রতিটি মঠের একটি বিশেষ প্রাত্যহিক কৃত্য হইলেও এই কয় দিবস তাহার গুরুত্ব লক্ষ্যণীয়। এই রথযাত্রা উৎসব চুঁচুড়া শহরের একটি প্রসিদ্ধ উৎসব। শহরতলী হইতে বহু ব্যক্তি প্রত্যহ দুইবেলাই মঠে পাঠ ও কীর্তনে যোগদান করিতেন। দূর দূর দেশ হইতে আগত বহু যাত্রী উৎসবের এই কয় দিবস মঠে অবস্থান করেন। বিবিধ শাস্ত্রাদি হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ এই উৎসবে আলোচিত হয়। “অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা” অর্থাৎ “হস্তপদাদি ব্যতিরেকেই আমি চলিতে পারি”—এই শ্রুতিবাক্য-কথিত সিংহই শ্রীজগন্নাথদেব। কিন্তু নাস্তিকগণ তাহা স্বীকার করিবার শক্তি কখনই লাভ করিবে না।

এই বিরাট উৎসবের শেষ দিবস অর্থাৎ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা-দিবসে সর্বসাধারণের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। কত অগণিত নরনারী যে উৎসবকালে মহাপ্রসাদ সেবন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

*এই উৎসব Management-র দায়িত্ব সমিতির অগ্রতম তেজস্বী প্রচারক পূজ্যপাদ ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্তভক্তিবেন্দান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের উপর অর্পিত ছিল। এই মহোৎসব পরিচালনে তাঁহার ধৈর্য্য ও সহনশীলতা সমিতির প্রতিটি সেবকেরই অনুসরণীয়।

—প্রচার-সম্পাদক

শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ



১৬শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৭১ { ৭ম সংখ্যা



শ্রীপিছলদা গোড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

* স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে । *

ধর্মঃ স্বত্বজিতঃ পুংসাং বিশ্বকুলেন-কথাস্থ যঃ ।



নৌপাদমোষেদি রতিঃ শ্রমএব হি কেবলম্ ।

* অহৈতুক্যপ্রতিহতা যন্মাক্ষাঃ স্প্রপ্রসীদতি ॥ *

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিচক্ষুঃ ॥

অল্প ধর্ম হইরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

১৬শ বর্ষ } অনিরুদ্ধ, ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ৪৭৮ গৌরাক্ষ
বুধবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৭১; ইং ১৬৯১৯৬৪ { ৭ম সংখ্যা

সান্নিধ্যাদং

শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিতং

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

মায়াঞ্জনারুতচক্ষু গোরবনসম্বন্ধি-বস্তুকে জড়প্রায় দেখিলেও ধামের

স্বাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় বস্তুই চিদানন্দময়—

ভূতং স্বাবর-জঙ্গমাত্মকমহো যত্র প্রবিষ্টং কিম-
প্যানন্দৈকধনাকৃতি-স্বমহসা নিত্যোৎসবং ভাসতে ।

মায়াঙ্গীকৃত-দৃষ্টিভিস্তু কলিতং নানাবিরূপাত্মকং

তদগৌরাক্ষপূরং কদাধিবসতঃ স্থান্নে তহুশ্চিন্ময়ী ॥২৯॥

অহো ! স্বাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতনিবহ যে-স্থানে প্রবিষ্ট হইবামাত্র কি এক
অনির্কচনীয় ঘনানন্দস্বরূপ স্থানন্দে ষিভোর হইয়া নিত্যোৎসবে ভাসমান
হইতে থাকে, মায়ামোহাক্ষ চক্ষুর নিকট যে-স্থান (চিন্ময়ধাম) নানাবিধ

(জড়ময়) বিরূপাত্মক বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই শ্রীগৌরান্ধপুরে বাস করিয়া কবে আমার চিন্ময়ী তনু লাভ হইবে ? ২৯ ॥

সম্বন্ধ-কৌশলের সহিত ধামপ্রবেশকারী জীবমাত্রেরই সচ্চিদানন্দ

রূপতা-প্রাপ্তি ; উহা বহির্গুণ-দৃষ্টির অগোচর—

যত্র প্রবিষ্টঃ সকলোহপি জন্তুঃ সর্বঃ পদার্থোহপ্যবুধৈরদৃশ্যঃ ।

সানন্দ-সম্বিদ-ঘনতামুপৈতি তদেব গৌরান্ধপুরং শ্রয়ামি ॥৩০॥

যে স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া সর্বজীবই আনন্দ-সম্বলিত চিদ্ঘনতা (সম্বিতের সার, রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করে, যে-স্থানের পদার্থনিচয় বহির্গুণজন-গণের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না, আমি সেই ‘শ্রীগৌরান্ধপুর’কেই আশ্রয় করি ॥ ৩০ ॥

নিরপরাধে ধামাশ্রিত জীবগণের নিন্দাকারী শ্রীকৃষ্ণচরণে অপরাধী,

সুতরাং বঞ্চিত—

যে শ্রীনবদ্বীপগতেষু দোষান্ আরোপয়ন্তি স্থিরজঙ্গমেষু ।

আনন্দমুত্তিষপরাধিনস্তে শ্রীরাধিকা-মাধবয়োঃ কথং স্যুঃ ॥৩১॥

যাহারা সম্বন্ধজ্ঞানশ্রিত শ্রীধাম-নবদ্বীপের আনন্দময় স্বরূপ স্থাবর-জঙ্গমের প্রতি দোষারোপ করে, সেই অপরাধী ব্যক্তিগণ কিরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ লাভ করিবে ? ৩১ ॥

নিরপরাধে ধামাশ্রিত পুরুষের নিন্দাকারী, শ্রীমায়াপুরের বিরোধী,

গোক্রমের সহিত অগ্নতীর্থের সাম্যবুদ্ধিকারী ও ধামসেবানন্দকে

জড়ানন্দ-জ্ঞানকারী ব্যক্তি দুঃসঙ্গজ্ঞানে অসম্ভাষ্য—

যে গৌরস্থলবাসিনিন্দনরতা যে বা ন মায়াপুরং

শ্লাঘন্তে তুলয়ন্তি যে চ কুধিয়ঃ কেনাপি তং গোক্রমম্ ।

যে মোদক্রমমত্র নিত্যসুখচিক্রপং সহন্তেন বা

তৈঃ পাপিষ্ঠনরাধমৈর্ন ভবতু স্বপ্নেহপি মে সঙ্গতিঃ ॥৩২॥

যাহারা গৌরস্থলবাসি-জনগণের নিন্দায় রত থাকে, অথবা যাহারা মায়াপুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে, কিম্বা যে-সকল দুর্ভূদ্ধি-জন “গোক্রমের” সহিত অগ্নস্থানের তুলনা করে এবং “মোদক্রমকে” এই প্রপঞ্চে প্রকটিত নিত্য-চিংস্বত্বস্বরূপ মনে না করে, সেইসকল পাপিষ্ঠ নরাধমের সহিত স্বপ্নেও যেন আমার সঙ্গ না ঘটে ॥ ৩২ ॥

পাপাচার পরিত্যাগপূর্বক গৌরধামাশ্রয়কারী পুরুষেরই

বৃন্দাবনসম্পত্তি-প্রাপ্তি—

পরধন-পরদার-দ্বেষ-মাৎসর্য্য লোভা-

মৃত-পরুষ-পরাভিদ্ৰোহ-মিথ্যাভিলাপান্ ।

তাজ্জতি য ইহ ভক্তঃ শ্রীনবদ্বীপধাম্নি

ন খলু ভবতি বন্ধ্যা তস্মৈ বৃন্দাবনাশা ॥৩৩॥

পরধন, পরদার, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, লোভ, মিথ্যা ও ককর্শভাষণ, পরদ্ৰোহ এবং স্তোভ বা বৃথালাপাদি পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীনবদ্বীপ-ধামের ভজনা করেন, তাঁহার বৃন্দাবন-লাভের আশা কখনও বন্ধ্যা (বিফলা) হয় না ॥ ৩৩ ॥

গৌরধাম-বাস-নিষ্ঠার অনুকূল কার্য্যই ভক্তি, তৎপ্রতিকূল যাবতীয়

তথাকথিত ধর্ম্মও অধর্ম্ম বা পাপ—

কুরু সকলমধর্ম্মং মুঞ্চ সর্বং স্বধর্ম্মং

তাজ্জ গুরুমপি গোড়ারণ্যবাসানুরোধাৎ ।

স তব পরমধর্ম্মঃ সা চ ভক্তিগুরুণাং

স কিল কলুষরাশির্যদ্বি বাসান্তরায়ে ॥৩৪॥

‘নবদ্বীপ’-বাসের অনুরোধে অশেষ অধর্ম্মেরই (অর্থাৎ লৌকিক বা অন্ধজবিচারে যাহা অধর্ম্ম বলিয়া বিচারিত) অনুষ্ঠান কর, কিম্বা সকল স্বধর্ম্ম (বর্ণাশ্রমাদি), এমন কি গুরুজনকেও (পিতামাতা প্রভৃতি লৌকিকগুরু) যদি ত্যাগ কর, তবে তাহা তোমার পরমধর্ম্ম বলিয়া গণ্য, এবং তাহাই গুরুজনের প্রতি ভক্তি বলিয়াও গ্রাহ্য; পরন্তু নবদ্বীপবাসের যাহা অন্তরায়ে, তাহাই পাপরাশি বলিয়া পরিগণিত ॥ ৩৪ ॥

ঔদার্য্যধাম গৌরবনাশ্রয়ে জীবের সিদ্ধি অবশ্যস্তাবী—

নির্ম্মর্য্যাদাশ্চর্য্য-কারুণ্যপূর্ণং

গৌরারণ্য য নবদ্বীপ-ধাম ।

য কোহপ্যস্মিন্ যাদৃশস্তাদৃশো বা

দেহস্তান্তে প্রাপ্নুয়াদেব সিদ্ধিম্ ॥৩৫॥

যাহা “নবদ্বীপ-ধাম” বলিয়া আখ্যাত, সেই অসীম ও আশ্চর্য্য-কারুণ্য-পূর্ণ গৌরারণ্যে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভাবেই (ধামাপরাধশূন্য হইয়া)

অবস্থান করুন না কেন, দেহান্তে তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

লৌকিক ও বৈদিকধর্ম-কাননে ক্ষত-বিক্ষত না হইয়া অবিলম্বে

দীনতার সহিত শ্রীগৌড়মন্ডন আশ্রয় করাই বুদ্ধিমত্তা—

ন লোক-বেদোদিত-মার্গভেদৈ-

রাবিশ্য সংক্লিষ্ট্যত রে বিমুঢ়াঃ ।

হঠেন সর্বং পরিত্যক্ত্য গৌড়ে

শ্রীগৌড়মে পর্ণকুটীং কুরুধ্বম্ ॥ ৩৬ ॥

ওহে মূঢ় জীবগণ ! তোমরা বৈদিক ও লৌকিকভেদে বিভিন্ন মার্গসমূহ আশ্রয় করিয়া (বৃথা) কেশ প্রাপ্ত হইতেছ, বলপূর্বক (অর্থাৎ হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়া) চিদবলে বলী হইয়া 'সকল পরিত্যাগ করিয়া গৌড়দেশে "শ্রীগৌড়ম"-স্থলীতে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া অবস্থান কর ॥ ৩৬ ॥

নানা মনোধর্মোৎপত্তমতবাদ ছঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ-পূর্বক

ঔদার্য্যধাম গৌরধামাশ্রয়নিষ্ঠা—

যত্তজ্জলন্ত শাস্ত্রাণ্যহহ ! জনতয়া গৃহ্যতাং যত্তদেব

স্বং স্বং যত্তন্মতং স্থাপয়তু লঘুমতিস্তর্কমাত্রৈ প্রবীণঃ ।

অস্মাকন্তু জ্বলৈকোন্মদ-বিমলরস-প্রেমপীষু যমূর্ত্তে

রাধাভাবাপ্তলীলাটবীঃ হ ন বিনাশ্রয় নির্য্যাতি চেতঃ ॥ ৩৭ ॥

অহো ! শাস্ত্রসমূহ নানাবিধ জল্পনাই করুক, (অতাত্ত্বিক) জনসমূহ সেই সকল গ্রহণই করুক, শুকতর্কমাত্র প্রবীণ ক্ষুদ্রবুদ্ধি (হৈতুক) তাত্ত্বিককুল নিজ নিজ মত স্থাপনই করুক, আমাদের চিত্ত কিন্তু উন্নতোজ্জ্বল, হর্ষ-গর্ভাদি অপ্রাকৃতভাব-সমন্বিত বিমল প্রেম-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবানের রাধাভাবসম্বন্ধী লীলাকানন ব্যতীত অত্র যাইতে চায় না ॥ ৩৭ ॥

অনর্গল-প্রেমামৃতাকর-গৌরবনে রতিলান্ধের জ্ঞাত শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা—

অপার-করণাকরং ব্রজবিলাসিনী-নাগরং

মুহঃ সুবহু-কাকুভির্নতিভিরেতদভ্যর্থয়ে ।

অনর্গলবহনুহাপ্রণয়সীধুসিকৌ মম

কচিজ্জহুষি জায়তাং রতিরিহৈব খণ্ডে নবে ॥ ৩৮ ॥

অপার করুণানিধান সেই ব্রজবিলাসিনী-নাগর শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে বারম্বার কাকুবাঞ্চে নত হইয়া এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, যেখানে অনর্গল মহা-

প্রেমামৃত-সিন্ধু প্রবাহিত হইতেছে, একমাত্র সেই নবদ্বীপেই যেন কোন না কোন জন্মে আমার রতি উৎপন্ন হয় ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমায়াপুর-ধাম-সেবাফলে স্নহুরাচারেরও সর্বসাধুত্ব প্রাপ্তি—

নানামার্গরতোহপি দুর্ন্যতিরপি ত্যক্তস্বধর্মোহপি হি

স্বচ্ছন্দাচারিতোহপি দূর-ভগবৎসম্বন্ধ-গন্ধোহপি চ ।

কুর্ষ্বন্ যত্র চ কামলোভবশতো বাসং সমস্তোত্তমং

যায়াদেব রসাত্মকং পরমহং তনৌমি “মায়াপুরম্” ॥৩৯॥

নানামার্গরত অর্থাৎ মনোবর্জ্যশ্রয়-হেতু চঞ্চল্য-মতি, অতি দুর্ন্যতি, স্বধর্মোচার-বিরত, স্বেচ্ছাচারী, ভগবৎ-সম্বন্ধগন্ধ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তিগণও কামলোভবশে যে নবদ্বীপে বাস করিয়া সর্বোত্তমত্ব প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ সর্বদোষ-বিনশ্লুত হইয়া সর্বভক্তিগুণাকর হয়), সেই পরমশ্রেষ্ঠ রস-নিলয় শ্রীমায়াপুরকে আমি স্তব করি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীনবদ্বীপেই ভক্তিসুখ মাধুরীর পরাকাষ্ঠা বিরাজিত—

ইহ সকলসুখেভ্যাঃ সূত্তমং ভক্তিসৌখ্যং

তদপি চরমকাক্ষ্যং সম্যগাপ্নোতি যত্র ।

তদপি পরমপুংসঃ শ্রীনবদ্বীপধাম

নিখিল-নিগম-গূঢ়ং মূঢ়বুদ্ধির্ন বেদ ॥৪০॥

এই সংসারে সর্বপ্রকার সুখ হইতে ভক্তিসুখই শ্রেষ্ঠতম ; তাহাও আবার শ্রীধাম নবদ্বীপেই চরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে । মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি পরমপুরুষ শ্রীভগবানের এই নিখিল বেদগুহ্য নবদ্বীপধাম-তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না ॥ ৪০ ॥

অচিন্ত্যশক্তিশালী অপরাধভঞ্জনক্ষেত্র, প্রেমরসদ কোলদ্বীপ—

ভজন্তুমপি দেবতাস্তুরমথাক্ষর-ব্রহ্মণি

স্থিতং পশুবেদেব বা বিষয়-ভোগ-মাত্রে রতম্ ।

অচিন্ত্য-নিজশক্তিতঃ স্বগত-রাধিকা-মাধব-

প্রগাঢ়রস-মোহিতং কুরুত এব কোলাটবী ॥৪১॥

কেহ অত্র দেবতার ভজনাই করুন, অথবা অক্ষর-ব্রহ্মেই অবস্থিত থাকুন কিম্বা পশুর আয় একমাত্র বিষয়ভোগেই বা রত হউন, তাঁহাকে নবদ্বীপান্তর্গত (গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্তী) কোলাটবী নিজ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে স্বগত রাধা মাধবের নিগূঢ় প্রেমরসে নিশ্চয়ই মোহিত করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আজকাল যে যুগ বা কাল চলিতেছে, তাহাকে কলিকাল বা কলিযুগ বলে। 'কলি' শব্দে বিবাদ অর্থাৎ প্রেমের অভাব। কলিযুগের লোক স্বাভাবিক পরস্পর বিবাদপ্রিয়। সেইজন্ত কলিযুগের অসুবিধা দূর করিবার জন্ত প্রেমময়-বিগ্রহ চৈতন্যচন্দ্র প্রেমধর্মের প্রচার করিয়াছেন।

জনসংঘের মধ্যে যে বাদ-বিসম্বাদ প্রবল, তাহা প্রেমের প্রচারে প্রশমিত হয়; এ জন্ত প্রেমধর্ম সর্বজনাদৃত। যেখানে অবয়-জ্ঞানের অভাব, সেইখানেই বিবাদ। চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছেন। চৈতন্যবিমুখগণ পরস্পর-বিবাদমান-অপ্রীতিকে ধর্ম বলিয়া প্রচার করেন, সে-জন্ত তাঁহারা অচৈতন্য-বস্তুকে তাহাদের প্রেমের আধার কবিয়া তুলিয়াছেন, ইহাই হরিবিমুখতা।

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম অদ্বয়জ্ঞান ভগবানকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। যাহারা ভগবৎ-বিশ্বতীক্রেমে ভগবৎ-প্রীতি ভুলিয়া আর কিছু লইয়া আছেন, তাঁহারা প্রেমময়-বিগ্রহের সহিত বিগ্রহ করিয়া অপ্রীতি-বিগ্রহকে পূজা করেন। প্রেমধর্মের লক্ষ্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অনিত্য বস্তু সম্বন্ধে প্রেমের বিষয় ও

শ্রয় নির্ণয়পূর্বক অদ্বয়জ্ঞানের বিপরীত অবস্থায় প্রেমের যোজনা করেন। ফলে, তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

“গৌড়ীয়” সাময়িক-পত্ররূপে সর্বজনাদৃত প্রেমধর্মের প্রচারক। কলি বা বিবাদ লইয়া যাহারা ব্যবসায় করেন, তাহারাই গৌড়ীয়ের সহিত যুগধর্ম-অপ্রীতি স্থাপন করেন। গৌড়ীয়োপাস্ত্র চৈতন্য-প্রীতিরাহিত্যই গৌড়ীয়ের প্রতি বিতৃষ্ণ হইবার কারণ। শ্রীচৈতন্যপ্রসিত নিত্যানন্দের অনুগজন যে ভূমিতে বাস করেন, তাহা ‘গৌড়দেশ’ নামে প্রসিদ্ধ। এতদেশবাসিগণ সকলেই নৈসর্গিক প্রেমধর্মে অবস্থিত। দেশজ ভেদবুদ্ধিক্রমে কোন হরিজনই আপনাকে “গৌড়ীয়” বলিতে কুণ্ঠিত হন না। উৎকলদেশস্থিত শ্রীরায় রামানন্দ, দাক্ষিণাত্যবাসী ত্রিদণ্ডি-প্রবোধানন্দ ও গোপাল-ভট্ট, স্থানেশ্বরী জগন্নাথ সকলেই বিভিন্ন দেশবাসী হইলেও ‘গৌড়ীয়’ বলিতে সঙ্কোচিত হন না। আবার চৈতন্যসেবাবিমুখ স্মার্ত ভট্টাচার্যের অনুগগণ গৌড়দেশের অধিবাসী হইয়াও আপনাদিগকে ‘গৌড়ীয়’ বলিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা প্রেমহীন ধর্মের যাজকস্বত্রে অগৌড়ীয়।

গৌড়ীয়ের সহিত অগৌড়ীয়ের ভেদ কোথায় জানিতে হইলে, গোড়ায় অনুসন্ধান করা আবশ্যক। জীবের স্বরূপ নিরূপণে গৌড়ীয় আপনাকে

প্রেমাকর কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যদাস বলিয়া জানেন। অগৌড়ীয় আপনাকে নির্বিশেষবাদী বা কর্মপথের পথিক বলিয়া অভিমান করেন। নিত্য-বৈষ্ণব-স্বরূপ-বিস্মৃতি-ফলেই আপনাকে কিছুদিনের জ্ঞাত অবৈষ্ণব বলিয়া ধারণা করিতে গিয়াই গৌড়ীয়কে সংসাম্প্রদায়িক বলিয়া তাহাতে তাঁহার থাকিতে ইচ্ছা হয় না। এই স্বতন্ত্রতার ফলেই তিনি নিত্য-প্রেমধর্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনাকে অসংসাম্প্রদায়িক বা সার্বজনীন নামে অগৌড়ীয় আখ্যায় ভূষিত করিয়া স্মৃতি হন। কলি বা বিবাদযুগে বিশ্বজনীন ভাবের নামে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধক্রমে কর্মের দোহাই দিয়া ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর ফলকামী কণ্ঠবীর নামে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে ব্যস্ত হন। কেহ বা তাদৃশ বিরোধক্রমে জ্ঞানের দোহাই দিয়া ফলরহিত নির্বিশেষ পদার্থবিশেষে লীন হইবার মানসে গৌড়ীয়ত্ব-নিজত্ব বিনাশ করেন।

দেহ ও মনোধর্মের সেবকস্বত্রে অগৌড়ীয়গণ আত্মধর্মবিৎ গৌড়ীয়ের সহিত পার্থক্য স্থাপনে ব্যস্ত। ভগবৎ-প্রেমার পরিবর্তে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি ফল-প্রার্থনায় তাঁহারা অস্থির। চিত্ত-চাঞ্চল্যই তাহাদিগকে কুপথসমূহে প্রধাবিত করায়। দেহ ও মনকে অনাগ্ন বলিয়া বুঝিতে না পারিলেই জীবের ভোগপ্রবৃত্তি প্রবলা হয়, আবার কেহ কেহ আলস্যক্রমে ভোগরহিত নির্জীবতাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে চিত্ত-চাঞ্চল্য হইতে শান্তিলাভ করিতে ব্যগ্র হন। এই দুই শ্রেণীর অগৌড়ীয় চৈতন্য-চরণাশ্রয় করিবার পরিবর্তে অনাগ্নচেষ্টাবলে বিপথগামী হন। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত-লেখক শ্রীপ্রবোধানন্দ ত্রিদিগুপাদ গৌড়ীয়ের শুদ্ধ প্রেমধর্ম-প্রচারপ্রণালী বর্ণন করিতে গিয়া উপদেশ দেন যে—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োনিপত্য

কৃষ্ণা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাং

চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুণ্ডতানুরাগম্ ॥

গৌড়ীয়ের এই উপদেশই সর্বতোভাবে বরণীয় জানিয়া গৌড়ীয় সেই পথেই পাঠকের পদদ্বয়ে নিপতিত হইয়া তৃণগুচ্ছ-সম্বলিত বদনে তাঁহাদিগকে সাধু সন্মোদন করতঃ সমস্ত দুঃসঙ্গ-পরিবর্জনের প্রার্থনা জানাইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া একবার ভক্তিপথে অগ্রসর হউন—বলিলেন।

অনেক বৈঠকে বৈষ্ণবের বেষ লইয়া কথোপকথন হয়। বৈষ্ণবগণ বর্ণ ও

আশ্রম ধর্মের অতীত। সূতরাং তাঁহারা পরমহংস। শ্রীমৎ অদ্বৈতপ্রভু অবধূত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিয়াছেন—‘পরমহংসের পথে তুমি অধিকারী।’ সূতরাং বৈষ্ণব বা অবধূত-বেশে কোনও বর্ণ বা আশ্রমের চিহ্ন নাই। “স-লিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্তা চরেদবিধিগোচরঃ।”

“বৈষ্ণবের রক্তবস্ত্র পরিতে না যুয়ায়” (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। শ্রীল-সনাতন-গোস্বামী-প্রভু প্রমুখ পরমহংস বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন। কাষায়বস্ত্র বা ত্রিদণ্ডাদি ধারণ বর্ণাশ্রমের চিহ্ন। কিন্তু সাধারণ অনর্থযুক্ত পুরুষ এককালেই বর্ণাশ্রমাভ্যন্তরীণ পরমহংস হইতে পারেন না। অপক অবস্থায় পরমহংসের বেষ বা কোপীনাди গ্রহণ করিলেও গোপনে নানাপ্রকার ব্যভিচার করিয়া থাকেন। সেবাদাসী-গ্রহণ ও নানাভাবে অঐধ স্ত্রী-সন্তাষণাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া ধর্মের নামে কলঙ্ক আনিয়ন করেন। ইহা তাঁহাদের সমাজের মুখোজ্জ্বল করে না।

আজকাল লোকের ‘বৈষ্ণব’ সম্বন্ধে বড়ই বিকৃত ধারণা। ‘বৈষ্ণব’ বলিলেই লোকে অশিক্ষিত শাস্ত্রযুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসী, গলায় মালা, নাকে তিলক, হাতে বোলা, কোপীন আটা, সাদা বেষ পরিহিত, সঙ্গে সেবাদাসী, গাঁজা ও ধূম্রপানে পটু, গালে পান, আঁকু পাঁকু ভাববিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর কথিত বৈষ্ণবের নির্দেশ এই যে—

- ১। অতএব যার মুখে এক ‘কৃষ্ণ’নাম।
সেহঁত বৈষ্ণব, তাঁহার করহ সম্মান ॥
- ২। কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥
- ৩। যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে হরিনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥

অতএব বৈষ্ণব নামপরায়ণ।

মহাপ্রভুর নির্দিষ্ট বৈষ্ণব না হইয়া যাহারা গাঁজা-ধূম্রপানাদিতে ব্যস্ত, স্ত্রীসঙ্গী, তাহাদের মুখেও ত খুব নাম (?) শুনিতে পাওয়া যায়। তবে কি তাহারাও বৈষ্ণব? তদন্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলেন—

“এক ‘কৃষ্ণ’ নামে করে সর্ব পাপক্ষয়।

নববিধভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥

দীক্ষা-পুরস্কার্য-বিধি অপেক্ষা না করে ।

জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥

অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয় ।

চিত্ত আকর্ষণ করে কৃষ্ণে প্রেমোদয় ॥

অতএব যার মুখে এক 'কৃষ্ণ'-নাম ।

সেইত বৈষ্ণব, করিহ তাহার সম্মান ।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫শ অঃ)

ঐ সকল ব্যক্তিতে এই লক্ষণের একটীও দেখা যায় না । সুতরাং তাহাদের মুখোচ্চারিত নামাক্ষরগুলি 'নাম' নহে; নামাপরাধ মাত্র । ধাত্ব হইলে ভিতরে শব্দ থাকিবে । খাইলে পুষ্টি-তুষ্টি হইবে । শ্যামা গাছের বীজ দেখিতে ধাত্বের মত হইলেও তাহার দ্বারা ধাত্বের উপকার পাওয়া যায় না ।

অল্পকথায় বৈষ্ণবের সংজ্ঞা—

“কনক কামিনী,

প্রতিষ্ঠা বাধিনী,

ছাড়িয়াছে যারে, সেইত বৈষ্ণব ।”

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম ও শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন-ভজন

১। পুরুষোত্তমে শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপে কৃষ্ণানুশীলন করেন ?

“পুরীতে * * * আমি গোপীনাথ পণ্ডিতকে আমার পাঠের সহায়তার জন্ত নিযুক্ত করিলাম । প্রথমে সমস্ত দ্বাদশ স্বক্ৰ ভাগবত শ্রীধরস্বামীর টীকার সহিত আমি তাঁহার নিকট পড়িলাম । আমার সঙ্গে তখন হরিদাস মহাপাত্র ও মার্কণ্ডের মহাপাত্র ভাগবত পড়িতে আরম্ভ করেন ; কিন্তু ৫৭ দিনের মধ্যে উঁহারা এত পশ্চাৎপদ হইলেন যে, শেষে আমার নিকট পড়িতে লাগিলেন । উঁহারা তৎপূর্বে নদীয়া ও কাশীতে ছায়-বেদান্ত পড়িয়া আসিয়াছিলেন । * * * পুরীতে রীতিমত গ্রন্থ পাঠ করিলাম । ভাগবত শেষ করিয়া ‘ষট্‌সন্দর্ভ’ নকল করিয়া লইয়া পড়িলাম । বেদান্তের বলদেব-কৃত গোবিন্দভাষ্য লিখিয়া লইয়া পড়িলাম ।

‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ পড়িলাম। ‘হরিভক্তিকল্পলতিকা’ লিখিয়া লইলাম। নিজে কিছু কিছু সংস্কৃত রচনা করিতে লাগিলাম। ‘দত্তকৌস্তভ’ নামক সংস্কৃত-গ্রন্থ পুরীতেই রচনা করি। ‘শ্রীকৃষ্ণসংহিতা’র অনেক শ্লোকই সেই সময়ে রচনা করি। * * * পরমানন্দ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন আমার নিকট ভাগবত পড়েন। ঐ সময় শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্ভানের বাটীতে আমাদের ভাগবত-সংসদ হয়। মহান্ত নারায়ণদাস, মোহনদাস, উত্তরপার্শ্বের মহান্ত হরিহরদাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সকলেই সেই সভায় যান। কহাধারী রঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয় আমাদের সে সভার বিরোধী হইয়া অনেকগুলি লোককে সে সভায় যাইতে নিষেধ করিলেন। রঘুনাথ দাস বাবাজী তখন হাতী আখড়ায় থাকেন। বাবাজী মহাশয় সিদ্ধপুরুষ, স্মৃতাং সকল কথা জানিতেন। অল্প দিনের মধ্যেই আমার সহিত বিশেষ হৃদয়তা করিয়া কহিলেন,—‘আপনার তিলক-মালা না দেখিয়া আমার অবজ্ঞা করা অপরাধ হইয়াছে, আপনি ক্ষমা করুন।’ আমি বলিলাম,—‘বাবাজী মহাশয়! আমার দোষ কি? তিলক-মালা দীক্ষাগুরু দিয়া থাকেন, প্রভু আমাকে এখন পর্য্যন্ত দীক্ষাগুরু দেন নাই। আমি কেবল মালায় হরিনাম জপ করিয়া থাকি। এ অবস্থায় নিজের মনোমত তিলক-মালা লওয়া কি ভাল?’ বাবাজী মহাশয় সকল কথা বুঝিয়া আমার প্রশংসা করিলেন। আমাকে কৃপা করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার অনুগত থাকিলাম।

টোটা গোপীনাথের মন্দির হইতে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-বাটী যাইতে পথে সাতাসন ভজনকুটী। সেখানে নিরপেক্ষ বাবাজীগণ অনুক্ষণ ভজন করিতেন। স্বরূপদাস বাবাজী সেখানে ভজন করিতেন। মহাত্মা স্বরূপদাস বাবাজী একজন অপূর্ব বৈষ্ণব। তিনি সমস্ত দিবসই কুটীরের ভিতর ভজন করিতেন। সন্ধ্যাকালে প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসী প্রণাম দণ্ডবৎ করিয়া নামগান করিতে করিতে নাচিতেন ও কাঁদিতেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বৈষ্ণবগণ যাইতেন। কেহ কেহ এক মুষ্টি মহাপ্রসাদ তাঁহাকে সেই সময় দিতেন। তাঁহার ক্ষুদ্রবৃত্তি পর্য্যন্ত তিনি তাহা স্বীকার করিতেন, অধিক লইতেন না। কেহ কেহ সেই সময় চৈতন্তভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বাবাজী মহাশয় আবার ১০টা রাত্রে নিজের কুটীরে যাইয়া ভজন করিতেন। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সমুদ্রতীরে গিয়া হাত-মুখ ধোয়া ও স্নান করা সমাপ্ত করিতেন।

কোন বৈষ্ণব পাছে তাঁহার কোন কার্য করেন, সেই আশঙ্কায় একক সব কার্য নির্বাহ করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ ; কেমন করিয়া রাত্রি থাকিতে সমুদ্রে দৈহিক স্নানাदि করিতেন, তাহা মহাপ্রভুই জানেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিষয়-চিন্তা মাত্রই ছিল না। আমি সন্ধ্যার পর কোন কোন দিন তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইতাম। বড় মিষ্টবাক্যে তিনি আগন্তুক লোকের সহিত কথোপকথন করিতেন। আমাকে এই উপদেশ করিয়াছিলেন,—‘তুমি কৃষ্ণনাম ভুলিবে না।’

—ঠাকুরের আত্মচরিত

২। পুরীতে শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপভাবে ভজন করিয়াছেন ?

“পুরীতে থাকায় * * * আমরা প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীমন্দিরে দর্শন, নাম-কীর্তন, শ্রবণ ও সাধুসঙ্গের জন্ত যাইতাম। মহাপ্রসাদ অরহর ডাল না খাইলে একদিনও তৃপ্তিলাভ করিতাম না। আমি মন্দিরে প্রবেশ করিবা-মাত্র ‘কে-যেন’ আমাকে প্রত্যহই ডাল আনিয়া দিত।

মন্দিরের এক পার্শ্বে মুক্তিমণ্ডপ ; সেখানে শাসন-ব্রাহ্মণ-মাত্র বসিতে পান, তাঁহারা সকলেই মায়াবাদী। সেদিকে গেলে আমার মন তৃপ্তি লাভ করিত না। সুতরাং শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে অথবা শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মের নিকট বসিতাম। আমরা বসিলে মুক্তিমণ্ডপের অনেক পণ্ডিত আসিয়া তথায় বসিতেন। আমি ঐ স্থানটিকে ‘ভক্ত-প্রাঙ্গণ’ বলিয়া নাম দিয়াছিলাম ; সেইখানেই ক্রমশঃ আমাদের বিদ্বৎসভার উন্নতি হইল।

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির যেরূপ উচ্চ ও ননোহারী, সেবাও তদ্রূপ অপরূপ। যে লীলাই দর্শন করা যায়, তাহাই চিত্তকে মুগ্ধ করে। সন্ধ্যা-আরাত্রিক প্রভৃতি দৈনন্দিন উৎসব দেখিতে প্রত্যহই ৫৭ শত লোক উপস্থিত থাকেন, কি আনন্দ ! পর্বযাত্রায় নানাবিধ যাত্রী সমস্ত ভারত হইতে আসিতে থাকে ; দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। * * * দোলযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতিতে অনেক যাত্রী হয়। আমার প্রতি তাহাদের পর্যবেক্ষণের ভার ছিল। * * * পর্বকালে যাত্রীদিগকে যে পরিশ্রমের সহিত দর্শন করাইতাম, তাহা আমি আর নিজে কি লিখিব। যাত্রীদিগের দর্শন-সুবিধা ও শীঘ্র প্রসাদ-সেবনের সুবিধা করিতে গিয়া অনেক লোকের বিরাগ-ভাজন হইতাম। রাজা প্রভৃতি মন্দিরের কর্মচারিগণ কখনও কখনও স্বার্থ-সাধনের অভিপ্রায়ে অস্থায় কার্য করিতেন। আমি সেই সকল নিবারণ

করিতে গিয়া রাজা ও রাজার লোকদিগের শত্রুতা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। প্রভু জগন্নাথদেব আমার সহায় থাকায় কেহ আমার কোনপ্রকার অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। আমি স্বচ্ছন্দে প্রায় পাঁচ বৎসর শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় কাটাইয়াছিলাম। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আমি কয়েকটি বাসা বদল করি। * * * ১২৮০ সালের ২৫শে মাঘ 'বিমল' রামচাঁদ আঢ্যের দরুণ বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের অনুরোধাদি সকল শুভকর্ম শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদদ্বারা নির্বাহ হয়। সকল কর্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়া আমরা প্রসাদনিষ্ঠ হইয়াছিলাম।”

—ঠাকুরের আত্মচরিত

৩। পুরুষোত্তমে শ্রীভক্তিবিনোদ 'ভজনকুটী' কেন আশ্রয় করিলেন?

“আজ আমরা শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভজন-কুটীতে উপবিষ্ট। বিদ্বন্মণ্ডলী-পরিষেবিত বহুজনাকীর্ণ মহানগরী কলিকাতা পরিত্যাগ করত কেনই বা আমরা এই সূদূর প্রদেশে পলাইয়া আছি? বহুদিবস পূর্বে যখন আমরা সজ্জনতোষণী পত্রিকা প্রকাশ করি, তখন আমাদের হৃদয়ে একটি আশা ছিল যে, এই পত্রিকা দ্বারা জগতে যতই বিস্তৃত বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইবে, ততই জগতের মঙ্গল সমৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সরলভাবে আমরা কার্য আরম্ভ করিলাম। বঙ্গভূমির বহু প্রদেশ হইতে শিক্ষিত বহুতর গোস্বামী, বাবাজী প্রভৃতি আসিয়া আমাদের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন কোন নিরাকারবাদী কৃতবিদ্য ব্যক্তি আমাদের সহিত যোগদান করত বিস্তৃত ভক্তির্থের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সংসারসেবিগণও বৈষ্ণবধর্মের রমণীয় উপদেশাবলী শ্রবণ করত তাহাতে আকৃষ্টমনঃ হইলেন। বহির্গত গীতবাত্তপ্রিয় ব্যক্তিগণ বিস্তৃত হরিকীর্তনের শ্রোতে প্রাণ-মনঃ ভাসাইয়া দিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে ক্রমে-ক্রমে বহুতর হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের গরিমা যখন প্রায় সমুদায় বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া নিজের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সকলকেই মোহিত ও পুলকিত করিতে লাগিলেন, বঙ্গভূমির ঈদৃশ আশাতরিত্ত ভাব-দর্শনে যখন আমরা দিন দিন নবোৎসাহে বিস্তৃত বৈষ্ণবতার প্রচার করিতে লাগিলাম, সেই সময়ে কালের গতিতে সহসা এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবধর্ম-তপনের প্রথরতাপে যে-সমুদয় খণ্ডোতিকাপ্রায় উপধর্মসমূহ লুকায়িত হইয়াছিল, সহসা তাহারা চতুর্দিক হইতে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ

করত উপস্থিত হইল। কিয়ংকালের জন্ত বিশ্ব্তির অতল-তলে নিমজ্জিত মায়াবাদরূপ আত্মরিক ধর্ম কতকগুলি স্মৃতি-বচনের আবরণে নৈয়ায়িক স্মার্ত-অধ্যাপক-তরুণীর আশ্রয়ে বক্তৃতা-ছলে পুনরায় ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় যোগীও তাহাদের সহযোগিস্বরূপে উদ্ভিত হইয়া ধর্মজগতে এক বিপ্লব উপস্থিত করিল। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়-বিলাসী কতকগুলি জগজ্জগাল পুনরায় কতকগুলি উপধর্ম আশ্রয় করত আপনাদিগকে সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি বিবিধ আকারে সজ্জিত করিয়া জনসমাজে দৌরাণ্ড্য আরম্ভ করিল। প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠার কতিপয় কীট স্বীয় কুপ্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত আপনাদিগকে 'ভগবানের অবতার' (?) বলিয়া মুখ-সমাজে প্রচার করিতে লাগিল। কেহ বা বৈষ্ণবোচিত কমনীয় নামে আপনা-আপনকে নানারূপ আচার্য্য-পদোচিত প্রতিষ্ঠা-ভূষায় ভূষিত করত বৈষ্ণবধর্মের বিরোধী মত-নিচয়কে বৈষ্ণবধর্মের নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই সমুদয় অভাবনীয় অবস্থার দর্শনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। আমরা দীর্ঘ ভাবান্তরের কারণ গাঢ়রূপে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সহসা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের এই শ্লোকটি আমাদের হৃদয়ে স্মৃতি লাভ করিল—

‘কালঃ কলিবর্কলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ

শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিক্রুদ্বঃ।

হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং কবোমি

চৈতন্যচন্দ্র যদি নাশ্য কৃপাং করোষি ॥

কাল হৈল কলি, বলী ইন্দ্রিয়নিচয়।

ভক্তিপথ এবে কোটি কণ্টকাদিময় ॥

কোথা যাব, কি করিব, হ’য়োছ বিকল।

না পাইলে গৌরচন্দ্র তব কৃপা-বল ॥’

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর পর্যন্ত গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। তখন প্রভুর অন্বেষণে দেশত্যাগী হইয়া প্রভুর অপ্রকট-স্থান শ্রীক্ষেত্রে স্বর্ণ-বালুকার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। প্রভু হৃদয়ে জানাইলেন—

‘অয়ি সজ্জনতোষণি ! তুমি শান্তি লাভ কর। এই সংসারে জীবগণ জন্মজন্মান্তরীণ স্ব-স্ব কর্মানুরূপ যে স্বভাব লাভ করে, তাহারই বশবর্তী

হইয়া পুনরায় কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সল্পদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কৰ্ম্মপথ হইতেই প্রত্যাবর্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যতই ভক্তি-ধৰ্ম্ম প্রচার করিবে, যতই ভক্তিকথা আলোচনা করিবে, তাহা তাহাদিগের নিজ-কৰ্ম্মদোষে কোন সফল প্রদান করিতে পারিবে না ; স্মতরাং তোমাদিগের বক্তৃতা-আলোচনায় কিছুই ফল হইবে না। তোমাদের প্রতি আমার আজ্ঞা এই যে, আমি আমার প্রিয় হরিদাসকে যেখানে রাখিয়া উচ্চকীর্তন করিয়াছি, তথায় অবস্থান করত দুর্গতজীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অনুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্তন কর। সেই নাম-মহিমা শ্রবণে তাহাদের যে স্মৃতি সমুদিত হইবে, নামের মাহাত্ম্যে যে বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে জন্ম-জন্মান্তরে, তৎকৃপাক্রমে তাহাদিগের শুদ্ধভক্তি-ধৰ্ম্মে নিম্পট শ্রদ্ধা হইবে।’ হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই সকল উপদেশ অবলম্বন করিয়া আমরা তখন উত্তালতরঙ্গমালা-পরিসেবিত বেলাভূমে ভজন-কুটির বাঁধিলাম।”

—‘নববর্ষ আৰ্ত্তি-নিবেদন,’ সং: তো: ১৫।১

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কৃষ্ণই পরব্রহ্ম

সাকার সর্বিশেষ পরব্রহ্ম সনাতন।

গোলোক-বিহারী হরি,—শ্রীনন্দনন্দন ॥

নিত্য দ্বিভুজ শ্যাম, মুরলী বদন।

সচ্চিদানন্দময় গোপীপ্রাণধন ॥

সর্বরস-সার কৃষ্ণ, প্রেমের আকর।

তঁহার প্রসাদে হয় ভবসিন্ধু পার ॥

বাসুদেব আদি করি যত বিষ্ণুগণ।

সকলের মূল হন দেব সঙ্কর্ষণ ॥

স্বয়ং ভগবান, কৃষ্ণ সর্বদেবদেব।

যাঁর পদসেবা করে ব্রহ্মা আদি দেব ॥

“একমাত্র প্রভু কৃষ্ণ আর সব ভূতা।

যারে যৈছে নাচায়, তৈছে করে নৃত্য ॥”

বৃক্ষমূলে জল কেহ করিলে সিঞ্চন ।
 পত্র-পুষ্প-ফল-শাখা সবার তোষণ ॥
 সেরূপ কৃষ্ণের পূজায় সৰ্বদেব তোষ ।
 তাঁদের স্বতন্ত্র পূজায় তাঁহাদেরই রোষ ॥
 পৃথিবীতে আছে যত দেবদেবীগণ ।
 কৃষ্ণের নির্মাল্য সবে বাঞ্ছে সৰ্বক্ষণ ॥
 বিষ্ণু-পাদোদক গঙ্গা,—হর শিরে ধরি' ।
 প্রেমানন্দে 'হরি', 'হরি', বলে ত্রিপুরারি ॥
 সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি ভূভার হরণ ।
 বিষ্ণুদ্বারা সৰ্ব্বকার্য্য হয় সজ্জটন ॥
 যুগধৰ্ম্ম প্রবর্তন হয় কৃষ্ণ হৈতে ।
 কৃষ্ণ ভিন্ন অন্তে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥
 ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ভেদে ভক্তিসংজ্ঞা দুই ।
 মাধুর্য্যেতে ঐশ্বর্য্যের গন্ধমাত্র নাই ॥
 মাধুর্য্যময় বিগ্রহ শ্রীনন্দ-নন্দন ।
 ঐশ্বর্য্যের আশ্রয় হন প্রভু নারায়ণ ॥
 কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ হন বলরাম ।
 তাঁহার বিলাস মূর্ত্তি সেই নারায়ণ ॥
 'জীব', 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা', পুরুষ অভিধান ।
 সৰ্ব্বোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম নাম ॥
 লীলাময় বিগ্রহ হরি, পরম মহান্ ।
 কেহ নাহি জানে তাঁর লীলা অভিযান ॥
 কৃষ্ণের প্রসাদ লভি' কোন ভাগ্যবান ।
 বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁহার পান দরশন ॥
 শ্রীনন্দ-নন্দন কৃষ্ণ চিন্ময় পরতত্ত্ব ।
 বেদ পুরাণ শাস্ত্রাদিতে আছে হয় ব্যক্ত ॥
 অতএব বুধজনে লইয়া শরণ ।
 এ ভব তরিয়া করে গোলোকে গমন ॥
 রমাপতি দাসে মাগে কৃষ্ণের প্রসাদ ।
 অবিদ্যা-তিমির যেন হয় অবসাদ ॥

—পণ্ডিত শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

(আসাম)

সন্দভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দভ-২৭)

আমি যদি এখন প্রকটরূপে ব্রজে যাই, তবে জরাসন্ধাদি মনে করিবে যে ব্রজে আমার প্রীতি অক্ষুণ্ণ আছে। তাহা হইলে আমার অনিষ্ট সাধনার্থ ব্রজে অত্যাচার করিবে। আমার বাহ্যিক ঔদাসীন্ধ্য দেখিয়া তাহারা মনে করিতেছে যে আমার এখন আর ব্রজবাসিদের প্রতি সহানুভূতি নাই। সুতরাং তাহারা ব্রজে অত্যাচার করিতেছে না। আমি তাহাতে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইব না। বিরোধীজনগণকে প্রতারণিত করার জ্ঞানই আমি এখন ব্রজে আসিতেছি না।

এসকল বিচারের পর নিত্যসংযোগময়ী স্থিতি সিদ্ধান্ত করিতেছেন—

ময়ি ভক্তি হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১০।৮২।৪৪)

আমার প্রতি যে ভক্তি, তাহা দ্বারা নিখিল প্রাণী অমৃতত্ব (বৈকুণ্ঠ গতি) লাভ করিতে পারে। আমার প্রতি আপনাদের স্নেহ আমার প্রাপ্তি-সাধক। সুতরাং বৃন্দাবনে নিত্যলীলা বিद्यমান। সেই লীলায় তোমাদেরও অবস্থিতি আছে। আমি ব্রজাগমন বিষয়ে যে বারম্বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে তোমাদের প্রেমযন্ত্রিত হইয়া যত্নপূরী হইতে সক্ষম তোমাদিগকে সতত দর্শন দান করিব।

আমার প্রেমের উপর কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। আমি যেখানেই থাকি না কেন, তোমাদের স্নেহ বলাৎকারে আমাকে তোমাদের সান্নিধ্য-প্রাপ্তি করাইয়া থাকে। আমি তোমাদের নিকট যাই এবং প্রেমানুরূপ বিচিত্র বিহার করিয়া থাকি। কিন্তু তোমরা তাহা স্মৃতি মনে কর।

উদ্ধব দ্বারা অপ্রকট লীলায় নিত্য ব্রজে স্থিতি সংবাদ প্রেরণ করিয়াছি। তোমাদিগকে অধ্যাত্ম-শিক্ষা দেওয়া হয় নাই; কারণ বিরহানলে দগ্ধ চিত্তে অধ্যাত্মশিক্ষা দ্বারা বিরহ-সন্তাপ প্রশমিত হইতে পারে না। সাধারণ-ভক্তের নিকটও তাহা তুচ্ছ। ব্রজরামাগণের নিকট তাহা নিতান্ত রসবিরোধী।

উদ্ধব তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—

শ্রয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ ।

যমাদায়াগতো ভদ্রা অহং ভর্তু রহস্করঃ ॥ (শ্রীভাঃ ১০।৪৭।২৮)

হে ভদ্রাগণ, তোমাদের প্রিয় সংবাদ শ্রবণ কর। তাহা তোমাদের অতি সুখকর। আমি তোমাদের ভর্তা শ্রীকৃষ্ণের নির্জন কার্য্য-সম্পাদক। সুতরাং উদ্ধবদ্বারে সংবাদ প্রেরণ অপ্রকটলীলায় নিত্যস্থিতির সংবাদ-জ্ঞাপক। ইহা বিহ্বরের যুধিষ্ঠিরের নিকট জতুগৃহদাহবার্তা প্রেরণের মত। কেবল যুধিষ্ঠির মহারাজই তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এখানে ব্রজসুন্দরীগণও এই সংবাদের মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রিয়-তমের সেই আদেশ শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের স্মৃতি আগত হইয়াছিল। তাঁহারা উদ্ধবকে পূজা করিয়া বলিয়াছিলেন—

অপ্যেষ্যতীহ দাশার্হন্তপ্তাঃ স্বকৃতয়া শুচা ।

সঞ্জীবয়ন্ নু নো গাত্রৈর্যথেন্দ্রো বনমম্বুদৈঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১০।৪৭।৪৪)

শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত আমরা শোকসন্তপ্ত। ইন্দ্র যেমন বারিবর্ষণদ্বারা নিদাঘতপ্ত বনকে সঞ্জীবিত করে তদ্রূপ তিনি নিজ কর-স্পর্শাদি দ্বারা আমাদের সঞ্জীবিত করার জন্ত কি আসিবেন না? এই উক্তি অপ্রকটাবস্থায় মিলিতরূপে অবস্থান অনুভূত হওয়ায় তাঁহাদের চিত্তে সন্তোষ জন্মিয়াছিল।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রকট প্রকাশে যে-সকল বস্তু দৃষ্ট হয়, সে-সকল অপ্রকট প্রকাশগত লীলা হইতে পৃথক্ নহে। ব্রজগোপীগণও প্রকটাপ্রকট উভয় প্রকাশে বিরাজ করিলেও তাঁহাদের আত্মা দুইটি নহে। শ্রীবৃন্দাবনের উভয় প্রকাশ এবং গোপীগণের উভয় স্থানাগত প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াই আছে। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ত্ব আর গোপীগণ আশ্রিত তত্ত্ব। আশ্রিত-তত্ত্ব ছাড়া আশ্রয়-তত্ত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং উভয়ের বিচ্ছেদ সম্ভব নহে। তাহারা নিত্যলীলারূপ রহস্তার্থ স্বীকার করিলেও পূর্ব্বের ঞ্চায় প্রকটলীলাগত অভিনিবেশহেতু বিচ্ছেদভয় পাইয়া দৈন্তপ্রকাশের সহিত প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

আহস্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং

যোগৈশ্বরৈহৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।

সংসার-কুপপতিতান্তরণাবলম্বঃ

গেহং জুষামপি মনস্বাদিয়াং সদা নঃ ॥ (শ্রীভাঃ ১০।৮২।৪৮)

হে পদ্মনাভ, অগাধজ্ঞানসম্পন্ন যোগেশ্বরগণ কর্তৃক হৃদয়ে চিস্তনীয়, সংসার-কুপে পতিত জনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন তোমার শ্রীচরণকমল গৃহ-সেবিনী আমাদের মনে সর্বদা আবির্ভূত থাকুন।

নিষ্ঠুর বিধাতার কোপে আমাদের সর্বনাশ ঘটয়াছে। তোমার দর্শন, দর্শনবার্তা দূরে থাকুক, আমরা তাহার আশা করি না, কিন্তু তোমার উপদেশ অনুসারে তোমার চরণকমল আমাদের মনে উদিত হউক। চরণকে যে কমলরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহার হেতু—চরণস্পর্শেই বিরহতাপ প্রশমিত হয়; স্মরণ দ্বারা হয় না। যাহারা সংসার-কুপে পতিত, তোমার চরণ-চিন্তা দ্বারা তাহারা সংসার-কুপ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, কিন্তু বিচ্ছেদ-দুঃখ-প্রশমন তদ্বারা হইতে পারে না। কুপে পতিত ব্যক্তি সামান্য রজ্জু অবলম্বনে উঠিতে পারে, কিন্তু সমুদ্রে পতিত জীবের উদ্ধার-জন্ত অর্ণবপোত প্রয়োজন।

যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তাহা হইলে তোমরা এখানে আসিয়া আমার সাক্ষাৎ কর না কেন? তদন্তরে বলিতেছেন, আমরা গৃহসেবিনী—পর-গৃহিনী; অস্বাধীনা আমাদের সেরূপ আসার ক্ষমতা নাই।

গৃহসেবিনী-পদের অর্থ দেখাইতেছেন—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-

স্তে চোন্মীলিতমালতীস্বরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্ব-নিলাঃ ।

স। চৈবান্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ

রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠাতে ॥

(কাব্যপ্রকাশ)

কোন নায়িকা নিজ সম্পর্কে বলিতেছে—যিনি কৌমারহর অর্থাৎ আমার পতি, তিনি আমার অভিমত বর। সেই চৈত্ররজনী,—মধুযামিনী, সেই মালতী কুসুমের গন্ধবাহী কদম্ববায়ু, আর সেই আমি। তথাপি আমার চিন্তা সুরতলীলাব্যাপার-বিষয়ে রেবাতীরবর্তী বেতসীতরুতলে সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে।

গোপীগণেরও উক্তি—তোমার সঙ্গ, তোমার পূর্বসঙ্গম-বিলাসধাম শ্রীবৃন্দাবনই আমাদের অতীষ্টপূরণকারী। অতএব গোকুলেই তোমার সঙ্গ-

লাভ ছাড়া সে বাসনা পূর্ণ হইবে না। প্রকটাপ্রকট উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা গোপীগণের, গোপগণের ও সকল প্রাণীর অন্তশ্চরী এবং অধ্যক্ষ এই কথা জানাইবার জন্ত শুকদেব বলিলেন—

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামিহ দেহিনাম্ ।

যোহন্তশ্চরতি সৌহৃদ্যক্ষঃ ক্রীড়নে নেহ দেহতাক্ ॥

(শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩৫)

সুতরাং অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণসহ নিরন্তর ক্রীড়াশীল ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তভূদেব শ্রোতী মহারাজ

সনাতনের বন্ধন-মোচন

(নাটিকা)

প্রথম অঙ্ক

২য় দৃশ্য—নগর পথ

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৩ পৃষ্ঠার পর)

১ম ও ২য় নাগরিকের প্রবেশ । ১ম নাগরিক মুসলমান ধর্মাবলম্বী ও

২য় নাগরিক হিন্দু ধর্মাবলম্বী ।

১ম নাঃ—শুনেছো ভায়া, একজন হাঁছ সন্ন্যাসী এসেছে। সঙ্গে তার এক লাথেরও বেশী লোকজন ।

২য় নাঃ—আমিও তাই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি রে ভায়া। সন্ন্যাসী মানুষের যে অত লোকজন থাকে, তা' এই শুন্ছি ।

১ম নাঃ—একবার দেখে এসো না ভায়া, কি রকম দণ্ডিসন্ন্যাসী !

২য় নাঃ—তুমি দেখেছো নাকি ?

১ম নাঃ—আরে—না—না। তুমি পাগল হয়েছেো ? আমরা কখনো হিঁছ সন্ন্যাসী দেখতে যাই ?

২য় নাঃ—আমিও ভাই হিঁছ হ'লে কি হবে, সন্ন্যাসীর রীতিনীতি আমার মোটে ভাল লাগে না ।

১ম নাঃ—কেন ? তুমি হিঁছ হয়ে হিঁছ সন্ন্যাসী দেখতে ভালবাস না ?

২য় নাঃ—সন্ন্যাসী দেখতে আর কে না ভালবাসে ? এ সন্ন্যাসী আবার নাচ-গান আরম্ভ করেছে, ভগবানের নাম করে ধেই ধেই করে নাচে, আবার কখনো হাসে, কখনো কাঁদে—ভেঙ্কি দেখে বাঁচি না !

১ম নাঃ—তবেই বোঝ ! তোমরা হিঁচু হয়েও ও কথা বলছ। আর আমরা তো ইসলাম—বলবই।

২য় নাঃ—সন্ন্যাসী সদাই ভস্ম মেখে থাকবে, মাথায় মস্ত বড় জটা থাকবে ; তবেই তো তা'কে লোকে ভক্তি করবে, তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে।

১ম নাঃ—হেঃ-হেঃ-হেঃ, তাই বল—তাই বল ; এটা ভণ্ড কেমন ?

২য় নাঃ—আরে ভণ্ড তো বটেই ! তারপর আবার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোকজন নিয়ে ঘুরছে। না জানি কোন ফাঁকে বাদশাহের রাজ্য আক্রমণ করে বসে।

১ম নাঃ—তা' যা বলছো, ও সন্ন্যাসী সব পারে। ওকে বিশ্বাস নেই। হয়ত এ রাজ্য আক্রমণ করবার জন্তই এই সব ঘট।

২য় নাঃ—তবে ভাই এ খবরটা বাদশাহর কানে তুললে হয় না ?

১ম নাঃ—আল্‌বৎ তুলতে হবে। শত্রুকে প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই ভাল নয় !
[নেপথ্যে :—এক জন পাইক ঢাক বাজাইয়া ঘোষণা করিতেছে—
‘বাদশাহর হুকুম ঐ হিঁচু সন্ন্যাসীর প্রতি কোন প্রজা অত্যাচার করতে ও তাঁকে বিরক্ত করতে পারবে না। তিনি খুশীমত তাঁর ধর্মমত প্রচার করবেন। যে ব্যক্তি বাদশাহর এ আদেশ অমান্য করে সন্ন্যাসীর প্রতি অত্যাচার করতে ধাবিত হবে তার কঠিন দণ্ড হবে।’]

২য় নাঃ—আরে ভাই শুনলি, ঢাক বাজিয়ে কি ঘোষণা হচ্ছে ?

১ম নাঃ—এই যাঃ,—সন্ন্যাসীর খবর তা'হলে বাদশাহর কানে পৌঁছে গেছে দেখছি। কিন্তু হা আল্লা, বাদশাহর এ কি হ'ল ? সন্ন্যাসীর প্রতি অত্যাচার করতে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে !

২য় নাঃ—হায়, হায়,—কি হলো ! (মাথায় হাত দিয়া বদিয়া পড়িল)
[ইত্যবসরে পাইকের ঢাক-হস্তে প্রবেশ]।

১ম নাঃ—(পাইকের প্রতি) আচ্ছা পেয়াদা বাবা, বাদশাহর এ মতিগতি কবে থেকে হ'লো ?

পাইক—কি বলতে চাও, পরিষ্কার করে বলো—তবে তো।

২য় নাঃ—(ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইয়া) হ্যাঁ বাবা পেয়াদা, কিসের লাগি ঢাক বাজাচ্ছে গো ?

পাইক—বাদশার আদেশ—তোমরা কেউ হিঁচু সন্ন্যাসীর প্রতি অত্যাচার করতে যেয়ো না, গেলে বিপদ হবে।

১ম নাঃ—তাইতো গো, তা হ'লে কি দেশ কাফেরে ভরে যাবে বলতে চাও?

পাইক—তা' ভাই আমি কি করব? পেটের দায়ে চাকরী করছি, হাকিমের হুকুম তো মানতে হবে।

২য় নাঃ—তা' বেশ, তা' বেশ! তুমি আর কি করবে বল? তবে ঢাক বাজাও, আর কি?

পাইক—এখানে আর বাজাবো না। ঐ সাধারণের বারোয়ারীতলায় গিয়ে একেবারে বাজাবো।

১ম নাঃ—তাই চল। ওখানকার লোকের হাবভাব দেখি গে। এসো এসো ভাই ২য় নাগরিক। (সকলের প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য—

প্রধানমন্ত্রী সনাতনের বাটীর সন্মুখস্থ উদ্যান

প্রধান মন্ত্রীর প্রবেশ।

সনাতন—(খুব চিন্তিত-হৃদয়ে আপন মনে) আহা কোথা প্রভু, ওগো প্রাণনাথ, তুমি এবার ধরণীর ভার হরণ করতে আস নি, এসেছো গোলোকের অমৃত ভাণ্ড নিয়ে। যত পাপীতাপীর উদ্ধার লাগি' তোমার অমৃত মধুর নাম বিলাতে এলে। তুমি না জানালে কে জানবে তোমায়? তাই কলিহত জীবকে তার উদ্ধারের উপায় জানালে—হরিনাম মহামন্ত্র। রাধার অন্তর-বেদনা এবার নিজে কৃষ্ণ-বিরহী হয়ে তা' উপভোগ করছো ও জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছ। লীলাময়,—ধন্য, ধন্য, তোমার অচিন্ত্য-লীলা !!

[জর্নৈক গায়কের প্রবেশ]

গীত

গায়ক —

“জীবন সমাপ্তিকালে করিব ভজন,

এবে করি গৃহ-সুখ।

কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞ-জন,

এ দেহ পতনোন্মুখ ॥

আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,

নিশ্চিত না থাক ভাই ।

যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ,

জীবনের ঠিক নাই ॥

সংসার নির্বাহ করি' যাব আমি বৃন্দাবন,

ঋগত্রয় শোধিবারে করিতেছি স্মৃতন ॥

এ আশায় নাহি প্রয়োজন ।

এমন ছুরাশী-বশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,

না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন ॥

যদি স্মৃঙ্গল চাও সদা কৃষ্ণনাম গাও ।

গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ ॥”

সনাতন— বাঃ সুন্দর,—সুন্দর !

[কেশব ছত্রীর প্রবেশ]

ছত্রী—মন্ত্রী মশাই !

সনাতন—কে ?

ছত্রী—আজ্ঞে আমি ছত্রী ।

সনাতন—(সিংহাসনে উপবেশন পূর্বক) ভিতরে এস । কি খবর ?

ছত্রী—(সেলামপূর্বক) আজ্ঞে, আপনাকে শ্রীকৃষ্ণপাদ এই পত্রখানি পাঠিয়েছেন ।

[সনাতনকে পত্র প্রদান ও সনাতন তাহা গ্রহণপূর্বক পাঠ করিলেন । পাঠকালে তাঁহার ছু'চোখ হইতে ঝরঝর ধারায় জল ঝরিতে লাগিল । পত্রখানি নিম্নরূপ :—]

বৃন্দাবন ধাম

পরম পূজনীয় শ্রীচরণেষু—

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণে দণ্ডবদ্রুতি পূর্বকেষু—

দাদা,

যছুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী

রঘুপতেঃ ক গতান্তরকোশলা ।

ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃস্থিরম্

ন সদিদং জগদিত্যবধারণ ॥

[অর্থাৎ যত্নপতির বিশাল মথুরাপুরী কোথায়, যত্নপতির উত্তর-কোশলও বা আজ কোথায় ? এই সকল চিন্তা করিয়া শীঘ্র মনস্থির করুন । এই জগতের কোনও বস্তু সং বা নিত্য নহে]

“তুর্গং যতেত ন পতেদনুয্যুত্যা যাবৎ, নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্রাৎ”—দাদা, এই শাস্ত্রবাণী স্মরণ করে আপনিও চলে আসুন । আপনি তো জানেন—“ধন-জীবন-যৌবন-রাজ্যসুখং ন হি নিত্যমনুক্ষণ নাশপরম্ ।”

বৈষ্ণব-দাসানুদাস—

—শ্রীকৃপ

সনাতন—(কাঁদিতে কাঁদিতে) সত্যই তাই । ছত্ৰী, ছত্ৰী,—‘ধন-জীবন-যৌবন-রাজ্য সুখং নহি নিত্যমনুক্ষণ-নাশপরম্ ।’ শ্রীকৃপ, তুই গেলি, তা’ আমায় নিয়ে গেলি না ! আমি কি এতই নরাধম, পাষণ্ড, তোর করুণা পাব না । ওরে মুক্তভূমিতে বিচরণকারী একটা পিপীলিকা সে যত ক্ষুদ্রই হোক সে মুক্ত, সে আমাদের সকলের নমস্ত । আহা, সেই গোলোকবিহারী হরির আশ্রয়ে ধারা আশ্রিত, তাঁরা বড় ভাগ্যবান ! আমি অধমাদম কীটানু-কীট । ছত্ৰী,—ছত্ৰী, তুমিও আমার নমস্ত !

ছত্ৰী—এ কি বলছেন মন্ত্রীমশাই ? আপনার মাথা বিগড়ে গেল নাকি ?

(চোখে জল আসিল ।)

সনাতন—তাই বল্,—তাই আশীর্বাদ করছে ছত্ৰী, আমার মাথা যেন বিগড়েই যায় । আমি যেন অচিরেই সেই গৌরসুন্দরের চরণ-কমলে আশ্রয় নিতে পারি । তুই তবু তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখেছিস্ । ওরে তোর জন্ম সার্থক, ওরে তোর বহু স্মৃতি ছিল তাই সাক্ষাৎ শ্রীহরির দর্শন পেয়েছিস্ । আয়, আয়—বুকে আয়, তোকে বুকে নিয়ে আমার অন্তরকে একটু পবিত্র করি !

(ছত্ৰীকে বক্ষে আলিঙ্গন ও উভয়ে ক্রন্দন)

ছত্ৰী—(নিজ চোখের জল মুছিতে মুছিতে) কাঁদবেন না মন্ত্রী মশাই ! তিনি তো বৃন্দাবনে রয়েছেন, খবর পাওয়া গেছে । তা’ সেখানে গেলেই হবে ।

সনাতন—বৃন্দাবন !

“সর্ব ত্যজি’ জীবের কর্তব্য কাঁহা বাস ?

বৃন্দাবন-ভূমি যাঁহা নিত্যলীলা রাস ॥”

(কাঁদিতে কাঁদিতে) সেই বৃন্দাবন থেকেই শ্রীকৃষ্ণপাদ আমায় পত্রে আহ্বান জানিয়েছেন। হরি-গুরু-বৈষ্ণব, আমায় কৃপা করুন ! এ মায়ার কারাগার থেকে আমায় উদ্ধার করুন !

(হাত উত্তোলন করতঃ প্রণাম)

ছত্ৰী, তুমি আমাকে সেদিন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের যে রূপের বর্ণনা দিয়েছো, তা’ আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না— ভুলতে পারি না। ঐ দেখ, আমার মানসে নিয়ত সেই মনোমুগ্ধকর রূপ প্রতিভাত হচ্ছে। নরম তুলতুলে স্নদীর্ঘ হাত দু’টি নিয়ে আমায় আয় আয় বলে ডাকছে ! ঐ দেখ, চোখে মুখে আমায় কত ইসারা করছে, বলছে—

“এ ধন-যৌবন-পুত্র-পরিজন

ইথে কি আছে পরতীতি রে।

কমলদল-জল জীবন টলমল

ভজহু’ হরিপদ নিতি রে ॥”

যাব, যাব—আমি যাব। প্রভুজী তোমার ডাকে কে না সাড়া দেবে ? তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার নিত্যদাস। প্রভু— প্রভু—। (প্রস্থান)

ছত্ৰী—তাইতো, প্রধান মন্ত্রীর একি অবস্থা হ’লো। আমার সেদিন বলাটাই তা’ হ’লে কি ভুল হ’লো ? এমন মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণপাদের মত রাজ্য ছেড়ে চলে গেলে এ রাজ্য কে চালাবে ? তা হ’লে উপায় ? না, এ খবর বাদশাকে জানিয়ে আর কাজ নেই। বাদশাকে জানালে হয়ত তিনি আর মন্ত্রীকে ছাড়বেন না। মন্ত্রীমশায় যেতে না পেয়ে ছুঁখে গুম্বে গুম্বে কেঁদে কেঁদে মরবেন। না, মন্ত্রীমশায়ের সেরূপ দশা আমি দেখতে পারবো না। তা’তে উনি যদি আমাদের ছেড়ে চলেও যান তবু শান্তি ! যা’তে উনি মনেপ্রাণে শান্তি পান, তাই করুন। আমি মায়িক জীব। আমার প্রাণ তেমন তো কাঁদে না।

যদিও একবার সে কথা মনে হলে মনটা কেঁদে ওঠে, তবু পরক্ষণে যেন আবার ভুলে যাই। এসব কৰ্ম্মের দোষ! হায় রে ভাগ্য, মন্ত্রীজী আবার আমাকে ভাগ্যবান বল্লেন। কি জানি, ওঁর মত জ্ঞানী গুণী যা' বলেন আমি তার কী সমালোচনা করব? হয়ত মাথা বিগ্ড়ে যাওয়ায় এরূপ বলেছেন। যাই হোক, জয় ভগবান!—যা' মঙ্গল হয় তাই কর।

[জনৈক গায়কের প্রবেশ।]

গীত

পরনিন্দা পরচর্চা না কর কখন।
দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌর-চরণ।
গৌর যে শিখা'ল নাম, সেই নাম গাও।
অন্ত সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও ॥
গৌর বিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে।
সরল গৌরাঙ্গ-ভক্তি শিখাও সবারে ॥

ছত্ৰী—চমৎকার! চমৎকার! (গায়কের সহিত গাহিতে লাগিল)

পরনিন্দা পরচর্চা না কর কখন।
দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌর-চরণ ॥
গৌর যে শিখা'ল নাম, সেই নাম গাও।
অন্ত সব নাম মাহাত্ম্য সেই নামে পাও ॥
গৌর বিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে।
সরল গৌরাঙ্গ-ভক্তি শিখাও সবারে ॥

(গান গাহিতে গাহিতে উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য—রাজপ্রাসাদ

বাদশা হোসেন শা ও কেশব ছত্ৰীর প্রবেশ।

বাদশা—(সিংহাসনে উপবেশনপূর্বক) ছত্ৰী, আজ ক'দিন হ'ল সাকর-মল্লিকের দেখা নাই। রাজকার্য্যে অনেক শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। তা'র কি ব্যাপার বল তো? কোন অঘটন ঘটল নাকি? নইলে রাজ দরবারে আসবে না-ই বা কেন?

ছত্রী—কি জানি হুজুর ! হয়ত শরীর ভাল নেই— এমনও তো হ'তে পারে !

বাদশা—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া চিন্তাভারাক্রান্ত

হৃদয়ে পায়চারী করিতে করিতে) হ্যাঁ, কি বল্লে ছত্রী ?

ছত্রী—বল্ছি, হুজুর ! হয়ত মন্ত্রী মহাশয়ের দেহ খারাপও থাকতে পারে ।

বাদশা—তা' কথাটা বেশ বলেছো । আচ্ছা, বৈদ্যকে ডাক তো ?

(ছত্রী বাদশাকে সেলামপূর্বক প্রস্থান)

বাদশা—সেই সন্ন্যাসীর নাম শোনা অবধি সাকরমল্লিকের কাজকর্ম শৈথিল্য দেখা দিচ্ছে । মন যেন তার উড়ে উড়ে । সে কি

দবিরখাসের মত আমায় ছেড়ে চলে গেল ? কি জানি,—

হা আল্লা, সাকরমল্লিককে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না ।

সে আমার রাজ্যের পরিচালক ও রাজসভার শোভা-স্বরূপ ।

(বাহিরের দিকে লক্ষ্য করিয়া) কই, ছত্রী তো এখনও বৈদ্যকে

নিয়ে এলো না ? কত দেরী হচ্ছে ? সনাতনের খবর নিয়ে

পরে প্রয়োজন হ'লে বৈদ্যকে পাঠালেও হয় । না—না,

তা'তে ক্রমশঃ আরো দেরী হয়ে যাবে । বৈদ্য এলেই তাকে

পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে ।

(ইত্যবসরে ছত্রী ও বৈদ্য প্রবেশ করিয়া বাদশাকে সেলাম করিল ।)

ছত্রী—জাঁহাপনা, বৈদ্য এসেছেন ।

বৈদ্য—কি আদেশ জাঁহাপনা ?

বাদশা—(সিংহাসনে উপবেশনপূর্বক) বৈদ্য, আপনাকে এখনই প্রধানমন্ত্রী

সাকরমল্লিকের বাড়ী যেতে হবে । তার শরীর খুব অসুস্থ

বলেই মনে হয় । যাই হোক, তার দেহ ভাল করে পরীক্ষা

নিরীক্ষা করে যা'তে সে শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করে তার

সুবন্দোবস্ত করতে হবে ।

বৈদ্য—(সেলাম পূর্বক) জি আজ্ঞে, জাঁহাপনা ! (প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

গোপালচম্পু

বৈষ্ণবজগতে “গোপালচম্পু” একখানা অপূৰ্ণ গ্রন্থ। ইহা আয়তনে যে-প্রকার বিস্তৃত সে-প্রকার ইহার বিচার-গাভীৰ্য্যও অত্যন্ত গভীর। ভারত-বর্ষে ৪টি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং এই মৌলিক চারিটি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিশিষ্ট ৪টি শাখাও পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহারাও স্ব-স্ব সম্প্রদায়কে মৌলিক সম্প্রদায়গুলির একটীর অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন; যথা—রামানুজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ‘রামানন্দী’ সম্প্রদায়, মধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ‘গৌড়ীয়’ সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ‘বল্লভ’-সম্প্রদায় ও নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ‘নিম্বার্ক’ বা ‘রাধাবল্লভী’ সম্প্রদায় অঙ্গদেশে সম্প্রতি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং মূল ৪টি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত উক্ত আরও ৪টি সম্প্রদায়কে পৃথক্ করিয়া ধরিলে ৮টি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রবল প্রতাপের সহিত স্বাৰ্ত্ত, অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত বা তাহাদের হেয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া সমগ্র বিশ্বে অত্যন্ত প্রসারলাভ করিয়াছেন। ইহাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে “গোপালচম্পুঃ”-গ্রন্থখানি শাস্ত্র-সম্রাটের ত্রায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। “গোপালচম্পুঃ” একাধারে কাব্য, দর্শন, স্মৃতি ব্যাকরণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের সার ও শীর্ষ-স্বরূপ। এই গ্রন্থরাজ-সম্বন্ধে ভারতীয় অধিকাংশ পণ্ডিত সমাজকেই উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মৌলিক কারণ, ভাষার গাভীৰ্য্য, দার্শনিক চিন্তার কাঠিন্য, বৈয়াকরণিক শব্দ বিজ্ঞানের কোটিল্য, এবং নৈয়ায়িকের শব্দ-জাটিল্য। বেদান্ত, ত্রায়, দর্শন, কাব্য ও ব্যাকরণে অধিক জ্ঞান না থাকিলে অথবা ঐ সমস্ত শাস্ত্রের সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকিলে ‘গোপালচম্পুঃ’ আলোচনা করিতে সাধারণ লোক অক্ষম।

“গোপালচম্পুঃ” আখ্যার দ্বারা ইহাই বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণের অস্থ নাম গোপাল; তাঁহারই লীলাবলম্বনপূর্বক চম্পু অর্থাৎ গল্প ও পद्यে রচিত কাব্য-দর্শন শাস্ত্র। গ্রন্থকর্তা শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যাবতীয় বিরুদ্ধ চিন্তাপ্রোতের স্তসামঞ্জস্য-পূর্বক এইরূপ এক অপূৰ্ণ, অতুলনীয় সঙ্গতি-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা রাধাকৃষ্ণোপাসক সকল বৈষ্ণবগণেরই একান্ত পাঠ্য।

দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রীমাদ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এই অত্যন্তুত, অপূর্ণ বিশাল গ্রন্থখানি আজকাল বহু অনুদান করিয়াও পাওয়া যাইতেছে না। আমরা অতিকষ্টে ৪০৫ গৌরাদে রামনারায়ণ বিহারত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত অসম্পূর্ণ একখণ্ড ‘গোপালচম্পূঃ’, দ্বিতীয়তঃ, তড়াসের জমিদার বনমালী রায়বাহাদুরের অর্থসাহায্যে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ১৯৬১ বিক্রম সম্বৎ-এ (বর্তমানে ২০২১ বিক্রমসম্বৎ) প্রকাশিত নাগরী অক্ষরে একখানা ‘গোপালচম্পূঃ’ এবং তৃতীয়তঃ, ৪২৬ চৈতন্যাদে প্রকাশিত রাসবিহারী সাংখ্যাতীর্থ মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ সহ একটি বিরাট সংস্করণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। এই সংস্করণত্রয়ের কোন সংস্করণেই ইহার স্থচীপত্র বা কোন পরিচয়মূলক ভূমিকা প্রভৃতি কিছুই মুদ্রিত নাই। তবে কাহারও মতে এই গ্রন্থখানি ২৭০০০ শ্লোকে বা নিবন্ধে সমাপ্ত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধেও প্রকাশিত উক্ত তিনখানি সংস্করণেই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহার গল্প সংখ্যা ও পদ সংখ্যা এমনভাবে নির্দেশ করিয়াছেন যাহার মধ্যে ৮১০০টি সংখ্যাও সঙ্কুচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির পূর্বচম্পূতে ৩৩টি পূরণ (অধ্যায়) এবং উত্তরচম্পূতে ৩৭টি পূরণ (অধ্যায়) পরিদৃষ্ট হয়। আমরা সর্বসাধারণের সুবিধার জন্ত ইহার একটি সংক্ষিপ্ত স্থচীপত্র প্রকাশ করিতেছি। পাঠকগণের এই গ্রন্থখানি থাকিলে তাঁহাণও এই স্থচীপত্রের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন। এই “স্থচী” শেষোক্ত সংস্করণ, রাসবিহারী সাংখ্যাতীর্থ মহাশয়ের বঙ্গভাষায় অনূদিত ‘গোপালচম্পূঃ’ অবলম্বনে প্রদর্শিত হইবে।

স্থচীপত্র

পূর্বচম্পূ

বিষয়	পূরণ	পত্রাঙ্ক
গোলোকরূপনিরূপণম্	... ১মপূরণ	... ১-৮৫
শ্রীগোলোকবিলাসঃ	... ২য় ”	... ৮৬-১৬২
শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম	... ৩য় ”	... ১৬৩-২৪৮
শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসবঃ	... ৪র্থ ”	... ২৪৯-২৮২
পূতনাবধঃ	... ৫ম ”	... ২৮৩-৩৩৭
শকটভঞ্জনাদিঃ	... ৬ষ্ঠ ”	... ৩৩৮-৩৯৯
তৃণাবর্তবধ-মৃদুক্ষণাদিকথা	... ৭ম ”	... ৪০০-৪৪৬

দামবন্ধনলীলা	... ৮ম ”	...	৪৪৭-৪৯১
বৃন্দাবন-প্রবেশঃ	... ৯ম ”	...	৪৯২-৫০০
বৎসাসুরাদি বধঃ	... ১০ম ”	...	৫০১-৫৭২
ব্রহ্মবিমোহনম্	... ১১শ ”	...	৫৭৩-৬১৪
গোচারণম্	... ১২শ ”	...	৬১৫-৬৫০
কালিয়দমনম্	... ১৩শ ”	...	৬৫১-৭০৪
গর্দভাসুরবধঃ	... ১৪শ ”	...	৭০৫-৭২৬
পূর্বাসুরাগঃ	... ১৫শ ”	...	৭২৭-৮১৩
প্রলম্ব-দাবানল-সম্বর্ত্ত সংহার	... ১৬শ ”	...	৮১৪-৮৪৫
ধেনুশিক্ষাচ্ছলেন প্রেয়সীভিক্ষা	... ১৭শ ”	...	৮৪৬-৮৯৫
ইন্দ্রমথ-ভঙ্গঃ গোবর্দ্ধন-পূজনঞ্চ	... ১৮শ ”	...	৮৯৬-৯৮৮
ইন্দ্রহস্তস্তনং গবেন্দ্রহপ্রাপ্তিশ্চ	... ১৯শ ”	...	৯৮৯-১০৩৪
নন্দরাজস্ত বরুণলোকগমনম্	... ২০শ ”	...	১০৩৫-১০৬৮
বসুহরণ-কথা	... ২১শ ”	...	১০৬৯-১১৫৪
যজ্ঞপত্ন্যমভিক্ষা	... ২২শ ”	...	১১৫৫-১১৯৫
শ্রীরাসলীলারম্ভ	... ২৩শ ”	...	১১৯৬-১২৬২
রাসেইত্তর্কানে রাধা-সৌভাগ্যম্	... ২৪শ ”	...	১২৬৩-১৩৩১
বিপ্রলভ্যাং কৃষ্ণপ্রাপ্তিঃ	... ২৫শ ”	...	১৩৩২-১৩৬৬
শ্রীরাসবিলাস-বিস্তারঃ	... ২৬শ ”	...	১৩৬৭-১৩৯৮
জলকেলির্বনভ্রমণং রাসসমাপ্তিশ্চ	... ২৭শ ”	...	১৩৯৯-১৪৩৮
অধিকাবন-গমনম্	... ২৮শ ”	...	১৪৩৯-১৪৫৭
নির্জনবিলাসবাহুল্যম্	... ২৯শ ”	...	১৪৫৮-১৫১১
শক্রচূড়বধো নির্লজ্জহোরিকাক্রীড়া	... ৩০শ ”	...	১৫১২-১৫৫৭
নানারাগবিচিত্রচরিত্রম্	... ৩১শ ”	...	১৫৫৮-১৬২৫
কেশিদৈত্যবধঃ	... ৩২শ ”	...	১৬২৬-১৬৪৭
সর্বমনোরথপূরণম্	... ৩৩শ ”	...	১৬৪৮-১৮৫৬

উত্তরচন্দ্র

বিষয়	পূরণ	পত্রাঙ্ক
ব্রজানুরাগসাগর-প্রথমম্	... ১ম ”	১-৫২
অক্রুর-ক্রুরতা-পূরণম্	... ২য় ”	৫৩-১০০
মথুরাপুর-প্রস্থানম্	... ৩য় ”	১০১-১২৮

মথুরাপুর-প্রবেশঃ	... ৪র্থ ,,	...	১২৯-১৮৪
কংসবধ-কথা	... ৫ম ,,	...	১৮৫-২৫৭
নন্দবিসর্জনম্	... ৬ষ্ঠ ,,	...	২৫৮-২৯৯
ব্রজে নন্দপ্রবেশঃ	... ৭ম ,,	...	৩০০-৩১৫
চতুঃষষ্টিবিদ্যাধ্যয়নম্	... ৮ম ,,	...	৩১৬-৩৬০
গুরুতনয় সমানয়নম্	... ৯ম ,,	...	৩৬১-৩৯৫
উদ্ধব-সন্দেশঃ	... ১০ম ,,	...	৩৯৬-৪৪৩
দূত-ভ্রমকর-ভ্রমরসম্ভ্রমঃ	... ১১শ ,,	...	৪৪৪-৫০৭
উদ্ধবস্ত-ব্রজানন্দ-সম্পাদনম্	... ১২শ ,,	...	৫০৮-৫৭৭
জরাসন্ধ-বন্ধনম্	... ১৩শ ,,	...	৫৭৮-৬০৮
কালযবন-জয়-বিবরণ	... ১৪শ ,,	...	৬০৯-৬৭৫
বলদেববিবাহ	... ১৫শ ,,	...	৬৭৬-৬৯৭
রুক্মিণীপাণিপীড়নম্	... ১৬শ ,,	...	৬৯৮-৭৬০
সত্যভামাদি-বিবাহসপ্তকম্	... ১৭শ ,,	...	৭৬১-৮৬৮
নরকবধ-পারিজাতহরণ-ষোড়শ- সহস্র কথ্য বিবাহ	... ১৮শ ,,	...	৮৬৯-৯১৫
বাণযুদ্ধ কথা	... ১৯শ ,,	...	৯১৬-৯৬৭
বলদেবস্ত ব্রজগমনম্	... ২০শ ,,	...	৯৬৮-১০২৬
পৌণ্ড্রকাত্মর্থং বলদেব-দ্বারকাগমনম্	... ২১শ ,,	...	১০২৭-১০৬০
দ্বিবিদদানব কথা	... ২২শ ,,	...	১০৬১-১০৮৯
নন্দাদিসম্মিলনৌ কুরুক্ষেত্রযাত্রা	... ২৩শ ,,	...	১০৯০-১১৫০
ব্রজবাসিনাং ব্রজং প্রত্যাগমনম্	... ২৪শ ,,	...	১১৫১-১১৮৯
উদ্ধবমন্ত্রণা	... ২৫শ ,,	...	১১৯০-১২৩৬
জরাসন্ধবধ-রাজশুমোচনঞ্চ	... ২৬শ ,,	...	১২৩৭-১২৮৪
রাজহুয়যজ্ঞ-শিশুপালবধশ্চ	... ২৭শ ,,	...	১২৮৫-১৩২৩
সাল্যবধঃ	... ২৮শ ,,	...	১৩২৪-১৩৫০
ভাবিকথা-প্রথমম্	... ২৯শ ,,	...	১৩৫১-১৪৩৫
দন্তবক্রবধঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত ব্রজাগমনঞ্চ	... ৩০শ ,,	...	১৪৩৬-১৪৯৯
শ্রীরাধাদি-রাধাসমাপনম্	... ৩১শ ,,	...	১৫০০-১৫৬০
রাধাসমাধানাং বিবাহারম্ভঃ	... ৩২শ ,,	...	১৫৬১-১৬৩৪
শ্রীরাধামাধবাধিবাসঃ	... ৩৩শ ,,	...	১৬৩৫-১৬৮০
বিবিধালঙ্কার পরিধানম্	... ৩৪শ ,,	...	১৬৮১-১৭২৭
শ্রীরাধামাধববিবাহ-নির্বাহঃ	... ৩৫শ ,,	...	১৭২৮-১৮০৭
শ্রীরাধামাধব-বাতীদ্বয়ঃ	... ৩৬শ ,,	...	১৮০৮-১৯০৫
সর্বস্বপূর্ণ-গোলোকপ্রবেশঃ	... ৩৭শ ,,	...	১৯০৬-২০৮৪

শ্রী শ্রীনবদ্বীপ-শতক

[শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ-বিরচিত

“শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্”-এর পঞ্চানুবাদ

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠার পর)

কলুষ-স্বরূপ আমি এভাগ্য কি পাব ।
মরণান্তে শ্রীগোক্রমে বসতি করিব ॥
সেই বনে রাধাকৃষ্ণ বিহার-সময় ।
পদ-জ্যোতিঃ দেখি হবে আনন্দ উদয় ॥ ২৮ ॥
যে ধামে প্রতিষ্ঠ হয়ে জন্ম-স্বাবর ।
ঘনানন্দ মহোৎসবে ভাসে নিরন্তর ॥
মায়া যার জড়দৃষ্টি দিয়াছে নয়নে ।
জড়ময় দেখে সেই নবদ্বীপ-বনে ॥
অতএব আমার প্রার্থনা গৌরপুরে ।
বসিয়া চিন্ময়স্মৃতি পাই এ শরীরে ॥ ২৯ ॥
সম্বন্ধ-কৌশলে সেই ধামে প্রবেশিলে ।
সর্ব জীবে আনন্দ-সম্বিদ্ভাব মিলে ॥
অতাত্ত্বিক বহির্মুখ দেখিতে না পায় ।
দিউন গৌরান্দপুর আশ্রয় আমায় ॥ ৩০ ॥
সম্বন্ধ-আশ্রিত জীবে দোষদৃষ্টি যার ।
আনন্দ-স্বরূপে অপরাধ হয় তার ॥
যত দিন সেই অপরাধ নাহি যায় ।
রাধাকৃষ্ণ-সুসম্বন্ধ মিলিবে কোথায় ॥ ৩১ ॥
নবদ্বীপবাসি-মিন্দারত যেই জন ।
যেবা নাহি করে মায়াপুরের পূজন ॥
অন্ত তীর্থে যে মূর্থ গোক্রম-সম জানে ।
মোদক্রম-সুখ চিৎ-স্বরূপ না মানে ॥
সে পাপিষ্ঠ নরাধম সহিত সঙ্গতি ।
স্বপ্নেও না হয় যেন বিষম দুর্গতি ॥ ৩২ ॥
চৌর্য্য, লম্পটতা, ঘেষ, মৎসরতা, লোভ ।
মিথ্যাবাক্য, স্বেচ্ছাকাব্য, পরদ্রোহ, স্তোভ ॥
তাজিয়া যে জন করে গৌরপুরাশ্রয় ।
বৃন্দাবন-আশা তার বন্ধ্য নাহি হয় ॥ ৩৩ ॥
নবদ্বীপ-বাস লাগি করয় অধর্ম ।
তাজে গুরুজন আর সকল স্বধর্ম ॥

তাহে তার দোষ কিবা এই মাত্র সার।
 যাহে গৌড়বাস বাধা সেই পাপভার ॥ ৩৪ ॥
 আশ্চর্য্য কারুণ্যপূর্ণ শ্রীগৌড়নগরী।
 সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে তার মহিমা গিস্তারি ॥
 যে সে রূপে থাকি জীব নবদ্বীপ ধামে।
 দেহান্তে লভিছে সিদ্ধি শ্রীগৌরানন্দ নামে ॥ ৩৫ ॥
 ওহে মূর্খ জীব, তুমি লোক-বেদাশ্রয়ে।
 আচরি বহুল ধর্ম্ম আছ ক্লিষ্ট হয়ে ॥
 হঠাৎ ছাড়িয়া সব পথ অনিশ্চিত।
 শ্রীগৌড়মে পর্ণকুটি করহ বিহিত ॥ ৩৬ ॥
 শাস্ত্র সব নানাবিধ করুক জল্পনা।
 অতাত্ত্বিক জন তাহা করুক ধারণা ॥
 তর্কপটু লঘুমতি বিতর্ক করিয়া।
 স্থাপুক বিচিত্র মত দেশে দেশে গিয়া ॥
 আমরা সে সব ছাড়ি উজ্জ্বল বিমল।
 রস-প্রেম-সুধা-সার যেখানে সম্বল ॥
 সেই রাধা-ভাবাধিত পুরুষের স্থান।
 ছাড়িয়া কোথাও নাহি করিব প্রশ্নান ॥ ৩৭ ॥
 অপারকরণাসিদ্ধু শ্রীকৃষ্ণচরণে।
 পড়িয়া কঁাদিয়া আমি বলি সর্ব্বক্ষণে ॥
 তব অনর্গল প্রেমসিদ্ধু-গৌরবনে ॥
 কোন জন্মে রতি যেন দিও অকিঞ্চনে ॥ ৩৮ ॥
 চঞ্চল, দুর্ম্মতি আর স্বধর্ম্ম-বিরত।
 ছুরাচার, গৌরচন্দ্র-সম্বন্ধ-রহিত ॥
 কাম লোভে যথা আসি অত্যাশ্রম হয়।
 নমি সেই মায়াপুর রসের নিলয় ॥ ৩৯ ॥
 সর্ব্বসুখসার ভক্তিসুখ সুনির্ম্মল।
 পাই যেই নবদ্বীপ সেই গৌরস্থল ॥
 বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, অচিন্ত্য অপার।
 মূঢ়বুদ্ধি জন তত্ত্ব না জানে তাহার ॥ ৪০ ॥
 ভজে অশ্রু-দেব কিম্বা ব্রহ্মজ্ঞানে রত।
 অথবা পশুর হায়ে ভোগেতে বিব্রত ॥
 গজার পশ্চিম তীরে কোলাটবী তীরে।
 ফেলেন স্বশক্তিক্রমে প্রেম-পারাবারে ॥ ৪১ ॥

বিবিধ সংবাদ

(১) চাতুর্মাস্য-ব্রত

গত ৮ই শ্রাবণ পূর্ণিমা তিথি হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ সকল মঠেই চাতুর্মাস্য-ব্রত আরম্ভ হয়। এই ব্রত একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে যেরূপ একান্ত নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালিত হয়, অত্র সে রূপ হয় না। এই ব্রতকালে লাউ, বেগুন, পুঁই, শিম, বরবটী, পটল, মাষকলাই ৪ মাস অবশ্য বর্জনীয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে ছন্ধ এবং কার্তিকে আমিষ (অর্থাৎ যে-সকল বস্তু কার্তিক মাসে আমিষত্ব প্রাপ্ত হয়) নিষিদ্ধ।

(২) বুলন যাত্রা

গত ২রা ভাদ্র, মঙ্গলবার সমিতির মূলকেন্দ্র ও অত্রাশ্রম শাখামঠসমূহে বুলন যাত্রা আরম্ভ হয়। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে এই মহোৎসব অতীব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল মঠসমূহে অপূর্ব দোলনায় শ্রীরাধাবিনোদ-বিহারীজিউকে স্থাপন করা হয়। সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এই বুলন-সজ্জা অতীব স্তন্দর হইয়াছিল। এই উৎসব ৭ই ভাদ্র, রবিবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথি দিবসে সমাপ্ত হয়।

(৩) শ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথি

শ্রীরাধাগোবিন্দের বুলনযাত্রা সমাপ্তি দিবস—শ্রীবলদেব পূর্ণিমা তিথি। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভ্যবৃন্দ প্রতিবৎসর এই তিথিতে সমগ্র দিবস উপবাসী থাকিয়া শ্রীবলদেব-তত্ত্ব ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় আলোচনা করেন। সন্ধ্যার পর অর্থাৎ শ্রীবলদেবের আবির্ভাব মুহূর্ত্ত গত হইলে অনুকল্প গ্রহণ করা হয়।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব

এবৎসর শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী তিথি ১৪ই ভাদ্র তারিখে গত হইয়াছে। এইবার এই তিথিতে জয়ন্তী যোগ হয়। সমিতির সমস্ত মঠে এই তিথি পালিত হইলেও মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও শাখা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে একটু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রাতঃকাল হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পারায়ণ আরম্ভ হইয়া রাত্রি ১২টায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা মুহূর্ত্তে সমাপ্ত হয়। তদন্তর কিছু

অনুকল্প গ্রহণ করা হয়। অন্তত এই মুহূর্ত অতিক্রান্ত হইলে বিবিধ শস্যাদি-প্রস্তুত অন্ন-প্রসাদাদি গ্রহণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু তাহা কখনই শুদ্ধ বিচার সম্বলিত নহে। জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের সম্পূর্ণ আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্তৃকই এই বিচার স্তূপরূপে গ্রহণ করা হয়। পরদিবস অর্থাৎ নন্দোৎসব দিবসে প্রায় ২০০০ সমাগত আহূত-অনাহূত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে জন্মাষ্টমী-প্রদর্শনী

এই উৎসব উপলক্ষে জন্মাষ্টমী দিবস হইতেই প্রদর্শনীর উন্মোচন করা হয়। প্রদর্শনীতে কংসের কারাগৃহে বাসুদেব কৃষ্ণের আবির্ভাব, বাসুদেব-দেবকী-কর্তৃক তাঁহার জন্ম, নন্দালায়ে বাসুদেব কর্তৃক তাঁহার আনয়ন, শূগাল কর্তৃক শ্রীবাসুদেবকে পথ প্রদর্শন, তাঁহাদের যমুনা নদী অতিক্রম, যশোদা দেবীরও কৃষ্ণ ও যোগমায়ােকে এসব ইত্যাদি সকল তথ্যাদি মৃগয়ী মূর্ত্তি সাহায্যে ও বৈদ্যাতিক প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয় উপায়ে প্রদর্শিত হয়। সমগ্র প্রদর্শনী চলমান অবস্থায় দেখা যায়। এই প্রদর্শনী এমনই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, সমগ্র নবদ্বীপ ও তৎপার্শ্ববর্তী বহু অঞ্চল হইতে প্রত্যহ ১৪।১৫ সহস্র দর্শক ইহা দর্শন করিতে আসিতেন। নবদ্বীপ শহরের বহু ব্যক্তি আসিয়া বলিতে থাকেন, “এরূপ প্রদর্শনী আমরা কখনও দেখি নাই। এই প্রথম আমরা এইরূপ প্রদর্শনী দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিলাম। ধর্ম-বিষয় লইয়া এইরূপ প্রদর্শনী দেশের সর্বত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনারা দিকে দিকে এইরূপ শাস্ত্র-শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর উন্মোচন করিয়া দেশকে কুশিক্ষার কবল হইতে রক্ষা করুন।” প্রতিটি Stall (ষ্টল)-এ মঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দ সমাগত দর্শকদিগকে এতৎসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় শাস্ত্র-যুক্তি ও প্রমাণ অবলম্বনপূর্বক বুঝাইয়া দেন। এই প্রদর্শনী প্রথমে ৪ দিন উন্মুক্ত থাকিবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু দর্শকবৃন্দ ও নবদ্বীপবাসীগণের বিশেষ অনুরোধে ইহার সময় বর্দ্ধিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী দিবস পর্যন্ত এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকে। ঐ দিবস আবার একটা নূতন Stall-এ বুধভানু রাজার গৃহে শ্রীরাধারানীর আবির্ভাব প্রদর্শিত হয়। এই দিবসই প্রদর্শনীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হইয়াছিল। যাত্রী ও দর্শকবৃন্দ অনুরোধ করিতে থাকেন—যাহাতে এই প্রদর্শনী আরও কিছুদিন উন্মুক্ত থাকে। যাহা হউক, জনগণ যদি ইহা দ্বারা কিঞ্চিৎ শাস্ত্রীয় সুশিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে—এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সমিতির কর্তৃপক্ষ এই

প্রদর্শনীর স্থিতিকাল আরও বর্দ্ধিত করিয়া দেন এবং আগামী ১লা আশ্বিন শ্রীপার্ব্বকাদশীতিথিই এই প্রদর্শনীর অন্তিম দিবস বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মাইকযোগে এই প্রদর্শনীর বিবিধ শিক্ষা প্রচারিত হয়।

এই প্রদর্শনী তৈয়ারী করিতে ও তাহার বিবিধ সজ্জায় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীরোহিণী নন্দন ব্রজবাদী, শ্রীশ্রীহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারীর নাম উল্লেখযোগ্য; তন্মধ্যে শ্রীরোহিণী নন্দন ব্রজবাদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অপরায় ৪ঘটিকায় অম্বদীয় গুরুপাদপদ্ম আচার্য্যকুল-শিরোমণি পরমহংস-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ এই প্রদর্শনী উন্মোচন করেন। তৎকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা সম্বন্ধে যে স্নগভীর দার্শনিক বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন, পাঠকগণের অবগতির জ্ঞাত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জন্মাষ্টমী-প্রদর্শনীতে সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ

সমিতির সভ্যগণ আমাকে অগ্ন জন্মাষ্টমী-প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি তদনুসারে অগ্ন বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিতে আসিষাছি। প্রথমেই আমার বক্তব্য এই যে, এখন বৈকাল ৪টা হইয়াছে। অগ্নই রাত্রি ১২টার সময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়া সর্বত্র প্রকাশ আছে। সেজন্ত বৈকাল ৪টার সময় জন্মাষ্টমীর প্রদর্শনী উন্মোচন করায় একটা বিশেষ কৈফিয়তের প্রয়োজন হইয়াছে। মধ্য রাত্রে যে-জন্মলীলার আবির্ভাব, দিবসে সেই লীলার উন্মোচন একটু বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে পারে। দিবাভাগে নৈশ-লীলার অদর্শনই হইয়া থাকে; অথচ দিবাভাগেই তাহার উন্মোচন করা হইল। ইহার তাৎপর্য্য আমাদের অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমতঃ যিনি 'অজ'-অর্থাৎ ষাঁহার জন্ম নাই বা যিনি জন্মরহিত, তিনি জন্ম-গ্রহণ করিলে 'অজত্বের' কোন ব্যাধাত ঘটে না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, যিনি অনন্ত কোটী অর্থের মালিক তিনি যে কোন পরিমাণের অর্থ প্রদান করিলে তাঁহার অনন্ত কোটী অর্থের অধিপতিত্বের কোন ব্যাধাত হয় না। সমুদ্র অসীম; তাহা হইতে স্বর্ঘ্য প্রচুর জল আকর্ষণ করিয়া লইলেও সমুদ্রের

যে-প্রকার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় না, সেই প্রকার ‘অজ’ বস্তু জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার অজত্বের কোনও হানি হয় না। যাহারা ‘অজের’ জন্মগ্রহণ করা হেতু ভগবানের অজত্বের প্রতি সন্দেহ করেন, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ; শুধু তাহাই নহে, তাহাদিগকে অসুরশ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। অনেক আত্মরিক চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনা যায়, ভগবান নাই ; কারণ, ভগবান না থাকিলে তাহাদের অসং, কুংসিং এবং ঘৃণিত কার্য্য-সমূহ অবাধ গতিতে চলিতে পারে। ঈশ্বর স্বীকার করিলে অপকার্য্যের অবাধ গতি চলে না। যিনি সর্বশক্তিমান অথবা অচিন্ত্যশক্তিমান তিনি যদি তাঁহার কোন শক্তি প্রকাশ করেন বা ব্যক্ত করেন তাহা হইলে তাঁহার সর্বশক্তিমানতার বিন্দুমাত্রও হানি হয় না—ইহা সর্বতোভাবে যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। অসীম বস্তুতে সসীম সমাবেশ যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে। সমুদ্রের তীরবর্তী অচিন্ত্য অসংখ্য বালুকণার সীমা নির্দেশ সম্ভবপর নহে; কিন্তু অসংখ্য বালুকণার মধ্যে শত, সহস্র বালুকণা সংখ্যাগতভাবেই বর্তমান—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অজের জন্মলীলাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্মা, শিব, কালী, দুর্গাদি সমস্ত দেবদেবীর সৃষ্টিকর্তা ও উপাস্ততত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সর্ববাদিসম্মত। তিনি একই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বের আকর্ষণকারী ; তজ্জগৎই তিনি কৃষ্ণ শব্দে সংজ্ঞিত। দৈব-দানব, মনুষ্য ইত্যাদি প্রাণিগণের যাবতীয় চিন্তাপ্রসূত পার্থিব ও অপার্থিব—সমগ্র তত্ত্বের একমাত্র আকর্ষণকারী কৃষ্ণই অল্প রাত্রিতে জন্মলীলা পরিগ্রহ করিবেন। ইহা অজের পক্ষে কৃপাপরবশ হইয়া একটা অনুগ্রহ-স্বরূপ।

শাস্ত্রজ্ঞ-শিরোমণি বিদ্বৎ বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাকে নিত্য এবং সনাতন বলিয়া সকলের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। নিত্য ও সনাতন শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য আধুনিক তথাকথিত ধার্মিক সমাজের সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। যাহারা ধার্মিক বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়াও নিত্য এবং সনাতন শব্দদ্বয় বহুক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাদের উক্ত ব্যবহার অশাস্ত্রীয়, অনিত্য ও অসত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। তজ্জগৎ আমরা আধুনিক অভিধানকার বা কোষকারগণকেও দায়ী করিতে প্রস্তুত। স্মার্তগণের নিত্য-ক্রিয়া-পদ্ধতির মধ্যে ‘নিত্য’ শব্দের যে প্রয়োগ, তাহা বিদ্বৎ দার্শনিক-সাহিত্যিকগণের পক্ষে উপহাস্যাস্পদ। ‘নিত্য’ শব্দ তাহারা প্রাত্যহিক

অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা মূর্খলোকের ব্যবহার বলিয়া গণ্য হইলেও প্রকৃত গুহ্যসাংখ্যিক দার্শনিকগণ ইহা কোনমতেই স্বীকার করেন না। অপার্থিব বস্তুকে পার্থিব বস্তুর অন্তর্গত করিয়া তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা অবৈদিক এবং ধর্ম-বিরুদ্ধ; আজকাল বৌদ্ধবাদ, জৈনবাদ, শঙ্করবাদ আমাদের দেশে প্রবলভাবে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। নিত্য-শব্দের নৈমিত্তিক ধারণা চিন্তাশীল-জগৎকে মুগ্ধ করিয়া বিপথে চালিত করে। আমরা শব্দের এতাদৃশ অশাস্ত্রিক ব্যবহার জন্মাষ্টমী দিবসে আদৌ আলোচনা করিতে ইচ্ছুক নহি।

বর্তমান নবদ্বীপ-শহর স্মার্ত্ত সিদ্ধান্ত-জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণের দ্বারা লাঞ্চিত হইয়াছে। আধুনিক তথাকথিত পাণ্ডিত্যগণ মূর্খতায় ভরপুর হইয়া অজ্ঞতাকেই বিজ্ঞতার পোষাকে চালাইতে চেষ্টা করেন। শব্দ-জ্ঞানের নিতান্ত অভাবই ইহার মূল কারণ। পার্থিব জগৎ বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশকে বর্তমানে অনুকরণ করিতে গিয়া অজ্ঞানকেই বিজ্ঞান মনে করিতেছে। তথাকথিত বিজ্ঞান অজ্ঞানরাশিতে বিশ্বকে অবাস্তবের আয় গ্রাস করিতে বসিয়াছে। সেই পাপাসুরকে কৃষ্ণই বিধ্বংস করিয়া উন্নতচেতাকুলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ সেই কৃষ্ণেরই জন্মতিথি। প্রাকৃত স্মার্ত্তগণের মূর্খতা ও শাস্ত্রজ্ঞান-হীনতা প্রদর্শনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আবির্ভাব। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ তাঁহার দাসদাসীগণের দ্বারা পৃথিবীর অসুরগণকে বিনাশ করাইয়া থাকেন। অসুরগণ দেবদেবীর পদাবলেহন করিতে মত্ত থাকায় গুহ্য বৈষ্ণবগণ নিশ্চিন্তে ও অবাধে পরম-পরতত্ত্বের উপাসনায় নিত্যকাল স্রোযোগ পাইতেছেন। প্রাকৃত স্মার্ত্তগণ আজও বুঝিতে পারেন না যে, তাহাদের উপাস্ত বা উপাস্ত-তত্ত্বই তাহাদিগকে ধ্বংস করিবে। ইহাই কৃষ্ণের একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলা। এই শ্রেণীর উপাসনা মার্গে সর্বত্রই শাস্ত্র এবং যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, তথাকথিত উপাস্ত-তত্ত্বই তাহাদের উপাসকগণকে নিঃশূল ও ধ্বংস করিয়া বিশ্ব এবং অবিষ্টে শান্তি-স্থাপন করিয়া থাকেন। ইহাই অসুর-বিনাশের প্রকৃত তাৎপর্য।

শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন,—

“বিষ্ণুভক্তো ভবেদৈব আসুরস্তদ্বিপর্ধ্যঃ।”

অসুরকুলকে বিধ্বংস করিবার জন্ত কৃষ্ণ স্বয়ং নিজকে অথবা তাঁহার দাসদাসীগণকে আবির্ভাব করাইয়া থাকেন। কিন্তু অতঃপর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই

আবির্ভূত হইবেন। সুতরাং সেই স্বয়ং-কৃষ্ণের নিজ শিক্ষা সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে দুই-একটি কথা আলোচনা করা অসম্ভব হইবে না। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্লোকের কিঞ্চিৎ এস্থলে আলোচনা করিতেছি। ইহা স্বয়ং কৃষ্ণেরই উক্তি, অথু কাহারও নহে। সুতরাং ইহা বেদ অপেক্ষাও অধিক পূজ্য, এইজন্য গীতাকে ধার্মিক সমাজ ‘উপনিষদ্’ আখ্যা দিয়া থাকেন। তজ্জন্য ইহার নাম ‘গীতোপনিষদ্’। বেদ অপেক্ষাও ইহার গৌরব অধিক বলায় আপনারা কেহ বিশ্বাস্যবিষ্ট হইবেন না। কারণ বেদ ঈশ্বরের নিঃস্বাস-স্বরূপ (শঙ্করাচার্য্য মতে)। কিন্তু এই ‘গীতা’ বা ‘গীতোপনিষদ্’ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত বাণী। সুতরাং নাসাগর্জ্জন অপেক্ষা অধরায়ুতের প্রাধাত্য দিতে কোন্ দার্শনিক-সমাজই বা কুণ্ঠিত হইবেন? এইরূপ যুক্তিক্ষেত্রে অর্থাৎ বেদাপেক্ষাও গীতোপনিষদের প্রাধাত্য বিচার ক্ষেত্রে বিপদে পড়িয়া কোন কোন দার্শনিক ব্যবহারজীবী একটি তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, “গীতা গ্রন্থখানি বেদব্যাসের কাল্পনিক। উহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি নহে। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ এইরূপ কথা কখনও বলিবার স্বেযোগ পাইতে পারেন না। আর যদি বলিয়াও থাকেন, তাহা হইলে বেদব্যাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন ইতিহাসেই বেদব্যাসের যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ উপস্থিতির কথা উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং কৃষ্ণ যদি অর্জুনকে এতাদৃশী শিক্ষা দিয়াও থাকেন তথাপি বেদব্যাসের উহা লিপিবদ্ধ করা কল্পনা মাত্র। উহা ব্যাসেরই শিক্ষা। স্বয়ং কৃষ্ণের শিক্ষা বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। বেদব্যাসের উক্তিসমূহকে বেদের উক্তি বলিয়া অথবা ঈশ্বরের নিঃস্বাস বা অপৌরুষেয় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সুতরাং বেদাপেক্ষা ইহার প্রামাণিকতা অধিকতর নহে।” পক্ষান্তরে আমরা বলিতে চাই, বেদব্যাসের ‘মহাভারত’ পঞ্চম-বেদরূপে সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়া সম্মানিত হইতেছে। বেদ-চতুষ্টয়ের সতি এই পঞ্চম-বেদ খুব প্রাধান্যের সহিতই লোকসমাজে গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমি আধুনিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবলম্বন করিয়াই গীতা কৃষ্ণেরই উক্তি, বেদব্যাস কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ইহা প্রমাণ করিতেছি। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিল বলিয়া বিদ্বৎ সমাজ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। এমনকি, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশও ৩০৩৫ বৎসর পূর্বে পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছেন যে, শব্দশক্তির প্রভাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ভারত পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি তাঁহাদের সেই উক্তি সর্বতোভাবে সত্য বলিয়া আপনাদের নিকট জানাইতেছি এবং তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল এই গীতা। (ক্রমশঃ)

—শ্রীব্রন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী-কর্তৃক সংগৃহীত

পরলোকে শ্রীপাদ অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ্ প্রভু

বর্তমানে আমাদের অতীব দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে। জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একান্ত অনুগত জনগণ ক্রমশঃই জগৎ অন্ধকার করিয়া নিত্যধামে গমন করিতেছেন। আমরা সংবাদ পাইলাম, গত ৪ঠা শ্রাবণ, ইং ২০শে জুলাই সোমবার শয়নৈকাদশী তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ গৃহস্থ সেবকগণের অন্ততম শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাস, ভক্তিকোবিদ্ প্রভু (অমূল্যদা) নিত্যধামে প্রবেশ করিয়াছেন। সেরিভ্যাল থুসোসিস্-এ আক্ৰান্ত হইবার অভিনয় করিয়া কলিকাতায় আর, জি, কর, হাসপাতালে অবস্থানকালেই শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম-স্মরণমুখে ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক হইতে অপ্রকট হন। শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের একান্ত আশ্রিত সেবকগণের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও আপনবোধ অত্যাশ্চর্য্য গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য পরিদৃষ্ট হয় না। ইহাই তাঁহার গুরুপাদপদ্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয়। ‘গুরুর সেবক হন মাত্ৰ আপনার’—এই শিক্ষার আদর্শ আমাদের অমূল্য দা।

যদিও তিনি গৃহস্থ ছিলেন তথাপি মঠই তাঁহার আপন ছিল। ব্যবহারিক জীবনে তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার। সরকারের অধীনে তিনি চাকুরী করিতেন। কল্যাণলক্ষ্যে ভারতের প্রায় সর্বত্রই তাঁহার চাকুরীক্ষেত্র পরিবর্তিত হইয়াছে। তত্তৎ স্থানে প্রভুপাদের কোন মঠ বা আশ্রম না থাকিলে তিনি স্বয়ংই সেই সকল স্থানে মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিতেন। এলাহাবাদ, কাশী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের শ্রীগৌড়ীয় মঠরাজি তাঁহারই কীর্ত্তি। বাস্তবিক পক্ষে মঠই তাঁহার জীবন ছিল। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত তিনি এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেন না। “যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়”—এই উন্নততম শিক্ষার আদর্শ ও বিচার তাঁহার জীবনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে।

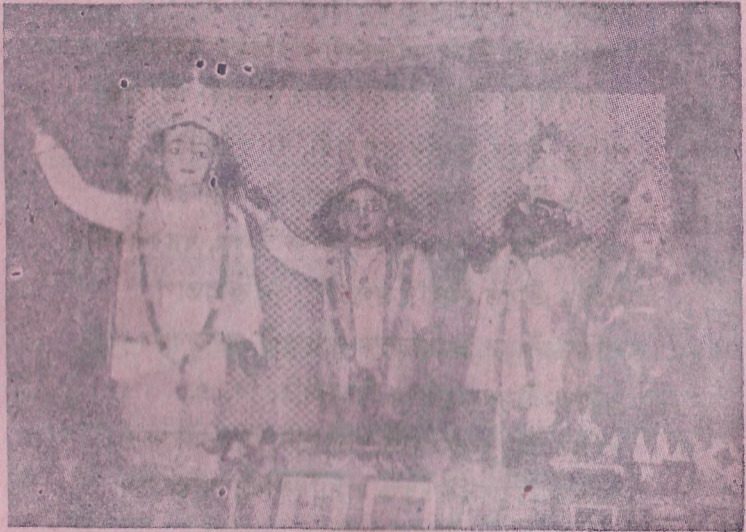
তাঁহার পূর্বনাম ছিল শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার সরকার। তদীয় সতীর্থগণের প্রতি তাঁহার মধুর ও অকণ্ট ব্যবহার এমনই এক অমূল্য সম্পদ ছিল যে, তাঁহার শ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত নাম “অধোক্ষজ” হইলেও সমগ্র গৌড়ীয় মিশনে তিনি “অমূল্যদা” বলিয়াই সুপ্রিয় ও সুপরিচিত। তাদৃশ ভক্তৈকপ্রাণ ভক্তের বিরহে আমরা আজ অতীব ব্যথিত ও সন্তপ্ত। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি সকলেই তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকিলেও আমরা ঈশ্বরের নিকট সেই অনুপ্রেরণার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

—সম্পাদক

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଗୁରୋରାଜେ ନମଃ:



୧୬ଶ ବର୍ଷ } ଆଶ୍ୱିନ-କାନ୍ତିକ, ୧୩୭୧ { ୮-୯ମ ସଂଖ୍ୟା




ଶ୍ରୀପିଞ୍ଚଳଦା ଗୋଡ଼ିୟ ମଠେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀବିଘ୍ନହର୍ଗ

୧ମ କଙ୍କେ ଶ୍ରୀଗୋର-ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ୨ୟ କଙ୍କେ ଶ୍ରୀରାଧା-ବିନୋଦବିହାରୀଜୀଉ

ସମ୍ପାଦକ—ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିକୁଶଳ ନାରସିଂହ ମହାରାଜ

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ—ଶ୍ରୀଦେବୀନନ୍ଦ ଗୋଡ଼ିୟ ମଠ, ଡେବପାଢ଼ା, ନବସିଂହ (ନଦୀରୀ)

স বে পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াহ্মা স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অত্র ধর্ম সুইরূপে পালে যেই জন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূন ॥ হরি-কথার বক্তি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

১৬শ বর্ষ } ক্ষীরোদশায়ী, ২৬ পদ্মনাভ, ৪৭৮ গৌরাদ শনিবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৭১; ইং ১৭।১০।১৯৬৪ { ৮ম সংখ্যা

সান্নিহাদে

শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিতং

শ্রী শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

বেদাতীত অচিন্ত্যাদ্রুত-স্বরূপ শ্রীগোক্রমধাম-স্বরূপ-দর্শন-লালসা—

যং কোট্যাংশমপি স্পৃশেন নিগমো যন্ন বিহুর্যোগিনঃ

শ্রীশ-ব্রহ্ম-শুকার্জুনোদ্ধবমুখাঃ পশ্যন্তি যন্ন কচিৎ ।

অন্যং কিং ব্রজবাসিনামপি ন যদৃশ্যং কদা লোকয়ে

তচ্ছ্রীগোক্রম-রূপদ্রুমতমহং রাধাপদৈকাশ্রয়ঃ ॥৪২॥

বেদ ধাঁহার কোটি অংশের একাংশও স্পর্শ করিতে পারেন না ;
যোগীগণও যাহা অবগত হইতে পারেন না ; লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, শুকদেব,
অর্জুন ও উদ্ধবপ্রমুখ ভক্তগণও কখনও যাহা দর্শন করেন নাই ; অথবা, অতের

কথা কি, ব্রজবাসিগণেরও যাহা নয়নগোচর হয় নাই, সেই অদ্ভুত গোক্রম-
ধামের স্বরূপ একমাত্র রাধা-চরণযুগল আশ্রয় করিয়া কবে আমি দর্শন
করিব !! ৪২ ॥

দৈতুবোধিকা প্রার্থনা—

দুর্ভাসনা সুদৃঢ়রজ্জুশতৈর্নিবদ্ধং
আকৃষ্য সর্বত ইদং স্ববলেন গৌর ।
রাধাবনে বিহরতঃ সহ রাধয়া তে
পাদারবিন্দ-সবিধং নয় মানসং মে ॥৪৩॥

দুর্ভাসনারূপ সুদৃঢ় রজ্জুশতদ্বারা আমার চিত্ত নিবদ্ধ। হে গৌরচন্দ্র,
তুমি নিজশক্তিবলে আমার এই চিত্তকে সর্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়া
রাধার সহিত রাধাবনে ক্রীড়াশীল তোমার পাদপদ্ম-সন্নিধানে উপনীত
কর ॥ ৪৩ ॥

নবদ্বীপ চন্দ্রে বিজ্ঞপ্তি—

বশীকর্ত্ত্বং শক্যো ন হি ন হি মনাগিন্দ্রিয়গণো
গুণোহভূন্নৈকোহপি প্রবিশতি সদা দোষনিচয়ঃ ।
ক যামঃ কিং কুর্ম্যো হরি হরি ময়ীশোহপ্যকরুণো
নবদ্বীপে বাসং বত বিতর মামনুগতিকম্ ॥৪৪॥

আমার ইন্দ্রিয়গণকে আমি কিঞ্চিং মাত্রও স্ববশে আনয়ন করিতে
পারিতেছি না। আমাতে একটিমাত্র গুণও বিद्यমান নাই, (অথচ) দোষ-
সমূহ সর্বদা আমাতে প্রবেশ করিতেছে! আমি কোথায় যাইব! কি
করিব! হরি! হরি! (হায়, হায়!) ভগবান্ও আমার প্রতি নির্দয়!
অহো অননুগতি আমি, (হে নবদ্বীপচন্দ্র) আমাকে শ্রীধাম-নবদ্বীপে বসতি
বিতরণ কর ॥ ৪৪ ॥

নবদ্বীপধামবাস-নিষ্ঠাপ্রার্থনা—

জাতি-প্রাণ-ধনানি যাস্তু সুষশোরাশিঃ পরিক্ষীয়তাং
সদ্বর্ম্মা বিলয়ং প্রয়াস্ত সততং সর্বৈশ্চ নির্ভংস্বতাম্ ।
আধিব্যাধিশতেন জীর্ঘ্যতু বপুল্লুপ্তপ্রতীকারতঃ

শ্রীগৌরানুপুরং তথাপি ন মনাক্ ত্যজ্জুং মমাস্তাং মতিঃ ॥ ৪৫॥

আমার জাতি, প্রাণ ও ধনসমূহ নষ্ট হউক; সুষশোরাশি সম্পূর্ণরূপে
ক্ষয়প্রাপ্ত হউক; আমার আচরিত সদ্বর্ষসমূহ বিলয়প্রাপ্ত হউক; সকলে

আমাকে নিরন্তর তিরস্কার করুক, এবং শত শত মানসিক ও শারীরিক
পীড়ায় প্রতিকারভাবে আমার দেহ জীর্ণ হউক, তথাপি শ্রীগৌরঙ্গপুর
অর্থাৎ নবদ্বীপ ত্যাগ করিতে যেন একবারও আমার মতি না হয় ॥ ৪৫ ॥

নবদ্বীপৈকানুরক্ত পুরুষগণের বন্দনা—

গৌরারণ্যাদম্যং প্রকৃতিরন্তর্ব্বহিবর্ষাপি ।

নৈবাস্তি মধুরাবস্থিত্যবিকলিতং যৈনর্মন্তেভ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রকৃতির অন্তরে ও বাহিরে, নবদ্বীপ ব্যতীত আর মধুর বসতিস্থল নিশ্চয়ই
নাই,—এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার ॥ ৪৬ ॥

গৌরসেবারতা শ্রীলীলাশক্তির জয়—

বিন্দ্ৰাজতিলকা গিরীন্দ্রতনয়া-নীরোধ-শুক্লাম্বরো-

দক্ষং কাঞ্চা-চম্পকছবিরহো নানারসোল্লাসিনী ।

কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধরেণ রসদেনাত্যন্ত-সম্মোহিনী

শ্রীমিশ্রাত্মজবল্লাভা বিজয়তে গোড়ে তু গৌরাটবী ॥ ৪৭ ॥

অহো ! তিলক-সুশোভিতা জাহ্নবীজলরাশি দ্বারা (প্রফালনহেতু)
শুভ্রবসন-পরিহিতা, কাঞ্চন-চম্পক (গৌর)-বর্ণ কোন পুরুষের পূজানিরতা
(সেবাতাৎপর্যায়ময়ী), নানারসে উল্লসিতা, (আনন্দ)-রস-বর্ণগরত কৃষ্ণ-
প্রেম-পয়োধর দ্বারা সৌন্দর্য্যময়ী জগন্নাথ-মিশ্রতনয় শ্রীগৌরসুন্দরের অতি-
প্রিয়তমা, গোড়দেশান্তর্গত গৌরাটবী (খেতরীপ) সর্বতোভাবে বিজয় লাভ
করুন ॥ ৪৭ ॥

পরমবৈভবশালী নবদ্বীপ নিত্যসেব্য—

যস্মিন্ কোটি-সুরেন্দ্রবৈভবযুতা ভূমীরুহাঃ পোষকাঃ

ভক্তিঃ সদ্ধনিতা মহারসময়ী যত্র স্বয়ং শ্লিষ্যতি ।

যত্র ব্রহ্মপুরাদি তীর্থনিচয়া ভ্রাজন্তি নানাস্থলে

তদ্বীপং নবসংখ্যকং সুখময়ং কো নাম নালম্বতে ॥ ৪৮ ॥

যে-স্থানে বৃক্ষগণ কোটি কোটি সুরেন্দ্রতুল্য বৈভবযুক্ত হইয়া শোভা
সম্পাদন করিতেছেন ; যে-স্থানে মহারাসময়ী ভক্তিরূপা সাক্ষীবনিতা স্বয়ং
(আবাচিতভাবে) অলিপন করিতেছেন এবং যে-স্থানে ব্রহ্মপুরাদি তীর্থসমূহ

নানাশ্বে দীপ্তিমান্ হইয়া শোভা পাইতেছেন, সেই সুখময় শ্রীধাম-নবদ্বীপকে কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আশ্রয় না করেন ? ৪৮ ॥

নবদ্বীপবাস-নিদকের কৃষ্ণপ্রেমভক্তিলাভ অসম্ভব—

নিদন্তি যাবন্নবখণ্ড-বাসং বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস-কন্দে ।

তাবন্ন গোবিন্দ-পদারবিন্দে স্বচ্ছন্দ-সদভক্তি-রহস্য লাভঃ ॥৪৯॥

জীবকুল যতদিন নবদ্বীপবাসকে নিদা করিবে, ততদিন তাহাদের শ্রীধাম-বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস-মূল শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দে সূর্য প্রেমভক্তি লাভ হইবে না ॥ ৪৯ ॥

সৌভাগ্যবানের নবদ্বীপবনে ভ্রমণ-প্রকার—

স্মারং স্মারং নবজলধর-শ্যামলধাম বিদ্যাং-

কোটী-জ্যোতিস্তম্বলতিকয়া রাধয়া শ্লিষ্যমানম্ ।

উচ্চৈরুচ্চৈঃ সরসসরসং কাকুভিজ্জন্তমানঃ

প্রেমাবিষ্টো ভ্রমতি স্কৃতি কোহপি গৌরস্থলীষু ॥৫০॥

কোটী-সৌদামিনী-প্রভাময়া শ্রীরাধিকার তম্বলতিকা দ্বারা আলিঙ্গিত নব-জলধর-শ্যামলকান্তি শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ কাঞ্চন-পঞ্চালিকার গৌরকান্ধিতে সর্বদাব্যত রাধাভাবহ্যতিসুবলিত কৃষ্ণরূপকে স্মরণ করিতে করিতে, ঐকান্তিক ভক্তিরসযুক্ত কাকুতি দ্বারা তারস্বরে (হা গৌরাজ, তুমি কি আমাকে রূপা করিবে,—এইরূপ) বলিতে বলিতে, প্রেমাবিষ্ট হইয়া, কোন স্কৃতিশালী ব্যক্তি শ্রীগৌরস্থলী নবদ্বীপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

গৌরপদাঙ্কিত গৌরধামে প্রেমলালসা—

বিশ্বম্ভরশ্য পাদসরোজোপেতস্থলীষু নির্ভরশ্রেয়া হরি হরি ।

কদা লুঠামি প্রতিপদ-গলদশ্চরুপ্লবং পুলকঃ ॥ ৫১ ॥

হরি ! হরি ! কবে আমি গাঢ়প্রেমবশে উল্লাস-পুলকিতাঙ্গে প্রতিপদে অশ্রুধারা বিদর্জন করিতে করিতে বিশ্বম্ভরের পাদসরোজসংযুক্ত (পূত-) ভূমিতে লুণ্ঠন (অঙ্গ পরিবর্তন বা গড়াগড়ি) করিতে থাকিব ? ৫১ ॥

রাধাভাবসুবলিতকৃষ্ণের ধাম-আশ্রয়কারী পুরুষেরই নিগূঢ়

প্রেমসম্পত্তি প্রাপ্তি—

পূর্ণোজ্জ্বলং প্রেমরসৈক-মুত্তির্যত্রৈব রাধাবলিতো হরিমে ।

তদেব গৌরস্থলমাত্রিতাণাং ভবেৎ পরং ভক্তি-রহস্যলাভঃ ॥৫২॥

পূর্ণোজ্জ্বল-প্রেমরসের অখণ্ড-মুত্তি-স্বরূপ শ্রীহরি আমার যে-স্থানে রাধা ভাববিভাবিত হইয়া বিরাজ করেন, সেই গৌরস্থল বাঁহারা আশ্রয় করিয়াছে- তাহাদেরই পরম-নিগূঢ় ভক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

বহিস্মুখ-লোকের শত চাঁৎকারেও ধামদেবানন্দীর উদ্বেগহীনতা —

চণ্ডাল-শ্ব-খরাদিবং যদি জনাঃ কুব্ধস্তি সর্বৈ তির-

স্কারং ছুৰ্ব্বিষহঞ্চ তেন ন হি মে খেদোহন্ত্যগীয়ানপি ।

শ্রীকৃষ্ণ-শ্রবণাদিকা তু নবধা রাগানুগা চাত্তদা

ভক্তির্ঘৃদু গ্রহসংখ্যকে বিজয়তে তত্রৈব খণ্ডে স্থিতিঃ ॥৫৩॥

লোকদল চণ্ডাল, কুকুর ও গর্দভাদির আঘাত জ্ঞান করিয়া আমাকে হুঃসহ তিরস্কার করিলেও তাহাতে আমার আত্মাত্মও হুঃখ নাই, যদি আমার সেই শ্রীধাম-নবদ্বীপে (গ্রহসংখ্যক—নব, খণ্ডে দ্বীপ) অবস্থিতি হয়, যথা— শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদি আত্ম-নিবেদন পর্যন্ত নবধা ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৫৩ ॥

দেহধর্ম-মনোধর্মোখ যাবতীয় সাধন পরিত্যাগপূর্ব্বক

ধামসেবাই সর্বমঙ্গলাকর—

ভ্রাতঃ সমস্তাশ্চপি সাধনানি বিহায় গৌরস্থলমাশ্রয়স্ব ।

যথা তথা প্রাক্তন-বাসনাতঃ শরীর-বাণী-হৃদয়ানি কুৰ্য্যুঃ ॥৫৪॥

প্রাক্তন-বাসনাবশতঃ তোমার শরীর, বাক্য ও মন যেক্রপই আচরণ করুক না কেন,—হে ভ্রাতঃ, (তুমি) সমস্ত সাধন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর-স্থলই আশ্রয় কর । ॥৫৪॥

শ্রীধামদেবার্থ নবদ্বীপের স্বপচগৃহে ভিক্ষাদ্বারা জীবন-নির্ভর

সর্বাংশে শ্রাবণীয়—

নবদ্বীপে রম্যে বরমিহ করে খর্পরভূতো
 ভ্রমামো ভৈক্ষ্যার্থং স্বপচ-গৃহবীথীষু দিনশঃ ।
 তথাপি প্রাচীনৈঃ পরমশুকুতৈরত্র মিলিতং
 ন নেষ্যাম্যশ্চত্র কচিদপি কথঞ্চিদ্ব বপুরিদম্ ॥৫৫॥

আমি করে ভিক্ষাপাত্র বহন করিয়া বরং এই রম্য নবদ্বীপ ধামে
 চণ্ডালাদির দ্বারে দ্বারেও প্রত্যহ ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিব, তথাপি পূর্বকৃত-
 পরমশুকুতিলক এই (সুহৃৎভ মানব)-দেহকে কোনও ভাবে অশ্রু আর
 কোথায়ও লইয়া যাইব না ॥৫৫॥

সাধক-দেহোচিত শ্রীগৌরবনবাস-লালসা—
 জরংকন্থামেকাং দধদপি চ কৌপীনমনিশং
 প্রণয়ন শ্রীরাধা-মধুপতি-রহঃ-কোল-লহরাম্ ।
 ফলং বা মূলম্বা কিমপি দিবসান্তে কবলয়ন
 নবদ্বীপে নেষ্যে বনভূবি কদা জীবনমিদম্ ॥৫৬॥

একখানি ছিন্নকন্থা ও কৌপীন পরিধান এবং দিবসান্তে কিঞ্চিৎ ফলমূল
 ভোজন করিয়া রাধাকৃষ্ণের নির্জন্ম-কেলিকথা সতত কীর্তন করিতে করিতে
 কবে আমি নবদ্বীপ-বনভূমিতে এই জীবন অতিবাহিত করিব ? ৫৬ ॥

বিরজার পরপারে পরব্যোম, তন্মধ্যে গৌড়মণ্ডল, তন্মধ্যে

আবার বৃন্দাবন—

প্রকৃতাপরি কেবলে মুখনিধৌ পরব্রহ্মণি
 শ্রুতিপ্রথিত-বৈভবং পরপদং পরব্যোমকম্ ।
 তদন্তরখিলোজ্জ্বলং জয়তি গৌড়ভূমণ্ডলং
 মহারসময়ঞ্চ তং কলয় তত্র বৃন্দাবনম্ ॥৫৭॥

প্রকৃতির উর্দ্ধদেশে অবিমিশ্র চিৎ-সুখ-সমুদ্র পরব্রহ্মে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ তদ্রূপ-
 বৈভব বিষ্ণুর পরমপদ ‘পরব্যোম’ নামক ধাম (অবস্থিত) ; তাহার অভ্যন্তরে
 সর্বাংশে উজ্জ্বল ও মহাভাবরসময় শ্রীগৌড়মণ্ডল জয়যুক্ত হউন । সেই
 গৌড়মণ্ডলের মধ্যেই শ্রীধাম বৃন্দাবনকে দর্শন কর ॥৫৭॥

সাময়িক প্রসঙ্গ

কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন শৈয়ক উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ। তিনি “গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম—প্রথম খণ্ড” নামে একখানি ৫৯ পৃষ্ঠা বিশিষ্টা পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। ঐ পুস্তিকাখানিতে অনেক গবেষণা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তবে লেখক মহাশয় আপনাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের অনুগত বলিয়া অভিমান না করায় বাহিরের লোকের মত ধর্মের সমালোচনা করিয়াছেন। তাহাতে বিষ্ণুভক্তির সহিত তাহার ব্যক্তিগত ছাড়াছাড়ি হইয়া পড়িয়াছে।

বৈষ্ণব-ধর্মের কিছু প্রশংসা যে ইহাতে স্থান পায় নাই, এরূপ নহে। তবে লেখক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সমাজের একজন হইয়া লেখনী ধারণ করিলে আমরা তাঁহার নিকট আরও ভাল কথা শুনিতে পাইতাম। বৈষ্ণবে তাঁহার শ্রদ্ধা আর একটি বন্ধি হইলে ধর্মের সহিত ভক্তির পার্থক্য দেখিতে পাইতেন। উপেন বাবু বলেন, “বৈষ্ণব-শাস্ত্রমতে অপূর্ণ জীবের পূর্ণতা লাভের জন্ত যে বিবিধ উদ্যম এবং চেষ্টা, তাহাকেই ধর্ম বলে।” শ্রীভগবানে মনঃ কান্না বা মনোনিবেশরূপে ভজনকেই ভক্তি বলা হইল।

উপেন বাবু বলেন,—“গীতা কর্মযোগের গ্রন্থ। নিষাদিত্য—বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী এবং বিষ্ণুস্বামী—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।” প্রকৃতপ্রস্তাবে এইসকল বিচার সত্য নহে। নিষাদিত্য ও পুরী-সম্প্রদায় উভয়েই শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক। পুরী-সম্প্রদায় বলিতে উপেন বাবু কাহাকে লক্ষ্য করেন? তিনি আরও বলেন,—“গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতে বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণমাত্রই নর নারায়ণ-সম হয়েন। যুগলে দ্বৈতবুদ্ধিকে বড় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত করা হইয়াছে। হরিদাসের তিরোভাবের পর ইহার চরণোদক * * * সপার্বদে পান করিয়াছিলেন।” কিন্তু ঘটনা তাহা নহে।

“হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।”—এই চরিতামৃতোক্ত কথাকে মহাপ্রভুর প্রতি চাপাইতে গেলে অপরাধ হইয়া পড়ে। তজ্জন্ত ঐস্থানে অপরাধ হইতে রক্ষা পাইতে গিয়া তারা চিহ্ন দেওয়া হইল। মহাপ্রভুকে লঙ্ঘন করা উপেন বাবুর ভাল হয় নাই। আবার মহাপ্রভুর উক্তি বলিয়া তিনি লিখেন—

“রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতেরাম শিবেশিব ।
যাসি সাসি নমো নিত্যং যোসি সোসি নমোহস্ততে ॥”

এই সব আজগুবি ছড়া কোথা হইতে পাওয়া যায়, আমরা তাহার সম্বন্ধন করিতে পারিলাম না । উপেন বাবু যেন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের কথা আলোচনা করিবার পর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তদ্বর্ষ সম্বন্ধে পুস্তিকা লিখিবার প্রয়াস করেন, তাহা হইলে নানা প্রকার অসমঞ্জস কথা তাহাকে ধর্মের প্রকৃত সমালোচকের স্থান হইতে দ্রষ্ট করিবে না ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অত্যুচ্চ স্থান এবং সাংসারিক চক্ষে তাঁহার প্রৌঢ়তা ও বার্কিক্য নব্য পাঠকগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করাইয়া তাহাদিগকে ধর্মপথে বিপন্ন না করে, এই আশঙ্কায় আমাদের কয়েকটি কথা বলিতে হইল । আশা করি, জীবনের শেষভাগে উপেন বাবুর হায়ে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের কথাগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে যত্নবান হইবেন ।

“শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনম্ ।

অব্যয়ব্রহ্মসম্পর্কাৎ ভূতগুদ্বিরিয়ং মতা ॥

ভূতগুদ্বিঃ বিনা কর্ত্ত্বুর্জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।

ভবান্ত নিফলাঃ সর্বা যথাবিধ্যপ্যনুষ্ঠিতাঃ ॥”

এই উদ্ধৃত বচনটীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু লিখিতেছেন,—
“শ্রীভগবতোহংশস্থেন সম্বন্ধাদ্ভেতোবিশোধনং । অব্যয়ব্রহ্মণো জীবতত্ত্বস্ত সম্পর্কাৎ তদানুকতয়া ।” ভূতগুদ্বি ব্যতীত সকল হোমাদি ক্রিয়া নিফলা । দীক্ষাবিধানে বায়ু-অগ্নিব্রহ্মণ বীজদ্বারা কৃতভূতগুদ্বি শিষ্যকে গুরুদেব দীক্ষাবিধি শুনাইবেন । ভূতগুদ্বি ব্যতীত শিষ্যের ক্রিয়া নিফলা হয় ।

দীক্ষা-হোমবিধিবেশে সংস্কার করিয়া অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিতে হয় । ভূতগুদ্বি ব্যতীত অগ্নির স্বরূপ বোধাপ্তি সম্ভবপর হয় না । শ্রুতি বলেন,—“ঋং দেবেষু ব্রাহ্মণোহস্তৃহং মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণনুপধাবতি উপধাবামি ।” অর্থাৎ “হে অগ্নে, তুমি দেবলোকে ব্রাহ্মণ, আমি মনুষ্যলোকে ব্রাহ্মণ । যেহেতু ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের সমীপে গমন করে, ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের সেবা করে, এজন্ত হে অগ্নে! আমি আপনার সেবা করিব” ইত্যাদি । দীক্ষা-বিধানে

সংস্কৃত অগ্নির প্রতিষ্ঠাবিধি ভূতশুদ্ধি-ক্রিয়াবর্জিত নহে। বারাহী দীক্ষা-বিধিতে অগ্নির দগ্ধবিধ সংস্কার সাগ্নিক ব্রাহ্মণতা হইতে ভেদ প্রতিপন্ন করা বিহিত নহে।

বিশেষতঃ দীক্ষাবিধানের অঙ্গপুণ্য অগ্নির যে দশ সংস্কার, তাহা বিয়ুগ্ধক্রিবাচক সাগ্নিক ব্রাহ্মণের ভূতশুদ্ধি ক্রিয়ায় পৃথক্ নহে। আবার দীক্ষাবিধানকালে “ভগবতে বিষ্ণবে সর্বরূপিণে” প্রভৃতি ষোড়শাক্ষর মন্ত্রদ্বারা নির্দিষ্ট অগ্নি শক্তিমান্ হইতে অপৃথক্ বিচার জানিতে হইবে। সেকালে উপাসক ব্রাহ্মণতত্ত্বের অগ্নিতত্ত্ব সহ পৃথক্ করণা বিহিত নহে, ক্রমদীপিকা-টীকাকার স্পষ্টতঃই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সাগ্নিক বিপ্রের পিতৃ-মাতৃ-বিবাহ তাঁহার নিজ সংস্কারেরই অন্তর্ভুক্ত। গর্ভাধান যেরূপ ব্রহ্মচারীর দশসংস্কারান্তর্গত শৌক্রেদেহ-লাভের পূর্বানুষ্ঠান, মাতা-পিতার বিবাহও ব্রহ্মচারীর দশসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত।

“অতাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।

কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥”

যাঁহার জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও রূপমদে মত্ত, তাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত লীলা দর্শন করিতে পারেন না। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা অপ্রাকৃত ধাম বা অপ্রাকৃত-লীলা দর্শন হয় না। গৌরপ্রণয়ী নিক্ষিঞ্চন ভক্তজনের অকৃত্রিম-সেবাক্ষেপে শ্রীধামকূপা লাভ হয়। সেবোন্মুখ-নেত্রে ধামের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে।

যোগমায়াদ্বারা সমাবৃত থাকিয়া শ্রীধাম ভক্তরূপগণের নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না। যে নীলাচল ক্ষেত্র একদিন শুদ্ধ হরিকথার প্রেমবত্নায় প্রাণিত হইয়াছিল, সেই শ্রীক্ষেত্র এখন বহির্গুণের নিকট স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে, ছাত, পান, স্ত্রী ও পশুহনন প্রভৃতি কলির কত বিভীষিকাময়ী লীলা প্রদর্শন করিতেছেন। তাহার কারণ শুদ্ধ হরিকীর্তনের অভাব।

নীলাচলবাসী আজ ছুঁভিক্ষে প্রণীড়িত। সে ছুঁভিক্ষের কারণ শুদ্ধ হরিকথার ছুঁভিক্ষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। হরিকীর্তনের ছুঁভিক্ষ হইলেই দ্বিতাপ, দেহ, দ্রবণ ও স্নানমিত্ত শোক, স্পৃহা, পরিভব ও বিপুল লোভ এবং সুরোগ বুদ্ধিয়া তৎসঙ্গে অধর্মে-বন্ধু কলির প্রবেশ।

তাই সেই স্থানে হরিকথার নামে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়ের কথা, নিগুণ মঠ বা হরিনিকেতনের আবরণে কলির স্থান, সংকীর্ণ-যজ্ঞের নামে ভোগযজ্ঞ ও তৎফলে পিতৃবুদ্ধি, সাত্ত্বতশাস্ত্রালোচনা ও আচার্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাগণ বিশ্ববাসী মানব-মণ্ডলীকে জাতিধর্ম-নির্ধিশেষে সংকীর্ণন-যন্ত্রে আব্বান করিতেছেন। ‘জীবের স্বরূপ হয় কষ্ণের নিত্যদাস।’ শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্তন ব্যতীত সাধক ও দিক্বেব আর অন্য সাধন বা সাধ্য নাই। সুতরাং যে হরিকীর্তনে মনুষ্যমাত্রেরই আধিকার আছে, তাহাতে নিত্য মঙ্গলপ্রয়াসী ব্যক্তিরই যোগদান বাঞ্ছনীয়।

শ্রীগৌরসুন্দর বৃক্ষলতা, ব্যাঘ্র, শূণ্ড প্রভৃতি জন্তকেও হরিনাম শুনাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এই নীলাচল ক্ষেত্রে শিবানন্দ সেনের ভাগ্যবান কুকুর নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণব-উচ্ছ্রিষ্ট গ্রহণ ও হরিকথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিতে করিতে অন্তর্ধান হইয়াছিল। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর হরিভজন-পরায়ণ ব্যক্তির জাতিকুল নিরর্থক বুঝাইতে যবনকূলে উদ্ভূত হইয়াও ঝামাচার্য্য জগদগুরু হইয়াছিলেন। তিনি এই শ্রীক্ষেত্রে অপততভাবে প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। তিনি শ্রীমদ্ব্যহাশ্রয় চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বলিতে বলিতে নির্য্যাণলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই স্থানেই শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণ লইয়া ঠাকুর হরিদাসের শাক্ত-মহোৎসব করিয়াছিলেন। ভক্তগণ শ্রীহরিদাসের পাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

কৃষ্ণস্বরূপ বিমল প্রেমের সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী কেন ?

“পরম তত্ত্বের যত প্রকার ভাব জগতে লক্ষ্য হইয়ছে, সে সমস্ত ভাবের অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপ ভাবটাই বিমল প্রেমের একমাত্র অধিকতম উপযোগী ভাব। মুসলমান শাস্ত্রে যে ‘আল্লা’র ভাব স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বিমলপ্রেম নিযুক্ত হইতে পারে না ; অতিপ্রিয়বন্ধু পয়গম্বরও তাহার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। কেন না, উপাস্ত-তত্ত্ব সধ্যগত হইয়াও ঐশ্বর্য্য-বশতঃ উপাসক হইতে দূরে থাকেন। খৃষ্টীয় ধর্ম যে ‘গড’-এর ভাবনা করেন, তিনিও অত্যন্ত দূরগত-তত্ত্ব। ব্রহ্মের ত’ কথাই নাই। নারায়ণও জীবের সহজ-প্রেমের প্রাপ্য বস্তু হন না ; পরন্তু কৃষ্ণই একমাত্র বিমল-প্রেমের সাক্ষাৎ বিষয়স্বরূপে চিন্ময় ব্রজধামে নিত্য-বিরাজমান আছেন।”

২। চরম গাতীত কি বিগুহ প্রেমের বিষয়াস্তর নাই ?

“যদিও ভাষাত্তরে কণ, বদাচন, গোপ, গোপী, গোধন, যমুনা, কদম প্রভৃতি বদাচন কোন ভাল লক্ষিত নাও হয়, তথাপি বিগুহ প্রেমদায়কদিগের তত্ত্বরক্ষণে লক্ষিত নাম ধাম, উপকরণ, রূপ ও লীলা-সমুদয় প্রকারান্তরে ও বাক্যান্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত বিগুহ প্রেমের বিষয়াস্তর নাই।”

—চৈঃ শিঃ ১।১

৩। বিষ্ণুতত্ত্বের চরম প্রকাশ কি ?

“শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণুতত্ত্বের চরম প্রকাশ। সত্ত্বগুণের উপাসনায় জীব নিগুণ হইলে কৃষ্ণতত্ত্বের সেবা প্রাপ্ত হন।”

—‘তত্ত্বৎকর্মপ্রবর্তন,’ সঃ তোঃ ১১।৬

৪। ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ কি পৃথক্ তত্ত্ব ?

“ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ বস্তুতঃ একই তত্ত্ব; যিনি যেক্রপ ও যতদূর দেখিতে পান, তিনি তাহাই দেখিয়া তাঁহাকেই সর্বোত্তম বলিয়া স্থির করেন।”

—চৈঃ শিঃ, ১।৩

৫। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য কি ?

“শ্রীকৃষ্ণ স চিদানন্দ-বিগ্রহঃ; পরমাত্মা ও ব্রহ্মের আশ্রয়।”

—শ্রীমঃ শিঃ, ৩য় পঃ

৬। ব্রহ্ম ও ভগবানের স্বরূপ ও তাঁহাদের উপাসনাগত ফলের তারতম্য কি ?

“ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম ভগবান্ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব ন’ন। ব্রহ্ম সেই ভগবানের মহা-বিভূতি; ব্রহ্ম—ব্যতিরেক গুণ অর্থাৎ অপ্রকটিত-শক্তি-সম্পন্নতা-ভাব-মাত্র। প্রকটিত-অবিচিন্ত্য-অদ্বুত বিচিন্ত-শক্তিবিশিষ্ট সেই বস্তুই ভগবান্; এইজন্মই সগুণ-নিগুণাদি বিরুদ্ধ গুণ-সমূহ তাঁহাতে সামঞ্জস্যরূপে প্রবিষ্ট আছে। সুতরাং ব্রহ্ম কেবল গুরুজ্ঞান সংযোগ দ্বারা জীবের মোক্ষমাত্র তুচ্ছ-স্থখ-লাভ। ভগবানে নির্মল ভক্তিরসাধন-রূপ ভূমা-স্বখের সম্ভব।”

—যঃ ভাঃ তাৎপর্যানুবাদ

৭। ব্রহ্ম ও ভগবৎস্বরূপের বৈশিষ্ট্য কি ?

“শরীরাপিণ্ডের ছায় কৃষ্ণপাদপদ্মই স্বরূপ ও সুখাধার। ব্রহ্ম কেবল

সেই সুখ-মাত্র, কিন্তু সুখাধার ন'ন। ভগবান্ ও ব্রহ্মে এই প্রকার ভেদ কেবল ভগবানের অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ-শক্তি হইতে পর্যাবসিত হয়।”

—বৃ: ভা:, তাৎপর্যানুবাদ

৮। শ্রীকৃষ্ণে কি দেহ-দেহি-ভেদ আছে?

“শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে জড়ীয় শরীরধারী জীবের আশ্রয় দেহ-দেহি-ভেদ ও ধর্ম-ধর্মি-ভেদ নাই। অবয়বজ্ঞান-স্বরূপে যে দেহ, সেই দেহী; যে ধর্ম, সেই ধর্মী। কৃষ্ণ-স্বরূপ একস্থান-স্থিত মধ্যমাকার হইলেও সর্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থিত।”

—শ্রীম: শি:, ৩য় প:

৯। পরব্রহ্মকে নির্কিংশেষ বলা অযৌক্তিক কেন?

“যাহা কিছু আছে, তাহার একটি বিশেষ ধর্ম আছে, যদ্বারা সে-বস্তু অগ্নি বস্তু হইতে স্বত: ভিন্ন হইতে পারে। বিশেষ নাই, তবে বস্তুর অস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়। পরব্রহ্ম নির্কিংশেষ হইলে সৃষ্ট-বস্তু হইতে বা প্রপঞ্চ হইতে কিরূপে পৃথক্ হইতে পারিতেন? যদি সৃষ্ট-বস্তু হইতে তাঁহাকে পৃথক্ বলিতে না পারি, তবে সৃষ্টিকর্তা ও জগৎ এক হইয়া যায়! আশা, ভরসা, ভয়, তর্ক ও সর্বপ্রকার জ্ঞান নাস্তিত্বে পর্যাবসিত হইয়া পড়ে।”

—প্রে: প্র:, ৯ম প্র:

১০। পরমেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব সম্ভব নহে কেন?

“পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পুরুষ, তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই, সমস্তই তাঁহার অধীন। তাঁহার হিংসা উৎপন্ন করিতে পারে, এমত কিছুই নাই। তাঁহার প্রতি ভক্তি অর্জন করিতে যে-কিছু কার্য্য করা যায়, তিনি হৃদয়নিষ্ঠ। লক্ষ্য করিয়া তাহার ফল দান করেন।”

—প্রে: প্র:, ৫ম প্র:

১১। ব্রহ্মকে কেন ভগবত্ত্বের অঙ্গকান্তি বলা হয়?

“ভগবৎস্বরূপই পূর্ণ-স্বরূপ; যেহেতু তাহাই বিশেষ্য-তত্ত্ব; ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই বিশেষ্যের বিশেষণ-দ্বয়। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র ভগবান্ বই আর কিছু ছিল না, তখন ব্রহ্ম ছিল না। জগৎ সৃষ্ট হইলে ‘সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ’—এই ভাবে ভগবানের একটি বিশ্ব-সম্বন্ধী আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয়। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে দুইটী ভাব আছে। একটি—‘সর্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম’; দ্বিতীয়টী—‘সমস্ত সৃষ্ট বা সঞ্জন বস্তুর ব্যতিরেক-চিন্তাবিশেষ। উভয় ভাবই

বিশ্ব-সম্বন্ধী ভাব। অতএব ব্রহ্মই ভগবানের জ্যোতিঃস্বরূপ বিশ্ব-সম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত। এস্থলে ব্রহ্মকে ভগবানের অঙ্গকান্তি বলিলে যথার্থের চরিতার্থই হইয়া থাকে।”

—‘বস্তুনির্দেশ’, স: তো: ২৬

১২। ব্রহ্ম কি বস্তু? তিনি পূর্ণ-সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ প্রকাশ?

“শ্রীকৃষ্ণের যশোরশি জ্যোতীরূপে সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়া ‘ব্রহ্ম’ নামে অভিহিত হন।”

—শ্রীম: শি: ৩য় প:

১৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব যে ব্রহ্মের আশ্রয়, তৎসম্বন্ধে গীতা-প্রমাণ কি?

“নিগুণ-সবিশেষ-তত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানিদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক স্বরূপ ব্রজরস,—এই সমুদায়ই নিগুণ-সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে।”

রসিকরঞ্জন ভাষ্য ১৪।২৭

১৪। ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম পার্থক্য কি?

“পরশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই পরব্রহ্ম। নিঃশক্তিক-নির্কিংশেষ-ব্রহ্ম পরব্রহ্মেরই একদেশ-মাত্র।”

—ত: বি:, ১ম অনু:, ৩২

১৫। পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ কি কি?

“পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ—অর্থাৎ ব্যষ্টি-প্রকাশ ও সমষ্টি-প্রকাশ। সমষ্টি-প্রকাশ-দ্বারা তিনি বিরাট—ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ। ব্যষ্টি-প্রকাশ-দ্বারা তিনি জীবের সহচর, তৎস্বদয়বাদী অগুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ-বিশেষ।”

—চৈ: শি: ৫।৩

১৬। ব্রহ্ম-দর্শন, পরমাত্ম-দর্শন ও ভগবদ্-দর্শনে পার্থক্য কি?

“ব্রহ্ম-দর্শন ও পরমাত্ম-দর্শন—সোপাধিক অর্থাৎ মায়িক উপাধির বিপরীত-ভাবে ব্রহ্ম-দর্শন এবং মায়িক উপাধির অন্বয়ভাবে পরমাত্ম-দর্শন হয়। কিন্তু নিরূপাধিক চিচ্ছক্ষুদ্বারা বস্তু দর্শন করিলে একমাত্র চিন্ময় ভগবৎস্বরূপ মাত্র লক্ষিত হয়।”

—শ্রীম: শি:, ৪র্থ প:

১৭। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের স্বরূপ কি ?

“নিঃশক্তি নির্কিশেষ ভগবদ্ভাবই ব্রহ্ম এবং শক্তিমান্ স বিশেষ-ব্রহ্মই ভগবান্। অতএব ভগবানই স্বরূপতত্ত্ব, ব্রহ্ম কেবল তাঁহার স্বরূপের নির্কিশেষ আবির্ভাবরূপ জ্যোতিঃ এবং পরমাত্মাও তাঁহারই জগৎ-প্রবিষ্ট অংশ।”

—শ্রীমঃ শিঃ ৪র্থ পঃ

১৮। অদ্বয়-তত্ত্ব কৃষ্ণে কোন্ সময় নির্কিশেষ-ব্রহ্ম-বিচার উপস্থিত হয় ?

“অনন্ত বৈভবযুক্ত কৃষ্ণ এক অদ্বয়তত্ত্ব। ‘জ্ঞান’-চর্চায় ইচ্ছা ও শক্তিকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিলে সেই অদ্বয়তত্ত্বকে নির্কিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া লক্ষ্য হয়।”

—‘নাম মাহাত্ম্য-সূচনা’, হঃ চিঃ

১৯। কৃষ্ণলীলার স্বরূপ কি ?

“কৃষ্ণ সে পুরুষ এক, নিত্য বৃন্দাবনে।

জীবগণ নারীবৃন্দ, রমে কৃষ্ণসনে ॥

সেই-ত’ আনন্দ-লীলা যা’র নাট অন্ত।

অতএব কৃষ্ণলীলা অখণ্ড-অনন্ত ॥”

—‘সম্বন্ধ-বিজ্ঞান লক্ষণ-উপলব্ধি’ ১, কঃ কলতরু

২০। কৃষ্ণের স্বকীয় ও পারকীয় রসের বিচার কিরূপ ?

“কৃষ্ণের আত্মারামতা-ধর্ম নিত্য হইলেও লীলারামতা-ধর্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধ-ধর্ম সামঞ্জস্যময় পরমপুরুষে পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম। কৃষ্ণতত্ত্বের এক কেন্দ্রে আত্মারামতা, তদ্বিপরীত কেন্দ্রে লীলারামতার পবাকাদ্বারূপ পারকীয়তা।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭৭

২১। আশ্রয় ও বিষয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা কোন্ কোন্ তত্ত্ব ?

“শ্রীরাধিকার অনুরাগরূপে আশ্রয় তত্ত্বের ইয়ত্তা, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ শঙ্কর-রূপে বিষয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭৭

২২। কৃষ্ণের প্রকটাপ্রকট-লীলার স্বরূপ কি ?

“কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ মানবের নয়ন-গোচর যে বৃন্দাবন-লীলা, তাহাই প্রকট-কৃষ্ণলীলা এবং যাহা চক্ষুচক্ষে লক্ষিত হয় না, সেই কৃষ্ণলীলাই অপ্রকট লীলা। গোলোকে অপ্রকট-লীলা সর্বদা

প্রকট এবং গোকুলে অপ্রকট-লীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে প্রকট হন।”

—ব্র: সং, ৫৮৩

২৩। ‘মথুরা’, ‘বসুদেব’, ‘দেবকী’, ‘কংস’, ‘কংস-কারাগার’—এ সকল তত্ত্বত: কি ?

“মহাপুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, ব্রহ্মজ্ঞান-বিভাগরূপ মথুরায় বিগুহ সত্ত্ব-স্বরূপ বসুদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। সাত্বতদিগের বংশ-সম্মত বসুদেব নাস্তিক্যরূপ কংসের মনোময়ী ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করিলেন। ভোজাধম কংস ঐ দম্পতি হইতে ভগবদ্ভাবের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া স্মৃতিরূপ কারাগারে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিলেন।” (ক্রমশ:)

—কৃ: সং, ৪১১

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

—

জগদগুরু পরমহংসস্বামী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুর

(১)

প্রণাম তোমা’ জগদগুরু

মাগ তোমার বশ্যতা,

তোমার পদ-স্পর্শে পূত

বসুন্ধরার মৃত্তিকা ।

জহরীতেই জহর চেনে,—

ভক্ত-সাধক তোমায় জানে,

ঐ মহিমা বুঝার মত

নাই তো আমার যোগ্যতা !

(২)

গৌড়ীয়-রবি আচার্য্য-বর

তুমি গৌর-নিজ-জন,

বাণী-বিনোদ-ধারার পুনঃ

করলে শুদ্ধ প্রবর্তন ।

তোমায় পেয়ে গরব করি,

তোমায় নিয়ে কাব্য গড়ি,

ধেয়ানে যে ধ্যান করি গো

নিত্য তোমার শ্রীচরণ ।

(৩)

ব্যাসাভিন্ন দয়াল প্রভু

কৃষ্ণ-প্রেমে তুমিই ধনী,

কৃষ্ণ পেতে তোমার পদে

লুটায় যত জ্ঞানী-গুণী ।

ফণী-শিরে মানায় মনি—

ভব-ভালের শোভা তুমি ;

তোমায় ঘিরে নিত্য যে তাই

উঠ্ছে কত জয়ধ্বনি ।

(৪)

তুমিই মোদের পরম শরণ—

মনে প্রাণে তোমায় স্মরি,

বৈষ্ণবতার মহা আদর্শ

স্থাপিলে এ জগৎ জুড়ি' ।

ভুবনে তুমি চির সত্য,

দরশনে কর পবিত্র,

প্রাণের ঠাকুর তোমার পদে

রাখ আমায় কৃপা করি' ।

সন্দভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দভ-২৮)

শ্রীবৃন্দাবনাদি-ধামে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট, অপ্রকট উভয় লীলাই বিজ্ঞমান। এক শ্রীকৃষ্ণ যেমন লীলার নিমিত্ত বহু প্রকাশ আবিষ্কার করেন, ধামেরও তদ্রূপ লীলাধিষ্ঠানহেতু প্রকাশ-ভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে এক লীলাস্থান দ্বারা অল্প লীলাস্থানসকল আক্রান্ত হয় না। প্রকট লীলাতেও না মিশিয়া লীলাসকল সমাহিত হইতে পারে; ধামসমূহে একরূপ বিচিত্র অবকাশ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—দ্বাদশ যোজন পরিমিত দ্বারকা পুরীতে ক্রোশবয় পরিমিত কোটিগৃহের সমাবেশ। আবার অল্প পরিমাণ গোবর্দ্ধন-গর্ভে (শ্রীকৃষ্ণে গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলায়) ব্রহ্মা দেখিলেন যে, শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষ-তৃণ-পক্ষী প্রভৃতির যথাযোগ্য অবকাশ থাকাসত্ত্বেও তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডাদি অনন্ত বস্তুর সমাবেশ রহিয়াছে। অপর দৃষ্টান্ত—শ্রীনারদদৃষ্ট বৈভবে একই সময়ে প্রাতঃকালীন, মধ্যাহ্নকালীন ও সাংকালীন লীলার সমাবেশ।

সকল ধামেরই এই প্রকার বিচিত্র লীলাসমাধানের জন্ত প্রকাশভেদ ঘটিয়া থাকে। অপ্রকটলীলাগত প্রকাশভেদ সম্বন্ধে যামলে রুদ্রগৌরী সংবাদে উক্ত হইয়াছে—হে গৌরি! শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি বীথিতে (পথে) রত্নময়-অঙ্গ কল্পবৃক্ষসকল অবস্থিত। তন্মধ্যে কতিপয় বৃক্ষ কোটি পূর্ণচন্দ্র-কিরণ-সমুজ্জ্বল। কতিপয় বৃক্ষ নিশাবসানে সমুদিত সূর্য্যদ্যুতিতুল্য দ্যুতিমান হইয়া বিরাজিত। কতিপয় বৃক্ষ এসকল হইতেও দীপ্তিশালী। সে সকল বৃক্ষের কান্তি সুবর্ণরচিত মুকুলের মত। যে ফুল, যে ফল, যখন অহুসঙ্কান করা যায়, বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষসকল সেই ফুল-ফল তখনই প্রসব করে। ব্রহ্মসংহিতায় দেখা যায়—

“শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো

ক্রমা ভূমিশ্চিন্তামণি-গণময়ী তোষমমৃতম্।

কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশীপ্রিয়সখী

চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদমপি চ ॥

স যত্র ক্ষীরাক্ষিঃ শ্রবতি সুরভীভ্যশ্চ স্তমহান্

নিমেষার্ক্যার্থো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।

ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং

বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিত্তিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥”

অর্থাৎ যেখানে লক্ষ্মীগণ কান্ত পরমপুরুষ কান্ত বৃক্ষগণ কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, জল অমৃত, কলা গান, গমন নৃত্য বংশী প্রিয়সখী, জ্যোতি ও আশ্রয়, অপ্রাকৃত চিদানন্দ সুরভিগণ ইত্যাদি সমুদায় ক্ষীরসমুদ্র প্রবাহিত হয়, যথায় নিমেষাঙ্গকালও ব্যথা অতিত হয় না—সহ শ্বেতদ্বীপকে আমি ভজন করি, যাহাকে একাগ্রে অগ্নি অগ্নিসংখ্যক সাধুপুরুষ ‘গোলোক’ বলিয়া জানেন।

সে ধাম যদিও স্বপ্রকাশ, তথাপি তথায় লৌকিক লীলামাধুর্য্য নির্বাহ-জন্ত মহাপ্রলয়ে অবিনশ্বর সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ বিद्यমান। সেই জ্যোতি এবং গোলোকবাসিগণের আশ্রয় বত বস্ত্র সবই চিদানন্দরূপ পরমতত্ত্ববস্ত্র, প্রাকৃত নহে; তথায় চন্দ্রসর্ব্বোপর্য্য বিলক্ষণরূপে স্থিতি। গীতমায় তন্ত্রে ‘সমানোদিত চন্দ্রার্ক’ বলিয়া উক্তি আছে। প্রতি রাশি ত পূর্ণচন্দ্র বলিয়া, সমানোদিত চন্দ্র, বলা হয়। বলা বাহুল্য যে, সূর্য্য প্রতিদিন সমানভাবে উদিত হয়। তথায় যদি কালের পরিবর্তন না ঘটে, তবে পৃথিবীর লীলার স্বরূপ-হানি হয়। যেমন—প্রাতে জাগরণ, মুখপ্রক্ষালনাদি প্রাতঃ লীলা, আসন্নব সময়ে গোষ্ঠে গমন ইত্যাদি। সুতরাং সময়ের আবর্তন না থাকলে বিভিন্ন কালোচিত লীলা নির্বাহ হয় না। তাহে সেই আবর্তন কালের অনুসারে না হইয়া লীলাঅনুসারে হয়।

ব্রহ্মা পূর্বে বলিয়াছেন—আদিপুরুষ গোবিন্দেই ভজন করি, পবে বলিলেন—শ্বেতদ্বীপেরও ভজন করি। শ্বেত-দ্বীপ, দোষবাহিত, দ্বীপ। দ্বীপ যেমন সমুদ্র মধ্যে থাকিয়া পৃথিবীর অগ্নিস্থানের সঙ্গশূন্য থাকে তদ্রূপ ইহা অগ্নিসঙ্গশূন্য অর্থাৎ সকল স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ। সর্বোপরে যেমন পক্ষী সঙ্গসম্পর্ক শূন্য হইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ গোলোক পাখিবসম্পর্কশূন্য হইয়া বর্তমান।

নারদপঞ্চরাত্রে ‘শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে’ শ্বেতদ্বীপের শোভা এইভাবে বর্ণিত—
তাহার চতুর্দিক, কোণসকল, উর্দ্ধ অধঃ—দশদিকে দশাদিকপাল অবস্থিত। জল সেখানে ক্ষীরামৃত। বৃক্ষসকল, কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, লক্ষ ক্রীড়া-বিহঙ্গ, বহু প্রকার সুরভি, নানাচিত্রিত রাসমণ্ডল ভূমি, কেলিকুঞ্জাদি তথায় শোভা পাইতেছে। প্রাচীর-ছত্রেয় রত্নসকল শেষের কণার স্তায় অপরাজিত। বৃন্দাবনের অপ্রকট লীলাভূগত প্রকাশই গোলোক।

প্রকটলীলাভূগত প্রকাশে যে প্রাকৃত প্রদেশের মত দেখা যায়, তাহা শ্রীভগবানের মত স্বচ্ছাক্রমে লৌকিক লীলাবিশেষবশতঃ বুদ্ধিতে হইবে।

অর্থাৎ ভগবান্ যেমন স্বেচ্ছাক্রমে লৌকিক লীলা অঙ্গীকার করিয়া কোন কোন লোকচেষ্টা প্রকাশ করেন, শ্রীধামও তদ্রূপ নরলোকে প্রাকট্যাহেতু লৌকিক লীলাবিশেষ অঙ্গীকার করিয়া জাগতিক প্রদেশ বিশেষের, রীতি-বিশেষের ত্রায় রীতি প্রকাশ করেন। যেমন বৃন্দাবনের কোন স্থানে যমুনা প্রবাহে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কোথাও নূতন চড়া পড়িতেছে, কোন স্থানে বন সৃষ্টি হইতেছে, কোন বন প্রান্তরে পরিণত হইতেছে ইত্যাদি। এসকল কালকৃত পরিণাম নহে, কিন্তু লীলাগত জানিতে হইবে; কারণ দৃশ্যমান ধামসকলের এ প্রপঞ্চাতীত স্বকৃতি-স্বত্বিতে উক্ত হইয়াছে। যথা—

বসন্তি যে মথুরায়াং বিষ্ণুৎপা হি তে খলু।

অজ্ঞানান্তান্ পশুন্তি পশুন্তি জ্ঞানচক্ষুঃ ॥ (আদিবাহাঃ)

মথুরায় বাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বিষ্ণুরূপধারী। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। তাঁহারা কেবল জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির দৃশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীবলদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

অহো অমী দেববরামরাচ্চিতং পাদাশুভ্রং তে স্ময়নঃ-ফল'র্হণম্।

নমস্তাপাদায় শিখাভিরাম্ননস্তমোপহৃত্যৈ তরুজন্ম যংকৃতম্ ॥

(শ্রীভাঃ ১০।১৫।৫)

হে দেববর! যাঁহারা তমোনাশের জন্ত তরুজন্ম প্রাপ্ত করিয়াছে, সেই বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষসকল ফলফুল উপহার দিয়া শিখাসমূহ দ্বারা অমরাচ্চিত আপনার চরণকমলে প্রণাম করিতেছে; অর্থাৎ বৃন্দাবনের বৃক্ষসকল দর্শন করিলে বা তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিলে সংসারী জীবের তমোনাশ হইবে। এজন্য তাঁহারা বৃন্দাবনে বৃক্ষজন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

সপশ্চেবাতিতঃ পশ্যন্ দিশোহপশ্যৎ পুরঃ স্থিতম্।

বৃন্দাবনং জনাজীব্যক্রমাকীর্ণং সমাপ্রিঃ ॥

যত্র নৈসর্গদুর্কৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ।

মিত্রাণীবাজিতাবাসজ্রতরুতর্ষকাদিকম্ ॥

(শ্রী ভাঃ ১০।১৩।৫২-৬)

ব্রহ্মা সকল দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ সম্মুখে দেখিলেন, জনগণের জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী বহু বৃক্ষাকীর্ণ সমাপ্রিয় বৃন্দাবন বিরাজ করিতেছে, যাহাতে স্বভাবতঃ দুর্নিবার শত্রুতাবিশিষ্ট মনুষ্য, পশু প্রভৃতি

প্রাণীসকল মিত্রের স্থায় বাস করিতেছে ; আর সেই ভগবন্নিবাস-স্থলী হইতে
ক্রোধ-লোভাদি পলায়ন করিয়াছে । সমাপ্রিয় অর্থাৎ সম—আত্মারামগণের
সম শ্রীভগবানেরও, আ—সর্বতোভাবে, প্রিয় ।

—ত্রিদিগ্গিশ্বামী শ্রীমন্ত্ৰিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

সনাতনে-বন্ধন-মোচন

(নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৬ পৃষ্ঠার পর)

বাদশা—ছত্রী, সাকর মল্লিকের কিরূপ অবস্থা বুঝ বল দেখি ? সো'কি
দবিরখাসের মত আমায় ছেড়ে চলে যাবে ?

ছত্রী—কি জানি হজুর, মনটা কিন্তু তাঁর ভাল নয় ? সব সময় কি যেন একটা
ভাবেন, আর আপন মনে সেই সাধুর কথা বলেন । সাধু-তো হজুর
আমিও দেখেছি ; কিন্তু আমার তো ওরকম হয় না ।

বাদশা—(উদ্বিগ্ন চিত্তে) এ'্যা, সাকরমল্লিক সব সময় সেই সাধুর চিন্তা করছে
নাকি ? কি বলছ তুমি ছত্রী !

ছত্রী—হ্যাঁ জাঁহাপনা, আমি ঠিকই বলছি । আমি হলপ করে বলছি,
আমার কথায় এতটুকু মিথ্যে নেই ।

বাদশা—তাইতো, তুমি আমায় বড় উদ্বিগ্ন করে তুললে ছত্রী ! আমার মন
বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছে । তা'হলে কি আমি যা' ভাবছি শেষে
তাই হ'লো ? তবে তো তাঁর অগুণ কিছু হয় নি ! হায়, হায় ! ঐ
বৈষ্ণব তার কি করবে ?

ছত্রী—হজুর, বৈষ্ণব গেছে ভালই হয়েছে । তাঁর মাথা বিগড়ে গেছে ।
ছ'ছটো ভাই সংসার ছেড়ে চলে গেছে ; তার একটা দাগা আছে
তো হজুর ।

বাদশা—বৈষ্ণব কি তা'কে ভাল করতে পারবে ?

ছত্রী—পারবে বৈ কি হজুর—পারবে । এ যে সে বৈষ্ণব নয়, এ বাংলার
মধ্যে সব চেয়ে বড় বৈষ্ণব ।

বাদশা—(উদ্বিগ্ন চিত্তে) তাই যেন হয়,—তাই যেন হয় । যদি বৈষ্ণব

হাত-যশ থাকে, আর আমার বরাং নেহাৎ ভাল হয় তবে সাকর-মল্লিকের মাথা ভাল হ'বে, তাকে আমার রাজদরবারে ফিরে পাব।

আচ্ছা ছত্রী, একবার সাকরমল্লিককে গিয়ে দেখে এলে হয় না ?

ছত্রী—হজুর, আপনি যদি তাঁর কাছে যেতে চান তো বলুন, তাঁকে আমি সংবাদ দিয়ে আসি।

বাদশা—না ছত্রী, এবার আমি সংবাদ দিয়ে প্রকাশে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব না। বৈদ্য ফিরে আসুক। বৈদ্যের কাছে তার খবর জানি, তারপর ব্যবস্থা। যদি যেতে হয়, আমি গোপনে হঠাৎ গিয়ে দেখবো সে কি করছে ও কেমন আছে।

ছত্রী—জাঁহাপনা, আমার একটা প্রার্থনা আছে।

বাদশা—কি, বল ?

ছত্রী—বল্‌ছিলাম, দয়া করে মন্ত্রীজীর পথে বাধা দেবেন না। তা'হলে তিনি দুঃখে গুমরে গুমরে থেকে মারা যাবেন।

বাদশা—দৈয়ং হাসিয়া। কেন, ও-কথা হঠাৎ বলে ফেললে ?

ছত্রী—আজ্ঞে, তিনি স্মৃতিবান্ পুরুষ। নইলে সাধুর জন্তে তাঁর মন অমন উতলা হবে কেন ? আমি ভেবেছিলাম এ খবর আপনাকে জানানো না, পাছে তাঁর কোন অনিষ্ট হয়। কিন্তু আমার আজ আর সে ভয় নেই। আজ আমি দেখছি, আপনি গুণগ্রাহী, কৃপাবান্, ধর্মনিষ্ঠ পুরুষ। আপনি কখনও এমন মন্ত্রীর কার্যে বাধা সৃষ্টি করবেন না—আমি বিশ্বাস করি। আপনি রাজা, বিফুর অংশ আপনাতে রয়েছে। আপনি প্রজাগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আপনি ইচ্ছা করলে সব করতে পারেন। (হাত জোড় করিয়া) তাই অনুরোধ, মন্ত্রীজী যে পথে শাস্তি পান, সেই পথে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি।

বাদশা—তুমি কি ভেবেছো ছত্রী, সাকরমল্লিক চলে গেলে তোমার পক্ষে সুবিধা হয়, না ? তাব্‌ছ,—তুমি প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হবে !

ছত্রী—আজ্ঞে না হজুর, আমি তা' ভেবে বলি নি। আমি কোন দিন স্বপনেও তা' চিন্তা করি না। মাপ করবেন এ অধমকে।

(বাদশার পদতলে পড়িয়া হাত জোড় করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন)

বাদশা—আমি বিষয়টি নিজে তদন্ত ক'রে দেখে তারপর যা' উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় তাই করব স্থির করেছি।

ছত্রী—জি আজ্ঞে ! জাঁহাপনার যা' ইচ্ছা—

বাদশা—বৈধ ফিরে এলে তা'কে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো ।

ছত্রী—জি হজুর ! (সেলামপূর্বক শস্তান !)

বাদশা—(সিংহাসন হইতে উঠিয়া করজোড়ে) হে খোদা,—মেহেরবান,
সাকরমল্লিককে কেড়ে নিও না—কেড়ে নিও না ! (প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—নগর পথ

১ম নাগরিক ও ২য় নাগরিকের প্রবেশ ।

(১ম নাগরিক মুসলমান ধর্মাবলম্বী ও ২য় নাগরিক হিন্দু ধর্মাবলম্বী)

১ম নাগরিক—কেমন ভায়া, সন্ন্যাসীটা তো পালিয়ে গেছে ।

২য় নাগরিক—আঃ বেঁচেছি । আমাদের উৎপাতে পালিয়ে গেছে বল !

১ম নাগরিক—আলবৎ ! এমন কি যেতে চায় গো ! কত ভণ্ডামিই না
সাধুটা জানতো । নাচতে নাচতে আবার কেঁদে ফেলে,
আবার ধুলোয় পড়ে গড়াগড়ি যায় ; হিছাঁ বলে কিনা এসব
মহাপুরুষের লক্ষণ । হ্যাঁ গো মহাপুরুষ কি ওকে লে ?
আশ্চর্য্য ! হিছাঁর মত এমন ধর্ম আর ছানয়ায় আছে ?

২য় নাগরিক—তা' যা বলেছো—ও সমস্ত ভণ্ড ভণ্ডাম ছাড়া আর কিছু নয় ।

১ম নাগরিক—কথায় আসে, হুচুকে হিছাঁ একটা হুচুক পেলে সব ছুটলো
সেটা দেখতে । আরে বাবা, সত্যিকারের সাধুরা যে আবার
লোকসমাজে আসে তা তো কোনদিন শুনি ন । তারা তো
হিমালয়ের গুহায় বসে তপস্তা করে বলে জানতাম্ ।

২য় নাগরিক—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হয়, ঠিকই বলেছো ভায়া । সত্যিকারের সাধু
লোকালয়ে আসে নাকি ? এসব ভেঙ্কি ! তবে বাপু যাই
হোক, শুনেছি—সাধুটাকে দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর ।

১ম নাগরিক—আরে ভায়া, সুন্দর পুরুষ কি নেই গো ! ওতে কি এসে যায় ?

২য় নাগরিক—নারে ভায়া, এ যেন বড় সুন্দর ! নইলে দেখ্‌ছিস্ না—অত
লোক কি এমনি জোটেরে । আরো লোকে আসে চেহারা
দেখতে,—সৌন্দর্য্য দেখতে ।

১ম নাগরিক—সে তো বটেই । দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি ।
রামকেলি নগরে লোকের ভীড়ও জীবনে এমন কখনও দেখি

নি। গুণে শেষ করা যায় না—যত দূর দৃষ্টি যায়, শুধু দেখি
লোক আর লোক।

[কেশব ছত্রীর প্রবেশ]

ছত্রী—কোথায় এত লোক দেখলে?

১ম নাগরিক ও ২য় নাগরিক—আরে এসো এসো ছত্রী ভায়া!

১ম নাগরিক—তোমাদের সেই সন্ন্যাসীর কথাই হচ্ছে

ছত্রী—বেশ, তা'হলে তোমরা সন্ন্যাসীর গুণগান করুহ, কেমন?

২য় নাগরিক—১ম নাগরিকের প্রতি। আরে ভায়া এ রাজার লোক;
বুঝে স্মৃঝে কথা বলবি। যেন বে-ফাঁস কিছু বলে ফেলিস্ না।

১ম নাঃ—ছত্রী ভায়া, ও সময় কথা বাদ দাও। এখন রাজার খবর টবর
কিছু বল দেখি, জিগ্যেস করি।

ছত্রী—আরে, বল না হাই ক বলবে? আমি বাঘ না ভালুক! আমাকে
অতভয় কেন?

১ম নাগরিক—জান্ছি, দবিরখাস তো পালিয়ে গেছে। সাকরমল্লিক এখনও
টিকে আছে নাকি?

২য় নাগরিক—সাকরমল্লিক কে রে ভাই?

ছত্রী—উনি গোড়ের প্রধানমন্ত্রী সনাতন।

২য় নাগরিক—আরে সর্বনাশ! (১ম নাগরিকের প্রতি) মন্ত্রী-টন্ত্রীর কথা
পাডলি কেন রে? আদার ব্যাপারী আমরা জাহাজের খবরের
কি দরকার?

১ম নাগরিক—না, ভাই জিগ্যেস করছি। বল তো ছত্রী ভায়া, আমি কিছু
অন্য় করেছি?

ছত্রী—মন্ত্রীজীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বেশ ভাল না। বোধ হয় উনিও
বৃন্দাবনে চলে যাবেন।

২য় নাগরিক—তা হলে বাদশার তো খুব ভাবনা হয়ে গেছে?

১ম নাগরিক—তা' ভাবনা হবে না? অমন দক্ষ হ'শিয়ার মন্ত্রী কি আর
মিলবে?

ছত্রী—প্রধান মন্ত্রীর জ্ঞান বাদশাহ বিশেষ চিন্তিত। আমাদেরও মন-মেজাজ
ভাল নেই। তোমাদের এত আনন্দ শোকা পায় না।

যাও—এখন এখান থেকে মানে মানে সরে পড়

১ম নাঃ ও ২য় নাগরিক—জি আজ্ঞে, জো হুকুম ছত্রী ভায়া ।

(সেলাম করতঃ উভয়ের প্রস্থান)

ছত্রী—প্রধান মন্ত্রীর সমস্ত ঘটনাই একরকম বাদশাকে বলে ফেলেছি । প্রথম ভেবেছিলাম বাদশা তো যবন, হয়ত হিন্দুর উপর অত্যাচার করতে পারে । কিন্তু সে দিন প্রধান মন্ত্রীর উপর বাদশার টান দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারি নি,—মন্ত্রীজী যে সাধুর চিন্তা করছেন, এ কথা জানিয়ে দিয়েছি । অবশ্য বাদশাকে মন্ত্রীজীর প্রতি অনুগ্রহ দেখাবার জন্ত অনুরোধও করেছি । কি জানি মন্ত্রীজীর ভাগ্যে যে কি আছে ! আমি আর কি করব ? শেষে বাদশার কাছে গোপন করতে গিয়ে আমিও ধরা পড়ে যেতাম, শেষে আমারই বিপদ ঘনিয়ে আসতো । বাদশার থেকেও আমার বেশী ভয় লাগে এই দুই নাগরিকদের । এদের হৃদয় যেন পাষাণ দিয়ে তৈরী,—এতটুকু মায়া মমতা এদের মধ্যে নেই । সন্ন্যাসী এখান থেকে চলে যাওয়ায় তাঁর ভক্ত শিষ্যদের ক্ষতি হয়েছে বটে, কিন্তু এই সব কুলাঙ্গার পাষণ্ডদের আনন্দই হয়েছে । আশ্চর্য্য লোক এরা,—উদারতা কি এদের মধ্যে এতটুকু নেই !! আমাদের বাদশাহ যদিও যবন, তথাপি তাঁর তুলনা হয় না । তেমনি লোক যবন কূলে আর আছে কিনা সন্দেহ ! আমাদের নদীয়ার ঐ সন্ন্যাসীকে তিনি বলেন সাক্ষাৎ দেবতা । সন্ন্যাসীর জ্যোতির্ময় রূপ দেখে বাদশার তাক্ লেগে গেছে । সত্যি, নদীয়ার ঠাকুরটি সাক্ষাৎ ভগবান ! নইলে তাঁকে যে দেখে সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, এমন অদ্ভুত শক্তি কার আছে ? আর এই বেটা নিন্দুক পাপিষ্ঠরা বলে কিনা ওটা কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি ! এদের চোখ থেকেও অন্ধ । ধন্য বাদশা তোমার উদারতা ! এখন যদি ঈশ্বরের রূপায় মন্ত্রীজীর প্রতি উদারতা দেখাও তবেই তো মঙ্গল, তবেই তো তুমি সকলের প্রিয় বাদশা ! (প্রস্থান)

ক্রমশঃ ।

— শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রী শ্রীনন্দীপ-শতক

[শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ-বিরচিত

“শ্রী শ্রীনন্দীপ-শতকম্”-এর পঞ্চানুবাদ]

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭২ পৃষ্ঠার পর)

লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, শুক, অজ্জুন, উদ্ধব ।

প্রভৃতি না জানে যারে অচিন্ত্যবৈভব ॥

আর কি কহিব বৃন্দাবনবাসী জন ।

যে রস না পায় যাহা তথা সংঘটন ॥

সেই শ্রীগোক্রমবন অভূত ব্যাপার ।

কেবো বা দেখিব পেয়ে রাধা-রূপা সার ॥৪২॥

দুর্কাসনা-রজ্জুশত-বদ্ধ মম মন ।

আকর্ষিয়া নিজ-বলে, হে শচীনন্দন ॥

রাধাকৃণু শ্রীগোক্রমে শ্রীরাধার সহ ।

বিহার-সময়ে তব পাদপদ্মে লহ ॥৪৩॥

দমিতে ইন্দ্রিয়গণে না পারিহু নাথ !

গুণমাত্র নাহি মোর সর্ব-দোষোৎপাত ॥

কোথা যাব, কি করিব, গতিহীন আমি ।

নবদ্বীপে স্থান দিয়া রূপা কর, স্বামি ॥৪৪॥

জাতি, প্রাণ, ধন, যশ, সদ্ধর্ম আমার ।

ক্ষয় হউ, সকলে করুন তিরস্কার ॥

ব্যাধি-জীর্ণ-কলেবর পাউক দুর্গতি ।

নবদ্বীপ তথাপি ত্যজিতে নহুঁ মতি ॥৪৫॥

প্রকৃতির মধ্যে বা বাহিরে কভু, ভাই ।

নবদ্বীপ সমান মধুর স্থিতি না ॥

এই ত সিদ্ধান্ত যার তাঁহার চরণে ।

সদা নমস্কার করি আমি মনে মনে ॥৪৬॥

তিলকশোভিতা গঙ্গাজল শুক্লাধরা ।

কাঞ্চনচম্পকভাসা রসোল্লাসপরা ॥

কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধর-রসে সম্মোহিনী ।

শোভা পায় গৌরাটবী গৌরাঙ্গমোহিনী ॥৪৭॥

সুরেন্দ্রবৈভবযুতা যথা তরুণগ ।

মহারসময়ী ভক্তি-বনিতা রঞ্জন ॥

ব্রহ্মপুর আদি তীর্থগণ যথা সুরে ।

হেন নবদ্বীপ কেবা আশ্রয় না করে ॥৪৮॥

নবদ্বীপ-বাস প্রতি নিন্দা যতদিন ।

ততদিন মানুষ স্বচ্ছন্দ ভক্তিহীন ॥

ততদিন বৃন্দাবনে প্রেমের নিলয় ।
 গোবিন্দপদারবিন্দে ভক্তি নাহি হয় ॥৪৯॥
 বিদ্যুৎকোটি প্রভাময়ী রাধা-আলিঙ্গিত ।
 নবজলধর শ্যাম ধ্যানে সমাহিত ॥
 উচ্চৈঃস্বরে তীর্থে তীর্থে কাকুতি করিয়া ।
 গৌরধামে ফিরে কৃতী প্রেমাৰিষ্ট হঞা ॥৫০॥
 গৌরপাদপদ্মপূত নবখণ্ড বনে ।
 কবে আমি প্রেমপূর্ণ হয়ে মনে মনে ॥
 প্রতিপদে গলদণ্ড-পুলক-উল্লাসে ।
 'হা গৌরান্ধ' বলিয়া লুঠিব অনায়াসে ॥৫১॥
 পূর্ণোজ্জ্বল প্রেমমূর্ত্তি রাধা-ভাবময় ।
 যথা কৃষ্ণ নবদ্বীপে সাক্ষাৎ উদয় ॥
 সেই গৌরস্থলাশ্রিত হয় যেই জন ।
 স্নভক্তি-রহস্য তার একমাত্র ধন ॥৫২॥
 চণ্ডাল, কুক্কুর, খর-সম তিরস্কার ।
 করুক, তাহাতে খেদ নাহিক আমার ॥
 স্নেহজ্ঞানে তুষ্ট হয়ে নবখণ্ড বনে ।
 বসিব সর্বদা আমি বৈরাগোর সনে ॥৫৩॥
 ওহে ভাই, সমস্ত সাধন পরিহারি ।
 গৌরস্থলাশ্রয় কর চিত্ত দৃঢ় করি ॥
 প্রাক্তন বাসনা-বশে তোমার হৃদয় ।
 শরীর-বচন-চেষ্টা করিবে নিশ্চয় ॥৫৪॥
 বরং আমি নবদ্বীপে ঋপর ধরিয়া ।
 স্থপচ-পল্লীতে ভ্রমি ভিক্ষার লাগিয়া ॥
 তথাপি স্কৃত্তিলক ছল্লভ শরীর ।
 অত্যাঁহ লইতে ইচ্ছা নাহি করি স্থির ॥৫৫॥
 ছেঁড়াকাঁথা-কোপীন ধরিয়া আমি কবে ।
 দিবসান্তে ফলমূল-ভোজন-গৌরবে ॥
 নবদ্বীপ-বনভাগে রাধাকৃষ্ণ-কথা ।
 গাইয়া জীবন মোর কাটাইব তথা ॥৫৬॥
 প্রকৃতির পর পরব্রহ্ম সুবিমলে ।
 বেদে যাকে পরব্যোম পরপদ বলে ॥
 তাহা মধ্যভাগে শোভে শ্রীগৌড়মণ্ডল ।
 তাহে শোভে 'নবদ্বীপ' বৃন্দাবন-স্থল ॥৫৭॥

জন্মস্ট্রীমী-প্রদর্শনীতে সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৮ পৃষ্ঠার পর)

Wireless অর্থাৎ বিনা তারে দূরদেশে বৈদ্যুতিক প্রগতি আমরা আজকাল লক্ষ্য করিয়া থাকি। অর্থাৎ আমি কোন এক স্থানে বসিয়া কথাবার্তা বলিলে সেই কথাগুলি সহস্র সহস্র মাইল দূরে নীত ও প্রতি-ধ্বনিত হইয়া থাকে। ইহা রেডিও সাহায্যে লক্ষ্য করিয়া থাকি। গীতা-ক্ষেত্রেও সেটা মনে করিলে অশ্চর্য্য হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার মুক্ত সখার নিকট যে-সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা রেডিও সাহায্যে বা বিনা তারে শব্দপ্রসারণ-পদ্ধতিতে ব্যাসের নিকট অবিকল অবিকৃত পৌঁছিয়াছে। এবং বেদব্যাস তৎক্ষণাৎ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং ইহা কৃষ্ণেরই উক্তি—বেদব্যাসের কাল্পনিক কথা নহে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে যদি এই প্রকার আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি, যে-ভারত পূর্বে সমগ্র মর্ত্য জগৎ হইতে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় পরম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহার পক্ষে কোনটাই অসম্ভব নহে। আধুনিক মূর্খ বৈজ্ঞানিকগণের অসমর্থতাহেতু বহু ভারতীয় বিজ্ঞানের ব্যবহার অনুভব করিতে না পারিয়া উহা অসম্ভব কাল্পনিক বলিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। তাহাদের এই নিরীক্ষিত-প্রসূত উক্তি শিক্ষিত সমাজ কখনই স্বীকার করিবেন না।

পাশ্চাত্যদেশ ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে কোন বিজ্ঞানের বিস্তার প্রদর্শন করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষে আসিবার পরই ভারতীয় বেদ, উপনিষদ্ ও অজ্ঞাত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্যদেশ বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ভারতে আসিবার পূর্বে তাহাদের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া কিছুই দেখা যায় নাই। ইহার দ্বারা ঐতিহাসিকরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, পাশ্চাত্যদেশ ভারতীয় বিজ্ঞান আলোচনা করিয়াই কিঞ্চিৎ অগ্রসর ও সভ্য হইতেছে। এখনও পাশ্চাত্যদেশ ভারতীয় সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে বা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

কৃষ্ণের শিক্ষা বেদব্যাসের কাল্পনিক নহে—উহা স্বয়ং কৃষ্ণেরই উক্তি। বেদব্যাস বিনা তারে রেডিও (Radio) সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ ও দর্শন করিয়া গীতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং গীতা শ্রীকৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ

বাণী এবং উপনিষদ-স্বরূপে বেদ হইতেও সম্মানিত বলিলে অত্যাক্তি হইবে না। বিশেষতঃ মহাভাবকে পঞ্চমবেদ বলিয়াই বৈদিক সমাজ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই গীতা উক্ত পঞ্চমবেদেরই শরোদেশ বা সার অংশ বিধায় বেদের অন্ত বা বেদান্ত বা উপনিষদরূপ সম্মানার্থ। ইহা আমরা ইতঃ-পূর্বেও আপনাদের নিকট নিবেদন করিয়াছি।

আমরা “বিষুভক্তো ভবেদৈব আসুরস্তদ্বিপর্গায়ঃ” এই শঙ্কাটী অবলম্বন করিয়া গীতার কথা উত্থাপন করিয়াছি। শ্রীগীতোপনিষদের ষোড়শ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্লোকদ্বয়েরও অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। শ্লোক দুইটি এস্থলে আপনাদের অবগতির জন্ত উদ্ধার করিলাম,—

“দৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥” (গীতা ১৬৮)

“অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহরনীশ্বরম।

অপরম্পরসমুত্তং কিমত্যং কামহেতুকম্॥” (গীতা ১৬৮)

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের ‘দৌ ভূতসর্গৌ’ ইত্যাদি ১ম শ্লোকটির অর্থ সুস্পষ্ট। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে, গীতায় স্বয়ং কৃষ্ণই অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, যে, পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোক বাস করিতেছে। একশ্রেণীর লোক দৈবভাবাপন্ন—যাহাদের কথা কৃষ্ণ পূর্বে অনেক বলিয়াছেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণী—অসুরগণের কথা তিনি বর্তমানে এই ষোড়শ অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। আপনারা শ্রোতৃমণ্ডলী গীতার এই বাক্য সর্বদাই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোকেরই বাস। এমন কি একই গৃহে একই পিতা বা মাতার ঔরস বা গর্ভজাত সন্তানগণের মধ্যে কেহ দৈব-ভাবাপন্ন, কেহ বা অসুরভাবাপন্ন হইতে পারে বা হইয়া থাকে। দেবাসুরের বাহ্য শরীর বা আকার-বিকারের কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। বিশেষতঃ উভয়ই মনুষ্য-শ্রেণী বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানুষ হইলেই যে সে আমাদের আদরণীয় হইবে—এইরূপ শিক্ষা গীতা বা আমাদের কোন শাস্ত্রই দেন নাই। মানুষ হইলেই তাহার ভরণপোষণ করিতে হইবে—ইহা শাস্ত্রীয় শিক্ষা নহে। যদি কোন মানুষের ভিতরে আসুরিক-ভাব লক্ষ্য করা যায়, তবে তাকে ছুঃসঙ্গ-জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাদের সদস্য বিবেচনা নাই, গুচি-অগুচির জ্ঞান নাই, তাহারাই প্রথমতঃ অসুর-শ্রেণীভুক্ত। কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি থাকা আবশ্যক এবং কি বিষয়ে নিবৃত্ত হইতে হইবে অর্থাৎ

পরিতাগ করিতে হইবে, কাহাকে গুদাচার বলে, কোন্টী গুচি অথবা কোন্টী অগুচি; কোন্টী সত্য ও কোন্টী অসত্য—এই সকল বিষয়ে যাহাদের জ্ঞান নাই তাহারাই প্রথমতঃ অসুর বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। তজ্জন্ম আমরা গীতার শ্লোক এস্থলে উদ্ধার করিয়া আপনাদের সংশয় বিদূরিত করিতেছি। উদ্ধৃত শ্লোক দুইটির প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে বলিতেছেন—
 “আমি নিয়ে আশুরিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট লোকের পরিচয় দিতে বসিয়াছি।
 তুমি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।” ইহার পরেই অর্থাৎ উক্ত
 ১৬শ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকের পরবর্ত্তী ৭ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যথা—

“প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেযু বিদ্যতে ॥” (গী: ১৬।৭)

অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি, আজকাল ধার্মিকের পোষাকে পরিচ্ছিন্ন হইয়া অর্থাৎ গৈরিক বসন বা লাল কাপড় পরিধান করিয়া বহু ধর্ম-সম্প্রদায়কে সদগৎ জ্ঞানহীন, শৌচাশৌচ বিচারহীন, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি আচারহীন হইয়া পড়িতে দেখা যায়। এমনকি, তাহার। স্নেহাচারী হইয়া মুগাঁর চাষ, মৎস্য চাষ, ছাগ ও মেষের চাষ আরম্ভ করিয়া উপজীবিকা নির্বাহ করিতেছে। ‘তপোবেশোপজীবিনঃ’ বাক্যের পূর্ণ সার্থকতা আধুনিক আশুরিক ধার্মিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যাইতেছে। এমনকি, বহু ধার্মিক সম্প্রদায় পেঁয়াজের চাষ, মসুর ইত্যাদি হিন্দুর অখাদ্য দ্রব্যগুলি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেছে। ইহাই শৌচাশৌচ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ইত্যাদি আচার-বিচার-হীনতার পরিচয়। ইহারাই প্রথমতঃ আশুরিক শ্রেণীভুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। ইহাদের মুখে ধর্মকথা কখনই শ্রবণ করিতে নাই। কারণ তাহারা মনুষ্যের হৃদয়ে আশুরিক প্রবৃত্তি প্রবেশ করাইয়া দিবে। এই জন্মই শাস্ত্রকারগণ বলেন, শাস্ত্রের কথা অতীব উন্নত এবং পবিত্র হইলেও অসদ্ব্যক্তি বা আশুরিক অবৈষ্ণবগণের মুখে কখনও শাস্ত্রীয় কথা শুনিতে নাই। প্রমাণ-স্বরূপ আমি বলিতে চাই—

“অবৈষ্ণবমুখোদগীর্ণং পুতং হরিকথামৃতম্।

শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং পয়ো যথা ॥” (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ আশুরিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট অবৈষ্ণবগণের মুখে অমৃত-স্বরূপ শাস্ত্রীয় বাণী কখনও শ্রবণ করিতে নাই; যেহেতু দুগ্ধ অত্যন্ত পবিত্র ও পুষ্টিকর খাদ্য হইলেও খল, আশুরিক, বিষাক্ত প্রাণী সর্পের দ্বারা উচ্ছিষ্ট হইলে সেই অমৃতের

জ্ঞায় দুঃখ ও বিস্ক্রিয়া করিয়া থাকে। সুতরাং আচার-বিচার-জ্ঞানহীন মৎস্ত-মাংসভোজী, পেঁয়াজ-রসুনভোজী, গৈবিক বসন-পরিহিত অবৈষ্ণব অসুরবর্ণের নিকট কখনও ধর্মের কথা বা শাস্ত্রের কথা শুনিতে হইবে না। ইহাই গীতার একটি প্রধান শিক্ষা। যাহারা বলেন, ধর্ম মনের বৃত্ত সুতরাং আহারের বিচার আবশ্যক নাই, যাহার যাহা কিছু খাইতে ইচ্ছা হইবে সে তাহাই গ্রহণ করিতে পারিবে বা তথাকথিত আত্মরক শরীর পুষ্টির জন্য অখাত-কুখাত গ্রহণ করিলেও ধর্মের হানি হয় না, তাহারাই প্রকৃত অসুর এবং পাষাণ। সুতরাং আপনারা এ বিষয়ে খুব সাবধান থাকিবেন। ধার্মিকের অভিনয় করিলেই ধার্মিক হয় না।

গীতা ইহার পরবর্তী ৮ম শ্লোকেই আত্মরিক ধর্মের অর্জু বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা এখানে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য আলোচনামুখে প্রকৃত আত্মরিক ধর্মের আরও বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতেছি। উক্ত ৮ম শ্লোকের অনুবাদ, যথা—“অসুর-সভাব লোকেরাই এই জগৎকে অদতা, আশ্রয়হান ও অনীশ্বর বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কার্য্যকারণের পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্বসৃষ্টির কারণ নয়, অর্থাৎ কারণশূন্য কার্য্যসত্ত্বে আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই; যদি কেহ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, তিনি কামপরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—আমাদের উপাসনার যোগ্য ন’ন।”

উক্ত ৮ম শ্লোকটির অনুবাদটী ধীর ও গম্ভীরভাবে চিন্তা করিলে বর্তমান-প্রসিদ্ধ ধার্মিক সম্প্রদায় সকলেই আত্মরিক প্রবৃত্তির মধ্যে পড়িয়া যান। অসুরবর্ণের ধর্ম নাই—ইহা আমাদের বক্তব্য নহে। আমি বহুপূর্বেই আপনাদের নিকট নিবেদন করিয়াছি, মানুষ ধর্মাচরণ করিলেই তাহাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ‘ধর্মে ন হীনাঃ পশুভিঃ সমানঃ’—এই প্রমাণ অনুসারে ধর্মানুশীলন না করিলে সে পশুর সমান হইয়া পড়ে। অসুরবর্ণকে মনুষ্যাকৃতি দেখা যাইতেছে, সুতরাং তাহাদের মধ্যে যাহারা ধর্মানুশীলন করে তাহারা অসুর হইলেও মনুষ্য, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। দৈব ধর্ম এবং আত্মরিক ধর্ম—এই ধর্ম লইয়াই আমরা বর্তমানে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। দৈবাসুর যখন সব সম্প্রদায়েই পরিলক্ষিত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাই আমাদের একমাত্র গ্রহণীয়। অতঃপর তাহার আবির্ভাব বলিয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণের তত্ত্ব এবং তাঁহার শিক্ষা আলোচনা করাই

প্রধান কর্তব্য। এখানে আমি আমার একটা পূর্বকথা আপনাদিগকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি। কথাটি এই,—“বিষ্ণুভক্তো ভবেদৈব আস্বরভূত্বিপর্যায়ঃ” পদ্মপুরাণের এই উক্তি অনুসারে বিষ্ণুর ভক্তগণই দৈব এবং বিষ্ণু ব্যতীত অত্ৰ দেবদেবীর পূজা করাই আস্বরিক ধর্ম। এ স্থলে বিচার্য্য এই যে, অস্বরগণও মনুষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া ধর্ম্মাহুণীলন করে। তজ্জগ্ৰহই তাহারা মানুষ—ইহা আমরা বিনা বিধায় বলিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আস্বরিক ধর্ম্মের পরিণতি ও দৈব ধর্ম্মের পরিণতি এক নহে। আপনারা জানেন, চিরদিনই অনন্তকাল হইতেই দেবাসুরের সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। অস্বরগণ বৈজ্ঞানিক চর্চার চরমক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেও দেবতাদের নিকট চিরদিনই পরাভূত হইয়াছে। দৈব-চেষ্টা, আস্বরিক চেষ্টাকে ধ্বংস-বিধ্বস্ত করিয়া ধ্বংসস্থাপে পরিণত করিয়াছে। এবং স্বয়ং ভগবান দৈবপক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের প্রাধান্ত সমগ্র বিশ্বে স্থাপন করিয়াছেন। আমরা তজ্জগ্ৰহই দৈবভাবাপনের পক্ষপাতী, আস্বরিক চেষ্টার অনাদরকারী। কৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণুভক্তের চরমপ্রকাশ-স্বরূপে আমাদের গীতার মারফতে বেদ-ব্যাসের লেখনী হইতে এই শিক্ষাই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাহারা গীতা-বিরোধী, তাহারা বিষ্ণু-বিরোধী।

শ্রীকৃষ্ণ তজ্জগ্ৰহই আস্বরিক ধর্ম্মের সহিত দৈবধর্ম্মের পার্থক্য নিরূপণ করিয়া অতি সহজ ও সরলভাবে জীবের উদ্ধার করিতেছেন। আমরা প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের ঐতিহ্য আলোচনা করিলে জানিতে পারি—একই গৃহে দেব ও অসুর উভয়েরই বাহ্যিক অস্তিত্ব। হিরণ্যকশিপুর্ যুগে প্রহ্লাদ, রাবণের গৃহে বিভীষণ, কংসের গৃহে অক্রুর প্রভৃতি আমাদের আলোচ্য বিষয়। তন্মধ্যে অস্বরগণ ধ্বংস-প্রাপ্ত হওয়ায় ভগবন্তকৃষ্ণের প্রাধান্ত নিত্যকাল বিद्यমান রহিয়াছে। কৃষ্ণ কলির জীবের প্রতি অত্যন্ত দয়াদ্রু চিত্ত হইয়া অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের আভিনয়ে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই আমাদের আদর্শ।

৮ম শ্লোকের শিক্ষা দার্শনিক জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। কেহ যদি মনে করেন, বেদব্যাাস আস্বরিক ঋষিগণের মতবাদ খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন, আমি তাহাতেও আপত্তি করিতে চাই না। বেদব্যাাস পৃথিবীর যাবতীয় লেখনী-চালকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, শুধু তাহাই নহে—অতুলনীয়। ভারতের বা পৃথিবীর অত্যাশ্রয় ঋষিবর্গ শ্রীল বেদব্যাাসের

কোটিংশের এক অংশের সমান যোগ্যতা অর্জন করেন নাই। ইহা শিক্ষিত সমাজে সর্ববাদি-সম্মত। আমি আপনাদিগকে পূর্বেই একথা জানাইয়াছি - গীতা স্বয়ং কৃষ্ণেরই উক্তি, ইহা বেদব্যাসের কাল্পনিক নহে। যদি কাল্পনিক বলিয়াও কেহ স্বীকার করেন, তাহা হইলেও ব্যাসোক্তের শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিতে বাধ্য। বেদব্যাস যাহা বলিবেন তাহাই প্রমাণ; ইহাতে মতভেদ-কারীই আশ্চর্য-শ্রেণীভুক্ত; তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। খেয়াল-খুসীর ধর্ম কখনও ধর্ম নহে—উহা পরিত্যাগ করাই জীব মাত্রেরই কর্তব্য। গীতায় এই ষোড়শ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে একটি কথা আমরা দেখিতে পাই, “অজ্ঞানং চাভিজ্ঞাতস্তু পার্থ সম্পদমাসুরীম্” অর্থাৎ অজ্ঞানতা একটি প্রধান আশ্চর্য সম্পদ। অসুর প্রবৃত্তির দ্বারা জ্ঞাত ব্যক্তিগণ জ্ঞানহীন হইয়া থাকে। জ্ঞানহীন অর্থাৎ অজ্ঞান বলিতে কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-বুদ্ধিশূন্যতাকেই লক্ষ্য করে। “অজ্ঞানম্ কার্য্যাকার্য্য-বিবেকধীশূন্যত্বম্” ॥ সুতরাং কোন্টি করণীয়, কোন্টি অকরণীয় এই বিচার-বুদ্ধিশূন্য ব্যক্তিগণকেই অসুর বলা হয়। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে ও গুরু-তত্ত্ব বিচারে এইরূপ উক্তি লক্ষ্য করিয়া থাকি। সেখানে বলা হইয়াছে—

“গুরোরপ্যবলিপ্তস্তু কার্য্যাকার্য্যমজ্ঞানতঃ।

উৎপথপ্রতিপন্নস্তু ত্যাগো এব বিধীয়তে ॥”

উক্ত শ্লোকে, স্বয়ং গুরু-পাদপদ্মও যদি কার্য্য এবং অকার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান-হীন হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং অজ্ঞানই বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। তিনি জ্ঞানাজ্ঞান শলাকার দ্বারা শিষ্যের অজ্ঞানতা দূর করিতে পারিবেন না। তজ্জন্তই তিনি পরিত্যাজ্য। অজ্ঞানতা বলিতেই, আশ্চর্য্য সম্পদ বুঝায়। স্বয়ং কৃষ্ণ উক্ত ৪র্থ শ্লোকের দ্বারা আমাদেরকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে তাঁহার এই শিক্ষা আমরা সর্বতোভাবে হৃদয়ে ধারণ করিব; অর্থাৎ নানা প্রকার দেব-দেবীর পূজায় যোগদান করাই অজ্ঞানতা বা আশ্চর্য্য সম্পদ। আমরা তাহা হইতে সর্বতোভাবে পৃথক থাকিব। মহাজনগণ এতৎ প্রসঙ্গে আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়াছেন যে,

“আলিঙ্গনং বরং মন্ত্রে ব্যাল-ব্যাঘ্র-জলৌকসাম্।

ন সঙ্গং শল্যযুক্তানাং নানা-দেবৈক-সেবিনাম্ ॥”

অর্থাৎ বিষধর সর্প (ব্যাল), ব্যাঘ্র, কুস্তীর নানাবিধ হিংস্র প্রাণীকে আলিঙ্গনকরাও ভাল, এমন কি বক্ষে শৈলবিদ্ধ হইলেও আপত্তি নাই; তথাপি

নানা দেব-দেবী-পূজকের সঙ্গ যেন কখনও না হয়। মৃত্যু হইলে শরীর নষ্ট হইবে কিন্তু চিত্ত-বৃত্তি খারাপ হইয়া গেলে আর কখনও মুক্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। বাঘ, ভল্লুক আমার শরীর নষ্ট করিতে পারে, আমার চিত্ত-বৃত্তি তাহারা নষ্ট করিতে পারিবে না ; কিন্তু দেব-দেবীর পূজারিগণ আমার চিত্ত-বৃত্তি দূষিত করিয়া দিলে আমি অম্বর-শ্রেণীভুক্ত হইয়া ভগবৎ পাদপদ্ম হইতে দূরে চলিয়া যাইব। ইহারই নাম অজ্ঞান। ইহাকেই বলে কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানশূন্যতা।

দার্শনিক জগতে এইরূপ দুঃসঙ্গ অর্থাৎ আত্মরিক সঙ্গ আমরা প্রচুর লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমাদিগকে তাহা হইতে দূরে থাকিতে হইবে। তৎসম্বন্ধে প্রথমতঃ আলোচনা করিতেছি যে,—

“অসত্যম্ প্রতিষ্ঠন্তে জগদাহরনীশ্বরম্”।

‘অসত্যম্’ বলিলে ‘মিথ্যা’ বুঝায়; “জগদাহরসত্যম্” বলিলে জগৎকে যাহারা মিথ্যা বলিয়া সংজ্ঞা দেন তাহারা অম্বর। স্বয়ং কৃষ্ণ গীতার উক্ত ৮ম শ্লোকে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তারশ্বরে এই কথাটি জানাইয়াছেন। আপনারা অধিকাংশ লোকেই জানেন, দার্শনিক জগতে অদ্বৈত-বাদিগণ প্রবল প্রতাপের সহিত “জগন্মিথ্যাস্ব-বাদ” লইয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতেছে। কেবলমাত্র অদ্বৈত-বাদিগণ নহে অদ্বয়বাদী বৌদ্ধগণও “জগন্মিথ্যাস্ব-বাদ” এর জন্মদাতা। এই প্রকার আত্মরিক চিন্তার দ্বারা কলির অধিকাংশ শিক্ষিত-সমাজই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন; অথচ গীতাশাস্ত্রখানি ভারতবর্ষের প্রতি গৃহে গৃহে পূজিত হইয়া থাকে; কিন্তু গীতার এই তাৎপর্য্য তাহারা আদৌ চিন্তা করেন না। জগন্মিথ্যাস্ববাদী আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ আনয়ন করিয়াছে। “ব্রহ্ম-সত্য জগৎ মিথ্যা” আজকাল দার্শনিক জগতে ‘ধূয়া’ হইয়া পড়িয়াছে।

যাহারা “গীতার শিক্ষা স্বয়ং কৃষ্ণের নহে—বেদব্যাসেরই লেখনী-প্রসূত শিক্ষা” বলিয়া চীৎকার করেন, আমি তাহাদিগকে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যথা—আচার্য্য শঙ্কর যে-বেদব্যাসের স্ব-রচিত “ব্রহ্মসূত্র” বা “শারীরক মীমাংসার” ভাষ্য রচনা করিতে গিয়া জগৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেই স্বয়ং বেদব্যাসই গীতায় বলিয়াছেন “জগদাহরনীশ্বরম্” আত্মরিক মত ; অর্থাৎ “জগৎ মিথ্যা” উক্তিকারিগণ আত্মরিক। (ক্রমশঃ)

—ঐব্রহ্মাবনবিহারী ব্রহ্মচারী-কর্তৃক সংগৃহীত

প্রচারকের ডায়েরী

(৪)

এবারকাল পালা মেদিনীপুরের দিকে। বীরসিংহের পুরুষসিংহ ঈশ্বর-চন্দ্রের নাম সহসা স্মৃতিতন্ত্রী ধ্বনিত করিয়া তুলিল। দিনের পর দিন সমান ভাবে দৃঢ়পদে গ্রামাঞ্চলপ্রাপ্ত অতিক্রম করিয়া চলিতেছি এমনই একদিন গুনিলাম—নেহরুর মৃত্যুতে তাঁহার স্বজনগণ দুঃখিত।* সহসা চিন্তার উদয় হইল— জাতীয় হি ঙ্গবো মৃত্যু ঙ্গবং জন্ম মৃত্যু চ ॥ অর্থাৎ জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃতেরও জন্ম সুনিশ্চিত। এই ধ্বংসশীল জগতের এই প্রকারই পরিণাম।

‘দেবসংজিতমপ্যন্তে কুমিবিড়্-ভস্মসংজিতম্।’

(শ্রীভাঃ ১০। ১০। ১০

অর্থাৎ জীবিতকালে যে শরীর দেবতা নামে কথিত হয় (অর্থাৎ দেবগণের-শরীরও) মৃত্যুর পর তাহাও কুমি, বিষ্ঠা বা ভস্মরূপে পণিত হইয়া থাকে। তবে এই বিনশ্বর শরীরের তৃপ্তির জন্য চেষ্টায় ফল কি? আমরা এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য যে জানি না, তাহা ত নহে। তবে মানুষের ঈদৃশ অবস্থা ও চিন্তা

* যমরাজ জওহরলালকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কোন ধর্মের প্রতি তাঁহার কোন আস্থা ছিল না। তজ্জন্ম ভারতীয় কোন ধার্মিক সমাজই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে নাই। তিনি ধর্মনীতি অপেক্ষা রাজনীতির প্রাধান্য দেখ্যার ফলে ভারতে প্রচুর দুর্নীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা রাজনীতি ক্ষেত্রেও একপ্রকার সর্ববাদিসম্মত। আমরা ‘প্রাচীন ইতিহাসে হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস প্রভৃতি দেশ-শাসকগণের ইতিহাস আলোচনা করিয়া থাকি। তাহাতে ঐ প্রকার সম্রাটগণের রাজ্য শাসন-প্রণালী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ভারত ধর্মের ক্ষেত্র। বুদ্ধক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইলেও উহা ধর্মনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া গীতার শিক্ষা। তাঁহারই অন্তিম মতে ভীক-কাপুরুষগণই ধর্ম্মানুশীলন করে। ইহা তাঁহার সর্বাপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা। কারণ প্রত্যক্ষক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, ভীক-কাপুরুষগণই রাজ-নৈতিকক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে। অতঃপর রাষ্ট্রের ভয়ে সৈন্যবিভাগ রক্ষা করিতে হয়। এমনকি রাজ্য শাসন করিতে হইলেও ভারতকে Militaryর ভয় দেখাইয়া শাসন-সংরক্ষণ করিতে হইতেছে। শাসনক্ষেত্রে আইনের ভয় দেখাইয়া অর্থাৎ বে-আইনী করিলে কারাগৃহের ভয় দেখাইয়া শাসন করা হয়। শাসন-বিভাগ, অর্থনৈতিক-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ, সৈন্য-বিভাগ,

বৈকল্য কেন ঘটয়া থাকে ? এই অনাত্ম-দেহে আত্মজ্ঞান করিয়া তন্নাশের জন্ত শোক শূন্যতারই পরিচায়ক। আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ, অশোষ্য ও অবিনশ্বর। অতএব এই সু-দুর্লভ মনুষ্য-জীবন প্রাপ্ত হইয়াও যদি আত্মজ্ঞান লাভ না করিতে পারি, তবে এ দেহধারণ শুধু বিড়ম্বনা মাত্র। আত্মা দ্বিবিধ— জীবাত্মা ও পরমাত্মা; বাহ্যদেবরূপী অন্তর্যামী পরমাত্মা জীবহৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট। মানব যখন বাহ্যদেবত্ব অর্জুন করে অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন হয় তখনই বাহ্যদেবের সন্ধান জানিতে পারে এবং আত্মার পূজ্য-জ্ঞানে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে থাকে। শাস্ত্রে ভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন—

‘সা চ পরাত্মরক্তিরীশ্বরে।’

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও গাহিয়াছেন,—

‘তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।

গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ ॥’

ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে আবাস্য ভগবান ব্রজেশ তনয় চিরন্তরে অরুদ্ধ ও পূজিত।

‘মদ্ভক্তপূজা ভাধিকো সর্বভূতেষু মন্যতিঃ’।

এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে গড়ের রাজবটীতে উপনীত হইলাম। বিরটি রাজ-প্রাসাদ বটে, কিন্তু রাজ্য অভাবে রাজ্য শ্রীহীন। রাজ-নন্দন

পররাষ্ট্র-বিভাগ, গতি-বিভাগ সমস্তই ‘ভীতি-প্রদর্শন-নীতি’র দ্বারা পরিচালিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং ভয় প্রদর্শনই রাজনৈতিক শাসনের প্রধান উপাদান। তজ্জন্ত বীরুতাই রাজনীতির ভিত্তি। কিন্তু ধর্মজগতে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, দেবা ধর্ম, আল্লাহস্বর্গ, তাগ, বৈরাগ্যের উপরই ভিত্তি। ইহার সহিত রাজনীতির ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের পার্থক্য। আমরা এ সম্বন্ধে পূর্বেও অনেক আলোচনা করিয়াছি; পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। এতৎসম্পর্কে অরুণকুমার সেন “পৌরবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞানপরিচয়” নামক গ্রন্থে বর্তমান রাষ্ট্রনীতি ও প্রাচীনযুগের রাষ্ট্রনীতির তুলনামূলক বিচার ক রয়া লিখিয়াছেন—“প্রাচীনযুগে রাষ্ট্র, আইনসভা, জেল, পুলিশ, সৈন্য প্রভৃতি ছিল না। তবুও সমাজজীবন বিশৃঙ্খল ছিল না।” (১৩।১৪ ছত্র ১২ অধ্যায় পৃ—১৪৫। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, প্রাচীন-যুগে ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা শাসন অপেক্ষা ধর্মনীতির দ্বারা শাসন সংরক্ষণ সুষ্ঠু, সুচারু ও শান্তিপ্রদায়ক ছিল। বর্তমান পাশ্চাত্যধারা ভারতের অহিত-কারিণী। সাধু সাবধান! —সম্পাদক

হইয়াও একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীকে তাঁর শ্রায্য প্রাপ্য প্রণামরূপ সম্মান দিতে কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হন নাই। অনন্তর তিনি তাঁহার পিতৃসেবিত বিষ্ণু-বিগ্রহ আমাকে দর্শন করাইলেন। নয়নমনোমুগ্ধকারী শ্রীবিগ্রহ নিরীক্ষণ করিয়া এ পতিতাদমের পথশ্রান্তি বিদূরিত হইল। সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তির স্নিগ্ধতা এবং দুর্বল চিত্তে শক্তির এবং আনন্দের উৎস অল্পভব করিলাম।

যতক্ষণ দেব-দর্শনে প্রবৃত্ত ছিলাম ততক্ষণ ক্ষুভ্ধরূপ দেহ-ধর্ম ক্ষণিকের জন্ত বিস্মৃত ছিলাম। কিন্তু নিষ্ঠুর দেহ-ধর্ম কিয়ৎ সময়ান্তর পারমাখিক চিন্তা পরিত্যাগ করাইয়া বহির্বিষয়ে মনঃসংযোগ করাইল। সঙ্গে সঙ্গে সর্কগ্রাসী ক্ষুধার উদ্বেক দেহকে অবসন্ন করিতে লাগিল। বুড়ক্ষুর কত রঙ্গীন আশা—বিষ্ণুসেবকের গৃহে আজ মহা মহোৎসব, সন্ন্যাসী-অতিথির সংকারের বিপুল আয়োজন ইত্যাদি বক্ষ আলোড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! স্বপ্নবিলাসীর কল্পনারাশি নিরাশায় পর্য্যবসিত হইল। স্বপ্ন ও বাস্তবের বৈত মিলনের কোন লক্ষণ না দেখিয়া আমি অবশেষে বিদায় প্রার্থনা কবিতে বাধ্য হইলাম। গৃহস্থামীও বহুভ্যস্ত মৌখিক মিষ্টভাষণে সন্ন্যাসীকে সেবা করিবার অযোগ্যতার অজুহাতে স্বীয় দুর্ভাগ্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। অবশ্য তিনি যৎসামান্য অর্থ প্রণামী দিতে ভুল করিলেন না। বিদায়ক্ষেণে তাঁহার গ্রামের অনতিদূরে জনৈক জমিদারের মন্দিরের সন্ধান দিলেন। শুধু মন্দিরের কথা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু তথাকার সেবাইত একজন বিশিষ্ট ভক্তের গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া যোগক্ষেম বহনকারী বিনোদবিহারীর নাম স্মরণে ভক্তের উদ্দেশে ত্বরিতপদে ধাবিত হইলাম। প্রায় দুই মাইল অতিক্রমণের পর জমিদার বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। মন্দির দ্বার রুদ্ধ, পূজারী স্নানরত। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া পূজারীর নিকট আমার মনোহতীষ্ট ব্যক্ত করিলাম। প্রত্যুত্তরে যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার অন্তরাত্মা ওড় হইবার উপক্রম হইল। গৃহস্থামী নাবালক; তাঁহার জননী ধন-সম্পত্তির রক্ষয়িত্রী। শ্রীবিগ্রহের পূজার পারিপাট্য আছে বটে, কিন্তু অতিথি অভ্যাগতের কোন সেবার বন্দোবস্ত নাই শুনিয়া কি বলিব ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা পশ্চাৎ-অপসরণে উদ্রত হইলে তত্রস্থ পূজারী অপর জনৈক ভক্তের নামোল্লেখ করিয়া আমাকে সেখানে যাইবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন।

দিবা তখন দ্বিপ্রহর; মধ্যাহ্নের তাণ্ডব লীলায় প্রকৃতি শুদ্ধ। পবনদেব

মার্ত্তণ্ডের প্রথর তাপে উত্তপ্ত হইয়া কোন্ এক উর্দ্ধদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। উন্নত প্রান্তর মধ্য দিয়া কেবল দুইজন ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে উন্নতপ্রায় চলিয়াছি। মধ্যাহ্নে জীবন্ত অগ্নিদ্বয়ের স্থায় পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক ভক্তের দর্শন মিলিল। সেবাইত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডা দণ্ডায়মান, অদূরে বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট তাঁহার যোগ্য পুত্র। পুত্রটী একটি কেরারায় আমাকে স্থান গ্রহণ করিবার ইঙ্গিত করিলে, আমিও স্থান গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ধর্ম্মীয় আলোচনারূপ প্রশ্নবাণে সেবাইত মহাশয় আমাকে জর্জরিত করিয়া তুলিলেন। একে ত' ক্ষুধায় নাড়ী নিষ্পেষিত, তদুপরি তর্কযুদ্ধে অংশ গ্রহণ—আমার পক্ষে অতীব দুর্ক্লিয় হইয়া পড়িল। প্রশ্নকর্তা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া অভিমান প্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম,—“আপনি ত' তাহা হইলে কেবলাদ্বৈতবাদী বা নিবিশেষবাদী।” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ব্রহ্ম ও ভগবান্ কি এক নহে?” আমি উত্তর দিলাম,—“কখনও নয়।” স্বয়ং ভগবানে ত্রিবিধ প্রকাশ (Three fold manifestation of God) যথা, ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্; শ্রীমদ্ভাগবত ইহার প্রমাণ দিতেছেন—

“বদন্ত তত্ত্ববিদন্তত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাশ্বেতি ভগবান্নিতি শব্দ্যতে ॥”

(শ্রীভাঃ ১।২।১১)

অর্থাৎ যাহা—অদ্বয়জ্ঞান—এক অদ্বিতীয় বাস্তববস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই ‘পরমার্থ’ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ‘ব্রহ্ম’ ‘পরমাত্মা’ ও ‘ভগবান্’ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন। আমি আরও সবিশেষ অভিব্যক্ত করিলাম,

“ষদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যশ্রু তত্ত্বভা”

অর্থাৎ উপনিষদে যে ব্রহ্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা স্বয়ং ভগবনের অপ্রকাস্তি—ভগবান্ নহেন। এতচ্চরণে প্রশ্নকর্তা নিরুত্তর হইলেন। তদনন্তর আমার আগমনের কারণ অবগত হইয়া দুইটি টাকা ভিক্ষাদানে বিদায় করিলেন।

ক্ষুণ্ণীড়িত দেহখানি আর এক পদও অগ্রসর হইতে চাহিল না। অতিকষ্টে বলপূর্বক এক ফালং অগ্রসর হইয়া এক তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এখন আমার “তরুতল-বাসঃ শয্যাভূতলম্।” ছায়া স্নগীতল আশ্রয়-মূলে দুর্বাদল শয্যায় শ্রান্ত দেহভার শুল্ক করিলাম। ক্ষুণ্ণপ্রাণ

তখন ওঠাগত। সঙ্গী-যুগলকে নিকটবর্তী কোন ভগবৎ মন্দিরবিহীন ভক্তা-
সঙ্ঘানের নির্দেশ দিলাম। শয়নাবস্থায় অক্ষুটস্থরে কাতর আর্তনাদ করিলাম,
—“হে গৌরহরি! এ দেশে কি কেহ ভক্ত নাই? ভক্তের মন্দির আছে, তথায়
কি তাঁহার প্রাণের ঠাকুর নাই? আমি ভক্ত নহি, তবু জীব, প্রাণী ত’ বটে।

“কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান জানি জীবের করিবে সম্মান।”

“কায়মনোবাক্যে কারে উদ্বেগ না দিবে।”

“এ হতভাগ্য কি এতটুকু সম্মান পাইবার যোগ্য নহে? এ দারুণ সঙ্কটে
স্বল্যাহার্যাদানে মুমূর্ষু ভিক্ষকের প্রাণরক্ষা করে, এমন কি কেহ জগতে নাই?”
এমন সময়ে ছিন্ন-মলিন-বসন-পরিহিত এক প্রৌঢ় ব্যক্তি আসিয়া অমুরোপ
জানাইল, “নরাধর্মের জীর্ণ-কুটীরে পদার্পণ করিয়া ধৃত করিবেন কি?” কোন-
রূপে উত্তর দিলাম,— “নিশ্চয়ই।”

কিয়ৎক্ষণ পরে সঙ্গীর তাহাদের অভিষ্টসিদ্ধিতে বিমুখ হইয়া প্রত্যা-
করিল। এক্ষণে আমরা সাদরে এই প্রৌঢ় ব্যক্তির গৃহ-গমন করিলাম।
এই স্মরবর্তী এক অপর চিত্তের পরিকূসরে যে সমাদর লাভ করিলাম তাহা
এ ক্ষুদ্র লেখনী সাহায্যে ব্যক্ত করিতে অক্ষম। পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায়
মস্তক অবনত হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে লাগিলাম,—ভক্ত চরিত্র
কিরূপ অলৌকিক ও অমন্দোদয়-দয়ার অধার।

—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমস্থী মহারাজ

সমিতি-সমাচার

(১) শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
আবির্ভাব-মহোৎসব

বিগত ৩রা আশ্বিন শনিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সকল মঠেই
বর্তমান কালে শুদ্ধভক্তি-সংস্থাপক শ্রী ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-
মহোৎসব বিশেষ সাড়ধরে অরুষ্ঠিত হয়। এই দিবস সন্ধ্যায় সমিতির
মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের “হরিকীর্তন-নাট্যমন্দিরে” এক বিধ্বংসলী
সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজ সভাপতিত্ব
করেন। তিনি ভাষণের মধ্যে মহাপুরুষের লক্ষণ ও গুণাবলী কীর্তন-
মুখে তাঁহার বিভিন্ন ধর্ম সংস্কার পদ্ধতির পর্যালোচনা করেন; দায়িত্বপূর্ণ

উচ্চরাজকর্মে নিযুক্ত থাকিয়াও ষড় গোষামীর কলিনাশন অমূল্য শিক্ষা-ধারা কিরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এই ভবদাবদন্ধ মর্ত্যবাসিকুলকে তিনি বিতরণ করিয়াছিলেন—তাহা এক অভিনব, অত্যাশ্চর্য্য ও অলৌকিক সাধনার পরিচায়ক। এক্ষেত্রে অগ্গদ্বন্দ্ব শ্রীল-সরস্বতী গোষামী প্রভুপাদের একটা বাণী স্বতঃই চিত্তে উদিত হয়; তাহা এই—“ভক্তিবিনোদ ধারা কখনই রুদ্ধ হইবার নহে। অচিরেই পঞ্চাশং সহস্র সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আগমন করিতেছেন।” আজ শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি সেই বাণীরই পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শ্রীল ঠাকুর রথযাত্রার পূর্ব-অমাবস্তা তিথিতে তাঁহার অপ্রকট লীলা প্রকাশ করিলেও দুইমাস পরে আমাদের জায় অন্ধ জীবগণের নিকট তাঁহার পুনঃ প্রকট লীলা যে কিরূপ রূপার পরিচয় তাহা বন্ধজীবের ধারণাতীত। তাঁহার এতাদৃশী রূপা শ্রীল প্রভুপাদের পূর্বোক্ত বাণীরই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, ভক্তিবিনোদ ধারা নিত্য, তাহার লয় বা ধ্বংস নাই; সৌভাগ্যজীবকুলই সেই ভক্ত্যমৃত-মন্দাকিনীর-ধারার আশাদক হইতে পারে। আজ তাঁহার আবির্ভাব তিথিতে আমরা পুনঃপুনঃ সংখ্যাভীত কাকু বাণী শ্রীল ঠাকুরের পাদপদ্মে নিবেদন করিতেছি—“হে ঠাকুর, তোমার বাণী পালনে সর্বপ্রকারে অযোগ্য আমরাদিককে বলাৎকারে বিগুহ্ণ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সেবা-বিস্তারে নিয়োগ কর। আমরা আর আপন সুখ-সুবিধায় দৃষ্টপাত করিব না; কারণ “তোমার সেবায় দুঃখ যত, সে-ও ত’ পরম সুখ...।”

(২) শ্রীবিধ্বরূপ মহোৎসব

ভাদ্র পূর্ণিমা বিশ্বরূপ-সন্ধ্যাস তিথি। শ্রীবিধ্বরূপ শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর পূর্বাশ্রমের অগ্রজ। ইনি গৃহত্যাগান্তর এই তিথির আশ্রয়ে সন্ধ্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। চাতুর্থাশ্র ব্রতের প্রথম ২ মাস সমাপ্তি স্বচক পূর্ণিমা তিথিই শ্রীবিধ্বরূপ পূর্ণিমা-তিথি। ত্যক্তগৃহ বিগুহ্ণ সাত্ত্বতগণ চাতুর্থাশ্র ব্রত-পালন কালে এই তিথিতে একবার ক্ষৌরকার্য্য করেন। এইরূপ বিধি সর্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। গত ৫ই আশ্বিন এই তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল মঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে বিশ্বরূপ প্রসঙ্গ পাঠ হয়। শ্রীবিধ্বরূপ তূর্যাশ্রমে অবস্থিতিকালে শঙ্করারণ্য নামে পরিচিত হইয়া পাণ্ডুরপুর (বোম্বাই প্রদেশে) নগরে শ্রীশ্রীবিঠলদেবের সমীপে অপ্রকট লীলার অভিনয় করেন। শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু

১৪৩৪ শকাব্দে এই পাণ্ডুরপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিশ্বরূপের অপ্রকট লীলার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সমিতির সকল শাখা মঠেই এই তিথি যথারীতি সম্মানিত হন।

(৩) শ্রীলক্ষ্মণাচার্যের শুভ আবির্ভাবোৎসব

অত্যাশ্চর্য বৎসরের ছায় এ বৎসরও শ্রীরঙ্গ-মাধব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্য্য শ্রীলক্ষ্মণাচার্যের আবির্ভাব তিথি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সর্বত্র শাখা মঠ হইতে প্রতীপালিত হয়। শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্য যে শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্য্য ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কতকগুলি পাষাণ মত-প্রচারক এই সত্যের গ্রাহক হইতে অক্ষম বলিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাহার প্রচার কার্য্য শুদ্ধ করিবেন না। জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণীই—“...শ্রীরঙ্গ- (মাধব)-সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসদিগের গুরুপ্রণালী।তাহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন তাহারা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচরণের প্রধান শত্রু ইহাতে আর সন্দেহ কি ?”—আমাদিগকে রক্ষা করিবে। এই তিথি সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আদরনীয় হইলেও বিশুদ্ধ সারস্বতগণ মধ্যেই ইহা পরিলক্ষিত হয়। —নিজস্ব

প্রচার-সঙ্গ

গত ২৫শে শ্রাবণ সোমবার ব্রিড্‌গিৎসামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, শ্রীরসিকমোহন ব্রজবাসী ও শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী - এই তিন জনের নেতৃত্বে তিনটি প্রচার-সঙ্ঘ আসাম, শিলিগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আশীর্ব্বাদ লইয়া বহির্গত হন। তাহারা প্রথমে সমিতির শাখা শ্রীগোলোক-গঞ্জ গৌড়ীয় মঠে গমন করেন। তথায় বুলনঘাত্তা ও জন্মাষ্টমী উৎসব সমাপন করিয়া তাহারা ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ বঙ্গাইগাঁও অঞ্চলে বিপুলভাবে হরিকথা প্রচার করিয়া গত ১০ই আশ্বিন শনিবার শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী চড়াইখোলা ও গোয়ালপাড়া জিলার অত্যাশ্চর্য স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া এখন আলিপুরছয়ারে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। এই স্থানে তাহার প্রচারে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রীরমেশচন্দ্র দাস ও মনিভূষণ পণ্ডিত মহাশয়গণ বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

শ্রীরসিকমোহন ব্রজবাসী গোয়ালপাড়া জিলার হেড কোয়ার্টার্স ধুবড়ী শহর, সাপটগ্রাম, ফকিরাগ্রাম, গৌসাইগাঁও, তামারহাট অঞ্চলে তেজস্বিতার সহিত পরমত নিরাস করিয়া শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর শুদ্ধ-বাণী প্রচার করিতেছেন। তাহারা এর পর শিলিগুড়ি শহরে যাত্রা করিবেন। —নিজস্ব সংবাদদাতা

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্মঃ বহুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বকুলে-কথাসু যঃ



গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোংপাদমরোহাদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়ান্নাঃ সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্র-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ।

অন্ত ধর্ম হৃষ্টরূপে পালে বেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পও সেই শ্রব ।

১৬শ বর্ষ { সঙ্কর্ষণ, ২৬ দামোদর, ৪৭৮ গৌরাক
 সোমবার, ৩০ কার্তিক, ১৩৭১; ইং ১৬/১১/১৯৬৪ } ৯ম সংখ্যা

সান্নিহাদং

শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিতং শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

ধামবাসীর প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি-জনিত ধামাপরাধে
ভক্তিপদবী লাভ অসম্ভব—

সানন্দ-সচ্চিদ্বদনরূপতা-মতি-

র্যাবন্ন গৌরস্থলবাসি-জন্তুষু ।

তাবৎ প্রবিষ্টোহপি ন তত্র বিন্দতে

ততোহপরাধাৎ পদবীং পরাংপরাম্ ॥৫৮॥

গৌরস্থলবাসী জীবকুলকে যে-পর্যন্ত সানন্দসচ্চিদ্বদন-স্বরূপ জ্ঞান অর্থাৎ তাহাদের উপর অপ্রাকৃত বুদ্ধি না হইবে, ততক্ষণ তথায় প্রবিষ্ট হইয়াও সেই গৌরস্থলবাসীর প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি-জনিত ধামাপরাধে কেহ সর্বোত্তম ভক্তিপদবী লাভ করিতে পারিবে না ॥ ৫৮ ॥

ধামবাসিজনে অপ্রাকৃতবুদ্ধির উদয়ে রাধামাধবের সেবাযোগ্যতা লাভ—

যদৈব সচ্চিদ্রসরূপবুদ্ধির্দীপে নবেহাস্মিন স্থির-জঙ্গমেষু ।

স্মান্নির্ব্যালীকং পুরুষস্তদৈব চকাস্তি রাধাপ্রিয়সেবিরূপঃ ॥৫৯॥

এই নবদীপস্থ স্বাবর-জঙ্গম বস্তুতে পুরুষের যখন অকপটভাবে সচ্চিদানন্দবুদ্ধি উদিত হয়, তখনই তাঁহার শ্রীরাধাকান্তের সেবা-যোগ্য রূপ স্ফুর্তি পাইয়া থাকে ॥৫৯॥

নবদীপধামসেবাতৎপরতা সর্ববিধ সাধন-ভজন ও সর্বসিদ্ধির ফল—

সকলবিভব-সারং সর্বধর্মৈকসারং

সকল-ভজন-সারং সর্ব-সিদ্ধ্যেক সারম্ ।

সকল মহিমসারং বস্তুখণ্ডে নবাখ্যে

সকল-মধুরিমাস্তোরশি-সারং বিহারঃ ॥ ৬০ ॥

এই নবখণ্ড নবদীপে বিচরণ সকল বিভবের সার, সর্বধর্মের একমাত্র সার, সকল ভজনের সার, সকল সিদ্ধির একমাত্র সার, সকল মহত্বের সার এবং সকল মাধুর্য্য-সমুদ্রের সার ॥ ৬০ ॥

নবদীপে সিদ্ধি-লালসা—

প্রগায়ন্নটমুদ্রসন্ বা লুঠন্ বা

প্রধাবন রুদন্ সংপতন্ মুচ্ছিতো বা ।

কদা বা মহাপ্রেমমাধ্বীমদান্ধ-

শ্চরিষ্যামি খণ্ডে নবে লোকবাহঃ ॥ ৬১ ॥

কবে আমি মহাভাবরূপ প্রেমমাধ্বীক-পানে মত্ত হইয়া উন্মত্তের স্থায় (কখনও) উচৈঃস্বরে গান, (কখনও) নৃত্য, (কখনও) উচ্চহাস্ত, (কখনও) ভূমিলুঠন, কখনও দ্রুতগমন, (কখনও) ক্রন্দন, (কখনও) পতিত বা মুচ্ছিত হইয়া লোকবাহ পরিত্যাগ-পূর্বক বিচরণ করিব ? ৬১ ॥

গৌরবনে কৃষ্ণপ্রেম-লালসা—

ন লোকং ন ধর্ম্যং ন গেহং ন দেহং

ন নিন্দাং স্তুতিং নাপি সৌখ্যং ন দুঃখম্ ।

বিজানন্ কিমপ্যন্যদঃ প্রেমমাধ্বা

গ্রহগ্রাস্তবৎ কহি গৌরস্থলে শ্যাম্ ॥ ৬২ ॥

কবে আমি লোকভয়, লৌকিকধর্ম, গৃহ, দেহ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ,—কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া হর্ষ-গর্বাদিভাব-সম্বিত প্রেমরস-পানে উন্মত্ত হইয়া গ্রহগ্রস্তের স্থায় এই গৌরস্থলীতে অবস্থান করিব ? ৬২ ॥

গৌরবনে সিদ্ধদেহে স্বাভীষ্ট রাধাকৃষ্ণ-সেবাভিলাষ—

হরেকৃষ্ণরামেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্

মহাশচর্য্য-নামাবলী-সিদ্ধমন্ত্ৰান্ ।

তথাচাষ্টকালে ব্রজদ্বন্দ্বসেবাং

কদাভ্যস্ত গৌরস্থলে স্ম্যং কৃতার্থঃ ॥ ৬৩ ॥

“হরে কৃষ্ণ, রাম কৃষ্ণ”—এই মুখ্য ও মহাশচর্য্য নামাবলী এবং সিদ্ধমন্ত্ৰ-সমূহ জপ এবং ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের অষ্টকালীয় সেবা করিয়া গৌরস্থলীতে কবে আমি কৃতার্থ হইব ? ৬৩ ॥

গৌরবনের ধ্যান—

ইম-স্ফাটিক-পদ্মরাগরচিঠৈর্মাহেন্দ্রনীলৈর্দ্রুমৈ-

নানারত্নময়স্থলীভিরলিঙ্গাক্ষরক্ষুটদল্লিভিঃ ।

চিঠৈঃ কীর-ময়ূর-কোকিলমুখৈর্নানাবিহঙ্গৈর্জলদং

পদ্মাত্মৈশ্চ সরোভিরদুত্তমহং ধ্যাযামি গৌরস্থলম্ ॥ ৬৪ ॥

হেম, স্ফটিক ও পদ্মরাগমণি-খচিত ইন্দ্রনীলমণি-ক্রমরাজি, নানারত্নময় বেদী, ভ্রমর-ঝঙ্কত প্রফুল্ল-লতাবলী, নানাবর্ণ-বিচিত্রিত শুক-শিখি-পিকপ্রমুখ বিভিন্ন বিহঙ্গমকুল এবং প্রফুল্ল-কমলদল-সুশোভিত সরোবরসমূহ দ্বারা অভূতপূর্ব দর্শন—সেই গৌরস্থলীকে আমি ধ্যান করিতেছি ॥ ৬৪ ॥

মধ্যদ্বীপে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাশ্বাদন-লালসা—

মধ্যদ্বীপবনে স্বরাট্ ক্ষিতিধরশ্রোপতাকাশে ক্ষুরন্-

নানাকেলি-নিকুঞ্জবীথিষু নবোন্মীলনকদম্বাদিষু ।

ভ্রামং ভ্রামমহমিশং ননু পরং শ্রীরাসকেলীস্থলী-

রম্যাস্থেব কদা প্রকাশিত-রহঃপ্রেমা ভবেয়ং কৃতী ॥ ৬৫ ॥

কবে আমি মধ্যদ্বীপবনে নববিকসিত কদম্বকুসুমাদি-মণ্ডিত, নানাবিধ উজ্জ্বল কেলি-কুঞ্জশ্রেণী-বরাজিত, শ্রীরাসকীড়াঙ্গনী সুশোভিত ‘স্বরাট্’ পর্বতের উপত্যকাসমূহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে যুগলকিশোরের নিগূঢ়প্রেমে ক্ষুণ্ণবিশিষ্ট হইয়া সৌভাগ্যবান হইব ? ৬৫ ॥

ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা পরিত্যাগ-পূর্বক প্রতিকল্পে রাধা-বনের

সেবানুরাগ-লালসা—

অলং ক্ষয়ি-সুহৃৎখদৈষু বতি-পুত্র-বিত্তাদিকৈ-

বিমুক্তি-কথ্যাপলং মম নমো বিকুণ্ঠশ্রিয়ে ।

পরস্থিহ ভবে ভবে ভবতু রাধিকা-কান্তিতঃ

ব্রজেন্দ্রতনয়ো বনে লসতি যত্র তস্মিন্ রতিঃ ॥ ৬৬ ॥

বিনশ্বর স্ব-দুঃখপ্রদ যুবতী স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদির প্রয়োজন কি? বিমুক্তির কথায়ই বা কাজ কি? (ঐশ্বর্য্যধাম) বৈকুণ্ঠগত সম্পদের প্রতিও আমার নমস্কার। কিন্তু রাধিকার কান্তিসুবলিত হঠয়া ব্রজনন্যন যে বনে বিলাস করেন, জন্মে জন্মে যেন সেই বনে আমার অনুরাগ থাকে ॥ ৬৬ ॥

শ্রীগোক্রমধাম-সেবা-নিষ্ঠা—

নমামি তদ্ গোক্রমমেব মূর্খা।

বদমি তদ্ গোক্রমমেব বাচা।

স্মরামি তদ্ গোক্রমমেব বুদ্ধ্যা

শ্রীগোক্রমাদন্যমহং ন জানে ॥ ৬৭ ॥

মস্তক দ্বারা আমি সেই শ্রীগোক্রমকেই নমস্কার করি, বাক্যদ্বারাও শ্রীগোক্রমেরই কীর্ত্তন করি এবং মনোদ্বারা শ্রীগোক্রমকেই স্মরণ করি। শ্রীগোক্রম ব্যতীত আমি আর কিছুই জানি না ॥ ৬৭ ॥

গৌরধামৈকনিষ্ঠ ভক্তকুলের পদরজাভিষেক-লালসা—

রাধাপতিরতিকন্দং গৌরস্থলমেব জীবনং যেসাম্।

তচ্চরণানুজরেণোরশামেবাহমাশাসে ॥ ৬৮ ॥

রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণের রতিনিলায় গৌরস্থলই যাহাদের জীবাতু, তাহাদের পাদপদ্মপরাগে অভিলাষই আমার প্রার্থনীয় ॥ ৬৮ ॥

নবদ্বীপে স্বাভীষ্ট-ধ্যান-লালসা—

নানাকেলি-নিকুঞ্জমণ্ডপযুতে নানা সরোবাপিকা-

রম্যে গুল্ম-লতা-ক্রমৈশচপরিতো নানাবিধৈঃ শোভিতে।

নানা জাতিসমুল্লসৎ খগ-মৃগৈর্নানাবিলাসস্থলী-

প্রত্যোত-দ্যুতি-রোচিষি-প্রিয় কদা ধ্যেয়োসি গৌরস্থলে ॥ ৬৯ ॥

হে প্রিয়, নানাবিধ কেলিকুঞ্জমণ্ডপ-সুশোভিত, বহু সরোবর ও দীর্ঘিকা দ্বারা সুরম্য, চতুর্দিকে নানাবিধ গুল্ম-লতা-বৃক্ষ ও নানাজাতীয় হর্ষবৃক্ত-পশুপক্ষী পরিশোভিত, বিবিধবিলাসস্থলীর সমুজ্জল দ্যুতি-দ্বারা প্রদীপ্ত (জ্যোতির্ময়) এই গৌরস্থলে কবে আমি তোমার ধ্যান করিব? ৬৯ ॥

সাময়িক প্রসঙ্গ

জগতের লোক ভোগ ও ত্যাগের কথাই জানেন। যুক্তবৈরাগ্য বা শুদ্ধবৈরাগ্যের কথায় অনেকেই অনভিজ্ঞ। যুক্তবৈরাগ্যকেই ‘সেবা’ বলে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান-মূলেই ভোগ বা ত্যাগের আদর্শ গৃহীত হয়। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে চার্বাক-ব্রাহ্মণ ভোগবাদ প্রচার করিয়াছেন। গ্রীকদেশে লুসিপস্, রোমদেশে লুক্রেসিয়স্, চীনদেশে ইয়াংচু তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষবাদী বলেন, “প্রকৃতির সকলেই চায় মিলন। শ্রোতস্বিনী সাগরের সঙ্গমের জন্ত প্রবাহিতা, লতিকার বিটপের অঙ্গে আলিঙ্গিত। স্তুরাং দেহে দেহে, জড়ে জড়ে মিলনই বিধাতার নিয়ম। স্তুরাং ‘আমি কেন শুধু র’ব মিলন-বিহীন।”

প্রত্যক্ষবাদী বলেন, ‘বিধাতা মানুষকে কুকুরের মত অগ্রদন্ত (canine teeth) বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। স্তুরাং মানুষ মাংসাদি ভক্ষণ করুক, ইহাই বিধাতার ইচ্ছা।’

এইরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান হইতেই ভোগবাদের সৃষ্টি। এই ভোগ অনেক রকমের আকার ধারণ কহিতে পারে—দস্যু যেমন বহুরূপী সাজিয়া গৃহস্থের দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া থাকে। ভদ্রলোকের বেশে দস্যুকে ধরা বড় কঠিন, তাই আজকাল শেষোক্ত-প্রকার দস্যুরই অধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্যাগবাদেরও ভিত্তি প্রত্যক্ষজ্ঞান। ত্যাগী বলেন, জগতের সব বস্তুই একটি নাম ও একটি রূপ আছে। জগতের বস্তু পরিবর্তনশীল। স্তুরাং নাম-রূপবিশিষ্ট বস্তু মাত্রেরই নাম-রূপ স্বীকার করা হয়, তবে তাহাও পরিবর্তনশীল বস্তু হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্রহ্ম অপরিবর্তনশীল অবলিয়া শাস্ত্রে কথিত। স্তুরাং নিত্যসত্য চরমতত্ত্বের নিত্য নাম-রূপ নাই, তাহা নির্বিশেষ নিরাকার।

গ্রাহ্যের যুক্তিতে সিদ্ধান্ত এইরূপ দাঁড়ায়—

“এযাবৎ যত কাক দেখা গিয়াছে সব কাল।”

আফ্রিকাতে কাক আছে, স্তুরাং আফ্রিকার কাক কাল—ইহাকে অধিরোহ যুক্তি বলে। এইরূপ যুক্তিতে ভুল সম্ভবপর। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা কাক দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাকৃত জগতেও তথাকার বস্তুর নাম-রূপ বিনশ্বর বলিয়া যে, অপ্রাকৃত গোলোক-বৈকুণ্ঠাদিধাম ও শ্রীকৃষ্ণের নাম ও মধ্যমাকারাদি রূপও অনিত্য হইবে, এইরূপ বিচার উপরি উক্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান-চালিত অধিরোহ যুক্তিমূলে সংস্থাপিত। উহা ভ্রান্ত যুক্তি।

তাগী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তি করিয়া আরও বলেন, ‘শ্রোতস্থিনী আপনার ক্ষুদ্র জলরূপ উপাধি সাগরে বিলীন করে, বিন্দু সিন্ধুতে মিশিয়া যায়, ঘটাকাশ-পটাকাশ তাহাদের সমান উপাধি অসীম অনন্ত আকাশে লয় করে; সুতরাং “জীব” উপাধিও ব্রহ্মেই লীন হইলেই পরাশান্তি লাভ করে।

ভোগীর লক্ষ্য স্বর্গসুখ, ত্যাগীর লক্ষ্য ব্রহ্মানন্দ, কৈবল্যসুখ, অষ্টাদশসিদ্ধি প্রভৃতি। উভয়েই চান নিজ সুখ। কেহ ক্ষুদ্র সুখ, কেহ বা বৃহৎ সুখের আকাঙ্ক্ষী। এক পক্ষ চান—কামদাত্রী দেবতাগণকে তোষামোদ ও কিছু উপহারাদি দিয়া কোনও রকমে নিজ সুখসাধন। আর একপক্ষ চান—অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবানকে নিকির্শেষ, নিরাকার, হস্ত-পদাদিবিহীন সাজাইয়া সব ভোগ নিজে কাড়িয়া নিতে! একজন চান—ক্ষুদ্র দেবতার সিংহাসন, আর একজন চান—পরমদেবতার পদবী ও আসন।

— — — —

সেবকের লক্ষ্য—ভোগ বা ত্যাগ নহে। কারণ ঐরূপ ফলুত্যাগও প্রচ্ছন্ন ভোগমাত্র। সেবক অবরোহ বা অধোক্ষজ-বাদী। তিনি প্রত্যক্ষজ্ঞানকে কখনও আদর করেন না। তিনি বলেন, ভগবানই একমাত্র ভোক্তা, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি আছে মানবের আত্মস্বল্পতম বুদ্ধিও সেই অচিন্ত্য-শক্তির ধারণা করিতে পারিবে না।

ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার বলে একই সময় নিরাকার ও সাকার, সবিশেষ ও নিকির্শেষ, বিভু ও মূর্ত্তিমান্। তাঁহার নিত্য নাম, নিত্য ধাম, নিত্য রূপ, নিত্য লীলা ও নিত্য পারকর আছে। তাহা জগতের বস্তুর মত পরিবর্ত্তনশীল বা অনিত্য নহে। তাহা অপ্রাকৃত, চিন্ময়।

ভগবান্ জীবের প্রভু, মায়াব প্রভু। অনন্তজীব তাঁহার সেবক, মায়া তাঁহারই সেবিকা। জীব তাঁহার বিভিন্ন অংশ, মায়া তাঁহার ছায়াশক্তি। শুদ্ধজীব ভগবজ্জাতীয়, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ নহে বা কখনও হইতে পারে না। ভগবান্ ও জীবে নিত্যভেদ; কারণ ভগবান্ বিভু জীব অণু।

ভগবানে ও জীবে নিত্য অভেদ ; কারণ ভগবান্ পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ,
জীবও স্বরূপগঠনে সচ্চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ ।

বিভু বস্তু বা ভগবানের ইচ্ছাপূর্ত্তিই অগুচিৎ জীবের নিত্যধর্ম । ভগবানের
নিষ্কপট প্রীতিবাঞ্ছাই সেবা । সকপট আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই ভোগ বা
ত্যাগরূপ কাম ।

সেবক কোনদিন নিত্যধর্ম ত্যাগ করেন না । তাঁহার সাধন-ভজন ভোগী
বা ত্যাগীর দ্বায় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির জন্তু নহে । অনাদি-বহির্মুখতা-হেতু যে
সেবাধর্ম লুপ্ত রহিয়াছে, তাহাকে উদ্ধারের জন্তুই সাধন । তাঁহার সাধনও
যাহা, সাধ্যও তাহাই ।

সেবক জন্মমরণ হইতে উদ্ধার হইতে চান না । কখনও আত্মবিনাশ
চান না । সেবকের নিত্য প্রার্থনা—

কোটি জন্ম হউক যথা তুয়া দাস ।

বহির্মুখ ব্রহ্ম-জন্মে নাহি মোর আশ ॥

সংসম্প্রদায় স্বীকার ও ভগবন্তত্ববিৎ আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার না
করিলেই মানুষ মনের খেয়ালকেই ধর্ম বলিয়া মনে করে । এখন অধিকাংশ
লোকেই দেখাদেখি কার্য্য ও মনের বিচার যাহা ভাল বলিয়া মনে হয়,
তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে । শাস্ত্র বা প্রকৃত সাধুর কাছে
তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করেন না ; ইহাকেই “গতানুগতিক বা মনগড়া ধর্ম্ম”
বলে ।

গঙ্গার ধারে কয়েক জন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ স্নান ও সন্ধ্যাদি কৃত্য করিতেন ।
সকলেই ‘কোশ ছিপ’ লইয়া যাইতেন কিন্তু প্রত্যহই একজনের কোশছিপ
অপর ব্যক্তির সঙ্গে পরিবর্ত্তন হইত । একদিস এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজ কোশ-
ছিপকে পৃথক্ চিনিয়া রাখিবার জন্ত তদুপরি একতাল বালুকা রাখিয়া স্নান
করিতে গেলেন । তাহা দেখিয়া বাকী ব্রাহ্মণগণ স্নানের পূর্বে কোশছিপের
উপর বালুকাপিণ্ড রাখিতে হয় মনে করিয়া পূর্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণের অনুবর্ত্তন
করিলেন । বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি স্নান করিয়া উঠিয়া দেখেন যে, তাঁহার কোশছিপ
চিনিবার উপায় নাই । সকলের উপরেই বালুকাপিণ্ড । তিনি আসিয়া
বলিলেন ‘লোকগুলি কি গতানুগতিক !’

আজকালকার ধর্মকর্মও সেইরূপ ! আজকাল সভা-সমিতিতে একটা কথা খুব শুনিতে পাওয়া যায় “দরিদ্রনারায়ণ” ।

একথাটার কোনও অর্থই হয় না ! ‘নারায়ণ’ শব্দে শাস্ত্রে ষড়ৈশ্বর্যবান্ লক্ষ্মীপতিকে বুঝাইয়া থাকে । যিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীর পতি, যাহাতে ষড়বিধ ঐশ্বর্য পরিপূর্ণরূপে বর্তমান, তিনি আবার দরিদ্র হন কি-প্রকারে ? মাটির সোনার কলস কিরূপ !

‘দরিদ্রতা’ একটি ত্রিতাপের অন্তর্গততাপ । ভগবদ্ বহির্মুখ বদ্ধজীবেরই ত্রিতাপ সম্ভব । মায়াধীশ নারায়ণে ত্রিতাপের আরোপ ! ইহার মত গুরু-তর অপরাধ আর কি ?

ভগবান্ যে কতরূপে অস্বরমোহন করেন তাহার ইয়ত্তা নাই । শঙ্করাচার্য্য এইরূপ অস্বর মোহনের জ্ঞাত ‘কপ্যাংসং পুণ্ডরীকং এবমস্তাক্ষিণী’ শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া নারায়ণের চক্ষুকে কপি অর্থাৎ বানরের গুহ-দেশের (লালবর্ণের) সহিত তুলনা করিয়াছিলেন । এই শ্রুত্যর্থ পাঠকালে শ্রীপাদ রামানুজের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল । তিনি তাঁহার আচার্য্যকে বলিয়াছিলেন, শ্রুতির অতি সুন্দর অর্থ থাকিতে আচার্য্যের এরূপ কদর্থ করিবার প্রয়োজন কি ? অস্বর-মোহন !

রামানুজ বলিলেন—‘ক’ শব্দের অর্থ ‘জল’; জল গ্রহণ করেন যিনি অর্থাৎ স্বর্ঘ্য, তাহার দ্বারা বিকসিত হয় যাহা সেইরূপ পদ্মের তায় প্রস্ফুটিত চক্ষু । অর্থাৎ ভগবানের চক্ষু স্বর্ঘ্যাকিরণ-প্রস্ফুটিত পদ্মের তায় । শঙ্করাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন, বানরের পুচ্ছের তায়, অধোভাগের তায়, লালবর্ণ পদ্মের তায় ; এইজ্ঞাত শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

তাঁর (আচার্য্যের) দোষ নাহি তিহেঁ আজ্জাকারী দাস ।

আর যেই শুনে তার হয় সর্বনাশ ॥

ভগবান্ গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন হইয়া জীবকে অপরাধের হস্ত হইতে নিস্তার করিবার জ্ঞাত কিরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন । তদনীন্তন কাশীর মায়াবাদিগণের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য প্রকাশানন্দের প্রতিভা যখন শ্রীমন্নহা-প্রভুর প্রতিভার নিকট স্নান হইয়া পড়িল, তখন অনন্তোপায় হইয়া গৌরসুন্দর-কে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন । তখন শ্রীজগদগুরু গৌরসুন্দর লোকশিক্ষার জ্ঞাত বলিয়াছিলেন—

“প্রভু কহে, বিষ্ণু বিষ্ণু, আমি ক্ষুদ্র জীব হীন।
জীবের বিষ্ণু মানি এই অপরাধ-চিহ্ন।
জীবের বিষ্ণুবুদ্ধি করে যেই ব্রহ্ম-সম।
নারায়ণে মানে তার পাষণ্ডে গণন।”

আরও বলিলেন

যন্তু নারায়ণ দেবং ব্রহ্মরূদ্ভাদিদৈবতৈঃ।
সমত্তেনৈব বৌদ্ধৈস্ত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

(পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি নারায়ণদেবকে জীবতত্ত্ব ব্রহ্ম-রূদ্ভাদি দেবগণের সঙ্গে এক
পর্মায়ে দর্শন করে সে নশ্চয়ই পাষণ্ডী।

জীবমুক্ত আপি পুনর্বার্যন্তু সংসারবাসনাম্।
যচ্চিহ্নমহাশক্তৌ ভগবতাপরাধিনঃ ॥

জীবমুক্তগণও যদ আচল্যশক্তি-ভগবানের চরণে ঐক্লপ অপরাধ করেন
তাহা হইলে তাঁহারাও পতিত হন।

সকলশক্তিসম্পন্ন মায়াবীণ নারায়ণের সহিত নিঃশক্তিক মায়াবশ জীবকে
এক করাকে চিৎ-জড়-সম্বয় বলে। চিৎ ও জড়ে কখনও সম্বয় হয় না।
চিৎ ও জড়ের সহিত আপোষ (compromise) নাহি। বুদ্ধিমান সারগ্রাহী
ব্যক্তি সাবধান হইবেন।

সেবক কখনও জগতের অভিজ্ঞতা লইয়া চিদ্বস্তু দর্শন করেন না।
আত্মায়-বাক্যই তাহাদের চিদ্বস্তু দর্শনের পরিচালক এবং ভজন-পরিপকতা
লাভ করিয়া বস্তুসিদ্ধি অবস্থায় তাহার সমাক্ষ উপলব্ধি।

সেবক জগতের বস্তুকে প্রাপাঞ্চক বুদ্ধিতে ভাগ বা গ্রহণ করেন না।
সকল বস্তুতেই হরিসম্বন্ধী দর্শন করেন। জগতের প্রত্যেক বস্তু শ্রীভগবানের।
সকলই তাঁহার সেবোপকরণ। সুতরাং তিনি সকল বস্তুতেই পূজ্যবুদ্ধি করেন
এবং যে-সকল বস্তু হরিসেবার অনুকূল তাহাদগকে ভগবানের প্রসাদ বলিয়া
গ্রহণ করেন এবং যাহা ভগবানের সেবার প্রাতকূল, তাহাকে দূর হইতে
দণ্ডবৎ (পরিহার) করেন।

আজকাল ‘সম্প্রদায়’ কথাটা শুনিলে অনেকে শিহরিয়া উঠেন। ঐ সকল লোকের ধারণা এই যে, সঙ্কীর্ণতা, গৌড়ামী ও অন্ধবিশ্বাসাদমূলে সম্প্রদায় গঠিত।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে-পর্যন্ত ভারতের সংশ্লিষ্ট হইয়াছে সেইকাল হইতেই এরূপ ধারণার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, স্বার্থপরতার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া প্রথমে আচার্য্যাগণ সম্প্রদায় স্থির করিয়াছিলেন।

যাঁহারা জগজ্জীবের কল্যাণের জন্য সর্ব্ব বিষর্জন করিয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়াছিলেন, যাঁহারা এক বৃক্ষতলে দুইদিন পর্য্যন্ত অবস্থান করেন নাই, যে-সকল নিক্ষেপন সাধু পুরুষগণ প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিস্টা জ্ঞান করিতেন, যাঁহারা নিজগ্রন্থে স্বীয় নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, সেইসকল মহাত্মনগণও সংসম্প্রদায়কে বহুমানন করিয়াছেন। অবধূতাগ্রগণ্য শ্রীশুকদেব, হরিরসমাদিরা-পানে নিরন্তর মন্ত শ্রীনারদ প্রভৃতি নিক্ষেপন পরমহংসকুল পর্য্যন্ত সাত্ত্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতদর্শী, অক্ষজবাদী, প্রত্যক্ষজ্ঞানদৃষ্ট, জড়ীয়জ্ঞানে মস্তিষ্ক পরিপূরিত ব্যক্তিগণ নিজদিগকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়াও মনোদ্বন্দ্বযুক্ত “অসাম্প্রদায়িক-সম্প্রদায়” নির্মাণ করিয়া ফেলেন! মনের খেয়ালকেই উদারতা বলেন এবং শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাত্ত্বতগণ-সেবিত পন্থা বা ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধিকেই সঙ্কীর্ণতা বলিয়া থাকেন।

অসংসম্প্রদায়ের সহিত সংসম্প্রদায়ের সমন্বয় হয় না। মনের খেয়ালের সহিত আত্মধর্ম্মের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। মুড়ি ও মিশ্রি কখনই এক-জাতীয় বস্তু নহে।

দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যেরূপ মনুষ্যের পক্ষে হিতকর, আত্মর বর্ণাশ্রম-বিরোধী ও বর্ণাশ্রম-সমাজ জগতের জঞ্জাল মাত্র। তদ্রূপ সংসম্প্রদায়ও জীবের শুদ্ধ আত্মধর্ম্ম বিকাশের উপযোগী স্থান এবং অসংসম্প্রদায়ও সংসম্প্রদায়-বিরোধী ধর্ম্ম-জগতের মহা অনিষ্টকারক।

সংসম্প্রদায় একমাত্র সং বা নিত্য সন্তাবিশিষ্ট বাস্তব বস্তু ভগবান্, ভগবদ্বক্তি ও ভগবদ্বক্তগণের আলোচনায় রত। সংসম্প্রদায় আস্তিক। অসংসম্প্রদায় নিত্যসদ্বস্ত ভগবান্, ভগবানের নিত্য-সেবা ও ভগবদ্বক্তগণের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা কেহ অপ্রচ্ছন্ন নাস্তিক, কেহ বা প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক।

কালপ্রভাবে সংসম্প্রদায়েও মলিনতা প্রবেশ করিতে পারে। বাজারে ভালদ্রব্য পাওয়া যায় না বা ক্রান্তমতা, ভেজাল প্রভৃতি চলিতেছে বলিয়া বাজার-প্রণালীটা উঠাইয়া দেওয়া বা বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিশৃঙ্খলা দোষিয়া বর্ণাশ্রম প্রণালীটা উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা কিছু বুদ্ধমানের কার্য্য নহে। শাস্ত্রানুমোদিত চেষ্টায় ঐ সকলের সংস্কার করাই উত্তম ও সমাজের হিতকর কার্য্য।

সংসম্প্রদায়ের আনুগত্যে আমাদের আত্মতত্ত্ব সাধু-পদাশ্রয়, সদ্ধর্মশিক্ষা, সংস্কার-নিপুণতা এবং সাধুগণ-পদাঙ্কিত ক্রমপন্থায় আরোহণ করিয়া অনায়াসে ও নির্ভীক-চিত্তে পরম প্রয়োজন লাভ হয়।

—জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২২৫ পৃষ্ঠার পর)

২৪। দেবকীর ষট্‌পুত্র ও সপ্তা পুত্র বলদেব কি তত্ত্ব? দেবকীনন্দনকে কংসভয়ে ব্রজে আনয়নের রহস্য কি?

“সেই দম্পতীর যশঃ, কীৰ্ত্তি প্রভৃতি ছয়টি পুত্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়; কিন্তু ঈশ-বিরোধী কংস তাহাদিগকে বাল্যকালেই হনন করে। ভগবদাস্ত্র-ভূষিত বিগুপ্ত জীবতত্ত্ব বলদেব তাহাদের সপ্তম পুত্র। জ্ঞানাস্রময় চিত্তরূপ দেবকীতে গুপ্তজীবতত্ত্বের প্রথমোদয়, কিন্তু মাতুল কংসের দৌরাস্ত্র-কার্য্য আশঙ্কা করিয়া সেই তত্ত্ব ব্রজ-মন্দিরে গমন করিলেন। তিনি বিশ্বাসময় ধাম ব্রজপুরী প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাময় চিত্ত রাহিণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। —কৃঃ সং ৪:৫-৮

২৫। কৃষ্ণলালা কি নর-চরিত্র হইতে গৃহীত কোন কল্পনা?

“নির্মূল কৃষ্ণ-চরিত্র শ্রীব্যাসাদি সারগ্রাহী জনগণের সমাধিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। জড়শ্রিত মানব চারিত্রের স্থায় উহা ঐতিহাসিক নয় অর্থাৎ কোন দেশে বা কালে পরচ্ছিন্নরূপে লক্ষিত হয় না; অথবা নর-চরিত্র হইতে কোন কোন ঘটনা সংযোগ-পূর্বক উহা কল্পিত হয় নাই।”

—কৃঃ সং ৩:১৬

২৬। কৃষ্ণের সমস্ত লীলাই নিত্য কেন?

“অধিকার-ভেদে কোন ভক্ত হৃদয়ে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ-জন্ম হইতেছে,

কোন ভক্ত-হৃদয়ে বস্ত্র-হরণ, কোন হৃদয়ে মহারাস, কোন হৃদয়ে পুণ্য-বধ, কোন হৃদয়ে কংস-বধ, কোন হৃদয়ে কুজা-প্রণয় এবং কোন হৃদয়ে পাকুর জীবনতাগ সময়ে অকর্দ্বান হইতেছে। যেমত জীবসকল অনন্ত, এক জগৎসংখ্যাও অনন্ত; এক জগতে এক লীলা ও অত্র জগতে অত্র লীলা, এরূপ শব্দরূপে বর্তমান আছেন। অতএব ভগবানের সমস্ত লীলাই নত্যা, কখনই লীলার বিরাম নাই, যেহেতু ভগবচ্ছক্তি সর্বদাই ক্রিয়া-তী।”

—কঃ সং ৭।১

২৭। বস্ত্রহরণ-লীলাটি কি?

“যে-সকল বাক্তির কৃষ্ণদাস্ত্রেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী, তাঁহাদের পূর্ণ বা পরগত কিছুই গোপনীয় নাই। ভক্তদিগকে এই তত্ত্ব শিক্ষা দবার জন্তই কৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র হরণ করিলেন।”

—কঃ সং ৫।৩৪

২৮। রাসাদি-লীলা কি অশ্লীল নহে?

“চিদ্রূপ মহারাস লীলায় কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত কীর্তি নারী। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, চিজ্জগতের সূর্যাস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা ও সমস্ত অণুচৈতন্যই ভোগ্য। প্রীতিস্থ্রে সমস্ত চিৎস্বরূপের নন্দন সিদ্ধ হওয়ায় ভোগাত্ত্বের স্ত্রী ও ভোক্তৃত্বের পুরুষই সিদ্ধ হইয়াছে। জড়দেহগত স্ত্রী-পুরুষই চিদ্রূপ ভোক্তা-ভোগ্যের অসৎ প্রতিফলন। সমস্ত অন্ধিধান অন্বেষণ করিয়া এমত এমতী শাক্য পাওয়া, যা বে না, যদ্বারা চিৎস্বরূপদিগের পরমচৈতন্যের সন্তিত অপ্রাকৃত সংযোগ লীলা সমকর্ণিত হইতে পারে। এতন্নিবন্ধন মায়িক স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ সম্বন্ধীয় শাক্যসকল তদ্বিষয়ে সর্বদা সন্মত। সমাক্ষ্যজক বলিয়া ব্যবহৃত হইল। ইহাতে অশ্লীল চিন্তার কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই।”

—কঃ সং ২।১৯

২৯। উগ্রসেন, কংস, কংস-ভার্যা ও জরাসন্ধ কি তত্ত্ব?

“নাস্তিক্যরূপ কংস বিগত হইলে তজ্জনক স্বাতন্ত্র্যরূপ উগ্রসেনকে শ্রীকৃষ্ণ রাজ-সিংহাসন অর্পণ করিলেন। অস্তি-প্রাপ্তি-নামা কংসে দুই ভাৰ্যা, কর্মকাণ্ডরূপ জরাসন্ধকে গাপন আপন বৈধবাদশা নিবেদন করিলেন।”

—কঃ সং ৫।২৫-২৬

৩০। কৃষ্ণলীলা কি মানব-কল্পিত ব্যাপার নহে?

“কৃষ্ণলীলা কোন নরকল্পনার বিষয় নয়, অথবা বঞ্চিত লোকের

অদম ও অক্লান্ত নিয়ম নয়। ইহা কোল পরমার্থজ্ঞ ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারেন।
 * * তাত্ত্বিক ও নৈতিকবুদ্ধি কৃষ্ণলীলার সাহায্যে স্পর্শ করিতে পারে না।
 * * তর্ক, নীতি, জ্ঞান, যোগ ও ধর্মধর্মের বিচার একদিকে অতিশয় ক্ষুদ্ররূপে পড়িয়া থাকে এবং ব্রহ্মতত্ত্বের মহাদীপক অপ্রাকৃত-বুদ্ধিশালী ব্যক্তি দগের হৃদয়ে অতদিকে দেদীপমান হইয়া চিদালোক বিতরণ করে।”

—শ্রীমঃ শিঃ ৫ম পঃ

৩১। কৃষ্ণলীলা কি আধ্যাত্মিক বা রূপক ?

আমরা বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে অপ্রাকৃত মনে করি, আধ্যাত্মিক মনে কর না। রূপক বর্ণনদ্বারা শুধু অভেদবাদকে বুঝাইবার জন্ত যে সকল চেষ্টা হয়, তাহা আধ্যাত্মিক; কেন না, তাহাতে প্রাকৃত-বৈচিত্র্য অবলম্বন-পূর্বক তন্নিরসনদ্বারা অদ্বৈতবাদ বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্মলীলা বর্ণন সেরূপ নয়। প্রাকৃত-বৈচিত্র্যের আদর্শ-স্থলীয় অপ্রাকৃত চিন্ময় বৈচিত্র্য আছে। যে সকল বর্ণন পাঠ করিয়া অপ্রাকৃত-বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা যায়, তাহাকে অপ্রাকৃত বর্ণন বলে।”

—‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ৬২

৩২। কৃষ্ণলীলা কেন আধ্যাত্মিক নহে ?

“কৃষ্ণলীলা আধ্যাত্মিক নহে। যে-স্থলে সকল তত্ত্বই একমাত্র ব্রহ্মাত্মায় পর্যাবসিত করা যায়, সেই স্থলে আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার উদয় হয়; মায়াবাদই আধ্যাত্মিক ব্যাপার। আধ্যাত্মিক অর্থের ও ভাবের যেখানে প্রবলতা, সেখানে কৃষ্ণলীলা ও চিন্ময় বৃন্দাবন-লীলার নিষ্পত্তি হয়। কৃষ্ণলীলা বিচিত্র। আধ্যাত্মিক-ভাব ও বৈচিত্র্য-ভাব—পরস্পর বিপরীত। আধ্যাত্মিক-ভাবে সেই পথম তত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয় সুপুঙ্খকৃত বস্তু। বিচিত্রশক্তি-ক্রিয়াতেই কে ল নিতরূপে কৃষ্ণলীলার উদয় হয়। এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরম-তত্ত্বে পরস্পর বিরোধ করে না। সুতরাং জ্ঞানমার্গে আধ্যাত্মিকভাবে যখন ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ ব্রহ্ম উদ্ভূত থাকেন, সেই কালেই বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন পরমতত্ত্ব নিতাদ্যম বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিতে থাকেন। মানব-বিচারে এইরূপ যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব স্থান পায় না; কিন্তু যাহার প্রতি সেই পরম-তত্ত্বের কৃপা হয়, তিনিই সেই বিরুদ্ধ তত্ত্বে সামঞ্জস্য দেখিতে পান। অচর্যশক্তিক্রমেই এই যুগপৎ ভেদাভেদ সিদ্ধ হইয়াছে।”

—‘সমালোচনা,’ সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮৭

৩৩। কৃষ্ণলীলা কি পার্শ্বভৌতিক ব্যাপার-বিশেষ ?

“অপ্রাকৃত-লীলায় যে-কিছু ব্যাপার বর্ণিত আছে, সকলই নিত্যসত্য, কখনই রূপকভাবে কল্পিত হয় নাই। জড়ীয় ইতিহাস ও অপ্রাকৃত-লীলার ভেদ এই যে, জড়ীয় ইতিহাস সম্পূর্ণ ভৌতিক ও দেশ-কালের অধীন, স্মরণীয় অনিত্য। অপ্রাকৃত-লীলা জড়ীয় ব্যাপারের ত্যায় ভাসমান হইলেও তাহাতে ভৌতিকত্ব নাই; সে-সমস্তই চিন্ময়। ভৌতিক চক্ষে কল্প-রূপায় দৃষ্ট হইতে পারে বলিয়া তাহার কোন অংশই এই পার্শ্বভৌতিক জগতের ব্যাপার নয়। কৃষ্ণলীলা প্রকৃতির অতীত, বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়াতীত বলিলে জড়েন্দ্রিয়ের অতীত—এইমাত্র বুঝিতে হইবে; তাহা চিন্ময় জীবের চিদিন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য বটে।” — সমালোচনা, সঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮৭

৩৪। কৃষ্ণলীলা। কল্পে নিগুণ? কৃষ্ণলীলার উপকরণ কি?

“এই জগৎ চিহ্নজগতের প্রতিফলিত তত্ত্ব এখানে মায়াদ্বারা সকলই কলুষিত হইয়া আছে। চিহ্নজগতে মায়া ও তদীয় ত্রিগুণ না থাকায় সমস্তই অনন্দ; সমস্তই শুদ্ধসত্ত্বময়। কালও তদ্রূপ; দেশও তদ্রূপ। কৃষ্ণলীলা মায়াগীত—ত্রিগুণাতীত; সূতরাং নিগুণ। সেই লীলার রস পুষ্টি করিবার জন্য নির্দোষ কাল, নির্দোষ-দেশ ও নির্দোষ-আকাশ-জলাদ কৃষ্ণলীলার উপকরণ। সূতরাং সেই চিন্ময়কালে (যাহাতে জড়ীয় কালের বিক্রম নাই) কৃষ্ণলীলা অষ্টকালীয়;—নিশান্তকাল, প্রাতঃকাল, পূর্বাহ্নকাল, মধ্যাহ্নকাল, অপরাহ্নকাল, সায়াংকাল, প্রদোষকাল ও রাত্রিকাল—এইরূপ অষ্টকালে দিব্য-রাত্রি বিভক্ত হইয়া কৃষ্ণলীলার নিত্য অখণ্ডরসের পুষ্টি করিতেছে।”

— চৈঃ শিঃ ৬৫

৩৫। প্রকট-ব্রজলীলা কয় প্রকার?

“প্রকট-ব্রজলীলা নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দুই প্রকার—ব্রজে অষ্টকালীয়া লীলাই নিত্য; আর পুতনা বধাদি ও দূর-পবাসাদি নৈমিত্তিক লীলা।”

— চৈঃ ধঃ ৩৮শ অঃ

৩৬। অস্বর-মারগাদি লীলায় কি শিক্ষা আছে?

“অস্বর-মারগাদি লীলায় ব্যতিরেকরূপে কৃষ্ণতত্ত্ব জানা যায়।”

— চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭৭

৩৭। ভগবান্ সাকার, না নিরাকার?

“তাহার অচিন্ত্য-শক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও চিৎসাকার। চিৎসাকার হইতে পারেন না—এ কথা বলিলে তাহার অচিন্ত্য শক্তি অস্বীকার করা হয়।”

— চৈঃ ধঃ ১১শ অঃ

৩৮। বেদ পরমেশ্বরকে নিরাকার বলেন কেন ?

“জড়পদার্থের যেরূপ একটী স্থূল আকার থাকে, ঈশ্বরের সেরূপ আকার নাই। এইজন্তই আমরা তাঁহাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারি না—
এইজন্তই বেদে কোন কোন স্থলে তাঁহার নিরাকার (?) বলিয়া উক্তি
হইয়াছে।” —চৈঃ শিঃ ১।১

৩৯। পরমেশ্বরকে সাকার অথবা নিরাকার, কোন্ বিচারে বিচার
করা ভাল ?

“পরমেশ্বর—বস্তুতঃ চিৎসাকার ও নিরাকার উভয়াত্মক। যে-সকল ব্যক্তি
উভয়ের মধ্যে কোন একটীর প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া অপর স্বরূপকে অগ্রাহ্য
করেন, তাঁহারা উভয় চক্ষে দৃষ্টি করেন না। বলিতে হইবে ” (ক্রমশঃ)

—তঃ সূঃ ৪ সূঃ

—জগদ্বন্ধু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বাঙ্গা পুরণ

পরম ঈশ্বর গোরা নামে করে মাতোয়ারা
যত নীলাচল বাসিগণে,
ভক্ত-বাঙ্গা পূরিবারে যেচে যাব ভক্তদ্বারে
হেন নাথ নাহি ত্রিভুবনে।
পুরী গোসাঞির মঠে ভাল জল নাহি কূপে
পুরী তাই দুঃখিত অন্তর,
জানিয়া পুরীর চিত অন্তর্যামী শচীশুত
ভক্ত লাগি' হইলা অস্থির।
ভক্তে দরশন দিতে পশিলা পুরীর মঠে
ভক্ত প্রেমে হ'য়ে বশীভূত,
পুরীর হৃদয়-নাথ ধরা দিলা পুরী-পাশ
লৌহে যেন ধরিল চুষক।
পুরী-প্রাণে সুখ দিতে কহে প্রভু উঠি' কূপে,
“কূপ-জল হউ গঙ্গাজল,
ভোগবতী গঙ্গা হেথা পশি' আন পবিত্রতা
হেথা স্নানে গঙ্গা-স্নান ফল।”

পুরী লাগি' বিশ্বস্তর কাহলেন হেন বর,
 ভক্তগণে করে হিধিনি,
 প্রভুসনে ভক্ত সবে বাসায় ফি'বল তবে,
 প্রেমোল্লাসে যাপিল বন্ধনী
 সেইক্ষণে গঙ্গাদেবী প্রভু-আজ্ঞা শিরে বহি'
 পূর্ণ হ'য়ে পশিলেন কৃপে,
 হ'ল তবে কৃপ-জল সুন্দর নিরমল,
 হেরে সবে প্রভাতে পুলকে ।
 বিস্মিত হইল পুরী নেহারি' কূপের বানি,
 বুঝিল এ ঈশ্বর-করুণা,
 পুলকে উঠিল নাচি', কহে কেঁদে—“হে প্রভুজী,
 হেন মোর পুরিলে বাসনা !”
 ভক্ত-ডাক শুনি' কানে আসি' প্রভু সেইক্ষণে
 কহিলেন পুরী বিদ্যামানে,
 “হের ভক্ত তোমা' লাগি' এল কূপে গঙ্গাদেবী
 কৃপ-জল পূত যে এক্ষণে ।
 এ জলে করিলে স্নান হবে জেনো গঙ্গাস্নান
 সত্য করি' কহিহু সবারে !”
 অনন্তর গৌরহরি সেই জলে স্নান করি'
 তুষিলেন পুরী গোসাঞিরে ।
 ভক্তবৎসল গোরাচাঁদ পুরিলা পুরীর সাধ,
 লভে পুরী সাক্ষাৎ ঈশ্বরে,
 প্রিয় ভক্ত লাগি' হরি : অকার্য্য সাধন করি'
 ভক্ত-গুণ জগতে প্রচারে ।

—জনৈক গুরুসেবাকাঙ্ক্ষী

সন্দভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দভ—২৯)

দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান ; এসকল তাঁহার আধার-শক্তি-লক্ষণ বিভূতি-স্বরূপ । শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

“স ভগবন্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্মে মহিম্যীতি সাক্ষাদ ব্রহ্ম গোপালপুরী” ইত্যাদি ; অর্থাৎ “হ ভগবন্, সেই ভূমাত্র শ্রীহরি কোথায় অবস্থিত ? তিনি নিজ বিভূতিতে প্রতিষ্ঠিত । গোপালপুরী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম”—ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ কথিত হইয়াছে । এই সকল ধামে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবিচ্ছেদে লীলা করেন । প্রাকৃত পৃথিব্যাদিতে তাঁহার স্পর্শ-সম্ভাবনাও নাই ; সুতরাং তাহার তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না । প্রকট-লীলায় কখনও কখনও যে অতুল গমনাগমন শুনা যায়, সেই সেই স্থানে তাঁহার আধার-শক্তিরূপ স্থান সমূহের আবেশ হেতু তাহা সম্ভব হয় ; অর্থাৎ দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন মিথিলায় গমন করেন, তখন দ্বারকা ধাম মিথিলায় আবিষ্ট হইয়াছিলেন—সর্বত্রই এই প্রকার জানিতে হইবে ।

যদিও তাঁহার অপ্রকট-লীলায় বাল্যাদিভাবও আছে, তথাপি কিশোর আকারেরই মুখ্য হেতু সেই আকার আশ্রয় করিয়াই সমস্ত লীলা প্রবর্তিত হয় ; আর প্রকট-লীলাও অপ্রকট-প্রকাশস্থিত কিশোর আকার আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয় । দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন—এই তিন স্থানেই যুগপৎ একই কিশোরমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ প্রাপঞ্চিক লোকলোচনের অগোচরে নিত্যলীলাময় ভূভাব-হরণাদি আনন্দময় কার্য্য করিলেও পরিকরগণের আনন্দ-চমৎকারিতা পোষণার্থ এই জগতে লৌকিক রীতি-সংযোগে অপূর্ণ নিজ জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ডাদি লৌকিক লীলা প্রকট করেন । তথায় দ্বারকাদি ধামে নিজ নিত্য-বস্থিত কৈশোরাদি বিলাস সম্পাদনের জন্ত যাদবাদি পরিকরগণের সহিত প্রকাশান্তর দ্বারা বিহার করেন ; অতঃপর বৃন্দাবন গৃহে অবতীর্ণ হইয়া বসু-দেবের মত প্রকাশান্তরে অপ্রকট-প্রকাশে অবস্থান করতঃ ব্রজের সহিত ব্রজ-রাজ গৃহেও আগমন করেন । ব্রজরাজের হৃদয়ে অনাদিকাল সিদ্ধা কৃষ্ণ-বিষয়িনী বাৎসল্য-মাধুরীকে নবীভূত করিবার জন্তই ব্রজরাজ গৃহে জন্মগ্রহণ-লীলা প্রকাশ করেন । তথায় অবস্থান করিয়া গোকুলজনের অন্তর্বিহরিক্রিয়াকে নিরতিশয় বশীভূত করিয়া তাঁহাদের প্রেম-সম্পত্তিকে সম্বন্ধিত করিয়া শ্রীবসুদেব

প্রভৃতিকে আনন্দিত ও পৃথিবীর ভার-স্বরূপ অস্তুরগণকে বিনাশ করিবার জন্ত মথুরায় প্রস্থান করেন। তৎপর দ্বারকা ধামকে প্রকাশ করিবার জন্ত তথায় লীলামাধুরী পরিবেশন করেন; অতঃপর প্রসিদ্ধ লীলাসমূহ সিদ্ধ হইলে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রকট লীলাকাল একাদশ বৎসরব্যাপী।

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

ততো নন্দরজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বি বিভ্যতা ।

একাদশ সমাস্তত্র গুচাচ্চিঃ সবলোহবসৎ ॥

(শ্রীভাঃ ৩।২।২৬)

সচরাচর পঞ্চদশবর্ষ বয়সে কৈশোর প্রাপ্তি হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অল্পকাল মধ্যেই কৈশোর অবস্থা অতিক্রম করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ কৈশোরকাল গোকূলে স্থিতি; তৎপর মথুবা ও দ্বারকালীলা। মথুরার প্রকটলীলা দ্বারকায় অল্পগমন করে।

কংসবধের পর কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ যাত্রা, তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, দুৰ্য্যোধন প্রভৃতিও আসিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে বসুদেব কুন্তী-দেবীকে বলিয়াছিলেন—

কংসপ্রতাপিতাঃ সর্কে বয়ং যাতা দিশং দিশম্ ।

এতর্হ্যেব পুনঃ স্থানং দৈবেনাসাদিতাঃ স্বসঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১০।৮২।২১)

অর্থাৎ, “হে ভগিনি, আমরা কংসের উৎপীড়নে বিভিন্ন দিকে গমন করিয়াছিলাম। সম্প্রতি দৈব কর্তৃক পুনরায় নিজ নিজ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।

তৎপরে পাণ্ডবদের রাজস্বয় যজ্ঞ; তাহাতে শিশুপাল বধ, তদনন্তর পাশা খেলা, দন্তবক্রবধ, পাণ্ডবদের বনগমন, শ্রীকলদেবের তীর্থযাত্রা, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ও দুৰ্য্যোধন-বধাদি লীলার ক্রমবর্ধন করিয়াছে। দন্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন।

দ্বারকার রাজবেশী কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়া গোপবেশ ধারণ করেন। এই বেশেই ব্রজবিহার। দন্তবক্র-বধান্তে তিনি যমুনা পার হইয়া ব্রজে আসেন। গোপবেশের বস্ত্রাদি সঙ্গে আনেন নাই; কিন্তু বৃন্দাবন-ভূমি স্পর্শমাত্রই গোপবেশে তাঁহার স্বরূপ-শক্তির দ্বারাই সজ্জিত হন। বৃন্দাবনে গোপবেশ, পুরীধয়ে রাজবেশ। ব্রজে দুইমাস প্রকটলীলার পরে অপ্রকট-লীলায়

প্রবেশ। দুইমাস প্রকট-লীলার পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে বিরহাভিভয়ে পীড়িত দেখিয়া যাহাতে পুনরায় বিচ্ছেদ না ঘটে এজন্ত তাঁহাদের নিকট নিজ গোকুলাখ্য-পদ আবির্ভাব করাইলেন। প্রকট-লীলাতে ভূভারহরণাদি প্রয়োজন থাকে; কিন্তু অপ্রকট-লীলা বহিঃসংসারের জন্য অসম্ভব বলিয়া তাহাতে বিরহ-সম্ভাবনা নাই। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে বিরহব্যাধি-বিরহিত নিজ নিত্যস্থান প্রদানপূর্বক দেবগণকর্তৃক স্তুত হইয়া অতুপ্রকাশে দ্বারকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ ব্রজাগমন স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু পান্মোত্তর খণ্ডে তাহার উল্লেখ আছে। তাহার উদ্দেশ্য—শ্রীশুকদেব বহিঃসংসার জনগণের নিকট ইহা গোপন করিয়াছিলেন। এজন্ত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

“পরোক্ষবাদা শ্বষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্”

(শ্রীভাঃ ১১।২।১৩৫)

অর্থাৎ, “শ্বষিগণ পরোক্ষবাদী এবং পরোক্ষ আমাব প্রিয়।” শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোকুলেই প্রকাশাতীত প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যগত, কারুণ্যগত, মাধুর্য্যগত ও লীলাগত এই চতুর্বিধ প্রকাশ। ব্রহ্মমোহনলীলায় ঐশ্বর্য্যগত প্রকাশ; পুত্ননাকে মাতৃগতিদানে কারুণ্যগত প্রকাশ। অর্থাৎ অশেষ দোষতুষ্টার প্রতিও ক্রুপা করা; ব্রজস্বীগণে, পুলন্দগণে, ব্রজের তৃণলতাদিতেও মাধুর্য্যগত প্রকাশ আর লীলাগত প্রকাশ—মথুরায় বহুদেব-দেবকী যে লীলা-আশ্বাদন করিতে পারেন নাই তাহা ব্রজরাজ দম্পতি আশ্বাদন করিয়াছেন। এজন্তই শ্রীশুকদেবের উক্তি,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩২)

ইতং সতাং ব্রহ্মস্বখাভূত্যা

দাস্ত্যং গতানাং পরদৈবতেন।

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন

সাকং বিজহুঃ কৃত পুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ (শ্রীভাঃ ১০।১২।১১)

এতাঃ পরং তদুভূতো ভুবি গোপবধেবা

গোবিন্দ এব নিখিলায়নি ক্রুচভাবাঃ।

বাজ্জন্তি যন্তবভিষৌ মুনয়ো বয়ঞ্চ

কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত-কথাসারম্ ॥ (শ্রীভাঃ ১০।৪৭।৫৮)

অর্থাৎ, পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র ষাঁহাদের মিত্র, সেই নন্দাদি ব্রজবাসিগণের কি সৌভাগ্য তাহা বর্ণনাতীত।

যে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ম স্খানুভূতিরূপে, ভক্তগণের নিকট পরমদেবতারূপে এবং মায়ামিশ্রিত জনগণের নিকট নরবালকরূপে বর্তমান, গোপবালকগণ তাঁহারই সহিত বিহার করিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে কেবল ব্রজবাসিনী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসী গোপীগণেরই দেহধারণ সার্থক ; যেহেতু নিরুপাধিক প্রেমাম্পদ সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণে ইচ্ছায়া অভূত ক্লটভাবসম্পন্ন অর্থাৎ পরম-প্রেমবতী। সংসারভয়ে ভীত মুনিগণ, মুক্তগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী আমরা (উদ্ধারের উক্ত) পর্যাণ্ত মহিমাদৃষ্টিতে যে-ভাব বাঞ্ছা করি, কিন্তু পাই না সেই মহাভাব সম্পত্তির অধিকারিণী একমাত্র এই ব্রজবধূগণ। অপরিদীপ্ত মাধুর্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকথা-রসিক ব্যক্তিগণের ব্রহ্মজন্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় (ত্রিবিধ—শৌক্য, সাবিত্রা ও দৈত্য) জন্মদ্বারাই বা কি অথবা চতুর্সুখ-ক্রমেই বা কি? যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহারা সর্বোত্তম।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তভিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

সনাতনের বন্ধন-মোচন (নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৪ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

প্রধান মন্ত্রী সনাতনের বাটী

সনাতন ও ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

সনাতন—পণ্ডিতজী, আমার প্রতি রাজার যে স্নেহ সেইটাই আমার বন্ধনের কারন। বাদশা যদি কোনক্রমে একবার আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হ'ন, তা'হলেই আমি অব্যাহতি পাই। তাই এই অস্ত্রখের অছিল। করে রাজকার্য্যে অবহেলা করে বাড়ীতে বসে আছি। জানি না—কবে আমার এ বন্ধন কাটবে!

ভট্টাচার্য্য—গুনলাম বাদশা নাকি গতকাল আপনার কাছে এক বৈয়াক্ষ পাঠিয়েছিলেন?

সনাতন—আজ্ঞে হ্যাঁ, বৈজ্ঞ এলো, আমায় দেখলো; বললে, কোন অসুখ দেখছি না।

ভাট্টাচার্য্য—(হাসিয়া) আপনার অসুখ কি কখনও ডাক্তারী ওষুধে সারে ?
এ হ'ল ভবরোগ। ভবরোগের বৈজ্ঞ ছাড়া এ রোগ ধরা সাধারণ
প্রাকৃত চিকিৎসকের সাধ্য নয়।

সনাতন—তাইতো ভবরোগীর হাসপাতালে যাবার জন্ত আমার এত
আকাজ্জা। না জানি—কবে গৌরসুন্দর রূপা করবেন!

(দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন)

ভাট্টাচার্য্য—মন্ত্রীবর, অত উতলা হবেন না। ধৈর্য্য ধরুন! ভক্ত-বৎসল
ঈশ্বর নিশ্চয়ই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন!

সনাতন—আপনি পাঠ আরম্ভ করুন।

ভাট্টাচার্য্য—বেশ, আপনি উপবেশন করুন।

(উভয়ে উপবেশন করিলেন ও ভাট্টাচার্য্য পাঠ আরম্ভ করিলেন)

ভাট্টাচার্য্য—“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।

ন সাধ্যায়ন্তপন্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা ॥”

অর্থাৎ, (শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন), উদ্ধব! আমার উজ্জিতা—শ্রেষ্ঠা,
ভক্তি—প্রেমভক্তি যেরূপ আমাকে রুদ্ধ করে, বশীভূত করে, যম-
নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য (আত্মনাত্মবিবেক), ধর্ম (গার্হস্থ্য
ধর্ম), স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) তপস্তা, এবং ত্যাগ (সন্ন্যাস) ইহারা
কেহই আমাকে সেরূপ বশীভূত করতে পারে না।”

“জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ধর্মে নহে কৃষ্ণ বশ।

কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তি রস ॥”

ভক্তি স্বতঃ প্রবলা। একমাত্র ভক্তিধারাই তিনি বশ হন। ভক্তির
শ্রেষ্ঠত্ব সর্বশাস্ত্রেই স্বীকৃত হয়েছে। ভক্তিই প্রাণীদের মোক্ষের করেন।

ব্রহ্মরমনীগণ লোকধর্ম, বেদধর্ম, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত বিসর্জন
দিয়ে শুদ্ধভক্তিপথ অবলম্বনেই কৃষ্ণকে লাভ করেছিলেন। তাই
শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ
নিগূঢ় প্রেমভাজনম্।” অর্থাৎ, হে পার্থ, ঐ গোপীরা ছাড়া আমার
প্রিয় পাত্র আর কেউ নেই।

[দীশানের প্রবেশ ।]

দীশান—(দণ্ডবৎপূর্বক মন্ত্রী প্রতি) প্রভু, জাঁহাপনা আসছেন ।

সনাতন—আচ্ছা, তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে এসো ।

দীশান—জি আজ্ঞে । (দণ্ডবৎপ্রতিপূর্বক প্রস্থান)

[বাদশার প্রবেশ ।]

(সনাতন ও ভট্টাচার্য্য উভয়ে বাদশাকে স্বাগত জানাইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

সনাতন—(নমস্কারপূর্বক) আসুন সম্রাট ! আজ আমার কি সৌভাগ্য,—

আপনি এ দীনের কুটীরে স্বয়ং পদার্পণ করেছেন ।

বাদশা—আমি আস্তে বাদ্য হ'লাম সাকর, তুমি ক'দিন ধরে রাজসভায় যাও নি । রাজকার্য্যে বড়ই শৈথিল্য দেখা দিয়েছে । তোমার কোন অসুখ হ'য়েছে ভেবে তোমার কাছে বৈद्य পঠালাম, বৈद्य ফিরে গিয়ে বললে—তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, কোন অসুখই তোমার নেই ।

ভট্টাচার্য্য—(স্বগত) এ রোগ কে ধরবে ?

সনাতন—সম্রাট ! (দূরে নীল আকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়া) ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, কে যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে । বল্হে—“বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল । বিষয় নয়,—ও বিষ । আমাকে মন-প্রাণ সঁপে দে, আমার শরণ গ্রহণ কর । আমিই তোকে উদ্ধার করবো !” ঐ দেখুন,—সেই গৌরবর্ণ নবীন সন্ন্যাসীর কি অভিনব লীলা ! অহা প্রভু শচীনন্দন, তুমিই তো যশোদা ছলল ! তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হয়ে কৃষ্ণ-বিরহে পাগল ! তোমার আগমনে এ অষ্টাবংশ কলিযুগও ধন্য । ধন্য কলির মানুষ !

বাদশা—(ভট্টাচার্য্যের প্রতি) সাকরের মন বড় উতলা হয়ে গেছে, পণ্ডিত ! তুমি কেতাব শুনিয়ে ওর মনটা একেবারে আরও পাগল করে দিয়েছো । এরকম পাগল করা তোমার উচিত হয় নি, বন্ধু । দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা কে জানে ! চলে গেলে তখন বুঝবে, এই বাদশা কেন তাঁকে ধরে রাখবার জন্ত এত আগ্রহী ছিল ।

(সাকরমল্লিকের প্রতি—সাকরমল্লিকের পিঠ চাপ্ড়াইয়া) ভাই সাকর, দবিরখাস চলে গেল দাগা দিয়ে । তুমিও কি সেইরকম আমায় ছেড়ে যাবে ?

সনাতন—ঐ, ঐ দেখুন, আমার প্রভুর কি নৃত্যছন্দ ! অহা, আজ প্রভুর

আগমনে বৃন্দাবন যেন নবীভূত ; সেখানকার ব্যাঘ্র, মৃগ, হস্তী ইত্যাদি বনের পশু ও পাখীরা সকলেই ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ বলে নাচছে। এ লীলার মহিমা কে জানবে! প্রভু আমার স্বয়ং নামী হ’য়ে নাম কীর্ত্তন করছেন ও করচ্ছেন। ঐ শুভ্র, প্রভু উদাস্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন,—

‘হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা ॥”

বাদশা—শোন সাকর, আমার একটা কথা রাখ। আমি দিন কতকের জন্ত দাক্ষিণাত্য বিজয়ে যাচ্ছি। সেখান থেকে আমার ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্ত রাজ্য-কার্য্য পরিচালনা কর।

সনাতন—সম্রাট্! আপনার এ অনুরোধ আমার দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আমাকে নিয়ত গৌরমুন্দর ডাকছেন। তাঁর আহ্বানে আমায় সাড়া দিতেই হবে। আর মায়াবিদ্রায় নিদ্রিত থাকলে চলবে না। আপনি যেন মনে ফুট হবেন না। আপনার আদেশের থেকেও তাঁর আদেশ বড়, সম্রাট্! আপনিই তো তাঁকে দূর থেকে দর্শন করে বলেছেন—এ সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ দেবতা। সেটা অবশ্য আপনার অনুমান আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, সত্য।

ভট্টাচার্য্য—করজোড়ে) জাঁহাপনা, ঠুকে যেতে দিন। যার মন ছুটেছে তাঁকে কি আগলে রাখা যায়?

বাদশা—চিন্তা করে দেখি, কি করা যায়? এখন আমি প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি।

সনাতন ও ভট্টাচার্য্য—আচ্ছা, আসুন। (সেলাম করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাদশার প্রস্থান।)

ভট্টাচার্য্য—চলুন মন্ত্রীবর, এখন বিশ্রাম করবেন।

সনাতন—শ্রীগৌরমুন্দরের পাদপদ্ম লাভ করা ব্যতীত পূর্ণ বিশ্রাম হতে পারে না, পণ্ডিতজী। চলুন কোথা যাবেন!

(উভয়ের প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

[বাদশা হোসেন শাহ ও কেশব ছত্রীর প্রবেশ]

বাদশা—(ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক) ছত্রী, মন্ত্রী

সাকরমল্লিককে আমি খুবই স্নেহ কর্তাম; সে কোন দিন আমার কথা এড়ায় নি। কিন্তু আজ এ কি দুর্ব্যবহার! সম্রাট স্বয়ং তার দরবারে গিয়ে অনুরোধ জানালো, তবু সেই অনুরোধ সে তামিল্য ভাবে প্রত্যাখ্যান করল! সে ঔদ্ধত্যের সীমা ছাপিয়ে গেছে! তাকে যথোচিত শিক্ষা আমায় দিতেই হবে। সে কি ভুলে গিয়েছে যে আমি তার প্রভু এবং সে আমার ভৃত্য?

যাও—এই মুহূর্তে সৈন্যাধ্যক্ষকে ডেকে আন।

ছত্রী—(ভয়ে ভয়ে) জি হজুর—যথাদেশ!

বাদশা—(সিংহাসন হইতে উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে) সাকর, সাকর, সে কত বড় ধূর্ত দেখি! এবার শয়তানকে নজর বন্দী করে রেখে দেবো। দেখি তা'কে কে মুক্ত করে দিয়ে যায়! সে রাজ্যের সম্রাটের অপমান করেছে, সে অপরাধী। সে যতই হোসেন শাহ'র প্রিয় হোক, হোক না কেন সে গোড়ের প্রধানমন্ত্রী; তবু—তবু সে অপরাধী। তার বিচার আমাকেই করতে হবে। সে শয়তানী মতলব এঁটেছে যে আমার অধীনে সে কাজ করবে না। সে এত শক্তি ধরে! সম্রাটের শক্তির কাছে তার সমস্ত শক্তি মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট হইয়া যাবে। আমারই রাজ্যে বাস করে আমার অধীনতা স্বীকার করবে না? আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবে, আর আমি নির্বিচারে তা' সহ্য করে যাব? তা'হলে আমাকে প্রজারা বলবে—রাজা ভীক, কাপুরুষ, রাজার পুরুষকার নাই। না—না, তা' হবে না। তা'কে আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না। সে আমার আর মিত্র নেই,—সে এখন আমার শত্রু, রাজ্যের শত্রু, রাজ্যের প্রজাদের শত্রু। সে রাজদণ্ড তথা রাজার অপমান করেছে।

(ছত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষ বাদশাকে সেলাম করিয়া প্রবেশ করিল।)

বাদশা—শোন সৈন্যাধ্যক্ষ, তুমি এই মুহূর্তে একশত সুশিক্ষিত সেনানী নিয়ে সাকর-মল্লিকের বাড়ী ঘেরাও করগে। দেখো যেন সে কোনক্রমে বাড়ী হ'তে পালিয়ে না যায়। আমি চাই তা'কে আটক-বন্দী করে রাখতে। স্মরণ রেখো সে প্রধানমন্ত্রী, তার বুদ্ধি তোমার থেকে ঢের বেশী। তার কোন অনুন্নয় বিনয়ে কিছুতেই কর্ণপাত ক'রো না। আর সাবধান, অতর্কিতে গিয়ে তার বাড়ী ঘেরাও করবে।

এ সংবাদ যেন সে পূর্বে একটুও জান্তে না পারে ; তা হ'লে কিন্তু তুমি যাবার পূর্বেই সে পালিয়ে যাবে।

সৈন্তাধ্যক্ষ—নিশ্চিত থাকুন জাঁহাপনা ! আমি আপনার অগ্নে প্রতিপালিত। আমার উপর আপনি বিশ্বাস রাখুন। আমি এই দরবারে দাঁড়িয়ে আপনাকে কুনিশ করে বলছি, আপনার আদেশ আমি যথাযথ পালন করব ! রাজ-আদেশের কাছে অস্ত্র সকল বুদ্ধিই পরাভূত হবে। সেলাম ! (প্রস্থান)

বাদশা—ছত্রী, তুমি সাকরের বিশেষ স্নেহভাজন। তাই তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, এ খবর যেন প্রকাশ না হয়। কোনক্রমে এ কথা প্রকাশ পেলে গর্দান যাবে। যাও,—এখন আমার অন্তঃপুরে যাবার ব্যবস্থা করগে।

ছত্রী—জি আজ্ঞে, জাঁহাপনা ! (সেলাম করতঃ প্রস্থান)

বাদশা—এইবার, এইবার দেখি সাকর তুমি বড় না আমি বড় !

[জর্নৈক গায়কের প্রবেশ।]

গায়ক—

গীত

“মন রে, ধনমদ নিতান্ত অসার। ধন-জন-বিস্তৃত যত, এ দেহের অনুগত,
দেহ গেলে সে সকল ছার ॥ বিচার যতেক চেষ্টা, চিকিৎসক উপদেষ্টা,
কেহ দেহ রাখিবারে নারে। অজপা হইলে শেষ, দেহ মাত্র অবশেষ,
জীব নাহি থাকেন আধারে ॥ ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ। ধনে নাহি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ,
অতএব কি করিবে ধন ? যদি থাকে বহু ধন, নিজে হবে অকিঞ্চন,
বৈষ্ণবের কর উপকার। জীবে দয়া অনুক্ষণ, রাধাকৃষ্ণ আরাধন,
কর সদা হ'য়ে সদাচার ॥” (প্রস্থান)

বাদশা—কে, কে তুমি গায়ক, আমায় শিক্ষা দিয়ে গেলে ?

(সিংহাসন হইতে উঠিয়া) হায়, হায়,—আমি কি করলাম ! রাজ্য, ঐশ্বর্য্যমদে আমি এমনই অন্ধ যে, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বৈষ্ণবকে বাঁধতে আদেশ দিলাম ! হায়, আমি ত্রায়দশ হাতে নিয়ে অস্ত্রায় কর্ম করলাম ! হে খোদা, আমি কি করলাম ! আমি কি করলাম !!

(প্রস্থান) (ক্রমশঃ)

—শ্রীচন্দ্ররঞ্জন মণ্ডল

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতক

(পূৰ্বপ্ৰকাশিত ১৬শ বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৬ পৃষ্ঠাৰ পৰা)

নবদ্বীপবাসী জন্তুগণে যত দিন ।
সানন্দসচ্চিন্তাব না হয় প্ৰবীণ ॥
ততদিন হইয়াও সে ধামে প্ৰবিষ্ট ।
ধাম-অপৰাধে নাহি লভে নিজ ইষ্ট ॥৫৮॥
নবদ্বীপে স্থাবর-জঙ্গমে যেই দিন ।
সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধি হয় মলহীন ॥
সেই দিন স্নানধাত্তসেবা যোগ্যৰূপ ।
লভে জীব ব্ৰহ্মধামে অতি অপৰূপ ॥৫৯॥
নবদ্বীপে বস্তুতত্ত্ব করহ বিচাৰ ।
সকল বিভব আৰ সৰ্বধৰ্ম্মসার ॥
সকল ভজন-সার সৰ্বসিদ্ধি-ফল ।
সকল মাধুৰ্য্য-সার বিহাৰ নিৰ্মল ॥ ৬০ ॥
কবে আমি নবখণ্ডে লোকধৰ্ম্ম ত্যজি ।
মহাপ্ৰেম-মাধবী-রসে নিরন্তর মজি ॥
গাহিব হাসিব আৰ ভূমিতে লুটিব ।
দৌড়িব কাঁদিব পাড় মুচ্ছিত হইব ॥ ৬১ ॥
গৌরস্থলে লোকধৰ্ম্ম গেহ দেহ ভুলি ।
তুল্য নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখে কুতূহলী ॥
উন্নদ প্ৰেমেতে মত্ত গ্ৰহগ্ৰস্ত মত ।
বিচাৰিব কত দিনে কৰি ধামব্রত ॥ ৬২ ॥
কুপামূৰ্ত্তি শ্ৰীগৌৰাঙ্গ-শিক্ষা-অনুসারে ।
হৰেকৃষ্ণ ৰামনাম সিদ্ধ মন্ত্ৰাঙ্করে ॥
মহাশৰ্য্য নামাবলী গাইতে গাইতে ।
কবে বা কৃতার্থ হব এ গৌরস্থলীতে ॥ ৬৩ ॥
ইন্দ্রনীলমণি বৃক্ষশু নানামত ।
পুৰট স্ফটিক পদ্মরাগ-বিনিৰ্মিত ॥
বত্ৰবেদী যেখানে বাক্ষারে অলিগণ ।

শুক পীক ময়ূরের অপূৰ্ণ দৰ্শন ॥
 গন্ধপুষ্প-অশোভিত নানা সরোবর ।
 সেই নবদ্বীপ ধামে প্রকৃতির পর ॥
 সেইধাম-ধ্যানসুখে নিমগ্ন হইয়া ।
 বসিব শ্রীগৌরধামে রসেতে ডুবিয়া ॥ ৬৪ ॥
 মধ্যদ্বীপে স্বরাটাত্য পৰ্ব্বতের পাশে ।
 কদম্বমণ্ডিত কেলিকুঞ্জ পরকাশে ॥
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাসমণ্ডল দেখিয়া ।
 প্রেমপূর্ণ হব আমি স্মৃতি অরিয়া ॥ ৬৫ ॥
 অনিত্য দুঃখদ পত্নী, পুত্র, বিত্ত ছার ।
 মুক্তিকথা, বৈকুণ্ঠে পিপাসা নাহি আর ॥
 রাধাভাব-ছাতি-মাথা কৃষ্ণগীলাবনে ।
 একবিন্দু রতিমাত্র মাগি নিজ মনে ॥ ৬৬ ॥
 মন্তক নোয়ায়ে নমি শ্রীগোদ্রমবন ।
 বাক্য সদা শ্রীগোদ্রম করিয়ে কীর্তন ॥
 স্নান বুদ্ধিযোগ অরি শ্রীগোদ্রম ধাম ।
 গোদ্রম ছাড়িয়া মোর অণু নাই কাম ॥ ৬৭ ॥
 রাধাকান্ত রতিকন্দ শ্রীগৌরঙ্গ-বন ।
 অবিরত কৃষ্ণ-ভক্তগণের জীবন ॥
 সেই সব ভক্তজন চরণের ধূলি ।
 আশামাত্র আশা করি বাস গৌরস্থলী ॥ ৬৮ ॥
 নানা কেলি-নিকুঞ্জ-মণ্ডলে অশোভিত ।
 নানা সরোবর-বাপী-তড়াগ-মণ্ডিত ॥
 নানা গুল্ম-লতাদ্রুম-মণ্ডপে বেষ্টিত ।
 নানাজাতি খগ-মৃগদ্বারা উল্লসিত ॥
 অনেক বিহারস্থল জ্যোতির্ময় ধামে ।
 কবে আমি গৌরস্থলে লভিব বিশ্রামে ॥ ৬৯ ॥

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

আউলাদি মত কি শুদ্ধ

(পত্র-মীমাংসা)

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

আউল, বাউল, কৰ্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ সাঁই ।

সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গৌঁসাই ॥

অতিবাড়ী, চুড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী ।

তোতা কহে এ তেরোর সঙ্গ নাহি করি ॥

এই তেরটার পরিচয় বিশেষভাবে বিস্তারিতরূপে জানিবার একান্ত লালসা । বিশদভাবে জানাইয়া বাধিত করিলে উপকৃত হইব ।

‘তোতা কহে’—এ ‘তোতা’ কে ? তাঁহার জীবনী জানিতে ইচ্ছা করি । ইনি কি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষচতুষ্টয়-বর্জিত ? তাঁহার বাক্য কি বেদবাক্যের আয় বিগুদ্ধ বৈষ্ণবমণ্ডলীর অবশ্যই প্রতিপাল্য ? যদি আমার উপরি উক্ত প্রশ্নের উত্তরগুলি আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ করেন তাহা হইলে বোধ হয় অনেকেরই উপকার হইতে পারে । ইতি—

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী

* * * দত্ত

শক্তিপুর, মুর্শিদাবাদ

উত্তর

অসমোদ্ধ পুরুষোত্তম ভগবান্ শক্তিমতত্ব ; শক্তি—তাঁহার আশ্রিত । সেই শক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ,—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ । অন্তরঙ্গ শক্তি ভগবানের স্বরূপ শক্তি এবং অতি উপাদেয়রূপে ভগবানের নিত্য আশ্রিতা । তদ্বিপরীত মায়া বা বহিরঙ্গ শক্তিরও শক্তিমতত্ব ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । সেই মায়াশক্তি গর্হিতভাবে পূর্ণপুরুষ ভগবানেই আশ্রিত । ইহাই প্রমাণ চুড়ামণি বিদ্বদনুভব-স্বরূপ বাদরায়ণের সমাধিলক্ক প্রত্যক্ষ এবং চতুঃশ্লোকীর “ঋতেহর্থং যং প্রতীয়েত” শব্দ-প্রমাণদ্বারা সমর্থিত । অতএব যেখানে যেখানে শ্রীভগবানের স্বরূপ বা তাঁহার স্বরূপশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইখানেই সম্যক্-প্রণিহিত অমলচিত্ত বিদ্বৎগণ স্বরূপশক্তি-সমন্বিত ভগবানের পশ্চাত্তাণে গর্হিতভাবে আশ্রিত বহিরঙ্গ মায়াকে দর্শন করেন । ভক্তিয়োগ

প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যগ্রূপে ভগবানে সমাহিত না হইলে, কেহই স্বরূপ-শক্তি সমন্বিত পূর্ণপুরুষ এবং অপকর্ষ-ভাবে তদধীন বহিরঙ্গা শক্তিকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না। শ্রীনারদোপদিষ্ট ব্যাসদেব সমাধিযোগে ভগবৎ স্বরূপ ও মায়া স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। বিগুহচিত্ত ভক্তিয়োগী ব্যাসানুগগণও তাহা দর্শন করিতে পারেন; কিন্তু অপরে পারেন না; যেমন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি তাহাকে যে ভূত আক্রমণ করিয়াছে, ইহা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম না হইয়া পর্যন্ত বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ জীবও বহিরঙ্গা মায়ার কবলে কবলিত থাকিয়া সেই বিমুখবিমোহিনী পিশাচিনীকে চিনিতে পারে না। ব্যাসদেব যেরূপ নারদের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া মায়া স্বরূপ জানিবার অভিনয় ও আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, তদ্রূপ মায়াবিমোহিত জীবও মায়ানির্মুক্ত শ্রীগুরুদেবের রূপায় ভক্তিয়োগ-প্রভাবে শুদ্ধচিত্ত ও সম্যক্ প্রণিহিত হইয়া স্বরূপশক্তিসমন্বিত ভগবান্ ও তদপাশ্রয়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে জানিতে পারেন।

উপরি-উক্ত পক্ষে যে তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজের নাম দৃষ্ট হয়, তিনি সেই প্রকার ব্যাসানুগ অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের কোন এক মহাপুরুষ। ভক্তিয়োগ-প্রভাবে তাঁহার চিত্ত শুদ্ধীভূত এবং ভগবানে সম্যগ্রূপে সমাহিত ছিল; তাই তিনি একদিকে যেমন স্বরূপশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানের ঐকান্তিক সেবক ছিলেন, অপরদিকে আবার ভগবানের পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা বিমুখবিমোহিনী মায়া বিচিত্ররঙ্গ দর্শন করিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ পরহুৎ-কাতরতা বশে মায়া ন্যাট্যলি পরমার্থ-পথে প্রবেশেচ্ছু জনগণকে জানাইয়া তাঁহাদের সাধন-পথের পরম বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীর কার্য্য করিয়াছেন। সর্বকালেই মহাজনগণের এইরূপ অযাচিত করুণায় জীবকুল স্নাত হইয়া থাকে! বেদান্তসূত্রে শ্রীব্যাসদেব ভট্টপ্রভাকর, কণাদ, প্রশস্তপাদ, ক্ষণিকবাদি-বৈভাষিক, শৃংখবাদি-সৌত্রান্তিক, স্তাদ্বাদি মাধ্যমিক, বিজ্ঞানবাদি যোগাচার, চারুবাক্‌নিপুণ চার্বাক প্রভৃতি মায়াবৈচিত্র্যরঙ্গবাদিগণের মতবাদসমূহ বেদান্ত অর্থাৎ বৈদিক সনাতনযাজিগণকে জানাইয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পথ সূচন করিয়া দিয়াছেন। ব্যাসানুগ-আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দরও—

“নামামত-গ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।

রূপারিণা বিমুচ্যেতান্ গৌরশক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥

ব্যাসানুগ মহাত্মা তোতারামও শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু-প্রচারিত নির্মল বৈষ্ণব ধর্ম্ম—যাহা জীবমাত্রের নিত্যধর্ম্ম, সেই শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে সকল শাশ্বত

অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ অর্থাৎ সেগুলি যে প্রকৃত ধাতু নহে, তাহা উপরি উক্ত পক্ষে সংক্ষেপে জানাইয়া দিয়াছেন।

বর্তমানে কলির প্রসারে মহাত্মা তোতারাম-কথিত ত্রয়োদশটি অসংসঙ্গ আরও বিভিন্ন আকারে প্রসারিত হইয়া বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে ও করিতেছে। উপরি উক্ত তেরোটি বিদ্বমতের বিস্তৃত পরিচয় একটি প্রবন্ধে অসম্ভব। যাহা হউক, আমরা ক্রমশঃ সংক্ষেপে উহাদের পরিচয় এবং ঐ সকল মতের শাস্ত্রযুক্তিমূলে সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিব। অসংসঙ্গ-গণের কথা আলোচনা করিলে জগতের অধিকাংশ লোকেরই অপ্রীতিভাজন হইতে হয়। কারণ জগতের অধিকাংশই আমরা কৃষ্ণবিমুখ হইয়া অসংসঙ্গে পতিত। শ্রীগৌড়ীয় ঐক্য অপ্রীতিকর কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াও লোকের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতে আছেন। অসংসঙ্গের আলোচনায় অনেক অসংকথাও প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইবে। কারণ, তাহা না হইলে অসদ-ব্যক্তিগণের স্বরূপ সাধারণ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবেন না। আশা করি, এজন্ত আমরা আপনাদের সহিষ্ণু ও সদাশয় পাঠকবর্গ এবং কৃপাময় বৈষ্ণববর্গ ক্ষমা করিবেন।

উপরি-উক্ত তেরটি বিদ্ব সম্প্রদায়ই মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া থাকেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই তাহাদের মতটাই মহাপ্রভুর প্রচারিত মত বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা সম্পূর্ণ বিদ্বদ্ভ্রমতের অনুশীলনকারী। ঐ সকল বিদ্বদ্ভ্রমত শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর বিদ্বদ্ভ্রমতের ব্যতিরেকভাবে ‘পুষ্টি’ অর্থাৎ নিষ্কপট সত্যাত্মসন্ধিৎসুগণকে ঐ সকল কদর্য্য ভ্রমত বা ভ্রুংসঙ্গ পরিত্যাগ করাইয়া পরমোপাদেয় বিদ্বদ্ভ্রম প্রেমধর্ম্মের নির্মল সৌন্দর্য্যানুসন্ধানে সাহায্য করিলেও ঐ সকল মতের সহিত অদ্বয়ভাবে শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু-প্রচারিত সর্বসং-সিদ্ধান্তসম্মতির কোনও সম্বন্ধ নাই। উপরি-উক্ত ত্রয়োদশটি বিদ্বদ্ভ্রমত শিক্ষার অভাব, কুরুচি, অপস্বার্থ, অসদভিপ্রায়, কপটতা, আত্মবঞ্চনা এবং মনোব্রহ্মের মুক্ত-প্রগ্রহবৃত্তি হইতে উদ্ভিত হইয়াছে।

ঐ সকল মতবাদিগণের সকলেই মনোব্রহ্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আনুকরণিক। সংসিদ্ধান্তবিৎ শ্রীতপস্বী সদগুরুর অনুসরণে আত্মব্রহ্মানু-সন্ধান করিবার পরিবার্ত্তে অনুকরণ-প্রণালীর পক্ষপাতী হইলে যে বিপরীত ফল ফলে, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ উপরি-উক্ত ত্রয়োদশটি বা তদনুরূপ অত্যাচার বিদ্বদ্ভ্রমত। ইহারা শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর লীলা-লেখকগণের হু’একটি শব্দের

কদর্থ ও বিপর্যয় করিয়া স্ব-স্ব মতের প্রতিষ্ঠার্থ প্রযত্ন এবং অধোক্ষজ ভক্ত ও ভগবান্কে মনোধর্মের কারখানায় ফেলিয়া (†) স্ব-স্ব-রুচি অনুসারে মাপিবার, গড়িবার অসতী প্রবৃত্তি ও রুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

১। আউল বাদ—‘আউল’ শব্দটি ‘আর্ত’ বা ‘আতুর’ শব্দের পরিণাম। আর্ত, আতুর, কাতর, বিহ্বল প্রভৃতি সমপর্যায় শব্দ। সাহিত্যে প্রেমার্ত, প্রেমাতুর, কামার্ত, কামাতুর, ক্ষুধার্ত, ক্ষুধাতুর, শোকার্ত, শোকাতুর প্রভৃতি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যাবনিক ভাষায় ‘আউল’ শব্দে সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্বপ্রথম বুঝায়। শ্রেষ্ঠের অন্তর্গত অধঃগণ তাঁহাদের পূজ্যকে বা ভাইকে আউল বলিয়া থাকেন।

সর্ববিধেয়তাবিবর্জিত সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত চিদ্দিলাস-রাজ্যে নায়ক বা বিষয়ালম্বন একজন; তিনি অদ্বয়জ্ঞান-ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন। সেই একমাত্র বিষয়ালম্বনের আশ্রয়ালম্বন অবশিষ্ট সকলেই। সেইরূপ বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে যে স্বাভাবিকী নিরুপাধিকা প্রীতি, তাহাই প্রেম। সেই প্রেমে কোনও প্রকার কামগন্ধ নাই। চিদ্দিলাস-রাজ্যের হেয়-প্রতিফলনস্বরূপ জড়বিলাসরাজ্যে ভোক্তাভিমানী পুরুষের বহুত্ব-হেতু হৈতুককামব্যতীত আর কিছুই নাই। জগতের বিচারে তাহা যতই শুদ্ধ ও উচ্চ হউক না কেন, তথাপি তাহা কৃষ্ণৈকমুখতাংপর্য্য না হইলে নিশ্চয়ই কামগন্ধযুক্ত হইবে। কিন্তু অদ্বয়তত্ত্ব-ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনের আশ্রয়ালম্বনগণের নিরুপাধিকা প্রীতি সম্পূর্ণ নির্মল; কারণ সেখানে—“প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ”, “স্বচ্ছ ধোত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।” তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—“অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্মল ভাস্কর ॥” অপ্রাকৃত আশ্রয়ালম্বনগণ যখন একমাত্র অধোক্ষজ বিষয়ালম্বনের স্মৃৎককামী হইয়া তাঁহার সেবাতুর হন, তখন যে ব্যাকুলতা, কাতরতা ও বিহ্বলতা, তাহা প্রাকৃত-নায়ক-নায়িকার হৃদ্রোগোথ কাতরতার সহিত সমান নহে। বিষয়ালম্বন কৃষ্ণের জন্ত, অপ্রাকৃত আশ্রয়ালম্বনগণের যে অপ্রাকৃত সহজ আতুরতা, প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া তাহার অনুকরণ করিতে গিয়াই জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। সেই উৎপাত বিভিন্ন আকারে উপরি-উক্ত ত্রয়োদশটি বিদ্বৎসম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। ‘আউল’ নামক আনুকরণিক সম্প্রদায়টি সেইরূপ উৎপাতপূর্ণ মতবাদের

অন্ততম। এ আনুকরণিক সম্প্রদায় কিরূপভাবে উৎপন্ন হইল, তাহা নিম্নে বিশ্লেষিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি লীলাগ্রন্থে অপ্রাকৃত প্রেমবিহ্বলতা বুঝাইতে ‘আর্ত’ বা ‘আতুর’ শব্দ হইতে ‘আউল’, ‘আউলায়’ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ;

যথা—(১) নিত্যানন্দ বলিতে হয় প্রেমোদয়।

আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রুগঙ্গা বয় ॥ (চৈঃ চঃ আ ৮২৩)

(২) ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁহার মন।

(চৈঃ চঃ অ ১৩।১২৬)

(৩) মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,

সে বিয়োগে দশ-দশা হয়।

সে দশায় ব্যাকুল হৈঞা, মন গেল পলাঞা,

শূন্য মোর শরীর আউলায় ॥ (চৈঃ চঃ অ ১৪।৫১)

(৪) যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,

জগন্নারী চিত্ত আউলায়। (চৈঃ চঃ অ ১৭।৪৬)

(৫) কাজে নাহিক আউল।

(চৈঃ চঃ অ ১৯।২১)

উপরি উক্ত দৃষ্টান্তের সর্বত্রই অপ্রাকৃত প্রেমবিহ্বলতা বুঝাইতে “আউলায়” শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। শুদ্ধবৈষ্ণব-সাহিত্যে ‘আউল’ শব্দে অপ্রাকৃত, ‘প্রেমাতুর’, ‘প্রেমার্ত’, ‘প্রেমবিহ্বল’, ‘প্রেমশিথিল’, ‘প্রেমপূর্ণ’, ‘নিষ্কিঞ্চন’ প্রভৃতি অর্থ বুঝাইয়া থাকে ; ইহাতে কোনপ্রকার হেয়তা বা কামগন্ধযুক্ততা নাই।

মনোধর্মের দ্বারা আত্মবৃত্তির সহজ্জীব ও তদ্ব্যঞ্জক শুদ্ধশব্দের তাৎপর্য ধারণা করিতে অসমর্থ কতকগুলি অর্কাচীন লোক তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণপর মনগড়া একটী অবৈধ মতবাদ সৃষ্টি করিয়া পরবর্তীকালে তাহাকে ‘আউল’ সম্প্রদায় নামে অভিহিত করেন এবং “মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, অবৈতপ্রভু ও গোষামিগণ সকলেই আউল ছিলেন (কারণ শ্রীচরিতামৃতাদি শাস্ত্রে ‘আউল’-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়)”—এইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন। এই ‘আউল’বাদ সহজিয়া ও কর্তাভজা-মতেরই ভিন্ন আকার ও ভিন্ন পরিভাষা মাত্র। ইহাদের মধ্যে পুরুষাভিমানি-ব্যক্তিগণ স্ত্রীদিগকে ‘প্রকৃতি’ বা ভোগ্যা এবং নিজদিগকে ‘পুরুষ বা ‘ভোক্তা’ মনে করে এবং ঐরূপ পুরুষের ‘চং’ বা

অনুকরণ করিয়া অবৈধভাবে বিলাসরত হওয়াকেই ‘সাধন’ বলে। এক একজন ‘আউলের’ সহিত বহু ‘প্রকৃতি’ থাকে। উহাদের মধ্যে কেহ নিজস্বী, কেহ বা পরস্বী, বারবনিতা প্রভৃতি। ইহারা নিজস্বী, পরস্বী ও বারবনিতায় কোন ভেদ করে না। কাহারও সহিত অ-সমন্বয় হইবার সম্ভাবনা নাই। এমন কি ইহারা এত উদার যে, এক ব্যক্তির প্রকৃতিকে অপরে ভুলাইয়া লইয়া গেলে ইহারা সন্তুষ্ট হয়। বাউলদের মত আউলগণ দাড়ি গোঁপ রাখে না। ইহারা বলে,—“সর্বপ্রকার সাধনের উদ্দেশ্যই এক, বিরোধ কেবল ব্যবহারিক; অতএব সাধকমাত্রেরই তাহা ত্যাগ্য।” ইহারা মনে করেন, “বেদাদিশাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা গুহ্য নহে। তাহাদের মনোদর্শন ও উচ্ছৃঙ্খলতাই বেদাতীত, বা বেদ-গুহ্য সূতরাং তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট!”

এই বিদ্যমতবাদ কোনও শুদ্ধবৈষ্ণব আচার্য্যের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। এই অসৎ মতবাদ মহাপ্রভুর প্রচারিত নির্মল প্রেমধর্মের অপাশ্রিত হেয়তামাত্র। এই বিদ্যমত কোন প্রকারেই যে ‘বৈষ্ণবমত’ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারেনা, তাহা বহুবিধ যুক্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে,—

(ক) বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সর্বদাই মায়াবাদের বিরোধী; কিন্তু বিচার করিলে জানা যাইবে যে, আউলমত মায়াবাদেরই একটা প্রকার বিশেষ। কারণ বৈষ্ণবমতে আশ্রয়ালম্বনের বহুত্ব স্বীকৃত হইলে ও বিষয়ালম্বনের বহুত্ব নাই। বিষয় আলম্বন এক অদ্বয়তত্ত্ব; কিন্তু আউল মতে বিষয় বা ভোক্তার বহুত্ব দৃষ্ট হয়। বহু প্রকৃতির ত্রায় তাহাদের মধ্যে বহু পুরুষ স্বীকৃত হয়।

(খ) শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তে জীবমাত্রই প্রকৃতি। কিন্তু আউলগণের মনো-দর্শনীয় মতে জীবের মধ্যে কতকগুলি পুরুষাভিমानी, কতকগুলি প্রকৃতি-অভিমानी।

(গ) আউলগণ বিবর্তবাদী, কারণ তাহারা দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া কুণপ বা খোলসকেই ‘পুরুষ’ বা ‘প্রকৃতি’ বিচার করিয়া থাকে।

(ঘ) বৈষ্ণবমতে জীব কখনও নিজকে ঈশ্বর, ভোগী, সিদ্ধ, ‘কৃষ্ণ’ প্রভৃতি বিচার করে না; কিন্তু ‘আউল’গণ সর্ববৈষ্ণব শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিজদিগকে ‘কৃষ্ণ’ ‘ঈশ্বর’ প্রভৃতি বিচার করিয়া অপরাধের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। সূতরাং আউলমত মায়াবাদেরই অগ্রতম।

(ঙ) শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে জীব নিজকে বিষয়ালম্বন জ্ঞান করা দূরে থাকুক, এমন কি জীবের মূল আশ্রয়গণের সহিতও একত্ব-ভাবনা 'মায়াবাদ' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর হৃগমসঙ্গমনী দ্রষ্টব্য। এমতাবস্থায় আউলমত যে কখনই বৈষ্ণব-মত নহে, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

(চ) একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই লীলাপুরুষোত্তম ; তাঁহার আসন গ্রহণ করিবার ধৃষ্টতা বা তাঁহার লীলাবিলাসের চং বা অনুকরণ মায়াবাদ ও কৃষ্ণ-বিরোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(ছ) শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হইলেও তাঁহার এই ওদার্য্যাবতারে পরস্ত্রী-সন্তাষণাদি কার্য্য নাই। অপ্রাকৃত রসাচার্য্য শ্রীস্বরূপ-রূপাদি গোস্বামিগণও কখনও ব্যাভিচারের প্রশ্রয় দেন নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডলীলা প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। শ্রীগৌর বা গৌরপার্ষদগণকে পরবর্ত্তি-কালের মনোধর্ম্মী ভোগপর-সম্প্রদায় তাহাদের ভোগ-যজ্ঞ প্রবর্ত্তনের মূলপুরুষরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে তাহা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাপরাধ বলিয়া গণিত হইবে।

(জ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মে কামকথার অবকাশ থাকা দূরে থাকুক, তাহাতে হৈতুক অভিলাষ পর্য্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছে। সেই প্রোজ্জ্বিত-কৈতব-ধর্ম্ম কখনও ব্যাভিচারযুক্ত মত হইতে পারে না। অতএব আউল-মত কখনও মহাপ্রভুর মত নহে।

(ঝ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম বেদান্ত ও বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সাত্ত্ব-শাস্ত্রবিরোধী ও সম্ভ্রান্ত-বিচারহীন আউলগণের মনোধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

(ঞ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম অধোক্ষজ পুরুষোত্তমের প্রতি আত্মার অহৈতুকী, অপ্রতিহতা সহজবৃত্তি। আর আউলের ধর্ম্ম অক্ষজ রক্তমাংসের পিণ্ডের প্রতি হৈতুক কাম বৃত্তি। একটী অপ্রাকৃত, আর একটী প্রাকৃত। একটী অব্যভিচারী আর একটী হেয়-ব্যভিচারী।

(ট) গোস্বামিগণ বা কোনও রূপানুগ মহাজন আউল মত স্বীকার করেন নাই। *

* আমাদের পত্রিকা-অফিসে একজন পত্রিকা পাঠক একটী প্রশ্ন প্রেরণ করেন। আমরা তাহার উত্তর পৃথকভাবে না লিখিয়া জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" হইতে অনুরূপ একটী প্রশ্নও তদুত্তর এখানে মুদ্রিত করিলাম। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরে জানাইব। —সম্পাদক

এখন উপায় কি !

দেখুন, আমি একজন ভক্তপ্রবর ! শাস্ত্রান্তরে “মোর ভক্তের পূজা হয় আমা হ’তে বড়” এই উক্তিটি আমার পক্ষেই প্রযোজ্য । শাস্ত্রকার কিরূপ উদার ও মহান্ । সেইজন্তই ত তাঁহারা জীবের কল্যাণসাধন করিতে পারিয়াছেন । শাস্ত্রকার অবৈদিক বা কপট নহেন, ইহা সর্ববাদিসম্মত । আমাদের প্রতিষ্ঠানেও এই বিষয় লইয়া শ্রীল গুরুদেবের সহিত বহু পণ্ডিতের বিচার হইয়াছিল । মনে পড়ে, সেই সেবার যখন শ্রীল গুরুদেব সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে শ্রীমন্নহা-প্রভুর বানীর নাম-গুণ প্রচারার্থ শুভবিজয় করিয়াছিলেন, তখন অনার্য্য-কর্মলিপ্ত কোন এক আর্য্য-মিশনের সভাপতির সহিত তাঁহার বিচার হইয়াছিল । তাহাতে বেদব্যাসের Authorityই স্থাপিত হয় । আমরা সেই বেদ-ব্যাসের গুরুপ্রণালী ধারায় অবস্থিত । বেদব্যাসের সমতুল্য বিরাট দার্শনিক ভক্তগণ আমাদের এই ধারার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন । তাঁহারা কতই না পণ্ডিত ছিলেন । আহা, তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের কি মহিমা ! সমগ্র জগৎ আজ সেই বেদ-বানী শ্রবণে উন্মুখ ও স্তব্ধ । সবই বর্তমান আছে ও ছিল ; তবে আদর্শ গুরুদেবের অভাব পূরণের জন্ত আমার নামই উল্লেখ-যোগ্য । তজ্জন্ত আমি আমার স্বরূপ ও স্বধর্ম বিজ্ঞাপন করিতেছি । আপনারা কেহ ব্যগ্র, ব্যস্ত বা চঞ্চল হইবেন না । ধৈর্য্যই সমস্ত দোষ অপনোদন করিয়া বস্তুসিদ্ধি করাইয়া দেয় ।

ইহার পর হইতে আমি প্রত্যহই মনে মনে লঙ্কায় অগ্নিসংযোগ করিতাম—বৈষ্ণবরা ত ভজন প্রয়াসী, আচার্য্যদেব ত কাহারও দোষ দর্শন করিবার সুযোগ পান না ; অতএব আমি সকলের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিব । সমস্ত বৈষ্ণবগণকে ইচ্ছানুযায়ী চালনা করিব । আমি যাহা খুদী বৈষ্ণবদের দিয়া তাহাই করাইবার প্রয়াসী হইব । A King can do no wrong”—এ ত্রায় ত আপনাদের জানা আছে । আমি King না হইলেও King-কর বলিয়া নিজেকে মনে করি । অতএব আমার ৭০০ খুন ও অপরাধ মাপ হইবে । শুধু তাহাই নহে, আরও ৭ লক্ষ খুনের অনুমতি পাইব—এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল । আমি তখনও বুঝিতে পারি নাই, ইহা শ্রীল গুরুপাদপদ্মের রূপা না অন্য কিছু । বিমূঢ়ের ত্রায় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মদনুগ্রহ-সূচক রূপাবলীগুলিকে আমি এইরূপে অপব্যবহার করিবার স্মৃতি (?) লাভ করিয়া সমগ্র মেশিনকে (১) বিরাটভাবে vibrate (আলোড়ন)

করিয়াছিলাম। বৈষ্ণবগণ কেহই কম নহেন। “ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।” তাঁহারা আমার এই দাপট ও স্বয়ম্ভূ গোপালগিরি সহ করিবে কেন? আমি কিন্তু দ্বিগুণ উৎসাহে আমার এই অসহনীয় ক্রিয়াকলাপগুলিকে জোরপূর্ব্বক সকলের সহনীয় করাইবার চেষ্টা করিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার এই বিক্রম মেশিনের (!) রক্তে রক্তে প্রসার লাভ করিল। কি কীর্তন, কি পাঠ, কি বক্তৃতা, কি রন্ধন-পরিবেশনাদি সর্ব্বক্ষেত্রেই আমার মণ্ডলকর্তৃত্ব একপ্রকার প্রবাদের ছায় হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময় কয়েকটি শাস্ত্রবাণী আমাকে সাহায্য করিল। আমি এই সকল বাণী অহোরাত্র নব বর্ষাগমে উল্লসিত ভেকের ছায় উদর স্ফীত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কি শয়নে, সিনানে, রন্ধনে, ভোজনে, জাগরণে, বিচরণে, পরিবেশনে এমন কি উপদেশপ্রদানে সর্ব্বদাই কীর্তন করিতে লাগিলাম, যেম ‘তে হি মম প্রাণাঃ’। এই সকল বাক্যের গভীরতা উপলব্ধি করা অপেক্ষা তাহাদের Morphology লইয়া টানাটানি করিতে বড়ই ভাল লাগিত। প্রধানতম গুণের মধ্যে আমি রসিকতা বুঝিতে অক্ষম ছিলাম। কোন বাক্যের রসগত মর্ম্মভেদ না করিয়া প্রকাশেই সেই বাক্যকর্তার সহিত কুরুক্ষেত্র বাধাইতাম। রক্ষা, কুরুক্ষেত্র—ধর্ম্মক্ষেত্র; মৎসরতাপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি বিশুদ্ধ দার্শনিক জগতে নাই।

শীঘ্রই এই অমর-নিধন-ক্ষেত্রে আমায় বীরত্ব-স্মরণের বিবিধ বীজ অঙ্কুরিত হইল। প্রথম অঙ্কুরিত বীজ—প্রবল আনুকরণিকতা-পীড়ায় মহাজন-বাক্য ব্যবহারে আপনাকে কোনও এক মহাজন বলিয়া ধারণা পোষণ করিতাম। বৈষ্ণবের কোনও দোষদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া চরম মেজাজের সহিত তাঁহার উপর Command দিতাম, “চুপ থাকবেন, বৈষ্ণবের দোষ-দর্শন নিষেধ—এটা সর্ব্বদাই মনে রাখিবার চেষ্টা করিবেন।” কখনও আন্তরিকতা-হীন কীর্তনকারীর উপর তাড়িদ বেগে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ছায় ঝাপ্স প্রদান করিতাম। কখনও অধিক বিজ্ঞ-জ্ঞানে বৈষ্ণবদের সভায় স্থায় পাণ্ডিত্য-স্থাপন প্রয়াসী হইয়া প্রবীণ বৈষ্ণবগণের মুখের উপর অথবা অমূলক নানা কথা বলিবার অভ্যাস করিতেছিলাম। কখনও বা আমার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির মীমাংসায় একমাত্র ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সমকক্ষগণই সমর্থ, অথো নহে—এই চিন্তায় ভরপুর ছিলাম। একবার আমি এমনই উদ্যস্ত হইয়া পড়ি যে, কোনও এক প্রবীণ জীবন্ত মৃদঙ্গের নিকট হিসাব দাখিলের ফতোয়া জারি করি। আমার যে

ঐ বিভাগ বা বিষয়ে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই—ইহা আমার অবিদিত না হইলেও মণ্ডলকর্তৃক পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে শূন্য কলসের তায় অনেক তর্জন-গর্জন-দ্বারা সকলের নিকট হইতে প্রশংসা দাবী করিয়াছিলাম। কিন্তু হায় আমার দুর্ভাগ্য, সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট পারদর্শী হইতে পারি নাই।

সময়ে সময়ে নিদারুণ জিহ্বাবেগ আমাকে “ভুঙক্তে ভোজ্যতে চৈব” এই মহাজন বাণীর সার্থক প্রয়োগ-ক্ষেত্রের বিচার করিবার অবসর দেয় নাই; ক্ষেত্রাক্ষেত্র বিচার পরাজুখ আমার নিকট এই বাণী নির্বিশেষ রূপ ধারণ করায় অনেক বিপদাগমের উপক্রম হইয়াছিল। জিহ্বা-বেগকে কোনও মহাজন পরমেশ্বরের সেবায় নিয়োগ করিবার এক স্নযুক্তি দিয়াছিলেন—(জিহ্বা দ্বারা) “প্রসাব সেবা করিলে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়।” দর্শনমাত্রই আমি এই স্নকৌশলটী অতি সত্ত্বর হৃদয়ে ধারণ পূর্বক উক্ত মহাজনের প্রতি পূর্ণাঙ্গা স্থাপন করিয়া কোন এক মহান রাজ্যে বিচরণ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলাম। অত্ৰ (ভক্তির) “এক অঙ্গ সাধে কেহ, কেহ বহু অঙ্গ” বাক্য আমার উৎসাহ আরও বর্দ্ধিত করে। প্রসাদ গ্রহণ ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্ততম—ইহা শ্রীকৃপাগোষামিপাদই বলিয়াছেন। তাঁহার অনুগত কে না হইবে? সেদিন আবার আর একটী গীতার বাণী অবলোকন করিলাম—“প্রসাদে সর্ব্বভুতানাং হানিরশ্চোপজায়তে।” “অহো ভাগ্যমহোভাগ্যম্” যেন দৃষ্টা লিপিরিয়ম্।

মৎ চিন্তোথিত আর একটী সেবা-বুদ্ধির পরিচয় সন্তুক্তগণের সম্মুখে স্থাপন করিবার ধৃত্তা-জন্ত প্রথমেই ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। অনাদি-অসজ্জনগোষ্ঠী-প্রতিপালিত মাদৃশ অন্ধতমকেও শ্রীল গুরুপাদপদ্ম অলৌকিক, অচিন্ত্য শক্তিবলে তদীয় শ্রীচরণসরোজে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। এই বোধ উপলব্ধি হওয়া মাত্রই আকুলাস্তিস্থের সন্তুক্তচরণে এই সকল পূর্ব-ইতিহাস নিবেদন করিয়াছি। উদ্দেশ্য—আত্মশোধন। স্মৃতিপট হইতে পূর্ব ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিস্মৃতি আর কবে আমাকে সেবাস্থখাস্বাদন করাইবে! নূতন সেবা-বুদ্ধির মধ্যে একটু-আধটু ভবিষ্যচ্চিন্তা করিতে পারি। ভবিষ্যচ্চিন্তায় স্পর্শকগণের মাদৃশ কাঙ্গালের সান্ত্তি নিবেদন শ্রবণের স্বাভাবিক-বৈখ্যাহীনতা প্রত্যক্ষীভূত হওয়ায় অধিক অগ্রসর হইতে সাহস পাইতেছি না। হে ভক্তগণ, এখন আমার উপায় কি? —জনৈক অপরাধী

সমিতি-সমাচার

শ্রীদামোদর-ব্রতরত্ন

গত ৪ঠা কার্তিক, পূর্ণিমা দিবস হইতে সমিতির মূল মঠ ও অগ্নিশ্রী শাখা মঠসমূহে শ্রীশ্রীদামোদর-ব্রতরত্ন হয়। চাতুর্মাস্য মধ্যে এই ব্রতের অবস্থিতি হইলেও এই দামোদর মাসে ভোগ-সুখ এবং যে কোন প্রকার বিলাসাদি বিশেষভাবে ত্যাজ্য। এক পাকে প্রস্তুত প্রসাদাদি ভিন্ন গুরুভক্তগণ অথ কিছু গ্রহণ করেন না। এই ব্রত-উপলক্ষ্যে সমিতির সকল মঠেই প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত “দামোদরাস্টকম” গীত হইতেছেন। মূল কেন্দ্রে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে প্রত্যহ সকালে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলা হইতে শ্রীমমহাপ্রভুর শ্রীরঙ্গে চাতুর্মাস্য-ব্রত-পালন-প্রসঙ্গ ও সন্ধ্যায় দশমস্কন্ধ ভাগবত হইতে দাম-বন্ধন-লীলা-বর্ণন পাঠ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন মহাজন-লিখিত বিবিধ বৈরাগ্যসুচক গীতি ও কীর্তন ভক্তগণের হৃৎকর্ণরসায়ন বিধান করিতেছে। শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে এই দামোদর-ব্রত পালনে এইরূপ সুন্দর ও অপূর্ব ব্যবস্থা দর্শনে নবদ্বীপ শহর ও তৎপার্শ্ববর্তী বহু অঞ্চল হইতে প্রায় তিনশতাধিক হরিকথা-লুপ্ত ব্যক্তি এবং এতদ্ব্রতযাজী ভক্তবৃন্দ পাঠ কীর্তনের সভায় আগমন করিতেছেন।

উর্জাব্রতে কলিকাতায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ

কলিকাতার ক্যানিং স্ট্রীটস্থ “ভবানী পেপার কনসার্ন”-এর মালিক শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার সাহা মহাশয় শ্রীল আচার্যদেবকে সমগ্র দামোদর মাস তাঁহার বাটীতে কৃপাপূর্বক অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার সনির্বন্ধ অনুরোধে পরদুঃখদুঃখী শ্রীল গুরুদেব অতঃপর গত ৪ঠা কার্তিক কয়েক জন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীসহ তাঁহার কলিকাতা বাসভবনে (২৭ মায়াদাসী রোড, বেহালা) গুরুবিজয় করেন। পরদিন হইতে প্রত্যহ দুইবেলায়ই পাঠ-কীর্তন হইতেছে। সকালে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ হয় এবং সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ঐ বাটীর সম্মুখস্থিত সরকারী ময়দানে নবনির্মিত সভা-মণ্ডপে শ্রীল আচার্যদেব স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন।

সভার প্রথম দিনই শ্রীল আচার্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের স্বতঃ প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। তাঁহার এই ভাষণ মায়িক-যোগে সর্কভ্র শব্দায়িত হইলে পরদিন সভামণ্ডপে বহু শ্রোতার আগমন হয়। তিনি ক্রমান্বয়ে ‘সদগুরু-চরণাশ্রয়-ব্যতীত জীবের অপ্রাকৃতানুভবে অসামর্থ্য’, ‘বিষ্ণুতত্ত্বই জীবের মোক্ষদাতা, দেবদেবীগণে নহে’, ‘আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের Space conquest (গ্রহান্তর জয়) দৃশ্য ভগতেরই অঙ্গ বিশেষ - অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠরাজ্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত’, ‘মনোধর্ম ভগবদ্ভক্তি-বাধক’ প্রভৃতি বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের “নারদ-বসুদেব-সংবাদ” (নবযোগেন্দ্র সংবাদের প্রারম্ভে, শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়) পাঠ কালে ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় অধ্যাপক-উকীল-শিক্ষক-Bengal Civil service-এর অফিসার প্রভৃতি বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার বিচার শ্রবণে এই সভায় যোগদান করিতেন।

তাহারা এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত ব্যক্তিগতভাবেও তাহারা ধর্ম বিষয়ক আলোচনা করেন।

শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের কলিকাতায় প্রচারের এই সংবাদ সংবাদপত্র-সমূহ নিয়োক্তরূপে প্রকাশ করে—

“যুগান্তর” (৮ই কার্তিক ১৩৭১, ইং ২৭/১০/৬৪) : “অগ্ন সন্ধ্যা ৭টায় (শ্রী) গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য (শ্রীমন্তুক্তি প্রজ্ঞান) কেশব মহারাজ ২৭ নং মায়াদাসী রোডের (বেহালা পুলিশ থানার নিকট) সম্মুখস্থ ময়দানে এক ধর্মীয় সভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন।”

“যুগান্তর” (১০ই কার্তিক ১৩৭১ ইং ২৭/১০/১৯৬৪) : “শ্রীধাম নবদ্বীপের আচার্য্য শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ বেহালা মায়াদাসী রোডে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করিতেছেন।

অতঃপর ১৩ই কার্তিক শ্রীল আচার্য্যদেব নবদ্বীপ ধামে শুভ প্রত্যাগমন করেন। এক্ষণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ৭৮ জন মঠবাসী ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্তী-সহ সেখানে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই এখন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন। তাহার বাণী শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ মায়ায় কুহক হইতে রক্ষা লাভ করুন—ঈশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

অন্নকূট মহোৎসব

গত ১৯শে কার্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গো-পূজাও এই মহোৎসবের একটি অঙ্গ ছিল।

ব্রহ্ম-মাধব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীশ্রীগোপালের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং “অন্নকূট” করিয়া সকল মথুরাবাসীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন—চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বিবরণী আছে। মধ্যাহ্নে শ্রীশীগন্ধর্ষিকা গিরিধারীকে ভোগ নিবেদনের পূর্বে শ্রীহরিকীর্ত্তন-নাট্য-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে এই অধ্যায়টি উপস্থিত জন-সমুদ্রের নিকট পাঠ করা হয়। প্রায় ৪৫০ প্রকারের বিচিত্র বস্তুর দ্বারা শ্রীশীগন্ধর্ষিকা গিরিধারীর ভোগ হইয়াছিল। ভোগ-সামগ্রী সমগ্র মন্দিরের ভিতরের অংশ পরিপূরিত করিয়া শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখস্থ মন্দির বারান্দার পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্যের সহিত সুসজ্জিত হয়। ভোগ নিবেদনান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব এই অপরূপ-দর্শন অধীর জনসমুদ্রের সমক্ষে দর্শনার্থ উন্মুক্ত করেন। সেইদিন রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত আগন্তুক-মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় ৫৬ হাজার লোক মঠে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করে এবং প্রায় ১৫/১৬ হাজার লোক দর্শন করিয়া প্রসাদ গৃহে লইয়াছেন। নবদ্বীপের বিশিষ্ট ব্যক্তি-মাত্রই এই উৎসবে যোগ-দান করিয়াছিলেন। লোকমুখে শোনা যাইতেছিল, এক্রূপ বিরাট “অন্নকূট”

উৎসব নাকি এ পর্যন্ত তাহাদের চক্ষে পড়ে নাই, এমন কি কর্ণ দিয়া দর্শনের সৌভাগ্যও হয় নাই। এসম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণী স্থানাভাবে এবার প্রকাশ করা সম্ভব না হওয়ায় পরবর্তী আগামী সংখ্যায় তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই উৎসব সমিতির অন্যান্য শাখা মঠে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ এবং চুঁচুড়ায় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন এই উৎসব পরিচালনা করিয়াছেন।

মথুরায় প্রায় ১,৫০৬০ প্রকার ভোগ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে নিবেদন করা হয়। ঐ দিন বহুশত লোক ঐস্থানে বিচিত্র প্রসাদ সেবনে পরিতুষ্ট হন। চুঁচুড়ায়ও পূর্বা পূর্বা বৎসরের ঐতিহ্য লক্ষিত হয়। এখানেও প্রায় ১,২০২৫ প্রকার ভোগ শ্রীশ্রীগান্ধারিকা-গিরিধারীকে নিবেদিত হয়। প্রায় ৫৬ শত আহুত, অনাহুত ব্যক্তি মহাপ্রসাদ লাভ করিয়াছে।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের

তিরোভাব-উৎসব

গত ২২শে কার্তিক উথানৈকাদশী তিথিতে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-তিথি সমিতির সকল মঠেই পালিত হন। ঐ দিবস শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের হরিকীর্তন-নাট্য-মন্দিরে সন্ধ্যায় এক মহতী সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উদ্ধর্মহী মহারাজ বাবাজী মহারাজের অলৌকিক জীবনী পর্যালোচনা করেন। বাবাজী মহারাজ কাপট্য-ধর্ম্মাধিত চণ্ডগণের দণ্ড-স্বরূপ এবং ভগবদ্ভৈরাগ্য-ধর্ম্মের উজ্জ্বল বিগ্রহ। জগৎকে ছলধর্ম্মের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিকপট চেষ্টাকালে তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে প্রাপ্ত হন। আজ সেই সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কৃপায় শিখক ভক্তিসিদ্ধান্ত রাজ্যের সন্ধান পাইয়া ক্ষিতি ধরা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীরসিকমোহন ব্রজবাসী ও শ্রীজ্যেষ্ঠমোচন ব্রহ্মচারী—এই দুইজনের নেতৃত্বে দুইটী প্রচার-সঙ্ঘ উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়া শিলি-গুড়িতে মিলিন হন। এক্ষণে একযোগে তাহারা শিলিগুড়িতে বিপুলভাবে কৃষ্ণশিক্ষা প্রচার করিতেছেন। প্রচারের অঙ্গ-স্বরূপে তাহারা শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রস্থলে সভামণ্ডপে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ও প্রতিষ্ঠানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতাদি করিতেছেন। কখনও সহৃদয় সজ্জন ব্যক্তির গৃহেও তাহারা শ্রীমদ্ভাগবত-বাণী কীর্তন করিতেছেন। এখানে প্রচার কার্যে শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যগৌর দাসাধিকারী মহোদয়গণ বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

শ্রীশ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ন্তঃ



১৬শ বর্ষ }

অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

{ ১০ম সংখ্যা




শ্রীপিছলদা গোড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিগাড়া, নবরীপ (নদীয়া)

স নৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিমনোজ্ঞে ।

০ গোপীয়া-পত্রিকা




অহৈতুক্যপ্রতিহতা যন্মাত্মা স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোজ্ঞে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥

অন্ত ধর্ম স্বষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রুচি নৈলে পণ্ড সেই প্রয় ॥

১৬শ বর্ষ } গ্রন্থায়, ২৬ কেশব, ৪৭৮ গৌরাদ { ১০ম সংখ্যা
 } মঙ্গলবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭১; ইং ১৫/১২/১৯৬৪ {

ਸਾਹੁਬਾਦ॥

শ্রীল-প্রবোধ-নন্দ-সরস্বতী-গোষ্ঠ-মিঞা-দ-বিরচিত

শ্রীশ্রীনবদ্বীপাংশতকম্

রাধামাধব 'মলিত তনু-পুরট সুন্দর' গোঁরাঙ্গ-দর্শন-লালসা—

বাণ্য গদগদয়া কদা মধুপভেদ্যানি সংকীৰ্ত্তয়ে

ধারাভিনয়নাস্তথাং তরুতল-ক্ষৌণীং কদা পঙ্কয়ে ।

দৃষ্ট্যা ভাবনয়া পুরোমিলদহো গৌরস্থলীয়ং মহো-

द्वन्द्वं हेमहरिन्मणिच्छवि कदालम्बे मुहुरिह्वलः ॥ १० ॥

কবে আমি গঙ্গাদবাক্যে মধুপতির নামাবলী সঙ্কীৰ্তন করিব ? কবেই বা অজস্র অশ্রুধারায় তরুতল ভূমি পঙ্কিল করিয়া ফেলিব ? অহো ! দৃষ্টি ও ভাবনাযোগে হেমহরিমণি-কান্তিবিশিষ্ট (পুৰটমুন্দর-হ্যাত) গৌরঙ্গলীয় যুগল-জ্যোতিঃ (রাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরকিশোর) সম্মুখে আবিভূত হইবেন

এবং মুহমূর্ছঃ বিহ্বল হইয়া আমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনুকে আশ্রয় করিব ? ৭০ ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-সেবা-নিষ্ঠা—

নান্যদ্ব্যমি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি

নান্যদ্ব্যজামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি ।

পশ্যামি জাগ্রতি তথা স্বপনেহপি নান্যৎ

শ্রীরাধিকারুচি-বিনোদ-বনং বিনাহম্ ॥ ৭১ ॥

আমি অগ্র ব্যাক্য বলিব না, অগ্র কথা শ্রবণ করিব না, অগ্র বিষয় চিন্তা করিব না, অগ্র কোথায়ও গমন করিব না, অগ্র দেবতার ভজনা করিব না বা আর অগ্র কাহাকেও আশ্রয় করিব না । জাগ্রদবস্থায় এমন কি স্বপ্নেও আমি শ্রীরাধাকান্তিবিনোদ-কানন ব্যতীত অগ্র কিছু অবলোকন করিব না । ইহাই আমার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হউক ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মাধিপত্য ও সারূপ্যাদি মুক্তি হইতেও নবদ্বীপধামে কৃমিজন্ম কোটিগুণে

শ্লাঘ্য ও বাঞ্ছনীয়—

ন সত্যাত্ম্যে লোকে স্পৃহয়তি মনো ব্রহ্মপদবীং

ন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণোরপি মুগয়তে পার্শ্বদ-তনুম্ ।

নবদ্বীপে শুদ্ধে মধুররসভাবোৎসববতাং

নিবাসে ধ্যানাং সুবহুকৃমিজন্মাপি মনুতে ॥ ৭২ ॥

আমার মন সত্যলোকে ব্রহ্মার পদবী লাভ করিতে ইচ্ছা করে না, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পার্শ্বদ-তনুও (অর্থাৎ সালোক্য-সামীপ্যাদি মুক্তিও) অন্বেষণ করে না, কিন্তু ধাহারা মধুর প্রেমরসের ভাবে আনন্দিত, সেই সকল ধাত্ম পুরুষের নিবাস-ভূমি শুদ্ধ নবদ্বীপধামে কৃমিজন্মকেও অতিশয় বহমানন করে ॥ ৭২ ॥

কোনও প্রকারে নবদ্বীপ-সেবা-সৌভাগ্য লালসা—

মমাপি শ্রাদেতাদৃশমপি দিনং কিম্ পরমং

নবদ্বীপে যস্মিন্ কথমপি কৃতস্পর্শনমপি ।

অহো দেহং দূরাদপি সমবলোক্যাপি জহুষা

মুহুর্ধ্বাং মন্যে ধরণীপতিতঃ শ্রাং কৃতমতি ॥ ৭৩ ॥

আহা ! নবদ্বীপে কোন প্রকারেও আমার সংসর্গ ঘটিতে পারে, কিম্বা দূর হইতেও ঐ ধাম দর্শন-পূর্বক ধরণীতে পতিত হইয়া প্রণামপুরঃসরঃ

ইত্যাদি নামকীৰ্ত্তন-পুৰুষঃসরঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীগৌরচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইব ? ৭৬ ॥

গৌরবনে সুরধুনীতটে সাধকদেহোচিত বিচরণ-লালসা—

পুলিনে পুলিনে গিরীন্দ্রজায়া

বিচরিয়ামি কদা তলে তরুণাম্ ।

পতিতং গলিতং ফলঞ্চ ভুক্ত্বা

ললিতং তটিনী-জলং পিবামি ॥ ৭৭ ॥

কবে আমি হৈমবতী ভাগীরথীর প্রতি পুলিনপ্রদেশে তরুতলে বিচরণ করিব ? আর কবেই বা সেই সকল বৃক্ষ হইতে পতিত ও গলিত ফল ভক্ষণ করিয়া সুর-তরঙ্গিনীর মধুর বারি পান করিব ? ৭৭ ॥

নবদ্বীপসেবা ব্যতীত বৃন্দাবনসেবা-প্রাপ্তি এবং গৌর-সেবা ব্যতীত রাধাকৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তি অসম্ভব—

আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে

নারাধিতং নববনং ব্রজ এব দূরে ।

আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরস্তে

নারাধিতো দ্বিজসুতো ন তবেহ কৃষ্ণঃ ॥ ৭৮ ॥

যদি তুমি নববন অর্থাৎ নবদ্বীপের আরাধনা করিয়া থাক, তবে তুমি ব্রজ-কানন অর্থাৎ বৃন্দাবনেরও আরাধনা করিয়াছ ; আর যদি নবদ্বীপের আরাধনা না করিয়া থাক, তবে ব্রজধাম তোমার নিকট বহুদূরে অবস্থিত ; যদি তুমি জগন্নাথসুত গৌরের আরাধনা করিয়া থাক, তাহা হইলে ব্রজনাগর শ্রীকৃষ্ণেরও আরাধনা করিয়াছ ; আর যদি মিশ্রনন্দনের আরাধনা না করিয়া থাক, তাহা হইলে একগতে তোমার গোপেন্দ্রনন্দনের আরাধনাও হয় নাই ॥ ৭৮ ॥

নবদ্বীপ অভিন্ন বৃন্দাবন ও ঔদার্য্যধাম —

নবদ্বীপঃ সাক্ষাদ্ ব্রজপুরমহো গোড়পরিধৌ

শচীপুত্রঃ সাক্ষাদ্ ব্রজপতিসুতো নাগরবরঃ ॥

স বৈ রাধাভাবহ্যতিশুবলিতঃ কাঞ্চন-ছটৌ

নবদ্বীপে লীলাং ব্রজপুর-ছুরাপাং বিতহুতে ॥ ৭৯ ॥

আহা, এই গৌরমণ্ডলে নবদ্বীপ ধাম সাক্ষাৎ ব্রজপুর অর্থাৎ বৃন্দাবন ; আর শচীনন্দন শ্রীগৌরান্ধ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন নাগরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ । সেই (শচীসুত)

শ্রীরাধার ভাবকান্তিতে সুবর্ণচ্ছটাযুক্ত হইয়া শ্রীধাম-নবদ্বীপে ব্রজপুর অপেক্ষাও
দুপ্রাপ্যলীলা (ঔদার্য্যলীলা) বিস্তার করিতেছেন ॥ ৭৯ ॥

মাধুর্য্যধাম বৃন্দাবন হইতে ঔদার্য্যধাম নবদ্বীপ অধিক রূপাময়—

অহো বৃন্দারণ্যে হরি হরি হরীতি প্রজপতাং

ব্রজদ্বন্দ্বাবাপ্তির্ঘটত অপরাধাত্যয় ইহ ।

নবদ্বীপে গৌর কলুষনিচয়ং ক্ষাম্যতি সদা

ব্রজানন্দং সাক্ষাৎ পরমরসদং হন্ত ! তনুতে ॥ ৮০ ॥

অহো ! বৃন্দাবনে ‘হরি’, ‘হরি’, ‘হরি’,—এই নাম ঘাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে
(অর্থাৎ অপরাধনির্মুক্ত হইয়া) জপ করেন, তাঁহাদের অপরাধ অপগত
হইলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের (চরণসেবা) প্রাপ্তি ঘটে ; কিন্তু আহা ! এই নবদ্বীপে
শ্রীগৌরানন্দেব কলুষরাশি অপনোদন করিয়া সাক্ষাৎ পরমরসদ ব্রজের আনন্দ
সর্বদা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৮০ ॥

গৌরধাম সেবকেরই ব্রজধাম করস্থিত—

নবদ্বীপে বসেদ্ যন্তু করে তস্য ব্রজস্থিতিঃ ।

মরীচিকাবদন্তত্র দূরে বৃন্দাবনং ধ্রুবম্ ॥ ৮১ ॥

এই নবদ্বীপে যিনি (অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে সেবানুখ হইয়া) বাস করেন,
ব্রজধাম তাঁহার করগত (অর্থাৎ অত্যন্ত স্নেহ) ; কিন্তু ঘাঁহারা অন্ত্র বৃন্দাবন
অন্বেষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে বৃন্দাবন-প্রাপ্তি মরীচিকার ত্রায় নিশ্চয়ই দূরে
অবস্থিত ॥ ৮১ ॥

বৃন্দাবনস্থ বনোপবনাদি নবদ্বীপে সম্মিলিত—

বনঞ্চোপবনং সর্ববং শ্রীমদ্বৃন্দাবনস্থিতম্ ।

ক্রোড়ীকৃতং নবদ্বীপে কৃষ্ণলীলা-সুসিদ্ধয়ে ॥ ৮২ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত সকল বন, উপবন প্রভৃতি গৌরকৃষ্ণলীলা সুচারুরূপে
সম্পাদনের জন্ত শ্রীনবদ্বীপধামে সম্মিলিত হইয়াছেন ॥ ৮২ ॥

আমিষ-নিরামিষ

“জিনবাণী” নামক একটি সাময়িক অবৈদিক পত্রসত্ত্বে প্রকাশ যে, নিরামিষাশী বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ জিনবাণী-সম্পাদকের সহিত প্রাবণের প্রারম্ভেই বাঙ্গালা ও আসামের নানা স্থানে “অহিংসা” প্রচারার্থ বহির্গত হইবেন।

ইতঃপূর্বে উক্ত পত্রে নিরামিষ ভক্ষণ প্রচারের জন্ত বেতনগ্রাহী প্রচারকের আবশ্যক বলিয়া একটি বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার সেই বিজ্ঞাপনটি পত্রিকা সত্ত্বে কেন প্রকাশিত হয় নাই তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

তবে আমরা পূর্বাচার্য ও শ্রেষ্ঠ প্রচারকগণের নির্দেশ ও আচরণ হইতে জানিতে পারিয়াছি বেতনগ্রাহী কখনও প্রচারক পদবাচ্য হইতে পারেন না। জিনবাণী সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই; কারণ ঐ পত্র সনাতন বৈদিক ধর্মের বহির্ভূত। তবে ঐ পত্রসত্ত্বে যে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পূর্বে নিরামিষাশী বৈষ্ণব পণ্ডিত বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে শুদ্ধ বৈষ্ণব জগতের বিচারের দিক হইতে বিশেষ আপত্তি আছে।

সনাতন বৈদিক ধর্মের অনভিক্রতা নিবন্ধন এইরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করা জিনবাণী সম্পাদক লেখকের নিকট বিশেষ দোষাবহ নহে, একথা স্বীকার্য; কিন্তু পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আচরণ বৈষ্ণবোচিত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ই বিচার্য।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় কি কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য শাস্ত্রের পারদর্শিতা লইয়াই গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের ষট্‌সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা-গ্রন্থ সর্মসম্বাদিনীর অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? যদি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শ্রীজীবপাদের কথায় বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকিত বা শ্রীজীবের সংসিদ্ধান্ত হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি এইরূপ আত্ম-হিংসা বহুল প্রচারকার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না।

তিনি যদি ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ আলোচনা করিয়া থাকিতেন তবে নিশ্চয়ই জানিতেন যে উহাতে আদি ‘জিন’ বা ‘তীর্থঙ্কর’ ঋষভদেবকে পাষণ্ড-ধর্ম-প্রচারক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ঐ ধর্মে, অহিংসা, বৈরাগ্য, তপস্বী, তিতিক্ষা, সংযমাদি যতই সদৃশ্যাবলী আচরণের কথা উল্লেখ থাকুক না শ্রীমদ্ভাগবতের ‘হরাবভক্তস্ত কুতো মহদৃষ্ণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ’

অর্থাৎ হরিতে অভক্ত মনোধর্মযুক্ত জনের মহদগুণ কোথায়—এই বিচারে তাহাদের সঙ্গ ছঃসঙ্গজ্ঞানে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতেন।

তিনি না “বৈষ্ণব পণ্ডিত” (৭), বৈষ্ণবগ্রন্থের লেখক ও সঙ্কলন কর্তা। তিনি কি কখনও কাত্যায়ন সংহিতা বচন পাঠ করেন নাই ?

বরং হতবহজালা পঞ্জরান্তর্বাবস্থিতিঃ ।

ন সৌরিচিন্তাবিমুখ-জনসম্বাসবৈশম্যম্ ॥

অর্থাৎ যদি কাহারও পিঞ্জরাবদ্ধ হইতে অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে হয় তাহাও ভাল তথাপি কৃষ্ণচিন্তা-বর্জিত জনের সঙ্গ করা কর্তব্য নহে।

পণ্ডিত মহাশয় হয়ত উত্তরে বলিবেন যে, তিনি কাহারও সঙ্গ করিবার জন্ত ঐরূপ কার্যে ত্রুটি হইল নাই, কেবল অহিংসা ধর্ম প্রচারকল্পে তিনি এইরূপ কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন কারণ বৈষ্ণবধর্মেরও অহিংসা প্রচারের কথা আছে।

তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্র বলিবেন যে বৈষ্ণবগণ কখনও আরোহণস্থী নহেন। তাঁহারা অবরোহণস্থী। তাঁহারা অক্ষুণ্ণ জ্ঞানোপম মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অহিংসাধর্ম প্রচার করেন না। ঐরূপ অহিংসাধর্ম প্রচারের মূল্য অন্ধকপর্দক সদৃশও নহে। উহার দ্বারা আত্ম-হিংসা ধর্মই প্রচারিত হয়। যেখানে নিত্য ভগবদ্ভক্তি ও নিত্য ভগবানের শরণাগতির কথা নাই তাহা পাষণ্ড মত মাত্র। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন—

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ ।

অহিংসা যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২২শ)

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত নিসর্গতঃ হিংসামূল্যও সংযত। তাঁহাদের ঐ সকল সদগুণ কৃত্রিমপথে বাহির হইতে উপার্জন করিতে হয় না। আগে অহিংসা যাজন করিতে করিতে পরে ভক্ত হইব এইরূপ চেষ্টা আরোহণাদী নাস্তিকের চেষ্টা। গুরুভক্তি ধর্ম প্রচারে কুণ্ঠা যেরূপ জীবহিংসাপদবাচ্য, পাষণ্ড মত প্রচার বা উহাকে প্রশ্রয় দেওয়াও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিকতর জীব-হিংসা স্থানীয়।

কেবল কি নিরামিষ ভক্ষণ করিলেই অহিংসা ধর্ম পালন করা হইল ? শাস্ত্র বলেন—

অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্তোতে স্মৃদুঃখসমম্বিতা ।

বৃক্ষ, তৃণ, লতা, গুল্ম, ওষধি বৃক্ষাদি সকলেই চেতন যুক্ত জীব। স্মতরাং যিনি নিরামিষাশী বলিয়া অভিমান করেন তিনিও জীবহিংসক।

বৈষ্ণবগণ নিরামিষাশী বা আমিষভোজী নহেন। নিজের প্রীত্যর্থ নিজের দেহপুষ্টির জন্তু যাহাঁ কিছু গৃহীত হইবে তাহার দ্বারাই জীবহিংসা হইবে। প্রতি মুহূর্ত্তে এইরূপ কত অসংখ্য জীবহত্যা হইতেছে। জগতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি একটি জীবও হিংসা করিব না বলিতে পারেন? প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে, প্রতিপদ বিক্ষেপে অসংখ্য জীবকুল নষ্ট হইতেছে।

বৈষ্ণবগণ বলেন যে ঐরূপ জীবহিংসা বা অহিংসা লইয়া ব্যস্ত থাকিয়া সময় যাপন করা বৃথা। জীবমাত্রই ভগবানের নিত্যদাস। সুতরাং সর্বক্ষণ নিজে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া অপরকে যাহাতে সর্বজীবশত্রুর সেবায় নিযুক্ত করা যায় সেইরূপ চেষ্টা করিত হওয়াই একান্ত কর্তব্য।

সাত্ত্বতশাস্ত্রানুমোদিত ভগবান্নিবেদিত প্রসাদগ্রহণ করিয়া ভগবানের সেবোদ্দেশ্যে জীবন ধারণ আবশ্যক। মৎস্য-মাংসাদি অমেধ্য ভগবানের নিবেদন-যোগ্য বস্তু হইতে পারে না। উহা তামসিক, আত্মর প্রকৃতি জনগণের খাদ্য। নিরামিষ বা শাকসজ্জিও যদি ভগবৎপ্রসাদ-বুদ্ধিতে গৃহীত না হয় তাহাতেও যদি প্রাকৃত ভাত ডাল বুদ্ধি থাকে তবে তাহার দ্বারাও জীবহিংসা হইয়া পড়ে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় যদি এই বৈষ্ণব সংসিদ্ধান্ত অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিজেকে একজন আরোহবাদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া এইরূপ আরোহপন্থায় নিরামিষ-ভোজন প্রচারে ব্রতী হইতেন না। মনোধর্ম্মজীবগণে সকলই সম্ভব। তিনি মাঝে পরচর্চক ‘প্রেমপুষ্প’ নামক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কাগজের সম্পাদক কার্যে ব্রতী হওয়ায় তাহার রচিত গৌর-সমাজ নুনানিধিক ছাড়িয়া ছিলেন কিন্তু সাধের গুপ্ত শ্মশ্রু, পুনরায় ধারণ করেন নাই।

মনোধর্ম্মী জগৎ প্রাকৃত পাণ্ডিত্য প্রতিভা, আভিজাত্য প্রাচীনতা প্রভৃতির দ্বারা মুগ্ধ হয় এবং গতানুগতিক ক্রমের বশবর্ত্তী হইয়া তিলকে তাল করিয়া ফেলে, নিজেরা বঞ্চিত হয় ও অপরকে বঞ্চনা করেন। জগতের বিচারে সেকেন্দর বড়, নেপোলিয়ান বড়, জৈমিনী ও পরাশর খুব বড়। কিন্তু ভাগবতের বিচারে তাহাদের মূল্য অতি অল্প, এমন কি কিছুই নহে। শুধু বৈষ্ণব বড়ই বিরল। জগৎ বৈষ্ণবব্রত অত্যাভিলাষী মনোধর্ম্মী বৈষ্ণব নামে প্রচলিত ব্যক্তির সংখ্যায় পরিপূর্ণ। কোমলশ্রদ্ধ ও বাহর্নুখ জীবগণ তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া দুগ্ধক্রমে চুনগোলা পান করিয়া বঞ্চিত হইতেছেন। *

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

* বাংলা ১৩৩১ সালের ২৪শে শ্রাবণ সাপ্তাহিক ‘গৌড়ীয়ে’ প্রকাশিত শ্রীলসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত “সাময়িক প্রসঙ্গ” শীর্ষক হইতে উদ্ধৃত। —সম্পাদক

প্রশ্নোত্তর

(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-৩০) ✓ 10/3

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ৩৩৫ পৃষ্ঠার পর।)

৪০। নিরাকার ও চিদাকারের স্বরূপ কি ?

“বেদশাস্ত্র-মতে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নিত্য। নিরাকার ধর্ম প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বৈপরীত্যরূপ বিকার-বিশেষ অর্থাৎ জড়ীয় সত্ত্বে যে আকার আছে, তন্নিষেধক ভাব বিশেষ। প্রকৃতির অতীত যে চিন্ময় বিগ্রহ, তাঁহার আকারও চিন্ময়। মায়িক সত্ত্বের নিরাকারত্ব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।১৬৬-১৬৭

৪১। সাকার ও নিরাকার উভয় কথাই পরমেশ্বরের প্রতি যুগপৎ সত্য কিরূপে ?

“সাকার ও নিরাকার লইয়া বিবাদ নিতান্ত অকর্মণ্য। পরমেশ্বরের ভৌতিক আকার নাই, কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বময় বিভূর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সকল ভক্তেরই গ্রাহ্য। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত-চক্ষের পক্ষে সাকার, ইহা বলা যাইতে পারে; অতএব তাঁহার উভয় স্বরূপই স্বীকৃত।”

—তঃ স্বঃ, ৪ স্বঃ

৪২। কিরূপে ভগবানের একই কালে সর্বব্যাপিত্ব ও সাকারত্ব সম্ভব হইতে পারে ?

“বিচিত্র শক্তিক্রমে ভগবান্ একই কালে সর্বব্যাপী ও চিৎ-সাকার থাকিতে পারেন। ইহা কেবল ব্রহ্মের পদার্থের পক্ষে হুঃসাধ্য।”

—তঃ স্বঃ, ৪ স্বঃ

৪৩। পরমেশ্বর কি জীবকৃত অথবা স্বকৃত বিধি বাধ্য ?

“শারীরিক নিয়ম এই যে, একহস্ত পরিমিত দড়িতে এক হস্ত দড়ি সংযোগ করিলে দুই হস্ত হইবে, কখনই তিন হস্ত হইবে না। কিন্তু এই সমস্ত নিয়মে পরমেশ্বর বাধ্য নহেন। তিনি বিধিসকলের বিধাতা; অতএব স্বকৃত বিধিতে তিনি বাধ্য হন না।”

—তঃ স্বঃ, ৪ স্বঃ

৪৪। পরমেশ্বর কি দেশ-কালের অধীন-তত্ত্ব ?

“Our ideas are constrained by the idea of space and time, but God is above that constraint.”

—*The Bhagabata : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.*

৪৫। কোন্ সময়ে সাকার-নিরাকারের বিবাদ-ভঞ্জন হয় ?

‘সাত্বত-তত্ত্ব—সমস্ত সম্প্রদায়ের অতীত। অতএব সাকার-নিরাকার-রূপ বিবাদে সারগ্রাহিগণ কদাচ লিপ্ত হইবেন না। ভক্তির উদয় হইলেই মানবের বুদ্ধি-বৃত্তিতে উভয়াত্মক ঈশ্বর প্রতীত হইবেন।’

—তঃ স্বঃ, ৪ স্বঃ

৪৬। শ্রীকৃষ্ণের অসমোদ্ধিত কেন ?

“চতুঃষষ্টি গুণ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ চিন্তাবে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে নিত্য-দেদীপ্যমান। শেষোক্ত চারিটি গুণ কেবল শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ ব্যতীত তাঁহার কোন বিলাস-মূর্তিতেও নাই। সেই চারিটি পরিত্যাগ করিয়া ষষ্টি-সংখ্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে চিন্তার চিদ্বনবিগ্রহ পরব্যোমপতি নারায়ণে দীপ্যমান। শেষোক্ত নয়টি গুণ বিযুক্ত হইয়া অবশিষ্ট পঞ্চাশটি গুণ অংশরূপে শিবাদি দেবতায় আছে। প্রথমোক্ত পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে সমস্ত জীবে পরিলক্ষিত হয়। শিব, ব্রহ্মা, সূর্য্য, গণেশ ও ইন্দ্র—ইঁহারা সেই ভগবানের অংশ, গুণ-বিশিষ্ট, জগদ্ব্যাপারে অধিকার-প্রাপ্ত ভগবদ্বিভূতিরূপ অন্তার-বিশেষ ; স্বরূপতঃ তাঁহারা সকলেই ভগবদ্বাস। তাঁহাদের রূপায় বহু বহু জন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছেন।”

—জৈঃ ধঃ ১৩শ অঃ

৪৭। শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতের নিকট কিরূপ ?

‘সদা শুদ্ধ দিক্কাম,

ভকত বৎসল নাম,

ভকত জনের নিত্য স্বামী।

তুমি ত’ রাখিবে যারে,

কে তা’রে মারিতে পারে,

সকল বিধির বিধি তুমি।”

— শঃ

৪৮। শ্রীকৃষ্ণ লীলাময় কেন ?

“শ্রীকৃষ্ণ—পরম তত্ত্ব,

তাঁ’র লীলা—শুদ্ধ সত্ত্ব,

মায়া যাঁ’র দূরস্থিতা দাসী।

জীবপ্রতি রূপা করি'

লীলা প্রকাশিল হরি,

জীবের মঙ্গল-অভিলাষী ॥”

—‘শ্রীকৃষ্ণানুগ-ভজন-দর্পণ’ ২৮, গী: মা:

৪৯। পরব্রহ্মের অপ্রাকৃত-স্বরূপ-সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ কি?

“বহু স্তাম্” (তৈ: উ: ব্র:—৬ অ:) ইত্যাদি ঋতি-মতে ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন ‘স ঐক্ষত’ (ঐত: উ:—১।১) এই বাক্য-মতে প্রাকৃত শক্তিতে যিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে সময় প্রাকৃত-মন-নয়নের সৃষ্টি হয় নাই। তবে ভগবান্ যে মনে চিন্তা করিলেন, যে-নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঐক্ষণ করিলেন, সে-মন ও নয়ন প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বেই ছিল। সুতরাং পরব্রহ্মের স্বরূপত: অপ্রাকৃত নেত্র-মন ছিল,—ইহা সর্ববেদ-সম্মত।”

—অ: প্র: ভা: ম ৬।১৪৩-১৪৮

৫০। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্যের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-বিচার কিরূপ? নির্বিশেষ ব্রহ্ম কি স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব,—না আপেক্ষিক?

“সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীৰ্য্য, সমগ্র যশ:, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টি অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট তত্ত্বস্বরূপ ভগবান্। এই গুণগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-ভাবে বৃত্ত। ইহার মধ্যে অঙ্গী কে? অঙ্গই বা কাহার? অঙ্গী তাহাকেই বলি যাহাতে অঙ্গগুলি বৃত্ত থাকে; যথা, বৃক্ষ—অঙ্গী, তাহার ডালপালা—অঙ্গ; শরীর—অঙ্গী, হস্ত-পদাদি—অঙ্গ। এই গুণগুলি অঙ্গ-স্বরূপে যাহাতে অবস্থিতি করে, তাহাই অঙ্গী। ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের শ্রীই অঙ্গী এবং আর গুণগুলি অঙ্গ। ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, যশ:—এই তিনটি অঙ্গ; যশ: হইতে বিতৃত জ্যোতি:স্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গ-কিরণ-রূপে প্রতীয়মান; যেহেতু উহারা গুণের গুণ, স্বয়ং গুণ নয়। নির্বিকার-জ্ঞানই জ্ঞান ও বৈরাগ্য, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গ-কাশিত। নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিরবয়ব, নির্বিশেষ-ব্রহ্ম স্বয়ংসিদ্ধ-তত্ত্ব ন’ন—শ্রীবিগ্রহের আশ্রিত-তত্ত্ব। অগ্নির প্রকাশগুণ স্বয়ংসিদ্ধ-তত্ত্ব নয়,—অগ্নির স্বরূপাশ্রিত গুণবিশেষ।”

—ঈ: ধ: ১৩শ অ:

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রী শ্রীনবদ্বীপ শতক

[শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ-বিরচিত “নবদ্বীপ শতকম্”-

এর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত পড়ানুবাদ]

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ৩৪৭ পৃষ্ঠার পর)

গদগদ বচনে কবে গাব কৃষ্ণনাম ।

নয়নধারায় আর্দ্র করিব তদ্বাম ॥

ভাবেতে হেরিব সে যুগল জ্যোতি ।

হেম-হিরণ্মণি-ছবি স্তবিস্বলমতি ॥ ৭০ ॥

রাধাকাণ্ঠিবিনোদ কানন বিনা আন ।

না বর্ণিব, না স্তুনিব, না করিব ধ্যান ॥

জাগ্রতে স্বপ্নে বা আমি বিনা সেই বন ।

না দেখিব কভু ইথে দৃঢ় মম মন ॥ ৭১ ॥

মন নাহি চাহে সত্যলোকে ব্রহ্মপদ ।

বৈকুণ্ঠে পার্শ্বদ দেহ মুক্তির সম্পদ ॥

নবদ্বীপে বিগুহ মধুর ভক্তজন ।

গৃহে কৃমি জন্মি, লোভ হয় অনুক্ষণ ॥ ৭২ ॥

হেন দিন কবে মোর উদবে গগনে ।

যবে নবদ্বীপস্পৃষ্ট শরীর দর্শনে ॥

দূর হইতে জীবন সার্থক জ্ঞান করি ।

সাপ্টাঙ্গে পড়িব নমি ধরণী উপরি ॥ ৭৩ ॥

সর্বোত্তম নবদ্বীপ-মাহাত্ম্যে বিস্তর ।

না থাকে বিশ্বাস-গন্ধ তাহাতে আমার ॥

সে ধাম বাসের ইচ্ছা যতপিও নাই ।

তবু যেন ধামগুণ নিরন্তর গাই ॥ ৭৪ ॥

অচৈতন্য প্রায় বিশ্ব, সর্বজ্ঞ যে জনে ।

সেও নারে নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য-বর্ণনে ॥

প্রচ্ছন্ন সে ধাম নন্দনন্দনের স্থায় ।

ভক্তজনমাত্র জানে সদগুরু-কুপায় ॥ ৭৫ ॥

কবে নবদ্বীপ বনে সৈকত প্রচরে ।

‘হরেরাম হরেকৃষ্ণ’ বলি উচ্চৈঃস্বরে ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌর করিব দর্শন ।
 পড়িব বিহ্বল হ'য়ে অচল চরণ ॥ ৭৬ ॥
 জাহ্নবীর পুলিনে পুলিনে তরুতলে ।
 বিচরিব আমি কবে 'হরি' 'হরি' বলে ॥
 পতিত গলিত ফল করিব ভক্ষণ ।
 ললিত-তটিনীজলে তৃষ্ণা নিবারণ ॥ ৭৭ ॥
 সেবিলেই নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্মুরে ।
 নবদ্বীপ-সেবা বিনা বৃন্দাবন দূরে ॥
 যে সেবিল গৌর আর যশোদানন্দন ।
 গৌরসেবা বিনা কৃষ্ণ না পায় কখন ॥ ৭৮ ॥
 এ গৌড়মণ্ডলে নবদ্বীপ-বৃন্দাবন ।
 শচীর তনয় সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
 সেই নন্দসুত রাধা-দ্যুতি আচ্ছাদিত ।
 ব্রজের দুর্লভ লীলা করিল বিহিত ॥ ৭৯ ॥
 বৃন্দাবনে বসি যেবা জপে-হরি হরি ।
 অপরাধ গেলে পায় কিশোর-কিশোরী ॥
 নবদ্বীপে গৌর ক্ষমি অপরাধচয় ।
 পরম রসদ ব্রজরস বিতরয় ॥ ৮০ ॥
 গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে যার নবদ্বীপে স্থিতি ।
 করস্থিত ব্রজ তাঁর সনাতন রীতি ॥
 অতুত্র শ্রীবৃন্দাবন যে করে সন্ধান ।
 মরু-মরীচিকা যেন ক্রমে দূরে ভাণ ॥ ৮১ ॥
 বৃন্দাবনে আছে যত বন উপবন ।
 শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থল কে করে গণন ॥
 নবদ্বীপে সে সকল আছে স্থানে স্থানে ।
 গৌররূপে কৃষ্ণলীলা প্রকট কারণে ॥ ৮২ ॥

সন্দভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দভ—৩০)

শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে শ্রীভগবান্কে পরমতত্ত্বরূপে সংস্থাপিত করিয়া তাঁহার শক্তিদ্বয় নিরূপণ করা হইয়াছে। প্রথমা শক্তি শ্রীবৈষ্ণবগণের পরম উপাস্তা, শ্রীভগবানের আত্মভূতা ; আর দ্বিতীয়-শক্তি জগৎরূপে পরিণতা মায়ালাক্ষণা-শক্তি। পূর্বোক্ত স্বরূপভূতা শক্তিতে লক্ষ্মী-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সন্দর্ভে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণনামে বিখ্যাত, সুতরাং তাঁহার স্বরূপশক্তি কি নামে প্রসিদ্ধা তাহা নির্ধারণ করা কঠব্য।

মথুরা, দ্বারকাপুরীতে সেই শক্তির ‘মহিষী’ আখ্যা। তাপনী ক্রতিতে শ্রীকৃষ্ণদেবীর স্থিতির উল্লেখ আছে। স্বন্দপুরাণে শিবগৌরী-সংবাদে প্রভাস-খণ্ডে গোপ্যাতির মহাশ্লো দেখা যায়—পূর্বে যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে আগমন করেন, তখন তাঁহার সহিত ছাপান্ন কোটিসংখ্যক যাদব এবং ষোড়শ সহস্র গোপী সমাগত হইয়াছিলেন। একলক্ষ বাট হাজার শ্রীকৃষ্ণপুত্রও আসিয়াছিলেন। হে মহাদেবি বিচার্যাপিনী যে ষোড়শ গোপী আছেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর—

লঘিনী, চন্দ্রিকা, কান্তা, ক্রুরা, শাস্তা, মহোদয়া, ভীষণী, নন্দিনী, শোকা, সুবিন্দা, ক্ষুরা, শুভদা, শোভনা, পুণ্যা, হংসশীতা ও মালিনী। প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্র কলাসকলে সঞ্চরণ করে। এই যে গোপীরূপা ষোড়শ কলার কথা বলিলাম, তাঁহারা প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ সহস্রসংখ্যক ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমাকে জ্ঞান সম্ভব রহস্ত বলিলাম। যিনি ইহা অবগত আছেন পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলেন।

এখানে গোপী অর্থে রাজ্ঞী। নাম-লিঙ্গানুশাসনে গোপ অর্থে ভূপ, গোপের স্ত্রীলিঙ্গে গোপী বলিয়া ভূপের পত্নী রাজ্ঞী। লঘনী অবতার শক্তি। হংসশীতা—হংস এব জনার্দনঃ অর্থাৎ হংস অর্থে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার শীতা—শীতলকারিণী, আনন্দদায়িনী। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্ররূপ, শক্তিসকল কলারূপ। প্রথমে পঞ্চদশ শক্তির কথা বলিয়া অন্তিমে মালিনীর নামোল্লেখ। মালিনী সম্পূর্ণ মণ্ডলা। ইনি কলাশক্তির সমষ্টিরূপ। এই ষোড়শ শক্তি বিচার্যাপিনী।

ক্রুরা, ভীষণী ও শোকা নামের সার্থকতা কিরূপে হয়? তদন্তর—‘মল্ল-গণের অশনি’, ‘ভোজপতির মৃত্যুস্বরূপ’ এবং ‘অসদৃগণের শাসনকর্তা’ ইত্যাদি

বাক্যে যেমন শ্রীকৃষ্ণের কাঠিত্ব, কংসবিনাশকত্ব ও অসং শাসকত্ব বিশেষণ প্রতিপাদিত হয় তদ্রূপ শক্তিগণের নামেরও নিরুক্তি (অর্থ) উপপন্ন হয়। আনন্দরূপা শক্তি অধিকারবিশেষে ক্রুরা ইত্যাদিরূপে প্রতীতা হন। যেমন সূর্য্যরশ্মি যাবতীয় প্রকাশক হইলেও পেচকের নিকট অন্ধকার ব্যক্ত করে, সামান্য গৃহস্থ ব্যক্তি যেমন গৃহকর্ম্ম আচরণ করে, নিজ কামসংপ্লুত অচিন্ত্য শক্তিময় শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ মহিষীগণের সাম্যাতিশয়রহিত গৃহে অবস্থিত হইয়া রমাগণের সহিত রমণ করেন। (ভাঃ ১০ ৫৯৩২)

রমা—লক্ষ্মীর অংশভূতা, তাঁহারা স্বরূপ শক্তিরূপা বলিয়াই তাঁহাদের সহিত রমণ। শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরমানন্দ-শক্তিবৃত্তি-বিশেষোদয়রূপ প্রেম-বিশেষ-স্বরূপ যে-কাম তদ্বারা সংপ্লুত—ব্যাপ্ত; অর্থাৎ ইহা প্রাকৃত কাম নহে—নিজ কাম, নিজজন বিশেষে যে প্রেমবিশেষ তাহাই কাম। ষোড়শ-সহস্র দ্বারকা মহিষীই যখন স্বরূপ শক্তি বলিয়া নিশ্চিত হইলেন তখন অষ্ট পটুমহষীর স্বরূপশক্তিত্ব কৈমুতিক হায়ে সিদ্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে সত্যভামার ভূশক্তিত্ব শমুনীর কুপাশক্তিত্ব পান্ডোত্তর খণ্ডে দেখা যায়। হরিবংশের সত্যভামার সৌভাগ্যাতিশয়ত্ব ও ভীষ্মকান্নজা রুক্মিণী দেবীর কুটুম্বাধীশ্বরীত্ব দেখা যায়। স্বয়ং ভগবানের অনুকূপরূপহেতু রুক্মিণীদেবীর স্বয়ং লক্ষ্মীত্ব সিদ্ধ—

ভগবানপি গোবিন্দ উপযেমে কুরুধহ ।

ঐদত্তীং ভীষ্মকস্ততাং শ্রিয়ো মাত্রাং স্বয়ম্বরে ॥

(ভাঃ ১০।৫২।১৬)

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! ভগবান্ গোবিন্দ শ্রীর মাত্রা ভীষ্মকরাজতনয়া রুক্মিণীকে স্বয়ম্বরে বিবাহ করিয়াছিলেন। এস্থলে মাত্রাপদটি উনাদি প্রত্যয় নিপ্পন্ন। তদর্থ অন্তর্ভূত হওয়া। শ্রী-লক্ষ্মী অন্তর্ভুক্ত হন ইহাতে, এই অর্থে অধিকরণ বাচ্যে বাহুল্যে ত্রন্ প্রত্যয় যোগে নিপ্পন্ন; সুতরাং বৈকুণ্ঠনাথ-প্রেমদী প্রসিদ্ধ লক্ষ্মীর অন্তর্ভাবাপ্পদ অংশিনী বলিয়া এষ্ট রুক্মিণীই সর্ব্বতো-ভাবে পূর্ণা (লক্ষ্মী) ।

শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্য—

তং স্থানুরূপমভজং জগতামধীশ

মাত্মানমত্র চ পরত্র চ কামপূরম্ ।

স্থান্য তবাজ্জিহ্বররণং স্নাতভিভ্রমন্ত্যা ।

যো বৈ তজন্তমুপযাত্যনুতাপবর্গঃ ॥ (ভাঃ ১০।৬০।৪৩)

অতএব হে জগতের অধীশ্বর, ইহ-পরকালের সর্বাভীষ্টপূরক, ভজন-যোগ্য আত্মা সেই আপনাকে ভজন করিয়াছি। যে আপনাকে ভজন করে, তাহার সংসার সন্তাপ দূর করিয়া তাহাকে আপনি আল্লাসাৎ করেন। সংসার-পথে ভ্রমণশীলা আমার যেন আপনার শ্রীচরণশ্রয়-প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরেও যেন আপনার চরণসেবা করিতে পারি। এই শ্লোকে তিনি নিত্য প্রেমসী হইয়াও জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রার্থনাদি বাক্য বলিতেছেন। ইহা তাঁহার দৈত্বোক্তি মাত্র।

বাক্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ভক্ত ও ভগবানের অপকর্ষ সহ্য করিতে পারেন না। যে বাক্যে অপকর্ষ ব্যক্ত হয়, সেই বাক্যেই অর্থাস্তর দ্বারা উৎকর্ষ স্থাপন করেন; সুতরাং রুক্মিণীর উক্ত ‘স্বতিভিভ্রমন্ত্যা—সংসার পথে ভ্রমণ-শীলা’ এস্থলেও ‘আপনার পদবী অনুসরণ করিয়া ভ্রমণশীলা’ ইহাই বাস্তব অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিচিত্র লীলাবিনোদার্থে দেব-মনুষ্যাদিরূপে আবির্ভূত হন ইনিও তদনুরূপ হইয়াই অবতীর্ণ হন। এ বিষয়ে প্রমাণ—

দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী। (বিষ্ণুপুরাণ)

দেবরূপে লীলাকারী বিষ্ণুর সঙ্গে ইন দেবরূপিণী, আর মনুষ্যরূপে লীলাকারী হরির সঙ্গে মনুষ্যরূপিণী

শ্রীরুক্মিণীরও উক্তি—

যর্হাস্ত বৃদ্ধয় উপাস্তরজোহতিমাত্রো

মামীক্ষসে তত্ব হ নঃ পরমানুকম্পা। (ভাঃ ১০।৬০।৪৬)

জগতের বৃদ্ধিনিমিত্ত আপনি অতিমাত্র রজঃ (রজোগুণ) অবলম্বন করিয়া আমাকে নিরীক্ষণ করেন। এই বাক্যে রুক্মিণীদেবী নিজেকে গুণময়ী প্রকৃতিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন; কারণ, জগতের সৃষ্টিপ্রবাহ বর্দ্ধন-জন্ত পুরুষ রজোগুণ অঙ্গীকার করিয়া গুণময়ী প্রকৃতিতে নিরীক্ষণ করেন। বাস্তবার্থ—শক্তি-শক্তিমান অভেদ। তজ্জন্ত স্বাভাবিক রতি বিद्यমান থাকিলেও রত্যাখ্যভাবের বৃদ্ধিনিমিত্ত অঙ্গীকৃত রাগাতিশয্যে (রজোহতিমাত্রায়) যখন আপনি আমাকে নিরীক্ষণ করেন অর্থাৎ ভাবের সহিত অলোকন করেন, তখন আমাদের প্রতি আপনার পরম অগ্নি প্রকাশ পায়।

রুক্মিণী প্রেরিত ব্রাহ্মণের নিকট শ্রীভগবানের উক্তি-তেও দেখা যায়—

তথাহমপি তচ্ছিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি (ভাঃ ১০।৫০।২)

আমার চিত্তও রুক্মিণীতে আর্পিত বলিয়া রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় নাই। অতএব রুক্মিণীদেবী তাঁহার স্বরূপশক্তি—ইহাই প্রমাণিত হইল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

সনাতনের বন্ধন-মোচন

(নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৫ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় অঙ্ক

৩য় দৃশ্য

নগর পথ

১ম নাগরিক ও ২য় নাগরিকের প্রবেশ।

[১ম নাগরিক মুসলমানধর্মাবলম্বী ও ২য় নাগরিক হিন্দুধর্মাবলম্বী]

১ম নাগরিক—জান্লে ভায়া, এইবার ঘুঘু ফাঁদে পড়েছে। বাদশা মন্ত্রীকে যেমন ভালবাসতো, এবার ঠিক তা'র উল্টো হ'য়ে গেছে।

২য় নাগরিক—কেন মন্ত্রীর কি হ'ল ?

১ম নাগরিক—তুমি কি কিছুই খবর রাখ না নাকি হে ? এত বড় একটা বিরাট কাণ্ড ঘটে গেল, তার তুমি কিছুই জান না ?

২য় নাগরিক—আরে, আমি নিজের হুঃখ-ধাক্কা করি, না ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই !

১ম নাগরিক—আ-হা, হুঃখ-ধাক্কা কার না আছে ?—আমার নেই ? তা' বলে খবর-টবর একটু আধটু রাখতে হবে না ? শুনেছো, ঐ হিঁদু সন্ন্যাসীটা মুসলমানগুলোকেও দলে ভিড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। ফুলিয়ার যবন হরিদাস ওর শিষ্য হয়ে গেছে। দেশটাকে পাগল করে তুলেছে, মশাই। দবিরখাসটা পাগল হয়ে পালিয়ে গেল ; সাকরমল্লিকও পাগল হ'য়ে গেছে—ভুল বক্ছে।

২য় নাগরিক—হেঃ-হেঃ, পিপীলিকার পালক উঠে মরুবার জ্বলে। নইলে হিঁদু-মুসলমান সবাইকেই দলে ভেড়াবার চেষ্টা করে গো ! আমাদের বাদশাকেও তো পাগল করেছিলো !

১ম নাগরিক—আরে না—না ; কে বলেছে ? বেটার ভারী ক্ষমতা যে, আমাদের বাদশাকেও পাগল করবে !

২য় নাগরিক—নইলে বাদশা সন্ন্যাসীর উপর অত্যাচার বন্ধ করার হুকুম জারী করবে কেন ?

১ম নাগরিক—আরে সেটা করেছিলো ঐ দবিরখাসটা। বাদশা সাকরমল্লিককে

তার কাজের জন্তে খুব ভালবাসেন। তাই তা'র মনস্তত্ত্বের জন্তই
ঐ ব্যবস্থা করেছিলেন। নইলে এবার ভেবে দেখ, সেই সাকর-
মল্লিকের কি অবস্থা !

২য় নাগরিক—সাকরমল্লিকের কি হ'য়েছে ?

১ম নাগরিক—সে আজ বাদশাহের হুকুমে বন্দী। শত শত সৈন্য গত রাত্রের
শেষ প্রহরে তার বাড়ী ঘেরাও করে তা'কে আটক করেছে।

২য় নাগরিক—হেঃ-হেঃ, শয়তানেয় শয়তান মতলব তা'হলে এবার বাদশাহ
কাছে ধরা পড়েছে, কেমন ?

১ম নাগরিক—আরে অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি। ভাই, আল্লাহ কাছে হুজুর
বিচার। এবার জব্দ হ'য়েছে।

২য় নাগরিক—না ভাই, তুমি আজ আমায় বড় একটা সুখবর দিয়েছো
ওকে শূলে চড়ায় না বাদশাহ !

১ম নাগরিক—দাঁড়া, এই তো সব মাত্র নমুনা দেখা গেছে। হবে বৈকি !

২য় নাগরিক—চল, ব্যাপারটা ভাল করে দেখা যাক।

১ম নাগরিক—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই চল ; কত দূরের জল কত দূরে গড়ায় একবার
দেখি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

সনাতনের বাটী

সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন—(করযোড়ে) হা প্রভু শচীনন্দন গৌরহরি ! আমায় দর্শন দান
কর। আমাকে তোমার নিত্য সেবক করে নাও। দাও—দাও
প্রভু আমায় গুরুভক্তি। আমি চাই শুধু তোমার চরণকমল সে-
করতে। প্রভু,—প্রভু !

(হাত জোড় করিয়া প্রণাম ।)

[ত্বরিত গতিতে দীশানের প্রবেশ]

দীশান—(দণ্ডবৎপূর্বক) প্রভু, বাদশাহের একশ সৈন্য এসে আমাদের বাড়ী
ঘেরাও করেছে। আপনাকে আটক-বন্দী করেছেন বাদশাহ।

সনাতন—(মৃহ হাসিয়া) আমায় আটক করেছেন বাদশা? তার জন্ত চিন্তা কি, দৈশান? গৌরসুন্দরের কৃপা হ'লে আমাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না।

দৈশান—আপনি সেই গৌরসুন্দরের কাছে বৃন্দাবনে যাবেন, বলেছিলেন; তা'র কি ব্যবস্থা হ'ল?

সনাতন—হ্যাঁ, আমাকে এখনই যেতে হবে, দৈশান। তা' তুমি যে বন্ছো বাদশার একশ সৈন্য আমায় ঘিরে রেখেছে; তবে আমি কি করে বাড়ীর বাহিরে যাব!

দৈশান—আমিও তো তাই চিন্তা করছি, প্রভু।

সনাতন—দেখ দৈশান, ঐ সেনাদলের সৈন্তাধ্যক্ষকে আমার কাছে ডেকে দিতে পার?

(দণ্ডবৎপূর্বক প্রশ্নান)

দৈশান—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এখনই তা'কে ডেকে আনছি।

সনাতন—হা শচীনন্দন, তোমার কৃপা হ'লে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আমায় কৃপা করে তোমার কাছে টেনে নাও। আর কষ্ট দিও না নাথ! ওগো হৃদয়সর্কষ, তোমার কাছে আমার যাবার উপায় কর।

[সৈন্তাধ্যক্ষ সহ দৈশানের প্রবেশ]

(ভৃত্য দৈশান তাহার প্রভু সনাতনকে দণ্ডবৎ করিল এবং সৈন্তাধ্যক্ষকে সেলাম করিল।)

সৈন্তাধ্যক্ষ—কি আদেশ, মন্ত্রীবর!

সনাতন—আদেশ নয়, সৈন্তাধ্যক্ষ—এ অনুরোধ! আজ আর আমি মন্ত্রী নেই। তাই তোমার কাছে একটা প্রার্থনা করছি।

সৈন্তাধ্যক্ষ—কি বন্ছতে চাইছেন, বলুন।

সনাতন—আমার প্রার্থনা,—আমাকে মুক্তি দিতে হবে।

সৈন্তাধ্যক্ষ—তা' কেমন করে সম্ভব? —এ যে বাদশার আদেশ।

সনাতন—তাহলে বাদশার আদেশ পালন করে তুমি ভৃত্যের কর্তব্য দেখাতে চাও, কেমন?

সৈন্তাধ্যক্ষ—জি আজ্ঞে!

সনাতন—মনে পড়ে সৈন্তাধ্যক্ষ, একদিন আমিই তোমাকে এই পদে বহাল করেছিলাম। আমিই তোমার মাসিক বেতন বাড়িয়ে দিয়েছি। আর আজ তোমার দ্বারাই আমি বন্দী—হয়ত সেটা আমার কোন পাপের ফল। আমার উপকারের প্রতিদানে তোমার দ্বারা উপকার পাবার বাসনা আমার নেই—সে প্রত্যাশাও করি না। শুধু আজ মুক্তি পাবার জন্য তোমার সিকট একটু অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি।

সৈন্তাধ্যক্ষ— (নিরুত্তর)

সনাতন—কি হ'ল বন্ধু, তুমি আমায় মুক্তি দিতে রাজী নও ? বন্ধু, আমিও রাজভৃত্য। ভৃত্যের প্রতি ভৃত্যের অনুগ্রহ দেখান কি কর্তব্য নয় ? যদিও তুমি মোপ্পেম—আমি হিন্দু, তথাপি ভাই কার্যের খাতিরে আমরা পরস্পর মিত্র। ভাই—বল, মুক্তি দেবে ?

সৈন্তাধ্যক্ষ— (নিরুত্তর)।

সনাতন—ভয় নেই,—ভয় নেই বন্ধু, আমি এদেশেই থাকব না। তোমার চাকুরী ঠিকই বজায় থাকবে। তোমার কোন অনিষ্ট হ'তে দেবো না। আমি দূরে—বহুদূরে চলে যাব, আর এখানে ফিরব না। দেখ ভাই, পারবে—পারবে আমায় মুক্তি দিতে ?

সৈন্তাধ্যক্ষ—বলছেন বটে, কিন্তু এ-কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

সনাতন—পারবে, পারবে ; চিন্তা করে দেখ সৈন্তাধ্যক্ষ ! এই নাও পাঁচ সহস্র মুদ্রা ! (মুদ্রা দিলেন ও সৈন্তাধ্যক্ষ তাহা গ্রহণ করিলেন)। এইবার ছেড়ে দাও ! এতে তোমার পুণ্য, অর্থ—দুইই লাভ হবে।

সৈন্তাধ্যক্ষ—আমি আপনাকে ছাড়তে পারি, কিন্তু বাদশাকে কি কৈফিয়ৎ দেবো ?

সনাতন—সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে বলো—‘সনাতন বাহুরূত্রে গিয়েছিল। নিকটে গঙ্গা দেখে তা'তে ঝাঁপ দেয় ; বহু চেষ্টা করেও তা'র নাগাল পাওয়া গেল না ! বেড়ীসমেত গঙ্গার স্রোতে কোথায় যে ডুবে বয়ে গেল !’ (সৈন্তাধ্যক্ষের পিঠ চাপড়াইয়া) কোন ভয় নেই বন্ধু ! আমি দরবেশ হয়ে মক্কায চলে যাব। ভাই, তুমি এক জিন্দাপীর, সৌভাগ্যবান।

(সনাতন অন্তরে বুঝিতে পারিলেন রক্ষক-সৈন্তাধ্যক্ষ এতেও রাজী নয়)

সনাতন—আচ্ছা, এই নাও আবার দুই সহস্র মুদ্রা দিচ্ছি।

[মন্ত্রীবর সৈন্তাধ্যক্ষকে মুদ্রা দিলেন । সৈন্তাধ্যক্ষ তাহা হাসিমুখে গ্রহণ করিলেন ।]

এইবার—এইবার পারবে ! দাও, ছেড়ে দাও । বল ভাই, মুক্তি দিচ্ছ ।

(মনে মনে) গোড়ের প্রধান মন্ত্রী আজ তারই অধীনস্থ এক রাজকর্মচারীর অনুগ্রহপ্রার্থী ।

সৈন্তাধ্যক্ষ—হ্যাঁ, আপনার মুক্তি দিচ্ছি । যান এবার একেবারে গুছিয়ে নিন ও সত্ত্বর চলে যান ।

সনাতন—বেশ, ধন্যবাদ !

(সনাতনকে সেলামপূর্ব্বক সৈন্তাধ্যক্ষের প্রস্থান) ।

ঈশান—প্রভু, তা'হলে কি কি নেবো ?

সনাতন—শোন ঈশান, তোমাকে আমি এই বাড়ী আর যাবতীয় ধন-সম্পত্তি সমস্ত ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি । তুমি এই নিয়ে থাক । আমাকে একটা জীর্ণ কস্থা ও কষল এনে দাও ।

ঈশান—প্রভু, আমিও আপনার সঙ্গে যাব । আমি এ ধন-সম্পত্তি সব ছেড়ে যেতে রাজি আছি । আমাকে আপনার সঙ্গে নিন্ ।

সনাতন—তা' হয় না ঈশান, তুমি পারবে না । পথে অনেক কষ্ট পাবে । এখানে থাক, তোমার সুখে দিন চলে যাবে ।

ঈশান—এ সুখ স্বর্গস্থ হ'লেও আমি এ-সুখ চাই না । আমি আপনার সঙ্গেই মহাসুখ অনুভব করব । আমি না গেলে আপনি বরং পথে কষ্ট পাবেন । আপনার থাওয়া-দাওয়া হবে না । কে আপনার সেবা করবে, প্রভু ?

সনাতন—ঈশান, আমি জাগতিক দুঃখ বরণ করতে সমর্থ । এ মহাশয় দেহ ক্ষণস্থায়ী । এ মনুষ্য দেহধারণ অপেক্ষাও শ্রীভগবান্ ও তাঁর ভক্তের দর্শন দুঃখিত ! শ্রীহরির দর্শন পেলে এই দেহপাতেই তার স্বার্থকতা !

ঈশান—আপনি ন'দের ঠাকুরকে দেখতে পাবেন, আর আমি আপনার এতকাল সেবা করেও কি এমন পুণ্য অর্জন করি নি যা'তে আপনার অনুগামী হ'তে পারি ? সেই গৌরহরিকে দেখবার আমারও বড় সাধ ।

সনাতন—যেতে পারবে ঈশান? পথে অনেক বড় জন্তুর উপদ্রব হবে, হয়ত দস্যুর হাতেও পড়তে হবে। শেষে হয়ত জীবনান্তও হতে পারে। পারবে?...ভয় করবে না?

ঈশান—আজ্ঞে না, আপনি কৃপা করে আমায় অনুমতি দিন।

সনাতন—বেশ, তবে চল। সঙ্গে কিছু নেবে না,—একেবারে কপর্দকশূন্য হ'য়ে যেতে হবে। কেবল একখানি জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে ও একটি জীর্ণ কস্থা নিয়ে বোরিয়ে পড়। আমাকেও জীর্ণ কস্থল একখানা এনে দাও।

ঈশান—প্রভু, আপনিও দরবেশের রূপ ধরবেন।

সনাতন—হ্যাঁ ঈশান, ত্যাগেই সুখ—ভোগে সুখ নেই। আপনার জন প্রাণ-সখার কাছে যাবো, আবার বসন-ভূষনের কি দরকার?

ঈশান—প্রভু, তাহ'লে আমি জীর্ণ কস্থলখানা ও কস্থা নিয়ে আসি।

সনাতন—যাও। বেশী দেরী ক'রো না।

ঈশান—জি আজ্ঞে। (প্রস্থান)

সনাতন—তাইতো, ঈশানকে তো সঙ্গে যেতে আদেশ দিলাম। ও পারবে তো? একেবারে নাছোড়বান্দা! কিছুতেই আমায় ছাড়তে রাজী নয়! কি করি--আবার একটা সৈঁখো জুটলো। কৃপাময় গৌর-সুন্দর, আমার উপর তোমার অহৈতুকী কৃপাকণা আমি স্পষ্ট অণুভব করছি। তোমার কৃপা-ব্যতীত এ বন্ধন হতে মুক্ত হবার উপায় ছিল না।

(ঈশানের আসিতে দেরী হওয়ায় বিশেষ চিন্তিত হৃদয়ে)

অনেক দেরী হচ্ছে তো...ঈশান এখনও পৌঁছাল না। তবে সে কি করছে! ঈশান,—ঈশান, ও ঈশান!... (প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিন্তরঞ্জন মণ্ডল

গুপ্ত বৃন্দাবন

এই সেই গুপ্ত বৃন্দাবন শ্রীনবদ্বীপ ভূমি, কলিজীবের একমাত্র ত্রাতা।
আহা ইহার শোভা কিরূপ হৃদয়-মনোহারিনী ! কোথাও বিচিত্র কুসুমাকর
গর্ষিত লতারাজি ; কোথাও সমুন্নত অটবীমণ্ডিত মনোরম বিটপীশ্রেণী ;
আবার কোথাও মুহুমুদ মরুৎ-সঞ্চালিত প্রস্ফুটিত সুরভিত পুষ্পনিচয় ।

অন্তর্দ্বীপ

সৌভগ নরকুল-মঙ্গল-বিধায়ক বৈকুণ্ঠবার্তা-বিতরণ অন্তর্দ্বীপ ক্ষেত্র শ্রীধাম
মায়াপুর এই বৃন্দাবনেরই অন্তরস্থলে বিরাজিত ; আর এই অন্তর্দ্বীপের
(স্বতঃস্ফূর্ত) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও কীদৃশ চিত্তাকর্ষক । ঐ অদূরে ইতস্ততঃ
বিচরণশীল অতীব চঞ্চলা খঞ্জনয়না যুগীগণ ; অশ্রুত মধু আহরণে ব্যাকুলিত
ভ্রমর সমূহের স্তমধুর গুঞ্জন-ধ্বনি । কোথাও বা অদূরে অশ্বরুচী মহীরুহারোহী
মাধবী-মাল্লিকা-মালতী-যুথকা-শেফালিকাদি প্রস্ননবল্লী । অহো ঈদৃশ দর্শন
অতীব সুচারু ! চতুর্দিকে বৃক্ষশাখে নবাক্ষুরিত কিশলয়দল ; আর তদধোদেশে
সুদীপ্ত বৃক্ষচ্যুত পুরাতন পত্ররাজির বিরহব্যঞ্জক দীর্ঘনিঃশ্বাসে বাতাসের
করণ রূপ কিরূপ হৃদয়ভেদী । অদূরে শ্রুত—বায়ু সঞ্চালনে শুক পত্রের মর্ম্মর-
ধ্বনি । ধরণীর ধূলাপর বিলুপ্তিত বটবিটপীর বিলম্বিত শিরোজটা হরের
জটার ছায়া এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের সূচনা করিতেছে ; আর সেই শিরোজটা
বিজড়িত কারয়া ধীরে ধীরে অগ্রগামিনী শ্যামান্ততীর নবদুর্লাদলবৎ
স্নিগ্ধ শ্যামলরূপে ভুবন মোহিত । তত্রস্থ ঘনশ্যাম-বল্লীর অতিবিস্তীর্ণ লতাজাল
ভূধরসম পাদপরাজিকে সমাচ্ছাদিত করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কুঞ্জ রচনায় ব্যস্ত ।
তথায় বৃক্ষশাখায় সুখে সমাসীন শুকপিকাদি শাখিগণ শ্রীগৌরাজের গুনকীর্তনে
মত্ত । অশ্রুত নীলাভ শালিল-পরিপূরিত বৈচিত্র্যময় মনোরম সরোবররাজি
মধ্যে প্রস্ফুটিত মনোহর পদ্মসকল গন্ধবহের সাহায্যে তাহাদের প্রাণকর্ষী
সৌরভ চতুর্দিকে বিতরণোত্তত । মনোহর পদ্মকাননে তন্মাধুরীমুগ্ধ রাজহংস-
হংসী দ্ব্যচিহ্নে বিহারশীল । চিরচৌর্য্যবৃত্ত পোষণকারী মধুকরও এই পদ্মমধু
লোভে ধাবমান ।

আহা ! এই সেই মায়াপুর ধামের চিন্ময় কানন, যথায় নবনটরাজ
শ্রীগৌরানন্দনর জগজ্জীবকে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করাইতে আবিভূত
হইয়াছিলেন । এই সেই গৌরাবির্ভাব ভূমি শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ—প্রপঞ্চে
উদিত গোলোক । এই চিন্ময়ধাম মায়াপুরেই ব্রহ্ম-ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাপ্রভু

শ্রীগৌরাজের নামে উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্যরত। কিন্তু হায়! ধামবিরোধী মাৎসর্য্যপরায়ণ গৌড়ীয়দলিত দানবগণের নিকট এই সকল গৌরলীলা-সৌন্দর্য্য বোধগম্য নহে। তাহাদের মাটিয়া চক্ষুতে শ্রীমায়াপুর-ধাম একটী জাগতিক স্থান-বিশেষ।

ধামের চিন্ময়ত্ব বিলুপ্তিবিহীন। ধামদর্শকেরই অভাব। আমরা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্মৃতিপথে আনয়ন করিয়া জানিতে পারি,—

“দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ॥”

যাবৎকাল না ভগবানের কৃপায় আমরা দিব্যচক্ষু লাভ করিতে পারি, তাবৎকাল শ্রীভগবান্ ও তন্নিত্যধাম আমাদের জ্ঞানের অগোচরীভূত। ভক্ত-হৃদয়বাহিত সেই অপ্ৰাকৃত ধাম অসুরগণের নিকট চিরলুক্কায়িত।

আর ওই সেই বিষ্ণুপাদপদ্মসমুত্তা ব্রহ্মার কমণ্ডলুধৃত মাতঃ সুরধ্বনি জগজ্জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া অত্যাধি অভিমান। আহা! মাতা সুরধুনীতে কত শত পুষ্পকানন! কত শ্যামল-বনানী! কত সুন্দর ফলময় পাদপশ্ৰেণী, রাশি রাশি কত বিহগ-বিহগী—ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম।

এই অন্তর্দীপ,—মায়াপুরই প্রাচীন নদীয়া নগরী। যখন আমাদের জীবনের জীবন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এই নদীয়ায় অবস্থান করিতেন, তখন নদীয়ার ঘাটে ঘাটে সহস্র সহস্র লোকে স্নান এবং সন্ধ্যা-পূজাদি সমাপন করত; অত্যাধি সেই ক্রিয়া-কলাপের কোন বিচ্যুতি ঘটে নাই। নদীপ্রবাহ সেই স্থানের অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। মহাপ্রভুর সময়ে যে ঘাটগুলি বর্তমান ছিল, আজ তাহা স্থান পরিবর্তন করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়াছে। সুরধুনীর গতিরও পরিবর্তন হইয়াছে। নবদ্বীপবাসী সকলেই জীবিতেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক। শ্রীমন্মহাপ্রভু কত মহান্, কত উদার!! তাঁ’র প্রেমধর্ম্মের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণে কোন্ পাষণ্ডীর না হৃদয় প্রেমে গদ্ গদ হইত। একমাত্র যাহারা নিম্নুক, অধম, পাপিষ্ঠ পণ্ডুয়া তাহাদিগকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রেমবত্না কদাপি স্পর্শ করে নাই, করিবেও না। মলিনতায় দ্রবীভূতচক্ষু, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সামান্য মানবমাত্র জ্ঞানকারী, পরহিদ্ভ্রাসন্ধানে সিদ্ধহস্তগণ কোন দিনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুবিমল প্রেমধর্ম্মের অনুধাবক হইতে পারিবে না। ষোকিল কেবল স্মধুর কণ্ঠ সঙ্গীতেই পারদর্শী, ভৃঙ্গ পুষ্পমধু আহরণেই ব্যস্ত—এরা শুধু জড়জগতেরই আনন্দ-

বিধানকারী ; কিন্তু মহাপ্রভুর সেবকবৃন্দ তাঁহাদের সেই স্মধুর কণ্ঠকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-গুণগানে, আর সেই মধু আহরণের ব্যস্ততাকে তাঁহাদের পরমারাধ্যতম প্রভুপাদপদ্ম-মকরন্দ অব্ধেগেই নিযুক্ত রাখিয়াছেন ।

নদীয়ার হাটে, ঘাটে, মাঠে, পথে যেথায় সেথায় জীবের পরমমঙ্গল-দায়ক এমন মধুমাখা হরিনাম জীবকে আর কেবা কবে দান করিয়াছিল ? যে নামের পসরা মাথায় লইয়া প্রভু নিত্যানন্দ ও হরিদাস দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বলিতেন,—“তোমরা কে কোথায় আছ, এস, এস । এমন মধুময়, প্রেমবিধায়ক নাম তোমরা একবার বল, বল, উচ্চৈঃশব্দে একবার বল । তোমাদের ত্রিতাপজ্বালা বিদূরিত হ’য়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হবে । শিব-বিরিঞ্চিরও দুর্ভাগ্য যে-নাম আজ আমাদের মহাপ্রভু তোমাদের কাছে সেই মহামন্ত্রের বিপণী খুলিয়াছেন । ধর, ধর,—ভরায় গ্রহণ কর ; বিলম্বের কোন প্রয়োজন নাই, এই নাম লইতে কোন বাধা নাই ।”

“কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে,
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥”

বিপুলভাবে বর্দ্ধিত আজ মহাপ্রভুর সেই জন্মলীলা-ক্ষেত্র মায়াপুর (নদীয়া)। গৌর-বাণী-বিনোদক বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর চরণানু-চরণগণের কীর্ত্তনে ভরপুর । তারকব্রহ্ম এই হরিনাম পৃথিবীর সর্বত্র কোণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । বর্ত্তমান সমস্ত জগৎ গৌরবাণীর সেবায় আকুলিতচিত্ত ।

আমাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম মায়াপুরকে অবলম্বন করিয়া দীন দুর্দশাগ্রস্ত জীবের ভববন্ধন-শৃঙ্খল মোচনার্থে এই পূর্বশৈলে আবিভূত হইয়াছিলেন ; যখনই আমাদের প্রাণনাথের কথা আমার চিত্ত-পটে উদিত হয়, তখনই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের কথা স্মরণ করিয়া চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া উঠে,—

“হইল পাপিষ্ঠ জনম তখন না হইল ।

হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥”

অবশ্য ব্যাসাভিন্ন শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাপ্রভুর নিত্য পার্শ্বদ ; তিনি সর্বত্র সর্বসময়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় অগ্গাপি যোগদান করিতেছেন । বদ্ধ-জীবের উদ্ধার-মানসে তিনি ঐ প্রকার দৈন্ত প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র । নদীয়া-নুপতি বল্লালসেনের টিবি এবং চাঁদ কাজীর সমাধি এখনও সেই পুরাতন

স্মৃতি বহন করিতেছে। মহাপ্রভু গাদিগাছা এবং তাহার চর অর্থাৎ গোপ-পল্লীতে গোপবৃন্দের সহিত কত রঙ্গ-পরিহাস করিতেন, কৃষ্ণাবেশে তাহাদের নিকট হইতে ক্ষীর, সর, ছানা, নবনীত ইত্যাদি কত ভক্ষণ করিতেন, স্নানবিহার ও মাজিদা পল্লীতে কত লীলা-বিলাসাদি করিয়াছেন—তাহা বর্ণনাতীত।

মহাপ্রভু কাজীদলনের দিন নদীয়ার সর্বত্র সঙ্কীর্ণনের মহাপ্রকাশ করিয়া সমস্ত নদীয়াবাসীর হিয়া মহন করিয়াছিলেন।

কোলদ্বীপ

এই গুপ্তবৃন্দাবনের অন্তর্গত আর একটি দ্বীপ—কুলিয়া। কুলিয়ার অপর নাম কোলদ্বীপ। ‘কোল’ শব্দ হইতে ‘কুলিয়া’ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্তমান সময়ে পুরাতনগঞ্জ ও বাবলা আড়ির চড়াংলগ্ন ভূমিতে কুলিয়াদহ,—কেলেদে নামক একটি স্থানকে নবদ্বীপের অধিবাসিগণ দেখাইয়া দিতেছেন। আবার কুলিয়ারগঞ্জ কোলেরগঞ্জ, কুলিয়ার ফেরি, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কালিনগর অর্থাৎ কুলিয়া নগর, কোবলা, গদখালির কোল, কাশিমপুর কোল প্রভৃতি নানাস্থান কোলদ্বীপ সম্পর্কীয় বলিয়া বর্তমান নবদ্বীপ নগরের পার্শ্ববর্তী স্থানরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

কুলিয়ার পৌরাণিক তথ্য সম্বন্ধে যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহা আপনাদের নিকট আমি উদ্ঘাটন করিতেছি। এই নবদ্বীপ ধামে মন্দাকিনী, অলকা সহিত ভাগীরথী এবং গুপ্তভাবে সরস্বতী বিরাজিতা আছেন এবং পশ্চিমদিক হইতে যমুনাসহ ভোগবতী আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। ইহাদের সহিত মহাবেগবতী মানস-গঙ্গাও আসিয়া মিলিতা হইয়াছেন। শাস্ত্রে এই নবদ্বীপধামকে মহামহাপ্রয়াগ বলিয়া উল্লেখ করেন।

পুরাকালে ব্রহ্মা ঋষিগণসহ বেষ্টিত হইয়া এইস্থানে যজ্ঞ করেন; ইহা ব্রহ্ম-সত্রস্থান। এই মহামহিমশালী ধামের যে কোন স্থানে থাকিয়া জীবন নির্বাহ করিলে অন্তিমে তাহার চরমগতি প্রাপ্তি হয়; অর্থাৎ, তাহার গোলোক ধাম প্রাপ্তি হইবে। এই ‘কুলিয়া পাহাড়পুর’ গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত; ইহার ভূমি পর্বত সমান উচ্চ। শাস্ত্রে এই স্থানকে ‘কোলদ্বীপ’ আখ্যা দিয়া থাকেন। তাহার প্রাচীন কারণ এই যে, সত্যযুগে বাসুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার এইস্থানে ব্যাকুলভাবে বরাহদেবের উপাসনা করেন। সেই ভক্তিবান্ ব্রাহ্মণ-বাসুদেব পুনঃ পুনঃ শ্রীবরাহদেবের অর্চন করিয়া

প্রার্থনা করিতেন, “হে প্রভো, কবে আপনি রূপাপরবশ হইয়া আমাকে দর্শন দান করিবেন।” বিপ্র কখনও কখনও বরাহদেবের নামেতে কাঁদিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন। এইভাবে কিছুদিন অতিক্রান্ত হইলে বরাহদেব রূপাপরবশ হইয়া বাসুদেবকে এইস্থানে দর্শন দান করেন। সেই বরাহদেবের শ্রীমূর্তি নানা রত্নময় আভরণে মণ্ডিত, তাঁহার গ্রীবা, নাসা, মুখ ও চক্ষুর্দ্বয় অতিমনোহর এবং পর্বতপ্রমাণ তাঁহার বিশাল উচ্চ বপু। বিপ্র শ্রীবরাহদেবের মূর্তি দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। ভগবান্ বরাহদেব তখন বিপ্র বাসুদেবকে বলিলেন, “হে ব্রাহ্মণ,—আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট, এই নবদ্বীপে আমার বিহার। এই নবদ্বীপ-ধামমণ্ডল অতিশয় পুণ্যতীর্থময় স্থান। ত্রিভুবনে ইহার তুলনা নাই। এইস্থানেই ব্রহ্মার যজ্ঞে প্রকাশিত হইয়া হিরণ্যাক্ষ-দৈত্যকে দন্তদ্বারা বিদারণে নাশ করিয়াছিলাম। বরাহদেব আরও বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ কলিকালে এই নবদ্বীপমণ্ডলে মায়াপুর নামক ধামে সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া **শ্রীগোরাঙ্গ** নামে প্রকাশিত হইবেন।” সেই সময় হইতে এই দ্বীপ, কোলদ্বীপ নামে বিখ্যাত। ইহা পর্বতাখ্য দ্বীপ। ভক্তগণ ইহাকে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন-তুল্য পূজ্যজ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব ইহা ভক্ত্যঙ্গ যাজনের একটি প্রধান ক্ষেত্র।

এই পর্বতাখ্য সৌন্দর্য্যময় মহেশ্বর্য্যশালী কোলদ্বীপেই বর্তমান নবদ্বীপ সহর অবস্থিত। মাতা সুরধুনী ইহার পূর্ব প্রান্ত দিয়া প্রবাহিতা হইয়া সাগরাভিমুখে ধাবিতা হইতেছেন। গঙ্গানদীর তীরে রম্য ভজনীয় পর্বতাখ্য দ্বীপ শোভা পাইতেছে। কলকল নিনাদে গঙ্গার তরঙ্গমালা বহিয়া চলিয়াছে। তরঙ্গরাশি একবার কূলের এদিকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ওদিকে ঘাইতেছে আবার ও-কূল হইতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এ-কূলে আসিতেছে। আবার কোথাও ফেনময় তরঙ্গরাশি বর্তুল আকার ধারণ করিয়া সবেগে গমন করিতেছে। অতএব দৃষ্ট হইতেছে,—তীরের পাড় ভাঙ্গিয়া জলের মধ্যে সবেগে পতিত। কোথাও আবার গভীরতা-জন্ত গঙ্গা-দেবী গভীরভাবে প্রবাহিতা হইতেছেন। স্থানে স্থানে গুহ্র বালুকারাশির উপরে চকোর-চকোরা বিচরণ করিতেছে। গঙ্গার তীরে তীরে সারিবদ্ধ ভাবে বিহ্বস্ত মনোহর পাদপসকল, প্রস্থনরাজি-মণ্ডিত কত শত শত বৃক্ষ-লতাগুল্য শোভমান।

এই কোলদ্বীপাভ্যন্তরে শত শত উপবনরাজি বিরাজিত, নিত্য যেথায় মন্দির-পূজারীর পুষ্পচয়ন ; তারপর স্বর্ঘ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ উপবন মধ্যে বিহগ-বিহগীর কুজন, কপোত-কপোতীর নৃত্য ও ভ্রমর-ভ্রমরীর স্রমধূর গুঞ্জন-ধ্বনি নিত্যারাধ্য বৈকুণ্ঠধাম-রথীন্দ্র শ্রীগৌরানন্দেবের সেবার বৈচিত্র্য সাধন করিতে থাকে ।

ব্রাহ্মমূর্ত্তে মন্দিরের পূজারিগণ মঙ্গল আরত্রিকাদি সমাপনাতে শ্রীমন্দির-মার্জ্জনান্তর পূজার বাসনপত্রাদি উপস্কার করেন । অনন্তর অংগুমালী কিঞ্চিং উদ্ধদেশে অগ্রসর হইতে থাকিলে শ্রীবিগ্রহের অর্চনকারিগণ বিভিন্ন আকৃতির কলসসমূহ স্বক্কে স্থাপন করিয়া গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত ধীরে ধীরে সুরধুনীতে গমন করেন ।

গঙ্গাতীরে কত সহস্র সহস্র গৌড়ীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ, কত শত শত বৈদিক ব্রাহ্মণ, কত লক্ষ লক্ষ অর্চনকারী — কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তবৃন্দ ! তাহাদের মুখোদগীর্ণ বৈদিক মন্ত্রধ্বনিতে তখন নবদ্বীপের গঙ্গাঘাটের যে শোভা তাহা অবর্ণনীয় । আবার অত্র ঘাটে সহস্র সহস্র চতুষ্পাঠীর ছাত্র,— কেহ বা বেদান্তের গোবিন্দ-ভাষ্যের ছাত্র, কেহ বা শঙ্কর বেদান্তের ছাত্র । কেহ বা স্মৃতিশাস্ত্রের, কেহ বা হ্যায়-বৈশেষিকের, কেহ বা ব্যাকরণের ছাত্র । অত্র আর এক ঘাটে বিভিন্ন ছাত্রগণ পরস্পর পার্থিব বিত্যাবিজয়ে মত্ত । একপ জড়রসমত্ত ছাত্রাদির বর্ণনা আর কত করিব ! তাহাদের বিরাট হুঙ্কার ধ্বনি সেই পুরাতন দিবসের বিশ্ববিজয়ী কেশব-কাশ্মিরীর কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে । কেশব কাশ্মিরী বহু পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়াও সপ্তদশ বর্ষীয় বালক নিমাই-এর নিকট এই গঙ্গাতটেই ব্যাকরণ শাস্ত্রে পরাজিত হন । ঐ অদূরে সেই লীলার পুনরাভিনয় চলিতেছে । জড়বিজ্ঞামত্ত ছাত্রগণ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের নিকট তাহাদের সঙ্গীর্ণ বিদ্যার জাহির করিতে গিয়া লজ্জায় আনতবদন । বিজ্ঞেতা ছাত্রগণ মানদ-ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সেবকস্বত্রে বিজিতগণকে সান্ত্বনা দিতেছেন, “হে ভবপথিক, সামান্য জড়বিজ্ঞায় পাণ্ডিত্য-প্রয়াসে কোন লাভ নাই । শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বিরচিত ‘হরিনামামৃত’-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া তোমাদের জ্ঞানের প্রসারতা সাধন কর । ইহা একাধারে দার্শনিক আবার একাধারে ব্যাকরণ ও তত্ত্বগ্রন্থ । বেদান্তে শ্রীধনদেব বিত্যাভ্যুষণপাণ্ডের “গোবিন্দভাষ্য” পাঠ কর । তোমাদের হৃদয় শঙ্করের গুহ ‘নেতি নেতি’-জ্ঞান হইতে উদ্ধার লাভ

করিয়া পরম তৃপ্তি পাইবে। আয়ের ফাঁকি শিক্ষা করিয়া বুখা কাল হরণ করিও না। আমাদের শ্রীগোরাঙ্গদেব অতি অল্প বয়সেই ত্রায়শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও তাহার বড় বড় ফাঁকি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তোমরা সেই কলিভয়-নাশন শ্রীগোর-গদাধরের পক্ষ অবলম্বন কর। নবদ্বীপের ‘বিদ্যাবিশারদ’ বংশ, যাহাদের প্রভাবে তদধুষিত অঞ্চল ‘বিদ্যানগরী’ নামে অতাপি বিরাজিত। সেই বিদ্যাবিশারদের বংশও শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল। দৃশ্য জগতের বহিরঙ্গ দর্শনে প্রলুব্ধ হইও না। তবেই তো তোমাদের জীবন সার্থক হইবে।”

কেহ কেহ বা স্নানঘাটে “ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ”—ইত্যাদি বেদমন্ত্রে বিষ্ণুসেনের স্তব পাঠ করিতেছেন। এই সকল বিভিন্ন কোলাহলে স্নান-ঘাট মুখরিত।

কত সুন্দর সুন্দর হর্ম্যমালা সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত; কত বিচিত্র মন্দিরাদি এদিক্ ওদিক্ ব্যাপ্ত রহিয়াছে; আর তন্মধ্যভাগে সিদ্ধান্তরত্ন* প্রকটিত নবধাভক্তির পীঠক নবচূড়া-সমন্বিত ভুবনাকর্ষী, সুবিশাল, সু উচ্চ গরুড়ধ্বজ শ্রীমন্দির যাহার গাত্রোপরি ব্রহ্ম মাধব-গৌড়ীয়-তিলক দূর হইতে পৃথককে বিশুদ্ধ গৌড়ীয়গণের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনতচিত্ত করাইতেছে; যাহার শৃঙ্গদেশ হইতে বংশীধ্বনিতে “কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” বিশ্বের সু-দূর প্রান্ত হইতে মহাভাগদিগকে নিত্য-হরি কীর্তন-মন্দিরে আস্বাদন জানাই-তেছে, যেথায় শ্রীকেশব-দাস্ত্রে সারস্বত গৌড়ীয়গণ বিশ্বস্তজীবন ভবরোগিবৃন্দকে বিশুদ্ধ বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণে উপযোগী করাইতে সুদর্শন অস্ত্রোপচার করিতেছে; যেথায় অহরহ গগন বিদীর্ণ করিয়া শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্তন-ধ্বনি মহাপ্রেমী শ্রীবাসচরণে অপরাধী শ্রীদেবানন্দের ত্রায় কোটি কোটি অপরাধীর অপরাধ ক্ষয় করিতেছে; যেথায় ধামেশ্বর শ্রীকোল-দেবের (বরাহদেব) নিত্য আরতি কোলদ্বীপের মহিমা ঘোষণা করিতেছে; যেথায় রাধাচিন্তানিবিষ্ট বিনোদবিহারীর অদ্ভুত শ্বেত-কান্তিশারণ নিগূঢ় ভজনা-নন্দীর চূর্ণেভ্য ভজনরহস্যকেও ভেদ করিয়াছে; যেথায় গৌরবাণী-শ্রীকৃপানুগ-সিদ্ধান্তে বিশ্ববিলোড়নকারী, ভুবনবিকীর্তিত বাণীর সেবায় জগৎ নিমগ্ন। এই কোলদ্বীপেই শ্রীকোলদেবের প্রহরীরূপে বিদ্যমান অসংখ্য ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়

* সিদ্ধান্তরত্ন—সিদ্ধান্তের রত্ন, অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যাঁ হাকে ‘কৃতিরত্ন’ আখ্যা দিয়াছেন।

মঠরাজি, যেথায় সহস্র সহস্র সংশিক্ষার্থীগণকে নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব মহাপ্রভুর ভজনসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। স্থানে স্থানে অপসম্প্রদায়গুলি গৌড়ীয়-গগনোদ্ভাসিত সিদ্ধান্ত-ভাস্করের কিরণ-ব্যাপ্তিতে খদ্যোতিকাপ্রায় বিলুপ্ত।

দিবাবসানে নৈশ অন্ধকারে গুপ্তবৃন্দাবন—সমগ্র নবদ্বীপধামমণ্ডলের শোভা আরও মনোহর। নির্মল আকাশে উদিত চন্দ্রের অমিয় কিরণরাশি নবদ্বীপমণ্ডলের মন্দির-প্রস্তরে পতনে চন্দ্রের এককত্ব বিনষ্ট হইল। চন্দ্র তখন আর একক রহিল না। মনে হইল, যেন সহস্র সহস্র চন্দ্র মন্দিরের প্রস্তর ফলকে নৃত্য করিতেছে। ক্রমে একটী একটী করিয়া দ্বীপালোক ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মন্দিরাদিতে ও দীপাবলী প্রজ্জ্বালিত হইল। দীপের ছটায় চতুর্দিক ঝলসিত হইয়া উঠিল। তাহাদের জ্যোতি এমনই প্রবল, মনে হইল যেন শত শত সূবর্ণ-মণি-মাণিক্যের রশ্মিরাশি মন্দিরাভ্যন্তর অতিক্রম করিয়া বহির্দেশে বিক্ষুরিত হইতেছে। ধূপ-ধূনা-অঙ্কুর-চন্দনের সৌরভে সমগ্র নবদ্বীপধামমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। নিতান্ত নাস্তিকের নিকটও প্রতিভাত হইবে,—স্বর্গেব নন্দনকানন কলিপাবন শ্রীগৌরের সেবায় মর্ত্যালোকে এই ভৌম (গুপ্ত) বৃন্দাবনে অবতরণ করিয়াছে। সহসা গগন, পবন, পাতাল ভেদ করিয়া মেঘমল্লস্থরে কাঁকার, কাঁসর, মৃদঙ্গ, শঙ্খ করতাল এবং গৌর প্রীতিমূলা বিবিধ সূযন্ত্র-বাদ্যের মধ্য দিয়া সন্ধ্যারতি ধ্বনি—

“জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা।

জাহ্নবীর তটবনে জগমনোলোভা ॥

দক্ষিণে নিতাই চাঁদ, বামে গদাধর।

নিকটে অর্ধৈত শ্রীনিবাস ছত্রধর ॥

* * * *

উথিত হইল। সত্যই প্রতীত হইল,—শ্রীমন্নহাপ্রভু স্বর্ণসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহার বামপার্শ্বে গদাধর, আর দক্ষিণ পার্শ্বে দয়াল নিত্যানন্দ প্রভু যেন কৃষ্ণপ্রেমে গদ্গদ হইয়া মগ্নক ঢুলাইতেছেন। আহা, সে শোভা কি অপক্লপ!

অতঃপর পূজারী শ্রীবিগ্রহগণকে ধূপ, পঞ্চদীপ, শঙ্খজল, বসন, পুষ্প, স্নেহ চামর ও ময়ূরপুচ্ছ-খচিত ব্যজনাদি নিবেদন করিলেন। আরত্ৰিক গীতি শুরু হইল। পুনরায় কীর্তনযোগে (বিষ্ণু-)মন্দির, তুলসীদেবী

পরিক্রমণ হইল। শাস্ত্রে আছে, বিষ্ণুমন্দির পরিক্রমণ ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের
অন্ততম ; ইহাতে জীবের ভবব্যাধি দূর হয়। আমিও এইরূপ একটী মন্দির
পরিক্রমণে যোগদান করিলাম। পরিক্রমণের পর কেহ ‘হা নিতাই, হা গৌর’
বলিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

নবদ্বীপমণ্ডলীর একদিকে যখন এইরূপ গৌরপ্রেমের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত
হইতে থাকে, তখন অন্য দিকে চলিতে থাকে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য। স্মার্ত্ত,
নিশাচর তান্ত্রিক, কাপালিক, যোগীর দল তখন সুরাপানে বিভোর হইয়া
পৈশাচিক লীলায় মত্ত থাকে। প্রদীপের তলায় অন্ধকার চিরকালই বর্তমান।
মনে হয়, উহাই প্রদীপের বৈশিষ্ট্য। ধত্ব কলি ! ধত্ব তোমার প্রভাব !!
ধত্ব তোমার স্নকৌশল !!!

আমি আরও কয়েকটী গৌর-মন্দির দর্শন করিলাম। সর্বত্রই তখন
সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। নাট্যমন্দির-প্রাঙ্গণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্ধ-
গাক্ষরিকা গিরিধারী, রাধারানী, বৃন্দারানী ও অনন্ত কোটী বৈষ্ণববৃন্দের
জয়ঘোষণায় নিনাদিত হইতেছে। অতঃপর জয়ঘোষণান্তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম
ও শ্রীবিগ্রহগণকে দণ্ডবৎ করিয়া বৈষ্ণবগণ পরস্পর একে অত্মকে দণ্ডবৎ
করিতেছেন, আর বলিতেছেন, “হে প্রভো, দয়ার অবতর হে বৈষ্ণব ঠাকুর !
আমার অপরাধরাশি বিদূরিত করুন। অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণবচরণে কত
অপরাধ করিয়াছি। আপনাদের কৃপা-ব্যতীত, বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে
মুক্তি পাইবার আমার আর অত উপায় নাই। আপনারাই বৈষ্ণব-অপরাধ
অপনোদিত করিয়া শ্রীগৌরান্ধে গুহ্যভক্তি দান করিতে পারেন।” অপর
বৈষ্ণব তখন ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন, “প্রভো ! আপনারা সকলেই
আমার প্রাণনাথ শ্রীগৌরান্ধদেবের সেবক। অতএব আপনারা সকলেই
আমার মাথ। আমার কি শক্তি আছে যে আমি আপনাদিগকে ভক্তি দান
করিব !”

আমিও সৰ্ব্ব বৈষ্ণবচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলাম। কাকুভরে তাঁহাদের
চরণে প্রার্থনা করিলাম, “হে শ্রদ্ধা ! কবে গৌরবনে সুরধুনী-তটে দেহ-সুখ
ভুলিয়া নানা লতা-তরুতলে ‘হা রাধে, হা কৃষ্ণ’ বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইব।
কবে কৃষ্ণ কোলাহলে উন্মত্ত হইয়া পুলিনে পুলিনে গড়াগড়ি দিব ; কবে
ধামবাসী জনে প্রণতি পূর্বক তাঁহাদের নিকট কৃপার লেশ মাগিয়া অবধূত
বেশ ধারণ করিব ; কবেই বা ধামের স্বরূপ স্মুরিত হইবে।”

তৎপর শ্রীমন্দিরে নৈশ-ভোগ নিবেদনান্তে বৈষ্ণবগণ স্নাত্তে সমাসীন হইয়া জয় ঘোষণা করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। আমিও বৈষ্ণবদের কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট সেবন করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিলাম। অনন্তর বৈষ্ণবগণের নিকট রাত্রিযাপনের একটু স্থান প্রার্থনা করিলাম। দয়ার সাগর বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া আমাকে একটা কুটীরে স্থান দান করিলেন।

শয্যা গ্রহণ করিয়া আমি এই 'গুপ্ত বৃন্দাবন'—নবদ্বীপধামমণ্ডলের—বিশেষতঃ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর ও অপরাধ-ভঞ্জনর পাট শ্রীকোলদ্বীপের অলৌকিক বিষয়রাশি চিন্তা করিতে করিতে অভিভূত হইয়া গেলাম। রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইতে লাগিল ; নিদ্রাদেবী আমার চক্ষুকে আচ্ছাদিত করিলেন। রাত্রিতে স্বপ্নাবেশে আরও কত অলৌকিক বস্তু দর্শন করিলাম, তাহা আমার আর স্মৃতিতে নাই।

জটনৈক পথচারী

—শ্রীরামপ্রসাদ রায় (দেবশর্মা)

শ্রীমদ্ গোপাল-ভট্ট গোস্বামিপাদ

দাক্ষিণাত্যে কাবেরীর তটে বেলগুঁড়ি-নামক গ্রামে,
বেঙ্কটভট্টের পুত্র জনমে গোপালভট্ট নামে।

ক্রমে সেই শিশু হ'ল বদ্ধিত ব্রাহ্মণ-পরিবারে,
তুষ্ট সকলে নেহারি' তাহার ভক্তি ও সদাচারে।

অতি অল্প বয়স যখন শিশুকাল অপগত,
অধ্যয়ন প্রায় হ'ল সমাপ্ত আছে শাস্ত্র-আদি যত।

এলেন একদা শ্রীগৌরঙ্গ হেরিতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্র,
মিলিলা সেথায় প্রভুজীর সনে বিপ্র বেঙ্কটভট্ট।

গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে জানা'ল ভট্ট তাঁ'য়,
ভট্ট-প্ৰীতে তাই ভট্টের গৃহে এলা গোরা স্বেচ্ছায়।

ভট্ট-আলয়ে চাতুর্মাস্ত্র হইল উদ্‌যাপিত,
ভট্ট-সঙ্গে কৃষ্ণ-কথায় ব্যস্ত প্রভু অবিরত।

গোপাল তখন সেবিত প্রভুরে নিত্য হর্ষভরে,
 কোলে করি' তা'রে প্রভু গৌরঙ্গ ভাসিতেন আঁখিলোরে ।
 সঁপিল গোপালে বেঙ্কট ভট্ট প্রভুর রাতুল পা'য়,
 সানন্দে প্রভুও গোপাল-মস্ত্রে দীক্ষা দিলেন তা'য় ।
 মায়াজালে যা'তে বাঁধিয়া না রাখে ভক্ত-শ্রীগোপালে,
 তাহারি উপায় সৃজিলেন তিনি বিদায়ের প্রাক্কালে ।
 যাবার সময় কহিলেন প্রভু ডাকি' বেঙ্কট ভট্টে,—
 'বিবাহ না দियो, পড়াইয়া মহা পণ্ডিত কোরো পুত্রে ।'

—উপদেশ পাই গোপাল ভট্টে সঁপিলেন মনে মনে,
 নিত্যকাল সুখে রহ' এই মহাপ্রভু-শ্রীচরণে ।
 পিতামাতা তার গেলা পরলোক সময় অন্তে যবে,
 চলিল গোপাল মনের হরষে বৃন্দাবনের পথে ।

পিতৃব্য তাহার 'প্রবোধানন্দ সরস্বতী' নাম নিয়ে,
 রহেন এখন বৃন্দাবনেতে প্রভুর শিষ্য হ'য়ে ।
 ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী ন্যাসীঘর যিনি মত্ত গৌর-গানে,
 ভক্তিসিন্ধু মথি' তিনি নিত্য সেবিছেন ভগবানে ।

মিলিল গোপাল তাঁহার সকাশে বৃন্দাবনেতে এসে,
 ল'য়ে গেলা তিনি ভ্রাতৃপুত্রে রূপ-সনাতন পাশে ।
 শুনেছেন তাঁরা গোপালের কথা শ্রীগৌরঙ্গ-কাছে,
 আজি সে গোপালে হেরিয়া তাঁদের হৃদয় আনন্দে নাচে ।

জানালেন তাঁরা পত্রে এ কথা নীলাচলে প্রভুজীয়ে,
 জবাবে প্রভুজী লিখিলা তাঁদেরে হরষিত অন্তরে—
 'গোপাল ভট্টে জেনো সহোদর, লহ মোর আশীর্বাদ,
 পাঠালাম তা'রে স্বকীয় আসন-কৌপীন-বহির্বাস' ।

প্রভুর আজ্ঞা হইল পালিত যথাযথ বৃন্দাবনে,
 গোস্বামিদিয়-সঙ্গে গোপাল রহে শাস্ত্র-সংকলনে ।
 প্রভুর অপ্রকট-বার্তা সহসা আসিল বৃন্দাবন,
 তাঁহার বিরহে ব্যাথিত এবে সকল গোস্বামিগণ ।

ঘুরিয়া বেড়ায় তীর্থে তীর্থে ভট্ট গোস্বামিপাদ,
সেই তীর্থই হয় পবিত্র যায় যেথা ভক্তরাজ ।
ঘুরিতে ঘুরিতে শালগ্রাম শিলা পেয়ে গগুকাী নদে,
আপন-ভজন-কুটীরে আনিয়া নিত্য তাঁহারে পূজে ।

মথুরার যত ধনীরা তখন কত অলঙ্কার দানে,
সাজান হ'ল তা' বৃন্দাবনের যত বিগ্রহগণে ।
সাধ জাগে তবে ভট্টের প্রাণে শালগ্রাম সাজাবারে,
সারা রাতি জাগি' ভট্ট সে তাই উপায় চিন্তা করে ।

প্রভাতে আসিয়া হেরিলা ভট্ট উপাস্ত শালগ্রাম,
মুরলী বদনে শ্যাম রূপ ধরি' রহে দণ্ডায়মান ।
ভট্ট-কুটীরে ভরিল আলোক যেন কোটি সূর্য্যসম,
প্রীত হ'ল সবে নেহারি' শ্যামের মাধুর্য্য অনুপম ।

অভিষেক তাঁ'র করিল তখন যত গোস্বামিগণে,
'শ্রীরাধারমণ' নামে আজো তিনি বিরাজেন সে-স্থানে ।
দয়ায় আপনি দেখা দেন কভু ভক্তের ভগবান,—
'রাধারমণের' আবির্ভাবই এ'র অপূর্ব্ব প্রমাণ ।

ভট্টের এক শিষ্য আছিল গোপীনাথ দাস নামে,
যা'রে একদা দীক্ষা দে'ছিল দেববন-নামে স্থানে ।
'রাধারমণের' অর্চনাভার দিয়া গোপীনাথ-পরে,
হলেন অপ্রকট ভট্ট গোস্বামী জীবের মঙ্গল তরে ।

প্রণাম তোমায় গোপাল ভট্ট বৈষ্ণব-দিকপাল,
মহাপ্রভুর সেবক-স্বরূপে কাটাইলে কত কাল ।
তব পবিত্র ভাবময় তনু আজো রাজে ব্রজধামে,
তব সেই লীলা করে প্রত্যক্ষ কভু কোন ভাগ্যবানে ।

স্বয়ং শ্রীহরি গোরাগুণমণি যাঁহার মহিমা গায়,
সে পুণ্যকথা কহিবার মোর যোগ্যতা কোথা হয় !
প্রার্থনা মোর—কৃপা করি' মোরে দেহ তব পদ-রজ,
মানসে নিয়ত হোঁরি যেন সেই মধুর ভৌম-ব্রজ ।

—শ্রীগোপাল দাস

(বড়বহরকুলি)

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদের দ্রুমকা জিলায় বিভিন্নস্থানে প্রচারের সারমর্ম

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৫ পৃষ্ঠার পর)

বর্তমান সমাজ ও নিরাকারবাদ

(সারসাজোলে প্রদত্ত বক্তৃতা)

ছেলেবেলা থেকে শোনা যায়, আমরা ভগবানে মিশে যাব। এই অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে দার্শনিক জগতে বহু আলোচনা হয়েছে। যদি আমরা ভগবানের সহিত এক হয়ে যাই তবে উপাসনার প্রয়োজন কি? এ সম্পর্কে গোড়ীয়গণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। শাস্ত্র বলেন,—

“সম্প্রদায়-বিহীন যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥

শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবা ক্ষিতিপাবকাঃ।

চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হুংকলে পুরুষোত্তমাং ॥”

চারজন বৈষ্ণব-আচার্য্য চারভাবে ভগবানের উপাসনা করেছেন। কেহ বিষ্ণু-উপাসনায় শিবের (রুদ্র), কেহ লক্ষ্মীদেবীর, কেহবা ব্রহ্মা এবং কেহবা সনক-সনাতন-সনন্দ-সনৎকুমার—এই চতুঃসনাদির পন্থা অবলম্বন করেছেন; কারণ, বিষ্ণু ছাড়া আর কেহ মুক্তি দিতে পারেন না। বিষ্ণুই মোক্ষদাতা। ভারতে দ্বাদশটি জ্যোতির্লিঙ্গ আছে। সে সব স্থানের প্রত্যেক স্থলেই বিষ্ণু-বিগ্রহ আছেন। কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরেও বিষ্ণু আছেন। ভুবনেশ্বরে অনন্ত-বাসুদেবের প্রসাদ দ্বারা ভুবনেশ্বর শিবের পূজা করা হয়। এই প্রকারে বিষ্ণুই পৃথিবীতে সর্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য আমাদের দেশে মায়াবাদ প্রচলন করে গেছেন। সেগুলি কেবল অস্বরমোহনের জগুই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রেও এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে,—

“মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।

ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা ॥”

(পদ্মপুরাণ)

(শিব পার্কতীকে বলছেন) “হে দেবি! আমি কলিকালে ব্রাহ্মণ-কূলে অবতীর্ণ হইয়া মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র যাহা প্রচলন বৌদ্ধবাদ, প্রচার করিব।”

মায়াবাদীরা ঈশ্বরকে ‘নিরাকার, নির্বিশেষ’ বলে থাকেন। এগুলি দ্বারা নাস্তিকতা বোঝায়। আজকাল শিক্ষিত লোকসমাজ সকলেই সেজ্ঞ নাস্তিক হ’য়ে পড়েছে। আমাদের হিন্দুসমাজ কিন্তু তা কোন দিন বরদাস্ত করেনি। যারা ভগবানের আকার স্বীকার করে না, তারা অস্পৃশ্য। খ্রীষ্টান-গণ আমাদের “Idolator” বলে, মুসলমানগণ আমাদিগকে “বুৎপেরাস্ত্” বলে। সেজ্ঞ তাদেরকে ঘরে উঠতে দেওয়া হয় না। খ্রীষ্টানরা আমাদের Idolator বলে, কারণ তারা নিরাকারবাদ স্বীকার করে। কোন হিন্দু মুসলমানের সাথে খাওয়া-দাওয়া মনে মনে স্বীকার করবে না, অথচ ধূয়া চলছে, “সব এক”।

হিন্দু-সমাজের একটা পদ্ধতি হাজার হাজার বছর ধরে চলছে। সেটা হ’ল,—সমাজে সর্বদা দুইটি শ্রেণী,—এক দল ঈশ্বরের আকার স্বীকার করে, অর এক দল তা’র বিরোধিতা করে। কবীর-পন্থী, নানক-পন্থী, আর্য্যসমাজী সকলেই নিরাকারবাদী। এ জ্ঞ তাদের হিন্দুর ঘরে উঠতে দেওয়া হয় না। আর্য্যসমাজীরা বেদের নাম করে দেশে নিরাকারবাদ চালায়। এদের সম্বন্ধে সাবধান থাকবেন। দয়ানন্দ (আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা) ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করে ‘কোরান শরীফ’ পাঠ করেছিল এবং সেই মতের পরিপোষক হয়। এতে পিতা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন,—“তুই অধার্মিক, তোকে ঘরে ঠাই দেবো না।” দয়ানন্দ দেখলে, যদি মুসলমানই হ’য়ে থাকি তবে বেদ পড়ে ইসলামী মতকে বেদের নামে চালাব। শেষে বেদ পড়ে সে তাই করল। রামমোহনকেও তাঁর পিতা এইরূপ করেছিলেন।

আমাদের দেশে রবিঠাকুর ‘নিরাকার ব্রহ্ম’-বাদী, অর্থাৎ ব্রাহ্ম। তিনি হিন্দুসমাজের বিরোধী ছিলেন, তাই হিন্দুদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বিযোক্তার তাঁর কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। একটা বিযুক্ত বীজ তিনি আমাদের মধ্যে চালিয়ে গেছেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে একটা বিযুক্ত বীজ তিনি বপন করে গেছেন। তাঁর সব কাব্য অবশ্য পড়ি নি, তবে যেগুলো জানি সেগুলোতে স্পষ্ট করে এই বিযুক্ত বীজের বপন দেখেছি। দেশের আবহাওয়াটা যাচ্ছে কোথায়? এসব না লক্ষ্য করলে আমরা মরব। আমরা সমগ্র ভারত জুড়ে এই কথা বলছি। নিতান্ত অকৃতকার্য হইনি; কিছু সফল হ’য়েছে। হিন্দুধর্মকে উড়িয়ে দিতে সমগ্র পৃথিবী উঠে পড়ে লেগেছে। এ সম্বন্ধে রবি ঠাকুরকে তাহারা সহযোগী ভাবল।

তাই গত রবি ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকীতে বিলাতে হৈ হৈ হ'ল। আমাদের সরকারও বহু টাকা খরচ করলেন। তারা ভাবলেন,—এটা একটা Policy।

যারা ঈশ্বরকে নিরাকার বলবে তাদেরকে একঘরে ক'য়ে দিন। তাদের বলুন,—তোরা পূর্বজন্মে নিশ্চয় খুষ্টান বা মুসলমান ছিলি। আমার মতে ঈশ্বরদেবী মাতাল ভাল; তবুও নিরীশ্বর সচ্চরিত্র ব্যক্তি ভাল নয়।

আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রায় ২৫০০ বছর প্রচলিত, জৈনধর্মও প্রায় তাই। কিন্তু তারা ভারতে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মমতও বৌদ্ধদের শূন্যবাদ-প্রায়। Jesus.Christ এই মতটী স্বীকার করে তাঁর মত চালিয়েছেন। ভারতে নেই এমন মত আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে তৈরী হয় নি। “Out of nothing everything has been created” মতটী কি যুক্তিসিদ্ধ? Cause and Effect Theory (কার্য-কারণবাদ) আলোচনা করুন। বস্তুসত্তা মূল কারণে না থাকলে ফলে তা দেখতে পাওয়া যায় না। ইট গুঁড়িয়ে তেল হয় না। Potency (সত্তা) Cause (কারণ)-এ না থাকলে বস্তুটী ফলে থাকতে পারে না। সেজন্ত বস্তু কখনও নিঃশক্তিক হ'তে পারে না। এটা যুক্তিহীন বিচার। ঈশ্বর নাই বা তাঁর কোন আকার নাই—এটা নাস্তিকের উক্তি।

“World is an accident” (পৃথিবীটা আকস্মিক)—এটা যুক্তিবিরুদ্ধ মত; কারণ When the accident is a frequent feature it must be a law. (আকস্মিক ঘটনা প্রায়শঃ সংঘটিত হলে, সেইটাই একটা নিয়মে পরিণত হয়)। যদি কোন Law বা ‘নিয়ম’ আবিষ্কার করতে না পারা যায়, তবে সেটা যুক্তির দুর্বলতা। নাস্তিক চার্লসও এই মতের প্রচারক। সায়েন মাধব তাঁর রচিত “সর্বদর্শন-সংগ্রহ” পুস্তকে কয়েকটি দার্শনিক মতের উল্লেখ করেছেন। তাঁকে শঙ্করের অবতার বলা হয়। তিনিও এইরূপ মতের পোষক! সেজন্ত তাঁর দর্শন Totally failure. Christianity, Mohamedanism ইত্যাদি এই মতের উপর based। এতে নিত্য শান্তি কোন দিন আসেনি। আমরা গৌরব বোধ করছি যে, আমরা হিন্দু। আমাদের মত পৃথিবীতে শান্তি দিবে।

চার্লস বলে, “ভস্মীভূতশ্ম দেহশ্ম পুনরাগমনং কুতঃ”? এই মতবাদই আমাদের দেশে নাস্তিকতা ও নিরীশ্বরবাদ আনয়ন করে। একটী লোকের

পাঁচটা ছেলে পাঁচ রকম হয় কেন? অযৌক্তিক নাস্তিকগণ বলবে, ওটা accident; বিপুল বৈদান্তিকগণ বলেন, ওটা পূর্বজন্মের কর্মফল। পাশ্চাত্যের Charles Darwin সাহেব আমাদের এই মতটা কিছুটা নিয়েছেন। তাঁর মত—পশু পক্ষী ইত্যাদি থেকে Gradual development-এ (ক্রমোন্নতিতে) মনুষ্য-জন্ম হয়, মানুষই শ্রেষ্ঠ জন্ম। এই মতটী আমাদের শাস্ত্রের “জলজা নবলক্ষাণি”—শ্লোকটির প্রতিধ্বনি মাত্র। তবে তাঁর ভ্রম এই যে,—তিনি মনুষ্য-জন্মের পর আর কোন জন্ম নেই বলেছেন। এইটাই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভ্রম। আমরা কিন্তু আমাদের দেশের উদাহরণ হ’তে জানতে পারি—অহল্যা পাষাণী হ’য়েছিলেন; ভরতরাজা হরিণ হ’য়েছিলেন, নলকুবের-মনিগ্রীব যশোজ্ঞান বৃক্ষ হ’য়েছিলেন—ইত্যাদি। যদি মনুষ্য-জন্মই শেষ জন্ম তবে সত্যতার আর প্রয়োজন কি? “যতদিন থাক লুটে পুটে খাও, মরার পর ত আর কিছু নেই”—এইরূপ মত তখন অত্যন্ত প্রবল হ’য়ে উঠে। দেশের শাস্ত্রের সাম্যাবস্থা তখন ব্যাহত হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এ সম্বন্ধে খুব বিশ্লেষণ করেছেন। সেথায় দেখি, “কীট জন্ম ইউ যথা তুয়া দাস”।

পূর্বে বর্ণিত অসং চিন্তার প্রাচুর্য্যাবের একমাত্র কারণ—মূলেতে ঈশ্বর বিশ্বাস নাই। পূর্ব জন্ম আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সেথায় কোন একঙুয়েমি চলবে না যে, ওটা মানি না। ভক্তের গৃহের পশুরও মূল্য আছে; কারণ তারা মহাপ্রসাদ পায়। পরজন্মে তারা ভগবদ্ভক্ত হবে। মহাজন বলেন, “যোগে যোগী পায় যাহা, ভোগে আজি হবে তাহা”। যোগিগণ হেঁট মুণ্ড ইত্যাদি দ্বারা বহু কষ্টে তপস্তা করে। কিন্তু ফল হয় কি? তারা যা লাভ করে সেটা একটা জড় রহস্য বৈ আর কিছু নয়। প্রসাদে ভোগবুদ্ধি থাকলেও তৎসেবনকারী যোগী অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলদায়ক ফল লাভ করে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটী বুঝতে পারি না, তথাপিও মঙ্গল হবে। শুধু খেয়ে দেয়ে মরব কেন? পশুরাও ত তাই করে। বেঁচে থাকার জন্তই শুধু খাব নাকি? এতে লাভ কি? মনুষ্য জন্মের Speciality (বিশেষত্ব) পালতেই হবে। ষোল আনা না পারি, এক আনা করব। একেবারে ছাড়ব কেন? কেনইবা আত্মীয় স্বজন কেনইবা চিন্তা, কেনইবা আমাদের দুঃখ-কষ্ট—সেগুলো! আমাদের চিন্তা করা দরকার। “এবাড়ী আমার, এ ছেলে আমার”—ইত্যাদি Provincialism পশুর মধ্যেও আছে। ধর্মচিন্তা পশুর নেই। সেই Speciality আমরা ছাড়ব কেন?

পিতার আদর্শ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন?

(আসনবনিতে প্রদত্ত)

বর্তমান সমাজে আহাৰ, ব্যবহার, শিক্ষা ও আচারের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বাহ্যিক পিতা, শিক্ষক ও শাসকসমাজে সজ্জিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই এই সকল অমাচার, দুৰাচার, অসদাচার ও কদাচার বহুল পরিমাণে থাকায় স্ব-স্ব-দোষগোপন-মানসে আরও সকলে যাহাতে এই সকল অপকর্মে লিপ্ত হইয়া কলির সাহচর্য্যবিধানে অধিকতর যোগ্যতাজ্জন করিতে পারে, সেইরূপ চেষ্টাই আজকাল ‘জীবসেবা’ বলিয়া কথিত হয়। ইহার একমাত্র প্রতিকার হইল, “Spare the rod and spoil the child” অর্থাৎ, “সন্তানগণকে বেত্রাঘাত বা কঠোর শাসন না করিলে তাহারা নষ্ট ও অধঃপাতিত হইবে”—এই নীতিবাক্য অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন। তজ্জন্ত শিক্ষা বিভাগে যেরূপ “Guru Training”-র (গুরু-ট্রেনিং) ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই প্রকার গৃহস্থ সমাজেও সন্তানগণকে শিক্ষা দিবার জন্ত “Father Training”-র (ফাদার ট্রেনিং) বিশেষ আবশ্যকতা আছে ; কারণ, আজকাল বহু ব্যক্তিকে পিতা হইতে দেখা যায়, কিন্তু সন্তানের প্রতি কর্তব্য-পালনে যে আদর্শের প্রয়োজন, তাহার অত্যন্ত অভাব তাঁহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এইজন্ত ‘পিতৃত্ব-শিক্ষার’ বা কি প্রকারে প্রকৃত পিতা হইতে পারা যায় সেই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। তজ্জন্তই পূর্বে বলিয়াছি “Spare the rod and spoil the child”। অনুপযুক্ত পিতৃগণ জগতের কোন মঙ্গলই সাধন করিতে পারেন না, উপরন্তু অমঙ্গলই আনয়ন করেন। আর সরকারপক্ষ হইতেই এই “Father Training” শিক্ষালয় খোলা প্রয়োজন; যেহেতু পিতৃগণই সন্তানের Wholetime Guide (সর্বক্ষণ পরিচালক)। (ক্রমশঃ)

— নিজস্ব সংবাদদাতা

ভ্রম-সংশোধন

মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ এই বৎসর আমাদের প্রকাশিত “শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকায়” শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথিতে উপবাসের পারণের সময় উল্লিখিত হয় নাই। পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে উহা নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশীর পারণ—৩রা ফাল্গুন, ১৩৭১ সোমবার পূর্বাহ্ন ৮টা ১৮ মিনিটের মধ্যে।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ ; ইং ১৫/১২/৬৪

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘাধা-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ৮ই ফাল্গুন ১৩৭১, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫, শনিবার
ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব- (মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী)
তিথিপূজা উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে চুঁচুড়া-
সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৬ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী,
বৃহস্পতিবার উল্লিখিত শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়-
পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্যবর্ষ্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-
প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব-তিথি (মাঘী
কৃষ্ণা তৃতীয়া) হইতে ৮ই ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার পর্য্যন্ত
দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-
পঞ্চক, ব্যাস পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-
পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ
হরিকীর্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব শংসন
ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুকভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান
করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই
মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, “বুদ্ধি” ও বাক্য-
দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগৎ-
সেবোন্মুখী শ্রুতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ—বৃহস্পতিবার পূর্নাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা পঞ্চকাদি, অপরাহ্নে
বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা। শুক্রবার পূর্নাহ্নে ও অপরাহ্নে
গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। শনিবার পূর্নাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদ-
পদ্মে অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ, এবং পবে
শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।



১৬শ বর্ষ { পৌষ, ১৩৭১ { ১১শ সংখ্যা




শ্রীপিছলদা গোড়ায় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কাৰ্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গোড়ায় মঠ, তেঘরিপারা, নবদ্বীপ (নদীয়া)

ধর্ম: স্বহৃদিত: পুংসাং বিধকুসেন-কথাস্থ য:	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকক্ষে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা যন্নান্ন: সুপ্রসীদতি ॥</p>	নোংপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥
<p>সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্ব-পরসম্ । অথ ধর্ম স্বরূপে পালে যেই জন । অধোকক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিরহুত ॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥</p>		

১৬শ বর্ষ } কারণোদশায়ী, ২৬ নারায়ণ, ৪৭৮ গৌরাদ { ১১শ সংখ্যা
 বৃহস্পতিবার, ৩০ পৌষ, ১৩৭১; ইং ১৪/১/১৯৬৫

সান্নিধ্য

শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিতং

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

গৌর, গৌরভক্ত, গৌরধাম, চিন্ময় ধাম-বিভূতি ও অপ্ৰাকৃতধামে

অপ্ৰাকৃতলীলার প্রতি নমস্কার —

নমামি তদ্গোক্রমচন্দ্রলীলাং

নমামি গৌরশূলচিহ্নভূতিম্ ।

নমামি গৌরানুপদাশ্রিতান্তান্

নমামি গৌরং করুণাবতারম্ ॥৬৩॥

গোক্রমচন্দ্রলীলা অর্থাৎ গৌরানুদেবের লীলাকে নমস্কার এবং গৌরশূলের যে চিন্ময় বিভূতি, তাঁহাকেও নমস্কার; আর ষাঁহার শ্রীগৌরানুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত, তাঁহাদিগকে নমস্কার এবং করুণাবতার গৌরচন্দ্রকেও নমস্কার করিতেছি ॥ ৬৩ ॥

পঞ্চতত্ত্বে বিজ্ঞপ্তি—

হা বিশ্বস্তর ! হা মহারসময় ! প্রেমিক সম্প্রসিধে !

হা পদ্মাস্ত্র ! হা দয়ার্জহৃদয় ! ভ্রষ্টৈকবন্ধুতম !

হা সীতেশ্বর ! হা চরাচরপতে ! গৌরাবতীর্ণক্ষম !

হা শ্রীবাসগদাধরেষ্টবিষয় ! হং মে গতিস্ত্বং গতিঃ ॥ ৮৪ ॥

হে বিশ্বস্তর ! হে মহারসময় ! হে প্রেমসম্পদের একমাত্র আধার !
(শ্রীগৌর !) হে পদ্মাবতী-স্বত ! হে দয়ার্জহৃদয় ! হে পতিতের একমাত্র
সর্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব ! (নিতাই !) হে সীতাপতে ! হে চরাচরপতে ! (বিশ্বের
উপাদানান্তর্যামিন্মহাবিষ্ণো !) হে গৌরাঙ্গদেবের অবতরণক্ষম ! (‘গৌর-
আনা-ঠাকুর’ অর্থেত !) হে শ্রীবাস ও গদাধরের অভীষ্ট বিষয় ! (গৌর !)
তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার গতি ॥ ৮৪ ॥

স্বমাধুর্য্যাস্বাদন ও প্রেমবিতরণার্থ আস্বাদনের ভাবকান্তিগ্রহণপূর্ব্বক

নবধাভক্তিপীঠ নবদ্বীপে অবতীর্ণ নবদ্বীপচন্দ্রের স্তব—

স্তমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-

দ্রুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্ ।

বিশুদ্ধ-স্বপ্রেমোন্মাদ-মধুর-পীযুষলহরীং

প্রদাতুং চান্ধেভ্যঃ পরপদনবদ্বীপপ্রকটম্ ॥ ৮৫ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন আপনাকে স্বীয় স্বর্বিমল প্রেমসিক্সসুখিত হর্ষাদি
মধুর অমৃতলহরী আস্বাদন করাইবার এবং অপরকে দিতরণ করিবার জ্ঞ
যিনি নবধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ “নীনবদ্বীপ”-নামক পরমধামে অবতীর্ণ
হইয়াছেন, সেই সর্বাবতার শ্রেষ্ঠ, অপরিমীম ও অত্যদ্রুত কারুণ্যের বিগ্রহ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধেয় পুরুষকে আমরা স্তব করি ॥ ৮৫ ॥

যোষিৎসঙ্গ, স্বর্গকাম, বহুগ্রন্থকলাভ্যাসাদি বজ্জনপূর্ব্বক একমাত্র

নবদ্বীপচন্দ্রের চরণাশ্রয়ই কৃতিত্বের পরিচায়ক—

অলং শাস্ত্রাভ্যাসৈরলমহহ তীখাটনিকর্য্য

সদা যোষিদ্ভ্যাত্মাস্রুত বিতথাং থুংকুরু দিবম্ ।

তৃণম্মন্থা ধন্যাঃ শ্রয়ত কিল সন্ন্যাসিকপটং

নবদ্বীপে গৌরং নিজরসমদাং গাঙ্গপুলিনে ॥ ৮৬ ॥

বাঘিনী কামিনীসঙ্গ হইতে সর্বদা সাবধান হও ; তৃণতুচ্ছ জ্ঞান করিয়া
(কালবিপ্লুত) স্বর্গপদে খুংকার প্রদান কর, রাশি রাশি শাস্ত্রানুশীলনে
কি প্রয়োজন ?—তাহাও ত্যাগ কর ; আর তীর্থপর্যটনেই বা কি লাভ ?—
তাহা হইতেও বিরত হও । (ঐ দেখ) সন্ন্যাস-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরাজ
শ্রীনবদ্বীপে ভাগীরথীর উপকূলে স্থায় কৃষ্ণস্বরূপের প্রেমোন্মাদে মত্ত । হে
ভাগ্যবান্ ভক্তমণ্ডলি, (যাও, যাও,) তোমরা তাঁহারই শ্রীচরণে আশ্রয়
গ্রহণ কর ॥ ৮৬ ॥

অনর্থসাগর হইতে মুক্ত হইয়া প্রেমসমুদ্রে বিহারেচ্ছ পুরুষের

শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবাই একমাত্র কৃত্য—

সংসারসিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্রাৎ

সঙ্কীৰ্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ ।

প্রেমাস্বোধে বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-

মায়াপুরাখ্যনগরে বসতিং কুরুষ ॥ ৮৭ ॥

যদি তোমার সংসার-সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে, যদি
সঙ্কীৰ্ত্তনামৃত-রস-মাধুর্য্যাস্বাদনের ইচ্ছা হয়, যদি প্রেমসমুদ্রে বিহারার্থ চিত্তবৃত্তি
হইয়া থাকে তাহা হইলে শ্রীমায়াপুর-নামক নগরে গিয়া বসতি কর ॥ ৮৭ ॥

নিত্যকাল নবদ্বীপে নবদ্বীপচন্দ্রের লীলা-দর্শনসৌভাগ্য-লালসা—

সৈবেয়ং ভুবি ধন্যগৌড়নগরী গঙ্গাপি তন্মধ্যগা

জীবাশ্তে চ বসন্তি যেহত্র কৃতিনো গৌরাজপাদাশ্রিতাঃ ।

নো কুত্ৰাপি নিরীক্ষ্যতে হরিহরি প্রেমোৎসবস্তাদৃশো

হা চৈতত্ত্ব ! কৃপানিধান ! তব কিং বীক্ষ্যে সদা বৈভবম্ ॥ ৮৮ ॥

এই সেই ধন্য গৌড়নগরী (এখনও) পৃথিবীতে বর্তমান রহিয়াছেন,
সেই ভাগীরথীও তাঁহার মধ্য দিয়াই প্রবাহিতা হইতেছেন, শ্রীগৌরাজদেবের
চরণাশ্রয়ে ঝাঁহারা ধত্ব হইয়াছেন, সে সকল জীবও এখানে বাস করিতেছেন ;
কিন্তু হরি, হরি ! কোথায়ও ত' তাদৃশ প্রেমোৎসব দৃষ্ট হইতেছে না । হা
চৈতত্ত্ব ! হা কৃপানিধান ! তোমার সেই বৈভব কি নিত্যকাল দর্শন করিতে
পারিব (অর্থাৎ “অত্ৰাপিও সেই লীলা করে গৌররায় । কোন কোন
ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥”—এই বাক্যানুসারে তোমার অপ্রাকৃত লীলা
নিত্যকাল দর্শন করিবার সৌভাগ্য কি আমার হইবে) ? ৮৮ ॥

দর্শন-স্পর্শনাদিমাতে পরমপ্রেমদ তদ্রূপবৈভব নবদ্বীপের স্তব—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীৰ্ত্তি তঃ সংস্মৃতো বা

দূরৈশ্চরপ্যানতো বাদৃতো বা ।

প্রেমঃ সারং দাতুমীশো য এক-

শিচদ্রুপং তং গৌরপীঠং নমামি ॥ ৮৯ ॥

যিনি দর্শন, স্পর্শন, কীর্ত্তন, সম্যগ্রূপে স্মরণ করিয়া অথবা দূরস্থিত ব্যক্তি-
গণের নমস্কার কিম্বা আদরের বিষয়ীভূত হইয়াও প্রেমদার (বিপ্রলম্বরস)
প্রদানে একমাত্র সমর্থ, সেই চিৎস্বরূপ শ্রীগৌরধামকে আমি নমস্কার
করি ॥ ৮৯ ॥

ধর্ম্যকৃৎ, তীর্থভ্রামী বা বেদপারগেরও গৌরধামসেবা ব্যতীত বেদশূন্য

ব্রজতত্ত্বের উপলব্ধি অসম্ভব—

আচর্য্য ধর্ম্যান্ পরিচর্য্য দেবান্

বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্ ।

বিনা ন গৌরপ্রিয়ধামবাসং

বেদাদি ছুপ্রাপ্যপদং বিদন্তি ॥ ৯০ ॥

বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্য-পরিপালন, রাম-নারায়ণ নৃসিংহাদি বিষ্ণুতত্ত্ব-দেবগণের
প্রকৃষ্টরূপে অর্চন, শত শত তীর্থ পরিভ্রমণ এবং নিখিল-বেদশাস্ত্রবিচার প্রভৃতি
করিয়াও শ্রীগৌরপ্রিয় শ্রীধাম নবদ্বীপে বসতি সেবাব্যতীত কেহই
বেদাদির ছল্ভপদ (শ্রীরাধাগোবিন্দের চিহ্নিলাস (ক্ষেত্র শ্রীধাম বৃন্দাবনের
সন্ধান) জানিতে পারেন না ॥ ৯০ ॥

কায়িক, বাচিক ও মানসিক বুদ্ধিজ যাবতীয় সদগুণগ্রাম

গৌরসেবাফলেই লভ্য—

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুন্ধাকৃতিঃ

সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধথুথুংকৃতিঃ ।

হরিপ্রণয়বিহবলা কিমপি ধীরমালম্বিতা

ভবন্তি কিল সদগুণা জগতি গৌরধামার্চনে ॥ ৯১ ॥

তৃণ অপেক্ষাও স্তনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত অভিমানশূন্যতা, স্বাভাবিকী স্নিগ্ধ-
কমনীয়-মূর্ত্তি, অমৃতের তায় মধুরভাষিতা, কৃষ্ণচেতনসম্বন্ধ-রহিত বিষয়গন্ধে

খুখুংকারিতা, হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহুজ্ঞানশূন্যতা—এই সকল সদৃশ জগতে একমাত্র শ্রীগৌরধামসেবাকালেই লাভ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

গৌরধামসেবা-ব্যতীত অত্র কোটি সাধন-ভজনেও সত্ত

নিগূঢ়প্রেম-সম্পত্তি-লাভ অসম্ভব—

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যাকোটি-

রধীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটিঃ ।

চৈতন্যচন্দ্রস্য পুরোঃসুকানাং

সত্তঃ পরং স্যাদ্ধি রহস্যলাভঃ । ১২ ॥

(গৌরপাদপদ্ম-অনাশ্রিত) কোটিসংখ্যক শ্রেষ্ঠ গুরুর আশ্রয়গ্রহণ করুক, অথবা (আগম-নিগমাদি) কোটি-কোটি-শ্রুতিশাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক, (তাহাতে নিগূঢ় প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই); কিন্তু শ্রীগৌরধাম-সেবোৎসুকব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই সত্ত (সেই) নিগূঢ় প্রেমপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

কলিকালে গৌরধামের কৃপা ব্যতীত শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবেশ অসম্ভব—

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ

শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ ।

হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি

চৈতন্যপীঠ যদি নাহ্য কৃপাং করোষি ॥ ১৩ ॥

কাল কলি; ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুসকল অত্যন্ত বলবান্ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কর্মজ্ঞানাদি কোটিকণ্টক-জালে আবদ্ধ। অতএব হে চৈতন্যপীঠ শ্রীনবদ্বীপ, তুমি যদি আজ আমাকে কৃপা না কর, তাহা হইলে হায়! এই অবস্থায় বিহ্বল আমি কি করি, কোথায় যাই? ১৩ ॥

কলিযুগে বিপন্ন দুষ্কৃত ব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয়দাতা গৌরধাম—

দুষ্কর্মকোটিনিরতস্য দুঃস্বপ্নোর-

দুর্ব্বাসনানিগড়শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ম্ ।

ক্লিশ্যন্মতেঃ কুমতিকোটি কদর্থিতস্য

গৌড়ং বিনাশ্র মম কো ভবিতোহ বন্ধুঃ ॥ ১৪ ॥

আমি কোটি কোটি দুষ্কর্মে একান্ত আসক্ত, দুর্দম দারুণ-দুর্ব্বাসনা-শৃঙ্খলে স্ফুট আবদ্ধ, কর্মজ্ঞানাদি প্রয়াসজনিত ক্লেশে কাতরচিত্ত এবং

কোটি কোটি কুবুদ্ধিজন-দ্বারা বিপরীত পথে পরিচালিত হইয়া অভিভূত ;
(এমত অবস্থায় শ্রীগৌর-প্রকটস্থলী) শ্রীগৌড় (নবদ্বীপ) ব্যতীত
আর কে আজ এই সংসারে আমার (মত বিপনের) বন্ধু অর্থাৎ আশ্রয়দাতা
হইবেন ? ৯৪ ॥

অযোগ্য ব্যক্তিও সর্বাভীষ্টপ্রদ গৌরধামাশ্রয়ফলে প্রেমসম্পত্তিলাভে

অধিকারী—

হা হন্ত ! চিত্তভূবি মে পরমোষরায়াং

সন্ততিকল্পলতিকাক্ষুরিতা কথং স্যাৎ ।

হৃদ্যেকমেব পরমাশ্বসনীয়মস্তি

গৌরান্ধধাম নিবসনু ন কদাপি শোচ্যঃ ॥ ৯৫ ॥

হায় ! হায় ! আমার এই অত্যন্ত উষর হৃদয় ক্ষেত্রে প্রেমভক্তি-
কল্পলতিকার অক্ষুর অর্থাৎ স্থায়িত্ব বা রতি কি প্রকারে হইবে ? আশা
হয় না, তবে একমাত্র পরমভরসা এই যে, গৌরধামে বাস করিলে
কাহারও কখনও কোনও শোকের বিষয় থাকে না ॥ ৯৫ ॥

বিপন্ন ও নিরাশ্রয়ের একমাত্র পরম-আশ্রয় গৌরধাম—

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-

ক্রোধাদিনক্র-মকরৈঃ কবলীকৃতস্য ।

দুর্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য

গৌরান্ধপীঠ ! মম দেহি কৃপাবলম্বম্ ॥ ৯৬ ॥

আমি সংসার-দুঃখার্গবে পতিত, দুর্বাসনার দৃঢ় শৃঙ্খলে আমার হস্তপদাদি
বদ্ধ, আমি অবলম্বনহীন ; কামক্রোধাদি নক্র-মকরসমূহ আমাকে গ্রাস
করিয়াছে ; (আমার এরূপ সঙ্কটে) হে গৌরধাম, কৃপাপূর্বক আশ্রয়
প্রদান করিয়া আমাকে রক্ষা কর ॥ ৯৬ ॥

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তিপীঠ শ্রীনবদ্বীপের মাহাত্ম্য—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া

মহাপ্রেমানন্দোজ্জলরসবপুঃ প্রোতুরভবৎ ।

নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে

মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধ্যানি রমতে ॥ ৯৭ ॥

গলিতকাঞ্চনের ন্যায় গৌরকান্তি, মহাভাবরূপ শৃঙ্গাররস-বিগ্রহ
লীলাময় কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং যথায় আবিভূত হইয়াছেন, যথায় প্রত্যেক
ভবন প্রেমভক্তিদেবীর উৎসবে পূর্ণ, যাহা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও অধিক মাধুর্য্যময়,
সেই নবদ্বীপধামে আমার মন বিহার করিতেছে ॥ ৯৭ ॥

নবদ্বীপান্তর্গত ব্রজবনে বিপ্রলভ্যভাবোথ যুগল-লীলাস্বরণ-লালসা—

নবদ্বীপৈকাংশে কৃতনিবসতিঃ শান্তহৃদয়ঃ

শচীসুনোভাবোথিত-যুগললীলাম্ ব্রজবনে ।

স্বরন্ যামে যামে স্বসমুচিতসেবা-সুখময়ঃ

কদা বৃন্দারণ্যং সকলমপি পশ্যামি সরসম্ ॥ ৯৮ ॥

কবে আমি শান্তমনে নবদ্বীপের একপ্রান্তে ব্রজবনে বাস করিয়া
শ্রীশচীনন্দনের ভাবোথিত (বিপ্রলভ্যভাবোথিত) যুগললীলাবলী প্রতি প্রহরে
স্বরণ করিতে করিতে আশ্রোচিত সেবায় সুখপূর্ণ হইয়া সমস্ত বৃন্দাবনকে
রসপূর্ণ অবলোকন করিব ? ৯৮ ॥

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতচক্রে চিন্ময় যোগপীঠ দর্শন-লালসা—

কদা ভ্রামং ভ্রামং লসদলকনন্দা-তট-ভূবি

জগন্নাথাবাসং জগদতুলদৃশ্যং ত্য্যতিময়ম্ ।

পরানন্দং সচ্চিদ্ব্যনস্করুচিরং তুল্লভতরং

শচীসুনোঃ স্থানং পুলিনভূবি পশ্যামি সহসা ॥ ৯৯ ॥

কবে আমি শোভমান্ গাঙ্গপুলিনে বিচরণ করিতে করিতে জগতে
অতুলনীয় দৃশ্য, দীপ্তিশালী, পরমানন্দময়, সচ্চিদ্ব্যন অর্থাৎ চিচ্ছক্তির
সন্ধিনী-প্রভাব-প্রকটে চিন্ময়ধাম, পরম মনোরম, তুল্লভ হইতেও তুল্লভতর
শ্রীজগন্নাথমিশ্রভবন শ্রীশচীনন্দনের স্থান (গৌরপ্রকটস্থলী বা যোগপীঠ),
গঙ্গাতীর-ভূমিতে সহসা অবলোকন করিব ? ৯৯ ॥

শ্রীনবদ্বীপবাসী, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামীরা হায়, কাশীবাস-গয়াধামাধেষণ

প্রভৃতি তুচ্ছাভিলাষশূন্য—

কাশীবাসিনোহপি ন গণয়ে কিং গয়াং মার্গয়ামো

মুক্তিঃ শুভীভবতি যদি মে কঃ পরার্থপ্রসঙ্গঃ ।

ত্রাসাভাসঃ স্মুরতি ন মহারোরবেহপি ক ভীতিঃ

শ্রীপুত্রাদৌ যদি ভবতি মে গোক্রমাদৌ নিবাসঃ ॥ ১০০ ॥

যদি আমার শ্রীগৌড়মপ্রমুখ শ্রীনবদ্বীপধামে বাস হয়, তাহা হইলে আমি কাশীবাসিদিগকেও গণনা করি না, গয়াধাম অন্বেষণইবা কি জন্য করিব? যদি মুক্তিই আমার নিকট গুণ্ডিতুল্য প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মার্থ-কাম—এই ত্রিবর্গের আর কথা কি? আর মহারৌরবেও যদি লেশমাত্র ভয় উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে শ্রীপুত্রাদি বিষয়েই বা ভীতি কোথায়? ১০০ ॥

সুরেশ্বরগণেরও তুল্লভ, বেদগুহ মহাপ্রেমলাভার্থ

গৌরধামাশ্রয়ের কর্তব্যতা—

অরে মুঢ়া গুঢ়াং বিচিন্ত্য হরেভক্তিপদবীং

দবীয়ন্ত্য দৃষ্ট্যাপ্যপরিচিতপূর্বাং মুনিগণৈঃ ।

ন বিশ্রান্ত্যশিঙ্তে যদি যদি চ দৌলভ্যমিব তং

পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজত শরণং গৌরনগরম্ ॥ ১০১ ॥

অরে মুঢ়গণ, মুনিগণ দূরদৃষ্টি-দ্বারাও পূর্বে ষাঁহার পরিচয় লাভ করিতে পারেন নাই সেই নিগূঢ়া হরিভক্তিপদবী অনুসন্ধান কর। যদি চিতে বিশ্বাস না হয়, আর যদি উহা তুল্লভ বলিয়াই মনে হয়, সেই সকল (মনোধর্ম্ম) সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরনগর শ্রীনবদ্বীপধামের শরণ গ্রহণ কর ॥ ১০১ ॥

উপসংহারে গ্রন্থকারের বক্তব্য : শ্রীনবদ্বীপধামই ঔদার্য্যলীলাভূমি—

ধাম্মোরভেদাচ্ছতকং পৃথক্ পৃথক্

কুত্বাপি ভাষাসমতা সমীহিতা ।

গৌরান্ধধাম্মো মহিমা বিশেষতঃ

অত্রৈব বাণী বিহিতা কচিৎ পৃথক্ ॥ ১০২ ॥

শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবনধামের অভেদত্ব-হেতু তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ শতক লিখিলেও ভাষার সামঞ্জস্য অতীতপিত বুঝিতে হইবে; কিন্তু (ঔদার্য্যলীলাভূমি) নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য বিশেষ থাকায় কোন কোন স্থানে পৃথক্ভাবেও বাক্যবিন্যাস করা হইয়াছে ॥ ১০২ ॥

সমাপ্তম্

সূত্র-বিবেচন

গ্রাম্য বাস্তবই পাঠ করিতে আমাদের অভ্যাস বা সময় না থাকিলেও অপরের প্রয়োজন মত আমরা মাঝে মাঝে গ্রাম্য সাহিত্য ও বিলাসী সামাজিকগণের কথা সমাজ-কল্যাণের জন্য বাধ্য হইয়া আলোচনা করি। গ্রাম্য সাহিত্যসম্বন্ধ বা বৃথা প্রজন্মী সাহিত্যিকগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ঘৃণিত কথার সহিত আমাদের মিশিতে যাওয়া উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। কেহ বালিতে পারেন, ইহাতে আপনাদের তৃণাদপি-স্নানীভ ভাব ও তরুর ত্রায় সহগুণসম্পন্ন হওয়ার ব্যাঘাত করে; কিন্তু আমরা কৈদিক সনাতনধর্মের প্রচারকস্বত্রে আত্মধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের উপর অনভিজ্ঞের বিদ্রূপ ও ন্যূনাধিক কটাক্ষের প্রশ্রয় দিতে পারি না। যেখানে ফাজলাম ও বিদ্রূপ মানবকে পৈশাচিক-বিলাসে প্রমত্ত করায়, সেই সকল কথা আলোচনা করিতে গেলে লোক আমাদেরকে বলে,—“নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেমে”—এই নীতি আপনারা স্বীকার করেন না কেন? ‘পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়’ এ কথা ত আপনারা জানেন, তাহা হইলে একরূপ স্ফুচ্চস্বাধীন হইয়া অসন্তোষ ও অসমালোচ্য-জনগণের মায়িক বিলাস প্রতিরোধ করিতে নিরস্ত হওয়াই ভাল। তদুত্তরে আমরা বলি, আদার ব্যাপারিগণ যখন জাহাজের খবর রাখেন না, তখন নিজের আধুলি পূঁজি লইয়া বড় সওদাগরের কথার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহাদের না করাই ভাল।

আর পিপীলিকার ত্রায় শক্তি লইয়া হস্তীর পদতলে পেষিত হইতে যাওয়া অসদৃশ। গ্রাম্য সাহিত্য বা গ্রাম্য সমাজহিতৈষণগণের গ্রাম্য কথার সহিত প্রকৃতির অতীত অপৌরুষেয় সত্যপ্রণকারী সামাজিকগণের ব্যবহার আলোচনা করিতে যাওয়া অসীম সাহস ও ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র।

সম্প্রতি “ভারতবর্ষ” নামক একখানি গ্রাম্য সাহিত্যিক সাময়িক পত্রে ‘অকাল মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ’ নামক একটি প্রবন্ধসম্বন্ধে কোনও অদ্বৈয় বন্ধু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাহার একটি সমালোচনা প্রকাশ করিতে বলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের গ্রাম্য রাসিকগণের সহিত চেষ্টা করিয়া সম্ভাষণ করিতে নাই, কিন্তু এম্মত্রে আমরাও সেই বন্ধুকে ‘গ্রাম্য প্রবন্ধ লেখক উপেক্ষণীয়’—বলিয়া দিয়াছিলাম। পরে অপর এক বন্ধু আমাদের নিকট একখানা বৈশাখ মাসের “ভারতবর্ষ” দিয়া প্রবন্ধের লিখিত-

বাক্য পাঠ ও সমালোচনা করিতে অনুরোধ করেন। তৃতীয় বন্ধু পুনরায় ঐ কথা বলায় আমরা বারবার বন্ধুবর্গের বাক্য পরিহার করিয়াও বাধ্য হইয়া ৩৭ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা লিখিতেছি। বিশেষতঃ আত্মবিদ্গণের উপর অযথা আক্রমণ শ্রবণ করিয়া বেদশাস্ত্রানুসারে আমাদিগের তিনটি প্রবৃত্তির যে কোনও একটি গ্রহণ করা আবশ্যিক। ভক্তবিদ্বেষী জড়েন্দ্রিয়পর প্রমত্ত ব্যক্তির জিহ্বা ছেদন করাইলে বিদ্বেশীর প্রতি কৃপা করা হয়। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ শ্রবণ করিয়া নিজ প্রাণ পরিহার করা অথবা চিরদিনের জন্ত ঈশ্বরবিশ্বাস রহিত হইয়া নাস্তিক হইয়া যাওয়া। দ্বিতীয় পন্থার প্রথমাংশ আত্মহত্যা, তাহা নিতান্ত ঘৃণ্য। দ্বিতীয়াংশ তদপেক্ষা ঘৃণ্য। প্রথম পন্থার প্রথমাংশে হিংসার পরিচয় আছে, সেই হিংসা সাধারণ-জ্ঞান নহে অর্থাৎ মুখ্যকৈ ভবিষ্যতে বৈষ্ণব-বিদ্বেষের বাক্য উচ্চারণ করিতে বাধ্য দেওয়া; অথবা রাজদ্বারে প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া সমাজের বাসায়োপ্য বিদ্বেষীকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা। তৃতীয় পন্থা এই যে, স্থান পরিত্যাগ করা। এই তিনটি পন্থা অবলম্বন করিলেই প্রকৃত আত্মবিশ্ব ইন্দ্রিয়পরায়ণ গ্রাম্য রসপর সাহিত্যিকের কুহক হইতে ও কপট সমাজহিংসার পরিবর্তন-শীলতারূপ অক্ষজ্ঞান হইতে রক্ষা পান। এই জন্তই দুঃশঙ্গ পরিবর্তনীয়।

যেখানে মহতের নিন্দা হয় ব্যক্তিবিশেষ সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু আত্মবিশ্ব জীবে দয়াবিশিষ্ট বলিয়া বিবৃৎমুখ্য-সমাজের হিতার্থে সত্য উপস্থাপিত করাও স্বধর্ম বলিয়া জানেন। খৃষ্টীয় সম্রদাদ্যের দশটি আজ্ঞার মধ্যেও পাশ্চাত্য দেশে সত্যের মর্যাদা স্থাপিত হইয়াছে, এমন কি মিথ্যাবাদীর শাস্তি ভারতীয় দণ্ডবিধান আইনের মধ্যেও স্থান পাইয়াছে। মুখলোকের বিষয়রোধের অভাবহেতু অথবা আইন বা বিধির অনভিজ্ঞানবশতঃ পাপীকে প্রায়শ্চিত্ত হইতে অবসর দেয় না। আমি আইন জানি না বলিলেই অথবা সর্পকর্তৃক দষ্ট হওয়ার পর উহা সর্প নহে বিবেচনা করিয়া বসিয়া থাকিলে দেশবিধি বা আইন অথবা সর্পবিষ আমাকে কল্ল-ফলভোগ হইতে অবসর দিবে না। আমি দেখিতে ভুল করিয়াছি যে আমি মুখ—এই কথা বলিয়া অহুতাপ করিলে বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর ব্যক্তিগত দোষ হ্রাস হয় বটে, কিন্তু তাহার অমুষ্টিত পাপাচরণ বা অসত্যপক্ষাশ্রয় জগতের অনেক অন্তত উৎপন্ন করে। সেজন্ত পাপকর্তা ও সাধারণ-লোকের

ভাবী পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার সুযোগ প্রদান সাধুর কর্তব্য। অনায়াসে অনেকে সরল অন্তঃকরণে বলিতে পারেন যে, কুকুরগণ না বুঝিয়া ঘেউ ঘেউ করুক; তাহাতে আপনাদের গাভীর্য্যের অভাব হইবে কেন? আপনারা বৈষ্ণব, স্তবরাং সহিষ্ণু। তদন্তরে আমরা বলি, বৈষ্ণব হইতে না পারায় অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছি। বৈষ্ণবগণই একমাত্র সহিষ্ণু, এ কথা আমরা জানি এবং সেই সহিষ্ণু বৈষ্ণবগণের পাদত্ৰাণবাহী হইয়া আমরা জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিতে ইচ্ছা করি। যেখানে বৈষ্ণবের জুতা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে পাদত্ৰাণ-বিহীন করিবার চেষ্টা, সেই খণ্ডম্ অপহরণকারীর হস্ত হইতে তাহাকে সমুচিত শিক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে হইবে। এই কাড়িয়া-লওয়া-সেবাই অসংখ্য যুক্তির বিরুদ্ধে বৈষ্ণবপূজা। যদিও দ্বাপরযুগ অতীত হইয়াছে এবং সেই যুগের পরিচর্যাাদি অংশুশীলন কালযুগে ফলবান নহে, তথাপি শত শত জন্ম বৈষ্ণবার্চনফলে আমরাও একদিন ভরভজনকারিগণের নিত্যজুতাবরদার হইব। মহাজন বলিয়াছেন—

কর্মাণ্যবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্ঞানাবলম্বকাঃ ।

বয়স্ত হরিদাসানাং পাদত্ৰাণাবলম্বকাঃ ॥

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রস্তোতঃ

(অবতার-তত্ত্ব)

১। অবতার-তত্ত্ব কি? ভগবান্ কেন জগতে অবতীর্ণ হন?

“মায়াবদ্ধ জীব যে-যে-ভাবে প্রাপ্ত হইয়া যে-যে-স্বরূপ পাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রাপ্ত্যাব শ্রীকার করত নিজ-অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। জীব যখন মৎস্তাবস্থা প্রাপ্ত, ভগবান্ও তখন মৎস্তাবতার। মৎস্ত-নির্দিগু, নির্দিগুতা ক্রমশঃ বজ্রদণ্ডাবস্থা হইলে কুর্মাভতার, বজ্রদণ্ড ক্রমশঃ মেরুদণ্ড হইলে বরাহাবতার হন। নর-পণ্ড্যাব-গত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্র-মানবে বামনাবতার, মানবের অসম্প্রাপ্ত্যবস্থায়—পরশুরাম এবং সভ্যাবস্থায়—রামচন্দ্র। মানবের সর্ব্ব-বিজ্ঞানসম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আবিভূত হন। মানব তর্কিষ্ঠ

হইলে ভগবন্তাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কল্কি—এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। জীবের ক্রমোন্নত-হৃদয়ে যে সকল ভগবন্তাবের উদয় কালে-কালে দৃষ্ট হইয়াছে, সে-সকলই ‘অবতার’। সেই সকল ভাবের উৎপত্তি ও কার্যসকলে প্রাপঞ্চিকত্ব নাই। ঋষিরা জী-গণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করত ঐতিহাসিক কালকে দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে-যে সময়ে একটা একটা অবস্থান্তর লক্ষণ রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নত ভাবকে ‘অবতার’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতেরা কালকে চব্বিশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—কেহ কেহ অষ্টাদশ ভাগ করিয়া তৎসংখ্যক অবতার নিরূপণ করিয়াছেন।” কৃ: সং ৩।৫-১১ অনুবাদ

২। অবতার-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিচার কি ?

“অদণ্ডাবস্থা হইতে মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা পর্য্যন্ত কোন কোন মহর্ষি অষ্ট, কেহ কেহ অষ্টাদশ এবং কেহ কেহ চতুর্বিংশতি অবতার লক্ষ্য করেন। দশটা অবতারই প্রায় অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ঋষিদিগের প্রসিদ্ধ মত। ঐ সকল ঋষি জীবের প্রথম বদ্ধাবস্থায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দশটা বিশেষ বিশেষ অবস্থার কল্পনা করেন। প্রথম—অদণ্ডাবস্থা, দ্বিতীয়ে—বজ্রদণ্ডাবস্থা, তৃতীয়ে—মেরুদণ্ডাবস্থা, চতুর্থ—উখিত-মেরুদণ্ডাবস্থা অর্থাৎ নরা-পশু-অবস্থা, পঞ্চমে—ক্ষুদ্র নরাবস্থা, ষষ্ঠে—অসভ্য নরাবস্থা, সপ্তমে—সভ্য নরাবস্থা, অষ্টমে—জ্ঞানাবস্থা, নবমে—অতিজ্ঞানাবস্থা এবং দশমে—প্রলয়াবস্থা। জীবের এই প্রকার ঐতিহাসিক অবস্থাক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি—এই দশটা অবতার অপ্রাকত-লীলারূপে লক্ষিত হয়।” —ত: সূ:, ৬সূ:

৩। আত্মাবতারের লীলা কি ?

সৃষ্টিকামযুক্ত সঙ্ঘর্ষণই প্রপঞ্চোৎপাদনোন্মুখ কৃষ্ণাংশ; তিনি কারণবারিতে আত্মাবতার-পুরুষরূপে শয়ন করত মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। সেই ঈক্ষণই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ।” —ব্র: সং ৫।৮

৪। ভগবদাবির্ভাবের কারণ কি ?

“ঈশ্বরের বিলাস দুই প্রকার, * * * চিদচিদাত্মক ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি ও অলজ্য নিয়ম-সকলের দ্বারা জগতের ব্যবস্থা-করণই তাঁহার একপ্রকার বিলাস। শুদ্ধ-জ্ঞানীরা এই প্রকার বিলাস যৎকিঞ্চিং অনুভব করিতে পারেন। এই

রচিত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে লীলা, তাহাই অল্পপ্রকার বিলাস। জীবই ভগবানের লীলার সহচর। জীব ভোগেচ্ছা-পূর্বক নিজ-স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া জড়সঙ্গ-বশতঃ যে-যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই সেই অবস্থায় তদনুরূপ ভগবদাবির্ভাবও দৃষ্টি করেন। জীবের প্রতি অপার কারুণ্যই ভগবদাবির্ভাবের একমাত্র কারণ।”

—তঃ সঃ, ৬মঃ

৫। শ্রীমূর্ত্তি বা অর্চ্যাবতারের প্রয়োজনীয়তা কি?

“সমস্ত নিরাকার তত্ত্বেরই নিদর্শন আছে। নিদর্শন যদিও লক্ষিত বস্তু হইতে ভিন্ন বটে, তথাপি তদ্বারা তদ্বস্তুর ভাব উপস্থিত হয়। ঘটিকা-যন্ত্র দ্বারা নিরাকার কাল, প্রবন্ধ দ্বারা অতিসূক্ষ্ম জ্ঞান এবং প্রতিকৃতি দ্বারা দয়া-ধর্ম্মাদি নিরাকার বিষয়সকল যখন পরিজ্ঞাত হইতেছে, তখন ভক্তি-সাধনে আলোচ্যগত লিঙ্গরূপ শ্রীবিগ্রহ দ্বারা যে উপকার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

—প্রঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

৬। বৈষ্ণবের শ্রীমূর্ত্তি-সেবা কি পৌত্তলিকতা?

“বৈষ্ণবেরা যে শ্রীবিগ্রহ পূজা করেন, সে দৈশরাতিরিক্ত একটা পুত্তলিকা নয়, কিন্তু দৈশ্বর-ভক্তির উদ্বীপক ও নিদর্শন মাত্র।”

—প্রঃ প্রঃ, ৫ম প্রঃ

৭। শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন কিরূপে?

“শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই স্বরূপেতর বস্তু হইতে পারেন না। সমস্ত শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহও সেইরূপ জড়চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎস্বরূপের প্রতিভূস্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎস্বরূপ প্রতিভূ যে যথাবথ, তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধ ভক্তি-বুদ্ধিরূপ ফল দ্বারা অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎ-পদার্থের সহিত বিদ্যুৎযন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিদ্যুৎ-ফলকোৎপাদনরূপ ফলের দ্বারাই লক্ষিত হয়। তদ্বিশেষে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুৎযন্ত্র দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে।”

—চঃ শিঃ ৫৩

৮। ভক্তগণের অর্চ্যাবতাবে ও জ্ঞানিগণের প্রতীকে পার্থক্য কি?

“শ্রীমূর্ত্তি প্রথমে জীবের চিত্তিভাগে প্রতিভাত হইয়া মনে উদ্ভিত হন। মন হইতে নিঃসৃত শ্রীমূর্ত্তিতে ভক্তিযোগে তাহা আবির্ভূত হইয়া পড়েন। তখন ভক্ত তদর্শনে হৃদয়ে যে চিন্ময়-মূর্ত্তি দেখেন, তাহার সহিত শ্রীমূর্ত্তির একতা করিয়া থাকেন। জ্ঞানবাদিদিগের পূজিত বিগ্রহ সেরূপ নয়; তাহাদের

মতে—একটি পার্থিব-তত্ত্বে ব্রহ্মতা কল্পিত হইয়া পূজাকাল পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকে ; পরে সেই মূর্তি পার্থিব বস্তু বই আর কিছু নয়।” —জৈঃ ধঃ, ৫ম অঃ

৯। সকল অধিকারীই কি শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন ?

“প্রতিমা-পূজা মানব-ধর্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূত-চিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময়-মূর্তির ভাবনা করেন। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে যখন তত্ত্ব-চিত্ত জড়-জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখনই জড়জগতে সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। ভগবৎ-শ্রীমূর্তি এইরূপে মহাজন কর্তৃক প্রতিকলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্বদাই চিন্ময়-বিগ্রহ। মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময় বিগ্রহ হইলেও ক্রমশঃ ভাবশোধিত বুদ্ধিতে চিন্ময়-বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষেই শ্রীবিগ্রহের প্রতিমা ভজনীয়। কল্পিত মূর্তির পূজার কোন আবশ্যকতা নাই কিন্তু নিত্যমূর্তির প্রতিমা বিশেষ মঙ্গলময়।”

—জৈঃ ধঃ, ১১শ অঃ

১০। প্রতীক-বিরোধী যুক্তিাদিগণ মূর্তি-পূজক কিরূপে ?

“কেহ কেহ চিত্তে ভক্তি-পরিপ্লুত হইয়া আত্মায়, মনে ও জগতে পরমেশ্বরের প্রতিচ্ছবিরূপ শ্রীমূর্তি সংস্থাপন করেন। তাহাতে তাদাত্ম্য-বোধে অর্চন সম্পন্ন করেন। কোন কোন ধর্মে অধিকতর তর্কপ্রিয়তা-নিবন্ধন মনে মনেই একটি দীক্ষা-ভাব গঠিত করিয়া তাহাতেই উপাসনা করেন, প্রতিমূর্তির স্বীকার নাই। কিন্তু বস্তুতঃ সকলই প্রতিমূর্তি।” —চৈঃ শিঃ ১।১

১১। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে কি বিচারে দর্শন করেন ?

“The system of Jagannath is viewed in two different ways. The superstitious and the ignorant take it as a system of idolatry by worshipping the idols in the temple as God Almighty appearing in the shape of a carved wood for the salvation of the Orias. But the Saragrahi Vaishnavas find the idols as emblems of some eternal truth which has been explained in the Vedanta Sutras of Vyasa.” (ক্রমশঃ)

= The Temple of Jagannath at Puri

--জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতক

[শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ বিরচিত “নবদ্বীপ শতক”-

এর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত পদ্যানুবাদ]

(পূর্বপ্রকাশিত ১৬শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, ৩৭৩ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীগোক্রমচন্দ্র-লীলা অনন্ত অপার ।

গৌরস্থলে চিহ্নিহার নমি বার বার ॥

গৌরপদাপ্রিতগণে করি নমস্কার ।

নমি সদা গৌরচন্দ্র করুণাবতার ॥ ৮৩ ॥

ওহে বিশ্বস্তর ! ওহে মহারসময় !

প্রেমসম্পদের মণি ! ওহে দয়াময় !!

ওহে পদ্মাবতীসুত দয়াদ্রুহদয় ।

পতিত জনের নাথ গৌরভক্তিময় ॥

ওহে গীতানাথ, চরাচরের ঈশ্বর ।

গৌর আনিবারে মাত্র তুমি শক্তিধর ॥

ওহে গদাধর, ওহে শ্রীবাসাদিগণ ।

তুমি সব মম গতি আমি অকিঞ্চন ॥ ৮৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণরসন লাগি' চৈতন্য আকার ।

পরম অদ্ভুত উদারতাপূর্ণ সার ॥

স্বীয় প্রেমামৃত জীবে দিব মনে করি ।

পরপদ নবদ্বীপে প্রকটিল হরি ॥

ঔদার্যের খনি সেই শচীর কুমার ।

তঁাহার চরণে আমি নমি বার বার ॥ ৮৫ ॥

শাস্ত্রাভ্যাস, তীর্থাটন-চেষ্টা পরিহরি ।

ষোড়ষদ্ব্যাহ্র ত্যজ, স্বর্গ ছাড় ঘৃণা করি ॥

দীনভাবে ভজ বিশ্বস্তরের চরণ ।

নবদ্বীপে রস যেই কৈল বিতরণ ॥ ৮৬ ॥

ভরিতে সংসারসিন্ধু যদি বাঞ্ছা তব ।

সংকীর্ণনামৃতাস্বাদে থাকে ইচ্ছা লব ॥

বাঞ্ছা যদি থাকে প্রেমসমুদ্র-বিহারে ।

মায়াপুরে কর বাস জাহ্নবীর তীরে ॥ ৮৭ ॥

শ্রীগৌড়নগরী ধন্ত, ধন্তা গঙ্গা তথা ।

ধন্ত সে নগরবাসী গৌরপদ্যশ্রিতা ॥

নবদ্বীপ বিনা নাহি হেন প্রেমোৎসব+ (১৬৩০)

হা গৌরঙ্গ দেখিব কবে তব সে বৈভব ॥ ৮৮ ॥

দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, কীর্তিত বা স্মৃত, উপাসিত ।

দূর হৈতে নমিত, আদৃত বা পূজিত ॥

হইলেই যেই ধাম দেয় প্রেমসার ।

চিৎস্বরূপ সেই গৌরধামে নমস্কার ॥ ৮৯ ॥

স্বধর্মাচরণ আর শ্রীবিষ্ণুপূজন ।

তীর্থাদি ভ্রমণ কিম্বা বেদানুশীলন ॥

এসব সাধনে কেবা জানিবারে পারে ।

বেদাদি দুর্লভ সেই ব্রজতত্ত্বসারে ॥

একান্ত আশ্রয় ধীর গৌরপ্রিয়ধাম ।

বৃন্দাবন লভ্য তাঁর পূর্ণমনস্কাম ॥ ৯০ ॥

তৃণাপেক্ষা হীন বুদ্ধি মোহন আকার ।

মিষ্টবাক্য বিষয়ে বৈরাগ্য বুদ্ধিসার ॥

কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ আর নিরপেক্ষ বুদ্ধি ।

পায় জীব গৌরধামার্চনে সর্বগুণ্ডি ॥ ৯১ ॥

গুরুবর বহুতর উপাসনা করি ।

শ্রুতিশাস্ত্র-অধ্যয়নে না পাঠিয়া হরি ॥

গৌরপুর রাসোৎসব হ'য়ে ভক্তজন ।

পরম রহস্য লাভ করে অনুক্ষণ ॥ ৯২ ॥

কাল হৈল কলি, বলী ইন্দ্রিয়নিচয় ।

অনেক কণ্টকে ভক্তিমার্গ রুদ্ধ হয় ॥

হায়, হায়, কোথা যাব, কি করিব আমি ।

যদি নবদ্বীপ, কৃপা নাহি কর তুমি ॥ ৯৩ ॥

দুর্দশে নিরত সদা দুর্কাসনা ঘোর ।

নিগূঢ় আবদ্ধমতি ক্লেশেতে বিভোর ॥

কোটি কোটি কুমতি কদর্থ করে মোরে ।

নবদ্বীপ বিনা বন্ধু কে বিপদ ঘোরে ॥ ৯৪ ॥

কঠিন উষর ক্ষেত্র তোমার আশ্রয় ।
 ভক্তিকল্ললতাবীজ অঙ্কুর না হয় ।
 তবে এক আশা মোর জাগিছে হৃদয়ে ।
 নবদ্বীপবাসে শোক স্থান না লভয়ে ॥ ৯৫ ॥
 সংসার-বাসনার্ণবে আমি নিপতিত ।
 কাম-ক্রোধ-আদি নরুণস্ত অতি ভীত ॥
 দুর্ব্বাসনা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নিরাশ্রয় ।
 গৌরস্থান, দেহ মোরে কৃপার আশ্রয় ॥ ৯৬ ॥
 স্বয়ং কৃষ্ণ স্বর্ণবর্ণ করুণা করিয়া ।
 প্রেমানন্দোজ্জ্বলে রস-বপু প্রকটিয়া ॥
 যেই নবদ্বীপে কৈল ভক্ত্যুৎসবময় ।
 মন সে মধুর ধামে সতত রময় ॥ ৯৭ ॥
 কবে আমি নবদ্বীপে করিয়া বসতি ।
 শাস্ত মনে পাব গৌরভাবোদিত মতি ॥
 ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণসেবা ধ্যান করি ।
 ভজিব ব্রজের রস অদ্ভুত মাধুরী ॥ ৯৮ ॥
 অলকানন্দার তটে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
 দেখিব সে মিশ্রবাস অতুল জগতে ॥
 দ্যুতিময় পরানন্দ সচ্চিদ্বিস্তৃতি ।
 দুর্লভ গৌরান্দ্রপুর চিচ্ছক্তি-বিভূতি ॥ ৯৯ ॥
 নাহি চাই কাশীবাস, গয়া-পিণ্ডদান ।
 মুক্তি শুভিসম ত্যজি, কিবা বর্গ আন ॥
 রোরবে কি ভয় মম, কি ভয় সংসারে ।
 শ্রীগোক্রমে বাস যদি পাই কৃপাদ্বারে ॥ ১০০ ॥
 ওহ মূঢ় জন, স্বপ্ন দৃষ্টির বিধানে ।
 মুনিগণাপ্রাপ্য ভক্তি করহ সন্ধান ॥
 বিশ্বাস অভাবে যদি নাহি সংঘটন ।
 সব চেষ্টা ছাড়ি লহ নদীয়া-শরণ ॥ ১০১ ॥
 বৃন্দাবন-নবদ্বীপ অভেদ-স্বরূপ ।
 ভিন্ন শতকেও ভাষা লিখি একরূপ ॥
 গৌরধাম-মহিমা বিশেষ তবু জানি ।
 'নদীয়া-শতকে' বলি কিছু ভিন্না বাণী ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকের পঞ্চানুবাদ সমাপ্ত ।

সন্দভ-সার

(শ্রীকৃষ্ণ-সন্দভ-৩১)

ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি । ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-

স্তাভির্ষ এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্নভূতো

গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥

যাঁহারা আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা, যাঁহারা নিজরূপতাহেতু তদীয় কলা, তাঁহাদের সহিত নিখিল জগতের আত্মস্বরূপ যে ভগবান গোলোকে বাস করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি । ‘কলা’ অর্থে শক্তি, ‘নিজরূপতা’—স্ব-স্বরূপতা । এই শক্তিত্বের উৎকর্ষ-হেতু পরমপূর্ণ প্রাচুর্য্যাববতী তাঁহাদের লক্ষ্মীত্ব প্রকাশ করিতেছে । তাঁহারা যে লক্ষ্মী, একথা ব্রহ্মসংহিতায়ই উক্ত হইয়াছে—“লক্ষ্মীসহস্রশত-সংভ্রম-সেব্যমানং” অর্থাৎ অসংখ্য লক্ষ্মীগণ সম্ভ্রম-সহকারে সতত সেবা করিতেছেন (যে গোবিন্দের) । আবার ঐ গ্রন্থের শেষে ‘শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ’ অর্থাৎ কান্তাগণ শ্রী, আর পরমপুরুষ কান্ত ।

স্বায়ম্ভুবাগমে শ্রী, ভূ ও লীলা-শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীত্বের বৈশিষ্ট্য উক্ত হইয়াছে । পরব্যোমস্থিতা এই শক্তিগ্রন্থ হইতে দ্বারকাস্থ শ্রী ভূ ও লীলা-স্বরূপা শক্তিগ্রন্থ শ্রেষ্ঠা ; তথা হইতে আবার বৃন্দাবনস্থ প্রেয়সীগণের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে । এই গোপীগণই লক্ষ্মী, ইঁহাদিগকেই শ্রীশুকদেব ‘কৃষ্ণবধূ’ বলিয়াছেন । লক্ষ্মীদেবী যেরূপ শ্রীনারায়ণের নিত্য-স্বরূপশক্তি, ব্রজদেবীগণও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া তাঁহাদের নিত্যদাম্পত্য বর্তমান । তাঁহারা লক্ষ্মীগণের হ্যায় পরম-পতিব্রতা ।

দশাঙ্করমত্ত-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“গোপীজনাবিদ্যাকলা” অর্থাৎ গোপী-জন আ—সম্যক্ প্রেমরূপা যে বিদ্যা তাহার কলা-বৃত্তিরূপা । গোপী-জনের অর্থ করিয়া ‘বল্লভ’ শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া তিনি তাঁহাদের প্রেরক । বিবিধ ক্রীড়ার প্রবর্তক—এইহেতু প্রেরক-শব্দ বল্লভ-শব্দের সহিত একার্থবাচক । শ্রীকৃষ্ণ যে তাহাদের বল্লভ, ইঁহা গোপালতাপনীতে দুর্দাসা-বাক্যে জানা যায়—“তিনি-তোমাদের স্বামী ।”

তাঁহারা যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হন, তবে তাঁহাদের কেহ কেহ পূর্বজন্মে সাধনানুষ্ঠান করিয়াছেন, শুনা যায় । তাহার হেতু—সাধকচরী গোপীজনই সাধনানুষ্ঠান করিয়াছিলেন । স্বরূপশক্তি স্বরূপা শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা ।

ইঁহারা স্বরূপশক্তি বলিয়াই শ্রীশুকদেব রাসপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

তাভির্বিদ্যুতশোকাভির্ভগবান্চ্যুতো বৃতঃ ।

ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্ষথা ॥ (ভাঃ : ১০.৩২।১০)

অর্থাৎ হে বৎস ! পুরুষ (পরমাত্মা) শক্তিগণ-পরিবৃত হইয়া যেক্রপ শোভমান হন, শ্রীকৃষ্ণ সেই বিধুতশোকা গোপীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া সেইরূপ অধিক শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

গোপীগণে প্রেমরস-নির্যাসের প্রচুর প্রকাশহেতু শ্রীভগবানেরও পরমোল্লাস প্রকটিত হয়, যাহাতে তাঁহাদের সহিত রমণেচ্ছা জন্মে। তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৯।১ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—

ভগবানপি তাঃ রাত্রীঃ শারদোৎকল্লমল্লিকাঃ ।

বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥

ভগবানও শরৎকালীন প্রফুল্ল মল্লিকায় অশোভিত সেইসকল রজনী অবলোকন করিয়া যোগমায়া উপাশ্রয়পূর্বক রমণ করিতে মনন করিলেন।

যোগমায়া দুর্ঘট-সম্পাদিকা স্বরূপ-শক্তি। সেই সেই লীলা-সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্ত তাঁহাকে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। ব্রজরামাগণের সহিত তাঁহার রমণকার্য্য সূত্ররূপে সম্পন্ন করাইবার জন্ত তিনি যোগমায়াকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই শক্তি অঘটন ঘটাইতে পারেন বলিয়া ঈঙ্গিত কার্য্যে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারিবে না—এই উদ্দেশ্য।

ব্রজ-গোপীগণমধ্যে পরম-সধুর প্রেমবৃত্তিময়ী শ্রীরাধিকাতেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। তিনি পরম প্রেমাৎকর্ষকপিণী বলিয়া অস্ত্র নিখিল শক্তি তাঁহার অনুগতা। তিনি সর্বশক্তি-বরীয়সী সর্বাশ্রয়-স্বরূপা। এইজন্ত তিনিই স্বয়ং লক্ষ্মী। আর তাঁহাতে প্রেমাধিক্যাহেতু নিখিল ব্রজসুন্দরী হইতে তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃসিদ্ধ।

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্মৈ প্রত্যুয্যতা ।

কৃষ্ণেনাত্তত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥

অচ্যুত কৃষ্ণ তাঁহাকে বৃন্দাবনাধিপত্য দান করিয়াছেন। অতএব দেবী, বৃন্দাবন-বনে রাধিকা অর্থাৎ অস্ত্র সাধারণ দেশে দেবীই অধিকারিণী, আর ‘বৃন্দাবন’ নামক বনে শ্রীরাধাই অধীশ্বরী।

বারাণশ্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে ।

ক্লক্লিণী দ্বারাবত্যাঞ্চ রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥ (স্কান্দে)

বারাণসীতে বিশালাক্ষী, পুরুষোত্তমে বিমলা, দ্বারকাতে ক্লক্লিণী এবং বৃন্দাবনে শ্রীরাধা। এই শ্লোকে মায়াধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবীর সহিত শ্রীলক্ষ্মী প্রভৃতির তুল্যত্ব সঙ্গত নহে। শক্তিমাত্রত্বের সাধারণ্যাহেতু অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই ভগবচ্ছক্তি—এই তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শ্রীসীতা, লক্ষ্মী, ক্লক্লিণী, রাধা প্রভৃতিকে দুর্গার সহিত গণনা করা হইয়াছে।

শ্রীরাধার স্বরূপভূতত্ব যামলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

ভুজদ্বয়যুতঃ কৃষ্ণো ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ ।

গোপৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্বদা ॥

শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভূজ, কখনও চতুভূজ নহেন। তিনি এক গোপী (শ্রীরাধা) সহ মিলিত হইয়া সর্বদা ক্রীড়া করেন।

শ্রীরাধার স্বরূপশক্তিত্ব-নিবন্ধন গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

“সৰ্বলক্ষ্মীময়ী সৰ্বকান্তিঃ সন্মোহিনী পরা।”

শ্রীরাধা সৰ্বলক্ষ্মীময়ী, সৰ্বকান্তি, সৰ্বসন্মোহিনী ও পরা (শ্রেষ্ঠা)। স্বকৃপরিশিষ্টেও—“রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেধা।” অর্থাৎ নিজজনসমূহে রাধাদ্বারা মাধবদেব (ক্রীড়াশীল)। মাধব দ্বারা রাধিকা সর্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছেন।

“জন্মান্তর” শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণপক্ষে যে-সকল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, শ্রীরাধা-পক্ষেও তাহা যোজনা করা যায়। যথা—

“জন্মান্তর যতঃ অদ্বয়াদিতরতচ্”—নিজ-পরমানন্দ-শক্তিরূপা রাধিকার সর্বদা অনুগমন করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়, শ্রীকৃষ্ণের সর্বদা ইতরা—দ্বিতীয়া শ্রীরাধিকা। যে অদ্বয় ও ইতর হইতে আত্ম-আদিরসের জন্ম, সেই দুই জনের (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) অদ্ভুত বিলাস-মাধুরী আবিষ্কার করিতেছেন যিনি—সেই সেই বিলাসে অভিভূত—বিদগ্ধ আর যে রমণীরত্ন (স্বেন রাজতে ইতি স্বরাট্) তথাবিধ বিলাসস্বরূপে বিরাজ করেন, বিলাস করেন বলিয়া স্বরাট্। এইজন্ত সর্বতোভাবে সেই দুয়ের রূপাই আমার অবলম্বন। এইজন্ত বলিলেন—আদিকবি সর্বপ্রথমে তাঁহাদের লীলা-বর্ণন আরম্ভকারী (শ্রীবেদব্যাস আমাকে) অন্তঃকরণদ্বারাই ব্রহ্ম—লীলাপ্রতিপাদক শব্দব্রহ্ম যাহারা বিস্তার করিয়াছেন—সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত আমার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, তদুভয়ে ধ্যান করি। “মুহুন্তি যং স্বরয়ঃ”—যে রাধা-বিষয়ে স্মর শেষাদি মোহপ্রাপ্ত হন, এবমুতা তিনি যদি রূপা না করেন তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের রূপাপ্রাপ্ত আমার পক্ষে (শ্রীরাধার) যৎকিঞ্চৎ লীলাবর্ণন-সাহস-সিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। তদুভয়ের আশ্চর্য্যরূপত্ব বলিতেছেন—“তেজো-বারিমুদাং যথা বিনিময়ঃ”—তেজ, বারি, মৃত্তকা এ সকল বস্তুর ঘে-প্রকার বিনিময়—পরস্পর স্বভাব-বিপর্য্যয় ঘটে, তেজপদার্থ চন্দ্র প্রভৃতি যাহার নথ-কান্তিদ্বারা বারি-মৃত্তিকার নিস্তেজত্ব-ধর্ম প্রাপ্ত হয়; বারি নভ্যাদিসংসর্গ-সম্পর্কিত বংশীবাত্তাদির দ্বারা তেজপদার্থের মত উর্দ্ধগমনশীলতা এবং পাষণাদি মৃৎপদার্থের মত স্তম্ভভাব প্রাপ্ত হয়; পাষণাদি যাহার বিচ্ছুরিত কান্তি-দ্বারা তেজপদার্থের উজ্জলতা এবং বংশীবাত্তাদি দ্বারা বারিবৎ দ্রবতা প্রাপ্ত হয়—এ সকল কৃষ্ণ-লীলা বর্ণন প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ।

অতঃপর শ্রীরাধার আশ্চর্য্যরূপতা বলিতেছেন—

“যত্র ত্রিসর্গো মৃষা”—সাহাতে শ্রী, ভূ, লীলা—এই শক্তিত্রয়ের প্রাদুর্ভাব কিম্বা দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবনগত শক্তিবর্গত্রয়ের প্রাদুর্ভাব অথবা বৃন্দাবনে রস-ব্যবহারে স্তম্ভ, উদাসীন ও প্রতিপক্ষ নায়িকারূপ ত্রিবিধ ভেদপ্রাপ্ত সমস্ত ব্রজদেবীর প্রাদুর্ভাব ‘মৃষা’—মিথ্যা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদি দ্বারা উক্ত

শক্তিবর্গ—প্রায়সীবর্গ শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়োজনে লাগে না, একমাত্র শ্রীরাধা-দ্বারা সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়, তাঁহাকে ধ্যান করি।

এক বচনান্ত ক্লীবলিঙ্গ ‘তদ’ শব্দদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়কে কিরূপে বুঝায় ? তদন্তর—পরমশক্তি ও শক্তিমানরূপে পরস্পর অভিন্ন বলিয়া একত্ব-বিবক্ষায় তদ-শব্দ। অতএব সাধারণভাবে নির্দেশহেতু ক্লীবলিঙ্গ (স্ত্রী বা পুরুষভাবে নহে)।

“ধায়া স্মেন সদা নিরন্তকুহকং”—নিজপ্রভাবে লীলা-প্রতিবন্ধক জরতী প্রভৃতি এবং প্রতিপক্ষ নায়িকাগণের কুহক—মায়া সর্বদা যে দুইজন-কর্তৃক নিরন্তর।

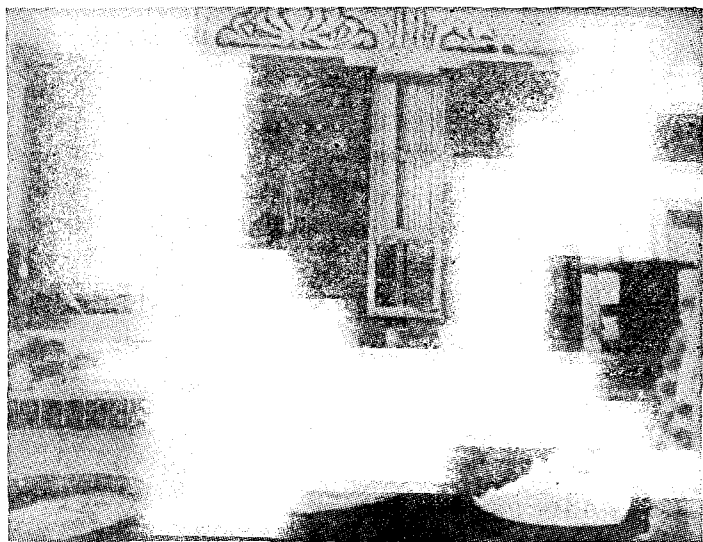
“সত্যং পরং ধীমহি”—তাদৃশরূপে নিত্যসিদ্ধ অথবা পরস্পর বিলাসাদি-দ্বারা যাহারা আনন্দ-দানে কৃত-প্রতিজ্ঞ। অতএব ‘পর’—অত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না একরূপ গুণ-লীলাদিদ্বারা বিশ্ববিস্মাপকহেতু সর্বোৎকৃষ্ট শ্রীরাধা-মাধবকে ধ্যান করি। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ সমাপ্ত)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও বিরাট অনুকূট-মহামহোৎসব

জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিসিদ্ধান্ত সুরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়-পার্বদপ্রবর পরিত্রাজকাচার্য্যবর্ষ্য ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের মনোহীষ্টামুসারে এবংসর কোলদ্বীপস্থ (সহর-নবদ্বীপস্থ) শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে যে অভূতপূর্ব বিরাট শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অনুকূট মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা গোড়ীয়-বৈষ্ণব-ইতিহাসে এক অস্বর্ণীয় অমুঠান। শ্রীশ্রীগোপালদেবের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অনুকূট-মহোৎসবের দ্বায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাজ-বাধা-বিনোদবিহারীজীউর অসীম প্রভাব ও প্রেরণায় ইহা অলৌকিকরূপে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-সারস্বত-পদ্ধতিতে ‘কার্ত্তিকী শুক্লপ্রতিপৎ-তিথির প্রভাতে’ শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার আদর্শ প্রকটিত করেন। সর্বপ্রথমে তাঁহার নির্দেশানুসারে শ্রীহরিকীর্তন-নাট্যমন্দিরে শ্রীহরিত্তক্তি-বিলাসমতে (১৬শ বিলাস) গাভীগণকে অলঙ্কৃত করিয়া দোহনপাত্রসহ পূজা সম্পন্ন হয়। অতঃপর সারস্বত-ধারায় শ্রীরূপ-রঘুনাথের মন্ত্র-চতুষ্টয়দ্বারা শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ-চরণস্পৃষ্ট, তৃণ-কন্দর-কন্দমূল-গো-গোপগণ-পরিশোভিত হরিদাসবর্ষ্য গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা সমাপ্ত হয়।

এদিকে শ্রীমন্দির-তোরণ, মন্দিরাভ্যন্তর, জগমোহন ও তন্নিয়বর্তী স্থান-সকল বিচিত্রবর্ণের পতাকা-পুষ্প-কদলীবৃক্ষ-আত্মপল্লব-নারিকেলসহ পূর্ণকুস্ত ও চন্দ্রাতপাদিদ্বারা সুশোভিত হয়। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সোপানাকারে সুবিস্তৃতভাবে খেতান্ন, খেচরান্ন, পুষ্পান্ন, লড্ডুক, রোটিকা, লুচি, পুরী প্রভাত পঞ্চশতাধিক ভোগসামগ্রী পর্বতাকারে স্তুপজিত হয়। গোড়-ব্রজ-ক্ষেত্র-মণ্ডলের গৌর-কৃষ্ণপ্রিয় যাবতীয় নৈবেদ্য-সন্তারের অধিকাংশই তুলসীমঞ্জরীর সহিত শ্রীগিরিরাজকে নিবেদন করা হয়।



অন্নকূট-মহোৎসবে সমর্পিত বিপুল নৈবেদ্য-সম্ভারের দৃশ্য

উষাকাল হইতেই শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের অন্নকূট-মহোৎসবাদি প্রসঙ্গ শ্রবণের সুযোগলাভ করেন। দ্বিপ্রহরে অন্নকূট-দর্শনের নিমিত্ত অধীর আগ্রহে বহুক্ষণ যাবৎ প্রতিক্ষারত উদ্বেলিত জনশ্রোতের সম্মুখে শ্রীল আচার্য্যদেব গিরিরাজে সমর্পিত নৈবেদ্য-কূট-প্রদর্শনীর আবরণ উন্মোচিত করেন। উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে সন্মোদন করিয়া তিনি কৃপাপূর্বক এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন—“‘গো’ অর্থে বিদ্যা ও ইন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করা হয়। গোবর্দ্ধনপূজায় পরবিচারপিনী ভক্তি বৃদ্ধিশ্রাপ্ত হয়। গোবর্দ্ধন-গরি-গুহায় নিত্যকালই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের ভোগ বর্দ্ধনই গোবর্দ্ধন-পূজার ফল। পুরুষাভিমান থাকিতে অপ্রাকৃত নবীনমদনের সেবা বা গোবর্দ্ধন পূজা সম্ভব নহে। ভক্তিবিনোদ-সারস্বত-দ্বারায় স্নাত হইতে না পারিলে গোবর্দ্ধনপূজায় অধিকার লাভ হয় না! ভক্তির বর্দ্ধন বা ভক্তির বিনোদনই গোবর্দ্ধন-পূজার একমাত্র উদ্দেশ্য” ইত্যাদি।

শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক ও নিরাজনাদি সম্পন্ন হইবার পর অল্প রাত্র ১০ ঘটিকা পর্যন্ত অন্নকূটের বিচিত্র মহাপ্রসাদ আহূত-অনাহূত-রবাহূত অনুান বিংশতি সহস্র শ্রদ্ধালু জনসাধারণকে বিতরণ করা হয়। নবদ্বীপ-সহবের সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট গণ্যমান্য সহস্রাধিক ব্যক্তি বিশেষ-ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভূতপূর্ব অন্নকূট মহোৎসবে যোগদানপূর্বক ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বিন্ময়াভিভূত ও চমৎকৃত হন।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ

(নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতীরী স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল-ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ২৮শে ফাল্গুন ১৩৭১. ১২ই মার্চ ১৯৬৫, শুক্রবার হইতে ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্তন ও নগর-সংকীর্তন-মুখে ষোল ক্রোশ পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসরও শ্রীনুসিংহপল্লী, মামগাছি ও শ্রীধাম মায়াপুরে মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও প্রসাদ সেবান্তে অপরাহ্নে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যানুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবার্থে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাঞ্ছিত হইব।

শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি - ৭ই পৌষ ১৩৭১ ; ইং ২২।১২।৬৪

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সত্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

জ্ঞপ্তব্যঃ—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরমহংস-স্বামী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২৮শে ফাল্গুন, শুক্রবার—১) **শ্রীগোক্রমদ্বীপ** (কীর্তনাখ্য)—গঙ্গা-স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-অখদ-কুঞ্জ, অুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহদেবপল্লী (মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবা) ;

২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্বরগাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২৯শে ফাল্গুন, শনিবার—৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবানাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি এবং

৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ**—(অর্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ৩০শে ফাল্গুন রবিবার ৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জাহ্নুগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিজ্ঞানগর (লীসার্কভৌম ভট্টাচার্যের পাট) এবং

৬) **শ্রীমোদক্রমদ্বীপ** (দাস্তাখ্য)—মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটে মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবা), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১লা চৈত্র, সোমবার—৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা এবং

৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা।

৫। ২রা চৈত্র, মঙ্গলবার—৯) **শ্রীঅশ্বর্ষীদ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅর্ধৈত-ভবন, ঈশৈতত্ত্ব মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদেব সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট ; তৎপরে মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও প্রসাদ সেবান্তে নবদ্বীপ-শহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন।

৬। ৩রা চৈত্র, বুধবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ৪ঠা চৈত্র, বৃহস্পতিবার—সাধারণ মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)।

শ্রীসিদ্ধবাটী গোড়ীয় মঠ ও

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের সপ্তবিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

শ্রীমঠের ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত, আসানগোল মহকুমার অধীন, 'চিত্তরঞ্জন রেলওয়ে লোকে ওয়ার্কসপ' হইতে ৩১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ডি, ভি, সি-র 'মাইথন হাইডেল পাওয়ার স্টেশন' হইতে ৩১০ মাইল উত্তরে মনোরম স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত, শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহের অষ্টম এই সিদ্ধবাটী গোড়ীয় মঠ। অপ্রাকৃত নবীন-মদন অনঙ্গমোহন আদি-কেশবের একান্ত নিজজনের রাজ-রোগাশ্রয়ে অস্ব-লীলাভিনয়কে কেন্দ্র করিয়া এই মঠ গড়িয়া উঠে। মদ্রদেশের 'ত্বং বরম্'-শৈলে তাঁহার সিকিপ্রাপ্তি হইলেও এ স্থান বিশেষভাবে তৎস্মৃতি-বিজড়িত। আজও এতদঞ্চলের অধিবাসিগণ তথা পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-শুল্ক-লতাদি পর্য্যন্ত তাঁহার স্মরণে অভাব বোধ করিয়া অবিরলধারে অশ্রু-বিসর্জন করে। এ স্থানের প্রতি অণু পরমাণু তাঁহার স্বভাব-স্বলভ স্নেহ ও অনুকম্পা-বর্জিত হইয়া তদ্বিরহে মুহমান। সাধুবাবা অনঙ্গমোহনের অভাবে এখানকার আকাশ-বাতাস আজও হাহাকার করিতেছে। সকলেই আজ তদ্বিরহে ব্যাকুল, কে কাহাকে সান্ত্বনা দান করিবে? মিলন উপযুক্তই হইয়াছিল, কিন্তু বিরহই তাহাকে তীব্রতর করিয়া বিরহীকে দশম দশায় উপনীত করিয়াছে!

অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে চলিল এই মঠ স্থাপিত হইয়াছে। তখন সাধুবাবা অনঙ্গমোহন এখানকার মঠরক্ষক। তৎপরবর্তীকালে বিগত ১৮ই ফাল্গুন ১৩৫৬, ইং ২রা মার্চ ১৯৫০, বৃহস্পতিবার, ফাল্গুনী ত্রয়োদশী তিথিতে তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে। তাঁহার পুণ্য-বিরহ-তিথিকে স্মরণ করিয়া গত ১৭ই বৈশাখ ১৩৫৭, ইং ৩০শে এপ্রিল ১৯৫০, রবিবার, বৈশাখী শুক্লা-ত্রয়োদশীতে এই মঠে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় অর্ধসহস্র নর-নারী গ্রামবাসী তাঁহার গুরু-সেবকনিষ্ঠা, বহুবিধ ভজনাঙ্কুল গুণাবলী ও সরল অমায়িক ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ও বিচিত্র ভগবৎ-প্রসাদলাভে ধৃত হন। তাহার বর্ষাধিককাল পরে গত ২৭শে বৈশাখ ১৩৫৮, ইং ১১ই মে ১৯৫১, শুক্রবার—স্থানীয় কতিপয়

উৎসাহী গ্রামবাসীর প্রদত্ত ভূমিতে মঠের নব-নির্মিত গৃহ-প্রবেশ-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয় এবং গ্রামবাসীগণকে মহাপ্রসাদ-দানে পরিতৃপ্ত করা হয়। তৎপরে শ্রীরাম-সেবা-নিষ্ঠায় ছায়ায় আয় অনুসরণকারী লক্ষ্মণের চতুর্দশ বর্ষ বন-বাসকাল উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আজও ভ্রাতৃবৎসল ভরত তথা মঠবাসি-সেবকবৃন্দ শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা-নগরীতে (সিদ্ধবাটীতে) প্রত্যাবর্তন ও তীব্রদর্শন-আকাজক্ষায় তৃষিত চাতকের আয় অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শন ও অভয়বাণী না পাইয়া বহুদিন তাঁহার পথ নিরীক্ষণ করিয়া সিদ্ধ-লোকবাসীগণ আজ বিরহে মুহমান।

সাধুবাবা অনঙ্গমোহন স্বধামে গমন করিলে মদ্র-শৈল হইতে পূজ্যপাদ ত্রিগুণাতীতদাস বাবাজী মহারাজ সহ শ্রীমন্নारायण महाराज परमाराध्य-দেবকে সেই নিদারুণ অপ্রকট-লীলাবার্তা জাপনমুখে পত্রশেষে লিখিয়াছিলেন,—“আমরা তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষণার্থ তাঁহার প্রিয় স্বাস্থ্যকর স্থান সিধাবাড়ী-গ্রামে (শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠে) অল্প বরাবর রওনা হইতেছি। অনুগ্রহ-পূর্বক জানাইবেন, আপনি সিধাবাড়ী মঠে কবে আসিয়া কৃপা করিতেছেন। ব্যগ্রভাবে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিব।” পত্রোত্তরে তিনি পুণ্যস্মৃতি-রক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা ও শ্রীমঠে পদার্পণপূর্বক ভক্ত চাতকদ্বয়কে কিভাবে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। তবে আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে শ্রীমন্দিরাদি নির্মাণ দ্বারা শ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা-পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধুবাবা অনঙ্গমোহনের স্থায়ী পুণ্যস্মৃতি সংরক্ষণের চেষ্টা দূরে থাকুক, বিরহোৎসব ও মঠের নবনির্মিত গৃহ প্রবেশোৎসবের পর আজ চতুর্দশ বর্ষমধ্যে মঠস্থ সেবক ও গ্রামবাসীগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের একাধিকবার দর্শন ও কৃপা-কটাক্ষলাভ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ! তাই আজও সকলের জিজ্ঞাসা,—“এখনও কি দর্শন-দানের উপযুক্ত সময় হয় নাই? তবে কি প্রভু আসিবেন না! আমাদের সকল আশাই কি বিফল!” এরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া আজ তাঁহারা নিরুৎসাহিত ও মর্মান্বিত।

আদর্শ বিশিষ্ট গুরুসেবক, গুরুপাদপদ্মের নিত্যসঙ্গী ও দক্ষিণহস্ত, প্রফুল্লানন, কষ্টসহিষ্ণু, ভোগরক্ষনদক্ষ, মৃদঙ্গবাদন-নিপুণ, স্নমধুর কীর্তনকারী অনঙ্গমোহনের গোলোক-বিজয়-বার্তা এক অদ্ভুত রহস্তাবৃত ব্যাপার! মহাপ্রাণ-কালে তাঁহার শ্রীগুরু-গৌরঙ্গ-গিরিধারীর স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্ত নামোচ্চারণ ও তাঁহাদের অদর্শনে বিপ্রলম্ব ভাব লক্ষ্য করিয়া উপস্থিত গুরুষাকারী সেবক ও

জনগণ চমৎকৃত হন এবং স্ব-স্ব ভাগ্যের প্রশংসা করিতে থাকেন। তাঁহার বিচ্ছেদে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধিকাংশ, বিশেষতঃ তাঁহার গুণগ্রাহী গুরুদ্বাতাগণের অত্যন্ত শ্রীরাধানাথ-দাসাকাজী “মন্তকপূজাভাষিকা” কবিতায় যে সদগুণাবলী বর্ণনা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—

“নয়ন ভরিয়া ভাই দেখিছ এবার ।

প্রভু ভৃত্য, দাস দাস্ত অদ্ভুত ব্যাপার ॥

সেবকের সেবা-সেবা নহে চমৎকার ।

অতীব মাধুর্য্য আছ! সেবক সেবার ॥

তোমার সদগুণ যত, আমি বা বলিব কত,

ইহা মাত্র করি নিবেদন ।

যে গুণে হইয়া বশ, প্রভু গায় ভৃত্য-বশ,

কণা তার করি আধিষ্ণন ॥”

অপর “হৃদয়োচ্ছ্বাস”-কবিতায় শ্রীহরিচরণ দাস্তাভিমानी ভক্তাদর্শ অনঙ্গ-মোহনের বিরহে যে ভাবাবেগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ—

“কে তুমি ভকত! পূজারী কাহার? কেন এসেছিলে মরত-ধামে?

সংসারত্যাগী গুরু-মহারাজ, কাঁদিয়া আকুল তোমার নামে ॥”

আদর্শ সেবকের প্রকটাবস্থায় সেবকের সেবা-সেবা ও সেবা-সেবকের অঙ্গাদী অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য হয়ত অনেকেই লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বিশিষ্ট সেবকের সেবায় বশীভূত হইয়া তদ্বিরহে প্রাকৃত-স্নেহ-মমতাশূন্য, সংসার-বিরক্ত, পারমহংস-ধর্মাশ্রিত প্রভুর ভৃত্য-গুণগান-মন্ততা ও অপ্রাকৃত ভক্ত-বাৎসল্য সত্যই বিরল। তদপেক্ষা আরও শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, সেই নিত্যসম্বন্ধ ও সেবক-বাৎসল্যকে স্থায়ীভাবে জগৎ-সমক্ষে সংরক্ষণ-প্রচেষ্টা। আজ হয়ত প্রভু তাঁহার পূর্বপ্রতিজ্ঞা বিন্ধিত হইয়াছেন, শত শত সুযোগ্য সেবক পাইয়া শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে সান্ত্বনালাভ করিয়া সম্ভবতঃ পূর্ব-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহা না হইলে দীর্ঘকাল যাবৎ এ সম্ভারাম ও তত্রত্য সেবকগণের প্রতি-একরূপ অকুপা ও উপেক্ষার কারণ কি? অবশ্য তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও নাই এবং সেরূপ ছঃসাহস ও ছরাশাও কেহ পোষণ করে না। তবে এ স্থলে আমরা তদাশ্রিত জনের সঙ্কল্প ও মনোবাঞ্ছা-পূরণের বিষয় উত্থাপন করিয়াই নিবৃত্ত হইতেছি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় অসামর্থ্যতার আশঙ্কা করিয়া তাঁহার প্রাণপ্রিয় সখা অর্জুনের দ্বারা কৌশলে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন,—
 “কৌন্তেয়! প্রতিজ্ঞানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি।” উদ্দেশ্য—তাঁহার স্বীয় প্রতিজ্ঞা বহুবারই ভঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু ভক্তের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইলে, ভক্ত-বাক্যের সত্যতা রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে অবশ্যই পূর্ব প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে। “কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না” ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় ভগবান্ স্বয়ং অসমর্থ হন। ভীষ্মের ভীষণ প্রতিজ্ঞা তাঁহাকে পূর্বসঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিয়া উঠা হইতে নিরস্ত করিয়াছে। ভগবানের প্রতিজ্ঞা-পালনের সহায়তাকল্পে ভক্তের একরূপ ভূমিকা গ্রহণ আমাদের অবিদিত নয়। কিন্তু ভক্তের স্বয়ংকৃত প্রতিজ্ঞারক্ষা-ব্যাপারে আবার অপর কোন্ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে?—“ঔষধের ঔষধ কোথা পাই?”

সিদ্ধবাটীস্থ জনগণ, বিশেষতঃ সাধুবাবা অনঙ্গমোহনের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ-শীল—শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ সেবকগণের অন্ততম পূজনীয় শ্রীপাদ ত্রিগুণাতীতদাস বাবাজী মহারাজ—যিনি নিজ জীবনের মায়ামমতা পরিত্যাগ-পূর্বক উহা তুচ্ছ ও বিপন্ন করিয়াও, কঠিন সংক্রামক রোগাক্রান্ত অনঙ্গ-মোহনের অন্তিমকাল পর্য্যন্ত যেভাবে যত্ন ও গুরুত্বাদিতে তৎপর ছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার স্থায়ী স্মৃতি-সংরক্ষণ-চেষ্টায়ও তাঁহার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বর্তমানে প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধাবস্থায়, উক্ত প্রস্তাব ও পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইতে না দেখিয়া তিনি অধিকতর ভগ্নোত্তম, ব্যথিত ও মর্ষ-বেদনাগ্রস্ত।

সুতরাং প্রভুর এ স্থানে পদার্পণপূর্বক ভক্ত-সঙ্কল্প-রক্ষণ ও দর্শনদানে ভক্ত-গণের মর্ষপীড়া দূরীকরণ—তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছাধীন হইলেও, অসহায় অবোধ শিশুর স্থায় ক্রন্দন ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর নাই। যদি সেই কাতর ক্রন্দনে কোনরূপে প্রভুর কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া আশ্রিতজনের মনোবাহু পূরণ হয়, তাহাই বর্তমানে আমাদের কাম্য।—

“গুরুদেব! স্তম্ভপায়ী শিশুজনে, মাতা ছাড়ে ক্রোধমনে,

শিশু তবু নাহি ছাড়ে মায়!

যেহেতু তাহার আর, এ জীবন ধরিবার, মাতা বিনা নাহিক উপায় ॥

অতঃ আশা নাহি যার, তব পাদপদ্ম তার, ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়।

তব পদাশ্রয়ে নাথ, করে সেই দিনপাত, তব পদে তাহার অভয় ॥”

“অশোক-অভয়, অমৃত-আধার, তোমার চরণদ্বয়।

তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া, ছাড়িঁনু ভবের ভয় ॥”

অতএব হে দয়াময় শ্রভো! আমাদের অশেষ অঘোগ্যতা ও দোষাদি-দর্শনে আমাদের দূরে পরিত্যাগ ও উপেক্ষা করিতে চাহিলেও তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ও অগতির গতি। তুমি আমাদের পরি-বর্জন করিলেও তোমার অহৈতুকী রূপা ব্যতীত আমাদের জীবন-ধারণ রূথা ও অপত্তা। তাই ভগ্নোত্তম মৃতকল্প অন্তেবাসী ও স্থানীয় অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে আমি এখানে আপনার শুভ-পদার্পণ ও শ্রীমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাপূর্বক শ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা-পূজা প্রচলন করিয়া সাধুবাবা অনঙ্গমোহনের স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার জন্ত কাকু প্রার্থনা জানাইতেছি।—

“হা হা প্রভু গুরুদেব! রাখ পদদ্বন্দ্বৈ।

রূপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥

মনোবাঞ্ছা-সিদ্ধি তবে হও পূর্ণতুষ্ট।

হেথায় দর্শন মিলে, সেথা সঙ্কল্প-রক্ষণ ॥

তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।

মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার ॥”

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিরহ-তিথিপূজা

সকলেই যখন সাধুবাবা অনঙ্গমোহনের স্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ-সংরক্ষণে অক্ষম হইয়া হতোত্তম ও তদ্বিরহে মুহমান, এমন সময়ে উষঃকালে জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সপ্তবিংশ-বার্ষিক বিরহ মহোৎসব আসিয়া সমুপস্থিত। এক্ষেত্রে “মড়ার উপর খাড়ার ঘা” বা “কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে”—লৌকিক প্রবাদ বাক্য স্মৃতিপথে উদিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই পুর হইতেই শোক-সন্তপ্ত ভক্ত-বিরহিণী অধিকতর উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কান্বিত হইয়া শৌষী কৃষ্ণ-চতুর্থী-তিথিবরাকে সতয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তিথিরাজ! বিরহা-নল-সন্তপ্ত মৃতকল্প আমাদের জন্ত আবার কি দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছ? আমাদের কঠিন অগ্নি পরীক্ষার কি এখনও অবসান হয় নাই? লৌকিক দৃষ্টিতে এ জগৎ হইতে আমাদের আত্যন্তিক অস্তিত্বলোপ হইলেই কি তুমি সন্তোষ লাভ করিবে ও তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে? মুমূর্ষু আমাদের প্রতি কি তোমার বিন্দুমাত্রও দয়া-মায়্যা, স্নেহ-মমতা নাই? স্থানা-স্থান, কালকাল ও পাত্রাপাত্র বিচার কি তোমার একেবারেই লোপ

পাইয়াছে ? দুর্বল, ক্ষীণকায় আমাদের প্রতি তোমার দীর্ঘ নিষ্ঠুর আচরণ শোভা পায় না ।”

বিরহিগণের প্রলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোক-পাবনী মঙ্গলদাত্রী করুণা-ময়ী সেই তিথিবরা কহিলেন,—“তোমাদের আশঙ্কা, উদ্বেগ ও নৈরাশ্যের কোনই কারণ নাই। আমি অন্তর্যামিস্ত্রে পূর্ব হইতেই তোমাদের বিরহ-জ্বালা অবগত আছি এবং তাহার উপশমের নিমিত্তই স্বয়ং মহৌষধিরূপে আগমন করিয়াছি।” “বিষস্ত বিষমৌষধম্”—“বিরহস্ত বিরহমেবৌষধম্”—যে রূপ বিষক্রিয়া নিবারণের নিমিত্ত বিষই ঔষধরূপে ব্যবস্থাপিত হয়, তদ্রূপ বিরহ-সন্তাপ নিবৃত্তির জন্ত বিরহই একমাত্র মহৌষধ এবং আমিই তাহার মুর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমিই তোমাদের দুঃবিষহ বিরহ-জ্বালায় শান্তি-বারি-স্বরূপে তোমাদিগকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিব। ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেই—ভগবৎ-ভাগবত-বিরহের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিলেই তোমাদের সকল অগ্নি-পরীক্ষা—ক্লেশের অন্ত হইবে। আমার হ্রায় পরম দয়াবতী, স্নেহশীলা ও হিতাকাঙ্ক্ষিনী চৌদ্দ ভুবনে কুত্রাপি মিলিবে না। আমি পূর্বাগত সকল বিরহানলেরই পরিসমাপ্ত ঘটাইয়া তোমাদের মনোবাহু পূরণ করিব।”

তখন বিরহিগণ আশ্বস্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তিথিবরার যথাযোগ্য সমাদরে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজার্তনায় প্রবৃত্ত হইলে তিনি কহিলেন,—“আমি চন্দনচর্চিত সুগন্ধি-পুষ্পমালা ও বিবিধ নৈবেদ্যোপহাৰে তৃপ্ত হই না, পরন্তু বিপ্রলভ-রসাশ্রিত যে ভক্ত ভক্তিপুষ্প-অঙ্ক-চন্দনোপহাৰে বার্ষভানবী-দয়িতের সেবা-পূজা বিধানের পর তদবশেষ আমায় প্রদান করেন, আমি তাহাতেই সৰ্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তলাভ করি। আরও বিশেষ বক্তব্য এই যে, আমার বাহ্য-সেবা-পূজার আড়ম্বর পরিত্যাগপূর্বক যে বিরহী ভক্ত অচৈতন্য বিশ্বে শ্রীচৈতন্য-বাণী-বিতরণরূপ আমার মনোভীষ্ট পালনে সবিশেষ যত্নবান, তিনিই আমার সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ; তিনিই আমার কথিত ‘বাণী ও বপু’-বিজ্ঞান সম্যক্রূপে উপলব্ধি ও অনুধাবনে সক্ষম হইয়া আমার অন্তরঙ্গ লাভ করিয়াছেন। তোমরা সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া আত্মাহুতি প্রদানের জন্ত প্রস্তুত থাক। অপ্রাকৃত হরিজনগণের পাদত্ৰাণবাহী ভূত্যানুভূত্য হইতে পারিলেই এ জীবনের সফলতা—ইহাতেই তোমাদের ও বিশ্বের কল্যাণ হইবে। তোমরা জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী না হইয়া শ্রীচৈতন্য-বাণীর স্পর্শ

আচরণমুখে তাহার প্রচারক হও। কীর্তনাখ্যা ভক্তিই তোমাদের একমাত্র প্রচার্য বিষয় হউক। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা বর্জনপূর্বক—নির্জনভজনের চলনা ও কৃত্রিম স্মরণ-পদ্ধতি পরিত্যাগান্তে রাধা-মাধব-মহোৎসবে আত্ম-নিয়োগ কর। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনই রূপানুগ ভজনপথ—সেই রূপ-সনাতন-শিফা হৃদয়ে ধারণপূর্বক অনাসক্তভাবে যুক্তবৈরাগ্য অংলম্বন করিলে ব্রজনরম্ব-দ্বন্দ্বের অপ্রাকৃত স্বারসিকী সেবালাভ হইবে। রাধানিত্যজন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কাতর ব্রজবাসগণের আনুগত্যেই সেই উন্নতোজ্জ্বল-রসে তোমাদের অধিকার মিলিবে। কীর্তনমুখেই শ্রবণ হয় এবং স্মরণের স্মযোগ উপস্থিত হয়। সেইকালেই অষ্টকাল লীলাসেবার অমুভূতি সম্ভব। ইহাই আমার মনোভীষ্ট—ইহাই আমার বিশেষ উপদেশ জানিবে। আমার এই মনোভীষ্ট কার্য্যে পরিণত হইলেই আমার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। ইহাতেই আমার শান্তি—ইহাতেই আমার তৃপ্তি।”

উক্তরূপ উপদেশ-নির্দেশানুসারে সিদ্ধেশ্বরীর নগণ্য সেবকগণ কৃষ্ণভক্তি-স্বরূপিণী কৃষ্ণপ্রিয়া বাণীরূপা শুদ্ধা সরস্বতী-তিথিবরার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাতঃকাল হইতেই ত্রিগুণাতীত তত্ত্বানুগত্যে কৃষ্ণ-কীর্তনমুখেই কৃষ্ণ-কীর্তন-পরায়ণা স্মৃতি আরাধিতা হইতে থাকেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-প্রার্থনামুখে স্তব-স্তোত্র, প্রার্থনামূলক ও বিরহসূচক বিবিধ মহাজন-পদাবলীরূপ স্নগন্ধি পুষ্প মাল্য-চন্দনে বিভূষিতা হইয়া ‘বাণী’ ও ‘উপদেশাবলী’ আলোচনারূপ নিরাজনে সঙ্কীর্ণ যজ্ঞের দ্বারা তিথিবরা সম্বন্ধিতা হন।

মাধ্যাহ্নিক-সেবারূপে শ্রীগৌরঙ্গ-গান্ধবিকা-গিরিধারীর অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তির সহিত কৃষ্ণ-কীর্তনমুখে উক্ত তিথিবরার পূজাচর্চন অনুষ্ঠিত হয়। শুদ্ধা সরস্বতীর বিরহ-কাতর তদাশ্রিত ত্রিগুণাতীত-দাম্যাকাঙ্ক্ষীর স্বহস্তপাচিত বিবিধ ভোগসামগ্রী গ্রহণ করিয়া দেবী পরিতৃপ্তা হন। সেবা-মৌষ্ঠবের নিমিত্ত অপ্রাকৃত বিরহীর ইষ্ট-নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া দেবী সরস্বতী তাঁহাকে প্রচুর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শন ও ভুক্তাবশেষ লাভে সমাগত ভক্তবৃন্দও কৃতকৃত্য হন।

সায়ংকালে শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর সহিত শ্রীবৃন্দাদেবীর আরাত্রিকান্তে কৃষ্ণপ্রিয়া সরস্বতীর আরাধনায় পুনঃ ভক্তগোষ্ঠী আহুত হন। তাঁহাদের দ্বারা বাণীর গুণ-কীর্তনরূপ অর্চ্চনান্তে দেবীর উদ্দেশে এক মানপত্র

পঠিত হয়। সকলেই তাঁহার ‘মনোভীষ্ট’-পালনে ব্রতী হইয়া জীবনপাত করিবেন—এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে দেবী সকলেরই প্রতি কৃষ্ণভক্তি-করুণা অকাতরে বিতরণ করেন। কৃষ্ণকীর্তন-পরায়ণা ত্রিধিবরার একান্ত আশ্রিত-জনের আনুগত্য-বিহীন হওয়ায়, বামনদেবের নিকট ভক্তি-বেদান্ত অধ্যায়না-কাজ্জলী শাঠ্য-কাপট্যাশ্রয়ীকে দেবী বঞ্চনা করিলেন। পুনঃ আশ্রয়-কেশবের অহৈতুক অনুগ্রহে তদানুগত্যে সে শ্রীকেশব-আশ্বাদিত “শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ” ও “বিরহ-স্মৃতি” লাভ করায় দেবীর করুণা যাচঞার অধিকার প্রাপ্ত হয়। তখন সেই বরাকামধম কীর্তনমুখে শুদ্ধা সরস্বতীর মঙ্গল নিরাজনে সমর্থ হইয়া, মুক্ হইয়াও বাচালের আয়, ভূতলে শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-স্থাপয়িত্রী স্বরূপ-রূপানুগবরা দেবীর অতিমর্ত্য চরিতাবলী ও অসমোদ্ধ করুণার কথা বর্ণনের সুযোগ লাভ করে। জানিনা, কৃষ্ণকীর্তন-ব্রতধারিণী শ্রীরূপ-কমল-প্রেমোদ-মঞ্জরীর আনুগত্যকারিণী শ্রীরাধার ‘নয়নমণি’ তাঁহার স্বাভীষ্ট-সেবায় কোনও দিন তাহাকে দাসানুদাস্ত প্রদান করিবেন কিনা। দেবী সরস্বতীর অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠ নিজজনের আনুগত্যে তাই তাহার একমাত্র প্রার্থনা—

“হা ! গুরু গোসাঞি, দয়া করি’ করে, দিবে দীনে ব্রজবাসা।

রাগাঙ্ঘিক তুমি, তব পদানুগ, হইতে দাসের আশা ॥”

“ছোড়ত পুরুষ-অভিমান। কিস্করী হইলুঁ আজি কান ॥

বরজ-বিপিনে সখী-সাথ। সেবন কববুঁ রাধানাথ ॥”

“হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন।

ভজিব শ্রীরাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন ॥

সুযন্তে মিশাঞা গা’ব সুমধুর তান।

আনন্দে করিব হুঁহার রূপ-গুণ-গান ॥

‘রাধিকা-গোবিন্দ’ বলি’ কাঁদিব উচ্চৈঃস্বরে।

ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে ॥”

—শ্রীসিদ্ধবাটী মঠান্তেবাসী

জৈনক বিরহী

সনাতনের বন্ধন-মোচন

(নাটিকা)

(পূর্ব-প্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮২ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ অঙ্ক

২য় দৃশ্য

বন-পথ

সনাতন ও ঈশানের প্রবেশ

সনাতন—ঈশান, আর কতদূর যেতে হবে জানি না ! (করজোড়ে) হা
শচীনন্দন গৌরহরি, তোমার কাছে পৌঁছাতে পারব কিনা জানি
না ! একবার কৃপা ক’রে দেখা দাও ; এই বনপথেই তোমায় দর্শন
ক’রে আমার জীবন ধাতু করি !

ঈশান—প্রভু, আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি বেশ বুঝতে পারছি।

সনাতন—না ঈশান, তুমি ব্যস্ত হ’য়ে না। আমি তবু ক’দিন গাছতলায়
ঘুমিয়েছি, তুমি কিন্তু এক ক্ষণের জন্তও চোখ বোজো নি। তুমি
ভাবছ, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে হয়ত আমি তোমায় ছেড়ে চলে যা’ব।
না—না, ঈশান, আমি তোমায় ছেড়ে যেতে পারি না। তুমি যে
স্থখে দুঃখে সব সময় আমার সেবা করছ।

ঈশান—প্রভু, এবার সন্ধ্যা নেমে আসছে। এই সন্ধ্যাকালে কোথায় থাকা
হবে ?

সনাতন—কোথা আর থাকবে ? এই বনপথে বৃক্ষতলই আমাদের আশ্রয়।

ঈশান—প্রভু, সামনে একটা নদী ও উঁচু পাহাড় রয়েছে দেখছি। ওটা কি
ক’রে পার হ’ব ? নিকটে কোন লোকবসতিও দেখছি না।

সনাতন—যাঁর ডাকে সব কিছু বিসর্জন দিয়ে বেরিয়েছি, সেই দয়াময় নিশ্চয়ই
আমাদের পারাপারের ব্যবস্থা করে দেবেন !

ঈশান—এ বনটায় বাঘ ভালুক যেন বেশী দেখা যাচ্ছে প্রভু !

সনাতন—(বৃহৎ হাসিয়া) আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম ঈশান, বনে বাঘ-
ভালুকের উপদ্রব হ’বে, দস্তাও থাকতে পারে ; যদি যেতে চাও তো
সঙ্গে কিছু নিও না। দেখ, প্রাণ-ভয় যদি থাকে তো এখনও ফিরে
যাও।

ঈশান—(সনাতনের পা ছু'টি ধরিয়া) প্রভু, আপনি জানবেন, এ ঈশান মৃত্যুকে ভয় করে না। আগে ঈশান বাঘের কবলে মরবে, তারপর আপনি।

সনাতন—(হাসিতে হাসিতে ঈশানের হস্তধারণপূর্বক) ঈশান, আমার অত শ্রদ্ধা করে না। তোমার ঐ স্নেহ আমার ক্ষতি করতে পারে। আজ তুমি আমার ভৃত্য নও—আমরা উভয়েই শ্রীগৌরদেবের ভৃত্য। তোমার কথায় আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি,—আমার প্রতি তোমার আন্তরিক আকর্ষণ কতখানি! (ঈশান উঠিয়া দাঁড়াইলেন।)

ঈশান—প্রভু চলুন; আমরা আর একটু এগিয়ে যাই। সন্ধান করে দেখি গে, যদি নিকটে কোন আশ্রয় থাকে।

সনাতন—তাই চল ঈশান। আশ্রয় পেলে তুমিও একটু ঘুমিয়ে বাঁচবে। আমার জন্তে তোমারও কষ্ট হচ্ছে।

[উভয়ে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় জনৈক পথিককে তাঁহাদের দিকে আসিতে দেখিতে পাইলেন।]

ঈশান—প্রভু, ঐ একজন কে আসছে এদিকে। খুব দ্রুত-গতিতে আসছে দেখছি!

সনাতন—তবে তো এই বনপথে লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে।

পথিকের প্রবেশ

পথিক—কে তোমরা, এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো? কোথা যাবে?

সনাতন—আমরা কোথা যাব তার ঠিক নেই। কাল প্রভাত হ'লে ঐ নদী ও পাহাড়টা পার হ'য়ে আরো দূরে যাব—এই ইচ্ছা।

ঈশান—ওগো পথিক ভাই, এখানে কোন লোকের বসতি আছে?

পথিক—তা' এখানে তোমরা ভুইঞা সর্দারের বাসায় গিয়ে থাকতে পার। ভুইঞা অতি সজ্জন লোক। অতিথি ফকির তার দ্বারে গেলে সে খুব খাওয়ায়,—খুব যত্ন করে।

ঈশান—(সনাতনের প্রতি) তা'হলে প্রভু, উপায় হয়েছে। ঐ ভুইঞা সর্দারের কাছেই আজকের রাতের মত আশ্রয় নেওয়া যাক।

সনাতন—তাই হোক। হ্যাঁ বাবা পথিক, দয়া করে আমাদের ঐ ভুইঞা সর্দারের বাড়ীতে পৌঁছে দিতে পার?

পথিক—তা' আর পারব না কেনে গো? তোমরা তো দরবেশ আছো। তোমাদের একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবো বৈকি!

ঈশান—(হাস্তমুখে) ভাই, তোমার দয়ার তুলনা নেই। তবু একটা আশ্রয় পেলে প্রভুর ও আমার অনেক কষ্টের লাঘব হবে। ক’দিন ধরে প্রভুর খাওয়া-দাওয়া ভাল হয় নি—ঘুমও তথৈবচ। চল ভাই, আমাদের এগিয়ে দেবে।

পথিক—এসো। খুব বেশী দূর নয়,—কাছেই। (সকলের প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য

পাতড়া পর্বত

ভুইঞা সর্দারের বাটী

[সনাতন ও ঈশানের বিশ্রাম-কক্ষ]

সনাতন ও ঈশানের প্রবেশ। উভয়ের পালঙ্ক-শয্যায় উপবেশন।

সনাতন—ঈশান, এ ভুইঞা সর্দার আজ আমাদের এত কেন যত্ন করুল বলতে পার ?

ঈশান—লোকটা খুবই ভাল মানুষ,—একেবারে সরল সাদাসিদে।

সনাতন—না ঈশান, আমার তা’ মনে হয় না। এরা বনে বাস করে, বস্ত্র পণ্ডবধ ও কাঠ-কুটো কেটে বাজারে বিক্রয় করে’ সংসার চালায়। এরা এতো সভ্যতা কোথা থেকে শিখলো ?

[ঈশান ঘুম-ঘোরে শয্যার এক পার্শ্বে গুইয়া পড়িল।]

সনাতন—(ঈশানের দিকে তাকাইয়া) যাঃ ঈশান ঘুমিয়ে গেছে ? ওঃ এতদিনে তবে ঈশান একটু ঘুমিয়েছে। কিন্তু কই আমার তো ঘুম আসছে না ? (পালঙ্ক হইতে উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে) আমার মনে হয়, এরা এভাবে পথিককে আশ্রয় দেয় ও তার খুব সেবা-যত্ন করে ; মধ্যরাত্রে পথিকের যথাসর্বস্ব লুটপাট করে তাকে হত্যা করে। নইলে আমরা এর কোন আত্মীয় নই, বন্ধু-বান্ধব নই,—সম্পূর্ণ অপরিচিত ; আমাদের প্রতি এর এত আদর-আপ্যায়ন কেন ? কিন্তু আমরা তো দরবেশ, আমাদের আর কি আছে ; কি নেবে সে ? কিসের আশায় সে এত যত্ন করুল ? আবার পালঙ্কের গদিতে উত্তম শয্যা বিছিয়ে দিয়েছে ? এ সব কিসের জ্ঞান ? আমাদের কাছে কিছু থাকলে তো সে নেবে ? আমার কাছে তো একটা কাণা কড়িও নেই ? তবে কি ঈশান

কিছু এনেছে ? না,—সে তো আনবে না ; সে যে আমার একান্ত
অনুগত, বিশ্বস্ত । আমি যে তাকে কিছু আনতে নিষেধ করেছি ।
(ঈশানের দিকে তাকাইয়া) আজ খুব ঘুমিষে গেছে । ঘুমোও !
ঘুমোও !...ক’দিন তোমার মোটেই ঘুম হয় নি ।

(ঈশানের পার্শ্বে শয্যায় উপবেশনপূর্বক মাথায় হাত রাখিয়া)

তাইতো, এ চিন্তা তো মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না । কেন,
কেন,—ভূইঞা আমাদের এত যত্ন করল ?—নিশ্চয়ই কিছু পাবার
আশায় ! (সহসা পালঙ্ক হইতে উখিত হইয় ঈশানের ঘুম
ভাঙ্গাইবার জন্ত গায়ে হাত দিয়া ঠেলিলেন ।)

—ঈশান,...ও ঈশান !

(ঈশানের ঘুম ভাঙ্গিল ও উঠিয়া বসিল ।)

—তুমি কিছু সঙ্গে এনেছো ?

ঈশান—(নিরুত্তর ।)

সনাতন—যদি কিছু এনে থাক তো দাও ! এখনও উপায় আছে, নইলে
আজ রাত্রেই আমাদের জীবন যাবে !

ঈশান—(ভয়ে ভয়ে) প্রভু, আপনার পথে কষ্ট হবে বলে কিছু এনেছি ।

সনাতন—কই দেখি ?—কি এনেছো ?

(ঈশান তাহার ছিন্ন-কন্বার মধ্য হইতে আটটি মোহর বাহির
করিল ।)

ঈশান—(মোহর হাতে করিয়া) এই আটটি আছে ।

সনাতন—(মোহর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া) এঁ্যা, মোহর ! কি করেছো,
ঈশান ! যাক্ সাতটি আমায় দাও । একটি মোহর তোমার কাছে
রেখে দাও । ঐটি তোমার যাতায়াতের পাথেয় হবে । তুমি বাড়ী
ফিরে যাও ঈশান । আমি ধর্ম্ম-পথে চলেছি, আমার মতে—‘অর্থম্
অনর্থম্’ । আর তুমি অর্থ-সঞ্চয়ের পথ অনুসরণ করেছো । এ ছ’টি
পথ সম্পূর্ণ পৃথক্ । ঈশ্বর-সেবী ও সংসার-কামী—উভয়ের একমত
হতে পারে না । অর্থের দ্বারা প্রাকৃত দ্রব্য হয়, আর ভক্তির দ্বারা
ঈশ্বর লাভ হয় । ঈশান, তুমি ফিরে যাও,—এ সাতটি মোহর
আমি এখনই ভূইঞাকে দিয়ে দিচ্ছি । আর কোন ভয় থাকবে না,
—প্রাণে বেঁচে গেলে !

ঈশান—(লজ্জায় অধোমুখে বিনীত হয়ে) প্রভু ! (চোখে জল আসিল ।)

[ঈশান তাহার প্রভু সনাতনকে সাতটি মোহর দিলেন ও সনাতন তাহা গ্রহণ করিলেন ।]

সনাতন—(ঈশানের পিঠ চাপড়াইয়া) তুমি ছুঃখ করো না । তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে না । যদি আমার মঙ্গল চাও, তো দেশে ফিরে যাও । সেখানে গিয়ে গৌরসুন্দরের সেবা কর গে ।

ঈশান—(সনাতনকে প্রণাম করিয়া) প্রভু, তবে চল্লাম । বিদায় ।...
(কাঁদিতে কাঁদিতে)

সনাতন—(ঈশানের মাথায় হাত দিয়া) কৃষ্ণে মতিরস্তু !

(ঈশানের প্রস্থান ।)

সনাতন—(ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া কক্ষের দরজা হইতে) সর্দারজী !
সর্দারজী !

ভূইঞা সর্দার—(নেপথ্যে) কে, কে ডাকছে ?

সনাতন—আজ্ঞে, আমি আপনার আশ্রিত পথিক । একবার আসুন ।

ভূইঞা সর্দার—(নেপথ্যে) যাই ।

[কালো বস্ত্র গায়ে ঢাকা দিয়া ভূইঞা সর্দারের ছুরিকা-হস্তে প্রবেশ]

ভূইঞা সর্দার—কি বলছ বাবা ?—এত রাত্রে ডাকাডাকি ?

সনাতন—এই নিম্ন ।...এই সাতটি মোহর আমার সঙ্গী ব কাছে ছিল ।

(ভূইঞা সর্দারকে মোহর প্রদান ও সর্দার-কর্তৃক তাহা গ্রহণ ।)

ভূইঞা সর্দার—(হাসিতে হাসিতে) বেশ বাবা বেশ ! ভাগ্যি আমায় এই মোহর ক'টা দিয়ে দিলে, নইলে দেখছো এই ছোরা !...
(ছোরা বাহির করিয়া দেখাইল) । আজ রাতেই তোমাদের খুন করে মোহরগুলো সব নিয়ে নিতাম । আমরা গুণ্ডাতে জানি বাবা, তোমরা যখন এলে তখন আমি গুণ্ডে দেখে নিয়েছি, তোমাদের কাছে কি আছে ! যাক্, বেঁচে গেলে !

সনাতন—সর্দারজী, আমার প্রার্থনা—আমাকে ঐ পাহাড় ও নদীটা পার করে দিতে হবে ।

ভূইঞা সর্দার—বেশ বাবা, তা' পার করে দিচ্ছি চল । তোমার সঙ্গীটা কই ?

সনাতন—সে দেশে ফিরে গেছে ; আমি একাই আছি ।

ভূইঞা সর্দার—আচ্ছা বাবা দরবেশ এসো ।

সনাতন—চলুন সর্দারজী ! (উভয়ের প্রস্থান ।)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিস্তুরঞ্জন মণ্ডল

সমিতি-সমাচার

বিবাহ-তিথি

বিগত ৭ই পৌষ মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তে সমিতির পক্ষ হইতে জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্ত্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সপ্ত-বিংশ-বার্ষিক বিবাহ মহোৎসব বিশেষ আন্তির সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এই পরমতিথি সমিতির সকল শাখামঠে আরাধিত হইলেও, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে, ঠাহার বিবাহ পূজা তাঁহারই অন্তরঙ্গ প্রিয়তম ভক্ত অস্মদীয় শ্রীল পরমারাধ্যতমদেবের উপাস্থতিতে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে। শ্রীতবাণীর সহায়তায় তিনি বিবাহ-মাধুর্যালোলুপ ভক্তভৃঙ্গগণের কণ্ঠকূহরে ভব-মহাদাবাগ্নি নিৰ্ব্বাপণে মহাবারিরূপ স্নহীতল বাণী বর্ষণ করেন। সমস্ত দিন বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী হইতে কীর্তিত বিবাহবাঞ্ছক গীতি, শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী, বৈকুণ্ঠ-পথ-নির্দেশক তাঁহার অমূল্য পত্রাবলী ও ভাষণ-বক্তৃতাди পাঠে মুখরিত আশ্রমস্থলী 'বপু' অপেক্ষা মহাজন-বাণী'র আদর শিক্ষা দেয়। ঐদিন মধ্যাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ ভোগ-রাগ নিবেদনান্তে সমাগত প্রায় ৩০০ শত সজ্জন বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনের স্বযোগ লাভে আপনাদিগের জীবন ধন্য করিয়াছেন। সন্ধ্যায় একটী বিশেষ সভায় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ উপস্থিত বহু সজ্জনবৃন্দের সমক্ষে 'বৈষ্ণব-জগতে বিবাহ-দর্শন' ব্যাখ্যামুখে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব

বিগত ১৫ই পৌষ বুধবার দ্বাদশ গোপালের অত্যন্ত শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব সমিতির নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে যথারীতি পালিত হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি এই যে, সমিতির মূলকেন্দ্র পূর্বোক্ত মঠটী যে স্থানের উপর অবস্থিত সেই স্থানেই শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের পাটবাড়ী ছিল। পণ্ডিতের অভিমানে অভিমানী শ্রীদেবানন্দ পাণ্ডিত জাগতিক মুখতার মানদণ্ডে শ্রীবাস পণ্ডিতকে মুখজ্ঞানে অপমান করায় ঘোরতর বৈষ্ণব-অপরাধে নিপতিত হন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীমন্নহাপ্রভু কোলদ্বীপে (বর্তমানে শহর নবদ্বীপ) আসিয়া তাঁহাকে সেই অপরাধ হইতে মুক্ত করেন। তাঁহার জীবনী হইতে জানিতে পারা যায়, বৈষ্ণব-অপরাধ কিরূপ ভয়াবহ! জগৎকে ঐরূপ ভয়াবহ অপরাধ হইতে সাবধান ও মুক্ত করিতে সমিতি এই তিথির প্রতি বৎসরই অনুস্মরণ করেন। ঐ দিন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে বৈষ্ণব-অপরাধের

বিবিধ দৃষ্টান্ত পঠিত হয়। শাস্ত্রে সর্বত্রই এইরূপ বৈষ্ণব-অপরাধীর অশেষ দুর্দশা বর্ণিত আছে। হে সজ্জন পাঠকবর্গ! আসুন, আমরা এই তিরোভাব তিথিআগমনের পূর্বেই বিগত ৭ই পৌষ যে তিথিবরা বন্ধজীবের শৃঙ্খল মোচনে আবিভূত হইয়াছিলেন তাহার আশ্রয় গ্রহণ করি। তাহা হইলে আমাদের আর বৈষ্ণব-অপরাধে পতিত হইতে হইবে না; জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত অপরাধরাশি বিদূরিত হইবে; আমরা নিত্য নবায়মান ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিব।

শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীর মঠে

শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব

১৬ই পৌষ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ-চতুর্থী তিথিতে সমিতির চুঁচুড়াস্থ মঠে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব গত হইয়াছে। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরও দ্বাদশ গোপালের অহুতম। তদানীন্তন সমাজচ্যুত বঙ্গের সুবর্ণ-বণিক-কুলকে উদ্ধার করিয়া তিনি তাহাদিগকে শ্রীগৌরসেবার অধিকার প্রদান করেন। সুতরাং এই স্মৃতিময়ী তিথি আমাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী হউক। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর আমাদিগকে অপরাধের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া গৌরসেবায় অধিকার দান করুন—ইহাই তাঁহার নিকট আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদ

সাহিত্য শ্রাদ্ধ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে

২৪ পরগণা জেলার লক্ষ্মীজনাৰ্দ্ধনপুর গ্রামনিবাসী সমিতির আশ্রিত শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার দাসাধিকারী মহাশয় জ্যেষ্ঠত্ব ভগিনীসহ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠেআগমন করিয়া বৈষ্ণব স্মৃতি অনুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাতের পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি তদীয় লোকান্তরিত দিবস হইতে একাদশাহে ১৫ই অগ্রহায়ণ সমাপন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহাশয় যদিও সমিতির আশ্রিত ছিলেন না, তথাপি সমিতির আচার-প্রচার ও সেবকগণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এজন্য তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সামাজিক আচার পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মঙ্গলের পথ-প্রদর্শক শ্রীবৈষ্ণব-স্মৃতির আনুগত্য গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার বিগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

আলমবাজারে

গত ১২ই পৌষ আলমবাজারের ৪৪ নং এস, পি, ব্যানার্জি রোডে শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র বসু মহাশয় দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর পৃথিবী হইতে বিদায়-

গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী অমলারানী বহু ধর্মপ্রাণা ও বুদ্ধিমতী। তিনি বহুকাল যাবৎ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যপাদপদ্মের নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন এবং বিবিধভাবে তাঁহার সেবা করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গত গৌর-পূর্ণিমার সময় শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রীনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র বসু মহাশয় অবশ্য তাদৃশ সৌভাগ্য অর্জন না করিলেও সমিতির আচার-প্রচারে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বসুর স্বজনাখ্যবন্দ তাঁহার বিগত আত্মার প্রতি প্রেত-শ্রাদ্ধের ইচ্ছা করেন। কিন্তু তেজস্বিনী শ্রীমতী বসু এই প্রকার প্রেত-শ্রাদ্ধে যে আত্মার কল্যাণ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার আরও অকল্যাণ হয়—জানিয়া বিগত-সাত্ত-স্মৃতি শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিকৃত শ্রীহরিভক্তি-বিলাস ও শ্রীসংক্রিয়াদারদীপিকা অনুসারে সাত্তত শ্রাদ্ধ করিতে প্রয়াসী হন। স্বজনাখ্যবন্দের পীড়নে প্রেতশ্রাদ্ধই প্রায় একপ্রকার সাব্যস্ত ছিল। কিন্তু প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে ধর্মপ্রাণা শ্রীমতী বসু অবৈধ স্মার্ত আচারের প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি নিম্প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের নিকট বিগত সাত্ত-স্মৃতির সহায়তা প্রার্থনাপূর্ব্বক দূত প্রেরণ করেন।

সংবাদ পাইবামাত্র পরম রূপালু শ্রীল আচার্য্যদেব চতুর্দশ মূর্ত্তি বৈষ্ণব-সহ আলমবাজারে শুভবিজয় করেন; উদ্দেশ্য—বিগত সাত্ত-স্মৃতির প্রচারে জগতের মঙ্গলসাধন। দেহত্যাগের একাদশ দিবসে (২২শে পৌষ) এই শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান বিহিত হয়। বিরাট বেদী-মণ্ডপে হোম, যাগ-যজ্ঞ, বেদপাঠ ও হরি-কীর্ত্তনে গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। এই সাত্ত-অনুষ্ঠান দর্শনের জন্ত পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলদি হইতে বহু দর্শকের সমাগম হয়। সকলেই এই অনুষ্ঠানে বিরাট হোম-যাগ-যজ্ঞ দর্শনে বলিতে থাকেন,—“এইরূপ বিরাট ব্যাপার ত আমরা কোথাও দেখি নাই। আমাদের কুল-পুরোহিতগণ ত এরূপ করেন না। তাহারা তাহা হইলে এই প্রকার অজ্ঞানতা ও ফাঁকির সাহায্যেই আমাদের দারুণ অকল্যাণই আনয়ন করেন।” অনেকে সভাস্থলে তাহাদের মৃত স্বজনাদির জন্ত এই প্রকার শ্রাদ্ধ করিতে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের নিকট অভিলাষ জ্ঞাপন করেন।

জীব যতই অধোগতি লাভ করুক না কেন, ভগবৎপ্রসাদ সকলকেই নিবেদন করা যাইতে পারে এবং একমাত্র তাহাতেই জীবের মঙ্গল, ভূত-প্রেত-রাক্ষস-শ্রাদ্ধে নহে। শ্রাদ্ধান্তে শ্রীমতী বসু সকল দর্শককেই আকর্ষণ বিচিত্র মহা-প্রসাদ সেবন করান। শ্রীমতী বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ননীগোপালও এই বিচারে অতীব শ্রদ্ধালু। বিগত আত্মার সহিত সকল গোষ্ঠী কল্যাণ লাভ করুন—ইহাই পরম করুণাময় পরমেশ্বরের শ্রীচরণসরোজে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

—প্রচার-সম্পাদক

শ্রীশঙ্করগোবিন্দো নমত:



৬শ বর্ষ }

মাঘ, ১৩৭১

{ ১২শ সংখ্যা




শ্রীপিছলদা গোড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণ

১ম কক্ষে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, ২য় কক্ষে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কাৰ্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেবক্লিয়ারা, নবদ্বীপ (নদীয়া)

ধর্মঃ স্মৃষ্টিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাস্থি যঃ	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরন্বোধক্জে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা ময়াহ্মাঃ স্মৃত্রসীদতি ॥</p>	নোংপাদয়োবাধি স্মৃতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥
সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।	<p>অথ ধর্মঃ স্মৃষ্টিরূপে পালে যেই জন । অধোদক্জে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূত্ব ॥ হরি-কথায় রুচি নৈলে পও সেই শ্রম ॥ </p>	নোংপাদয়োবাধি স্মৃতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

১৬শ বর্ষ } গভোদশায়ী, ২৬ মাঘ, ৪৭৮ গোঁরাব্দ { ১২শ সংখ্যা
 শুক্রবার, ২৯শে মাঘ, ১৩৭১; ইং ১২।২।১৯৬৫

ମାନ୍ବୁବାଦଂ

শ্রীমার্কণ্ডেয়কৃতঃ শ্রীশ্রীনারায়ণ-স্তুত-দশকম্
(শ্রী শ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে
অষ্টমেহধ্যায়েষু - ৪০-৪৯)

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচঃ

किं वर्णये तव विभो यद्दीरितो हसः
संप्रपन्नते तमन्नु बाङ्मनइन्द्रियाणि ।
संप्रपन्नस्ति वै तन्नुभूतामज्जशर्बयोश्च
अस्थाप्यापि भजतामसि भाववक्त्रः ॥१॥

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বিভো ! আপনার প্রেরণাবশতঃ নিখিল প্রাণিগণ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং আমার প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে এবং সেই প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করিয়াই বাক্য, মন ও অস্থান্য ইন্দ্রিয়গণও স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, তথাপি আপনি ভজনরত পুরুষগণের আত্মবন্ধুস্বরূপ ; আমি আপনার কি স্তুতি করিব ॥১৥

মুখী ইমে ভগবতো ভগবৎপ্রিলোক্যাঃ

ক্ষেমায় তাপবিরমায় চ মৃত্যুজিতৈ ।

নানা বিভষ্যবিতুমশ্চতনূর্যথৈদং

সৃষ্ট্বা পুনগ্রাসসি সর্বমিবোর্ণনাভিঃ ॥২॥

হে ভগবন্! আপনার এই মূর্তিযুগল ত্রিলোকের পালন, দুঃখ-নিবৃত্তি ও মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। আপনি এই বিশ্বের পালনের জন্য যেরূপ নানাবিধ বিগ্রহ স্বীকার করেন, সেইরূপ উর্ণনাভির সূত্র-সৃষ্টির আয় বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া পুনরায় স্বয়ংই তাহা গ্রাস করিয়া থাকেন ॥২॥

তস্ম্যাবিতুঃ স্থিরচরেশিতুরজ্জ্বমূলং

যৎস্বং ন কৰ্ম্মগুণকালরজঃ স্পৃশন্তি ।

যদৈ স্তবন্তি নিনমন্তি যজন্ত্যভীক্ষং

ধ্যায়ন্তি বেদহৃদয়া মুনয়স্তদাশ্রিত্য ॥৩॥

হে ভগবন্। গুণ-কৰ্ম্ম-কালজনিত পাপরাশি বা অন্যান্য তাপাদি দুঃখ যাঁহার আশ্রিতজনকে অভিভূত করিতে পারে না, দেদরহস্তজ্ঞ ঋষিগণ তৎপ্রাপ্তির জন্যই নিরন্তর যাঁহার স্তব, প্রণাম, আরাধনা ও ধ্যান করিয়া থাকেন, আমি স্থাবর-জঙ্গমান্তর্যামী, ভগৎপালনরত সেই আপনার পাদমূলের আরাধনা করিতেছি ॥৩॥

নাম্মাং তবাজ্ব্য পুনয়াদপবর্গমূর্তেঃ

ক্ষেমং জনশ্য পরিতো ভিয় ঈশ বিদ্বাঃ ।

ব্রহ্মা বিভেত্যলমতো দ্বিপরাধীধিষাঃ

কালশ্চ তে কিমুত তৎকৃতভৌতিকানাম্ ॥৪॥

হে ঈশ! সর্বত্র ভয়শীল জীবগণের পক্ষে অপবর্গস্বরূপ আপনার শ্রীচরণপ্রাপ্তিব্যতীত অণু কোনরূপ মঙ্গল আমরা অবগত নাহ। দ্বিপরাধীকালস্থায়ী ব্রহ্মাও ভবদীয় অবিজ্ঞানরূপ কালের নিকট অতিশয় ভীত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাদৃশ ব্রহ্মবিরচিত প্রাণিগণের কথা আর কি বলিব ॥৪॥

তদৈ ভজামাতধিয়স্তব পাদমূলং
 হিত্বেদমাত্মচ্ছদি চাত্মগুরোঃ পরম্ ।
 দেহাত্মপ্যর্থমসদন্ত্যমভিজ্ঞমাত্রং

বিন্দেত তে তরহি সর্বমনীষিতার্থম্ ॥৫৥

অতএব আমি আত্মাবরক, তুচ্ছ, বিনশ্বর, স্বরূপতঃ আত্মবাতীত
 পৃথক্ সত্তারহিত এই দেহাদির সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্বক সত্যজ্ঞান-
 সম্পন্ন জীবনীয়ন্তু স্বরূপ পরম পুরুষরূপী আপনার পাদমূল ভজন
 করিতেছি। মানবগণ আপনার সেবা করিলেই আপনার নিকট
 হইতে সর্বাভীষ্টলাভ সমর্থ হইয়া থাকেন ॥৫॥

তে রজস্শম ইতীশ তবাত্মবন্ধো
 মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োদয়হেতবোহস্ম্য ।
 লীলাধ্বতা যদপি সত্ত্বময়ী প্রশান্তৈস্ত্য
 নাশ্চে নৃণাং বাসনমোহভিযশ্চ যাভ্যাম্ ॥৬॥

হে অনাথজীববন্ধো ! জগদীশ ! যদিও আপনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-
 স্থিতি-সংহার-কারণরূপে সত্ত্ব-রজস্তমোগুণরূপ মায়াময় লীলাসমূহ
 স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি সাত্ত্বিকী লীলাই মানবগণের মোক্ষহেতু
 হইয়া থাকে। বাসন ও মোহজনক রাজস-তামস-লীলাসমূহ মোক্ষ-
 জনক হয় না ॥৬॥

তস্মাৎ তবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং
 শুক্রাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি ।
 যদবৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং
 লোকো যতোহভয়মুতাত্মসুখং ন চান্যৎ ॥৭॥

হে ভগবন্ ! যে সত্ত্বগুণ হইতে বৈকুণ্ঠপদ অভয় এবং আত্মসুখ
 লাভ হইয়া থাকে, ভক্তগণ যেহেতু সেই সত্ত্বগুণকেই ঈশ্বরের স্বরূপ
 মনে করেন— ইতর গুণদ্বয়কে তাহা মনে করেন না, সেইজন্য
 বিবেকিগণ ইহজগতে স্বাভীষ্ট ভবদীয় শ্রীনারায়ণ-সংজ্ঞক বিশুদ্ধ-
 বিগ্রহ এবং ভবদীয় নিজগণের মধ্যে নরসংজ্ঞক শুদ্ধবিগ্রহের উপাসনা
 করিয়া থাকেন ॥৭॥

তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষায় ভূয়ে

বিশ্বায় বিশ্বগুরবে পরদৈবতায় ।

নারায়ণায় ঋষয়ে চ নরোত্তমায়

হংসায় সংযতগরে নিগমেশ্বরায় । ৮।

হে ভগবন্ ! অতএব আমি বিশ্বমুক্তি, বিশ্বগুরু, পরম দৈবত, সর্বব্যাপী পুরুষস্বরূপ ভগবানকে এবং নিশুদ্ধ সংযতবাক্য, বেদমার্গ-প্রবর্তক নরোত্তম নারায়ণ ঋষিকে প্রণাম করিতেছি । ৮।

যং বৈ ন বেদ বিতথাক্ষপথৈর্ভ্রমদ্বীঃ

সন্তুং স্বকেদমুশু হতাপি দৃক্পথেষু ।

তন্মায়য়াবৃতমতিঃ স উ এব সাক্ষা-

দাত্তান্তবাখিলগুরোরূপসাত্ত বেদম্ ॥৯॥

কপটেন্দ্রিয়মার্গে বিভ্রান্তবুদ্ধি যে ব্যক্তি ভবদীয় মায়াকর্তৃক আবৃতমতি হইয়া স্বকীয় ইন্দ্রিয়াদি-করণসমূহ, রূপাদি বিষয়রাশি এবং আত্মহৃদয়মধ্যে নিরন্তর অবস্থিত আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন না, সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই জগদগুরুরূপী আপনার প্রবর্তিত বেদজ্ঞান-লাভ করিয়া আপনাকে সাক্ষাদ্ভাবে অবগত হইয়া থাকেন ॥৯॥

যদ্বদর্শনং নিগম আত্মবহঃপ্রকাশং

মুহুন্তি যত্র কবয়োহজপরা যতন্তুঃ ।

তং সর্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং

বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগূঢ়বোধম্ ॥১০॥

হে ভগবন্ ! একমাত্র বেদেই ভবদীয়-রহস্ত-প্রকাশক জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, অতুখা ব্রহ্মপ্রমুখ জ্ঞানিগণও সাংখ্য-যোগাদিমার্গে চেষ্টাযুক্ত হইয়াও ভবদীয়স্বরূপবিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন । আপনি সাংখ্যাদিবাদিগণের বিভিন্ন বাদানুযায়ী বিষয়সমূহের অনু-সরণে বিভিন্ন স্বভাব প্রকটিত করিতেছেন । জীবের নিকট দেহাদি উপাধিসমূহে ভবদীয় স্বরূপজ্ঞান নিগূঢ় রহিয়াছে । আমি মহাপুরুষ-রূপী আপনার বন্দনা করিতেছি ॥১০॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গী জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শাখা মঠ

শ্রীরূপসনাতন গৌড়ীয় মঠ

দানগলি, সেবাকুঞ্জ মোহল্লা

পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) উত্তর প্রদেশ

শ্রীভক্তি বেদান্ত গৌড়ীয় মঠ

সন্ন্যাস রোড, কনখল

হরিদ্বার (উত্তর প্রদেশ)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরান্দো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

প্রধান কেন্দ্র

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পশ্চিম বাংলা

শাখা মঠ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ

পোঃ + জিলা — মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

সূত্র-বিদ্বেশ

(পূর্ব প্রকাশিত ১৬শ. ১১শ সংখ্যা, ৪১১ পৃষ্ঠার পর)

শাস্ত্রবলেন —

নিন্দাং কুর্যন্ত-যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং ।

পতন্তি পিতৃভিঃ সাক্ষিং মহারৌরবসংজ্ঞিতং ॥

বৈষ্ণব-বিদ্বেশী জীবকুলকে মহারৌরব হইতে উদ্ধার করা এবং তাহা-
দিগের পিতৃপুরুষগণকে নরক হইতে উদ্ধার করিবার জগৎ মহাকরুণাবারিধি
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-চরণাশ্রিত ঐকান্তিক গোড়ীয়ভক্তগণ পৃথিবীর সর্বত্র কয়েক
বৎসর পূর্ব হইতেই নিগুণ ভগবন্মিকেতন শ্রীগোড়ীয় মঠরাজি প্রকট
করাইতেছেন। এই গোড়ীয়মঠসমূহের উদ্দেশ্য বৃষিবার শক্তি আত্মবিদের
আছে—আত্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণেরই আছে, অস্বর্ণাপর সক্ষীর্ণ সম্প্রদায়সমূহের
নাই। এ কথা জানিয়া গুনিয়াও মায়ামোহিত অক্ষজ্ঞানবাদীর সজ্জায়
দিবস্তুগাদাবলম্বনে গোড়ীয়মঠকে লোকচক্ষে নিন্দিত করিবার প্রয়াসে যে-
চেষ্ঠা তাহা কিরূপ শ্রেণীর লোকের হৃদয়ে অধিকার করিয়াছে তাহা ধীর
পাঠকগণ নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করুন। ‘ভারতবর্ষের’ জনৈক বনাম লেখকের
ধারণাগত শ্রীগোড়ীয় মঠ প্রজন্মকারী সমিতি মাত্র নহেন, ইহা জানিয়া
গুনিয়াও “ভারতবর্ষের” বনামী লেখক গোড়ীয় মঠের আদাড়ে পঁদাড়ে
থাকিয়া তাহার নিজস্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। বৈশাখের “ভারতবর্ষ”
এই কথাগুলি তাহার অঙ্গেই ছাপ লাগাইয়াছেন—“কিন্তু বর্তমানকালে
ব্রাহ্মণ হওয়া খুবই সহজ, কিছু সূত্র তাহা চরকা কাটাই হউক কিংবা
পুরাতন কাপড়ের পাড় ছিড়িয়াই হউক গলাই ঝুলাইলেই হয়। আমার
বাড়ীর পাশে গোড়ীয় মঠ বলিয়া একটা সমিতি আছে। দেখিতে পাই যে,
এই সূত্র গলায় জড়াইয়া দিয়া যাহাকে তাহাকে যখন তখন ব্রাহ্মণ করা
হইতেছে।”

গোড়ীয় মঠের পাশের বাড়ীওয়ালা বলিয়া পরিচিত বনাম-লেখক মঠ
স্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছেন তাহা পৃথিবীর সাতটা আশ্চর্য্যের পর অষ্টম
স্থান অধিকার করিয়াছে। কে তিনি, মঠের কোন পগারের পাশে তাহার
বাড়ী আমরা এখনও নিরূপণ করিতে পারি নাই। রেডিকলের ধোঁয়ায়
তাহার ইন্দ্রিয়জ্ঞান অনেকটা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে এ কথা প্রত্যেক সত্য-
প্রিয় ব্যক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য।

“শালুক চিনিয়াছেন, গোপাল ঠাকুর”—কথাটা এতদেশে বহুলভাবে প্রচারিত আছে। এক ছানিপড়া বৃদ্ধা শ্রীক্ষেত্রে গিয়া শ্রীজগন্নাথ দেখিবার পরিবর্তে মণিকোটায় পুঁইমাচা দেখিয়া ফিরিয়াছিলেন, এক নরহত্যাকারী ফেরারী আসামী হইয়া জাগ্রত ও স্বপ্নকালে, সর্বদাই তাহাকে ধরিতে আসিতেছে এই আতঙ্কে মগ্ন ছিলেন, আবার A brdeen College এর গ্রীকের অধ্যাপক Blackey সাহেব বলিয়াছিলেন—মুচি তাহার চামড়া দিয়াই সকল উদাহরণ দেয়, উদ্ভিৎতত্ত্ব যে ভাবে বৃক্ষলতাাদি দর্শন করেন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সেরূপ বস্তুর স্বরূপনিরূপণ করিতে অসমর্থ। নাস্তিকগণের ঈশ্বরালোচনায় যাবতীয় বশ্ত বস্ত্ত আসিয়া আবরণ করে। মরীচিকায় জল-প্রান্তি, রজ্জুতে সর্প-প্রান্তি প্রভৃতি বিবর্তের উদাহরণগুলি আমাদের দেশের মূর্খ চাষিগণও বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু জড়বিলাসপ্রমত্ত অসত্য স্বপ্ননরত—‘পুরোণো শিশি বোতল আছে বিক্রী ? খোলার ঘরের ভাড়াটীয়া অধুনা প্রাসাদবাসী আলুপটল ফিরিওয়ালা, পাটের দোকানদার সেগুলির মধ্য দিয়া নিজ নিজ ব্যবসায়রূপ রঙিন কাচের চশমা দিয়া যে রঙের কথা বলিয়া ফেলে সেগুলি আত্মবিদগ্ধের স্বন্ধে চাপাইতে গেলে বাস্তবিক সত্যের অমধ্যাদা করা হয়। সরকার বাড়ীর বুড়ো গিন্নি সর্ব্বশ্ব খোওয়াইয়া ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। ছেলে আদিকাল হইতে ফাষ্ট বুকের ক্লাশে এ, বি, সি পড়িতেন। পরে কনিংসক্সনে পড়িবার সময় সেই এ, বি, সি চিত্রে এ, বি, সি দেখিয়া বুড়োগিনী খেটা লইয়া তাড়া করেন আর কপাল ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে থাকেন—‘আমি ভগবানের কাছে কত আবদার করিয়া, সর্ব্বশ্ব খোওয়াইয়া তোকে লেখাপড়া শিখাইতেছিলাম; তুই কলেজে পড়িস্ বল্ছিস্ কিন্তু আমি দেখছি সেই এ, বি, সি আজও শেষ করিতে পারিস্নে’, বলিয়া করাঘাত করিতে লাগিলেন। আমাদের বনাম লেখক মহাশয়েরও গৌড়ীয়-মঠ-দর্শন ও মঠসম্বন্ধে ধারণা ঐরূপ। তিনি কাপড়ের পাড় ছেঁড়া ও চরকা কাটা স্মৃতাকেই বাজসনের বৈদিক শাখা কাত্যায়ন-গৃহসূত্রোক্তাবিধি বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন। তাহার আর দোষ দিব কি ! সম্প্রতি কেহ কেহ একায়ন শাখা হইতে চ্যুত হইয়া পরমহংস বেশ দেখাইতে গিয়া অবিবেচনাপাপে লিপ্ত থাকায় শ্রীশূদ্রসদৃশ ব্যবহার দ্বারা সত্যের আদর্শকে বিপন্ন করিয়াছেন। যাহাদিগের মুড়ি মিশ্রি বিশেষ করিবার যন্ত্র নাই তাহারা যন্ত্রণায় আবোল তাবোল কতই না বকিতেছেন ও দেখিয়া

ফেলিতছেন। মঠের পগারের ধারে বাসা করা পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা গোড়ীয় (পত্রিকা) কাগজখানা পাঠশালার ছেলেদের মত বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মত ভাল করিয়া পড়িয়া থাকিলে তিনি তাহার ঠান্ডির আমলের ভূতদেবার মত গোড়ীর মঠকে জুজু বলিয়া মনে করিতেন না।

সমাজ সম্বন্ধে কথা বলিতে গিয়া নিজে নিজেই তর্কপথে ভারতীয় স্মৃতি-শাস্ত্রগুলি, পঞ্চরাত্রগুলি ও গৃহ শ্রোতাদি সূত্রগুলি, পুরাণ ইতিহাসগুলি একটু পাঠ করার পরে ফকুড়ি করিবার জন্ম আসরে না নাগিলেই ভাল হইত। ব্যবস্থাপকের হ্রায় সামাজিক কথার গীমাংসা ও ধর্মসমাজের কোনও কথা না জানিয়া শ্রোতপথাবলম্বী কর্মজড় ব্রাহ্মণ বুঝিতে যাওয়া তাহার বিভাবুদ্ধি ও বিশ্বজনীন সহানুভূতির ব্যাঘাত করিয়াছে। অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত গোড়ীয় মঠবাসীর অজ্ঞ কোনও কৃত্য নাই। তবে অক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ-সম্পাদকচর ও কর্মযোগী-সম্পাদক বা গ্রামাচার্তাবহ হিতবাদী সম্পাদকের সহিত সমজ্ঞানে ফষ্টি নষ্টি করিয়া সমালোচনা করিতে না যাওয়াই ভাল ছিল। তাঁহার যেটুকু অধিকার সেই অধিকারটুকু ছাড়াইয়া মোড়ল-সাজিতে গিয়া বাচালতা করা ভাল হয় নাই। তাহার দেখা চরকার মাল তাহাকে বিপন্ন করিয়াছে মাত্র। ঐরূপ চরকার মাল গলায় দেওয়া লোকের নিকট তিন অনাদিকাল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নিজ চরিত্রে প্রতি-ফলিত করত প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নত হইতেও পারিতেন। তবে আনোহবাদ অবলম্বন করিয়া নিজ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব সাহায্যে যে পন্থা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তাহাকে একজন ব্রাহ্মণ-বিদ্যেধী নৈষ্ঠিক শূদ্ররূপে পরিচিত করাইয়াছে। ষা'হার বৃত্ত-ব্রাহ্মণের প্রতি এতাদৃশ বিদ্যেধ, সত্য পরমেশ্বর বস্তু তাহার প্রতি নিতান্ত নারাজ। ইহজন্মে যে বনাম লেখক কোনও সত্যের অনুসন্ধান করিবেন তাহা আশা করিতে পারা যায় না, কিন্তু বৈষ্ণবের পাদোদকের এরূপ ম হমা যে তাঁহার সংস্পর্শে যাবতীয় রিপু অল্পকালের মধ্যেই মিত্ররূপে পরিণত হয়। লেখক লিখিয়াছেন, 'যাহাকে তাহাকে' অর্থাৎ কেওকেটাকেও তাঁহার হ্রায় অসংখ্য নরশরীরধারীর নিত্য কল্যাণপ্রদ সাক্ষাদ ব্রহ্মবস্তু গুরু ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতীতি ঘটবে। তাহার হ্রায় সঙ্গীর্ণচেতা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃত বৈষ্ণবের অমর্যাদা করিতে গিয়া যে ছুরপনয়ে অপরাধে পতিত হইয়াছেন, সেই অপরাধ ফলেই পূর্বপুরুষদেহ শাস্ত্রমতে কোথায় নীত হইতেছেন দেখিলে তাহার এই অবৈধ পাপ-প্রবৃত্তিটা

কিছু প্রশমিত হইতে পারে। ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষকে শৌক্ৰ পদ্ধতি বিচার দ্বারা খেলার পুতুল করিলে আমাদিগকে আর 'সুরেন্দ্র' বলিবে না। গ্রাম্য রস-প্রিয়তার কলের দুর্গন্ধ গৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালীকে কখনই কলুষিত করিতে পারে না। ঔদ্ধত্য হইতে অবকাশ গ্রহণ করিতে পারিলেই তিনি বুঝিবেন যে শৌক্ৰপদ্ধতিকে 'বহুমানন' করিতে গিয়া বৈদিক বৃত্তপদ্ধতি অত সহজে আক্রান্ত হইবার বিষয় নয়। আর শাস্ত্রে অধোতী হইয়া সেই অক্ষয়তা ও শাস্ত্রজ্ঞান পারদর্শিতার সাহায্যে সুন্দরামল্ল-সন্তান বন্দীঘাটীর উপাধ্যায় পরিচয় কখনই শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণতায় পর্য্যবসিত করিবে না। সচরিত্রতা-বলে সত্যভাষিত্ব ও সরলতা শৌক্ৰ-পদ্ধতি অনুসারে জীবকে দেবশর্মা করায়; আর কল্যাণরহিত হইয়া অহঙ্কারে ক্ষীণ হইলেই আমাদিগকে রেড়ীর পেষণকার্য্যে ব্রহ্মণ্য আবদ্ধ বলিয়া প্রতীতি করায়। এ কারণ বেদশাস্ত্রকে আক্রমণ করায় যদি কাত্যায়ণগৃহসূত্রের মাইত্বে সমৃদ্ধ হয় তাহা হইলেও পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবগণ বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার শৌক্ৰ পদ্ধতির গুরুস্থানীয় মূলপুরুষ। কামকোষাদির কৈঙ্কর্য্যসূত্রে শ্রৌতপথে বিরোধী স্থাপন করিলে উইলসন হোটেলের বিরোধী পাচক-সমাজ স্থাপন হইবে মাত্র। পারস্য দেশীয় খান-সামা বঙ্গীয় পাচক শৌক্ৰপদ্ধতিজীবী সামাজিকগণের সহিত পরস্পর বিরোধী করিতে পারেন, কিন্তু তাহার সহিত শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বন্দীঘাটীর এক সুরেন্দ্র তনামধারী অথ দেবেন্দ্রকে বনামী ভাষায় আক্রমণ করিলে তাহার শাস্ত্রীয় জ্ঞানে অক্ষয় পদসেবা হইবে না; কেন না 'অক্ষয়' শব্দ 'অক্ষজ' মাত্র নহে। বনাম-লেখক জড়দর্শনের দ্রষ্টামাত্র। গৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক পরমাণু চিহ্নস্তাসিত পরার্থ বস্তু। সুতরাং লেখক মহাশয়ের ঔদ্ধত্য মঠের নিঃসারিত ধূলিকণাধারাই আবৃত হইতে পারিবে।

'যখন তখন' এই শব্দ লিখিয়া লেখক মনে করেন যে তাহার হায প্রস্তাবিত শৌক্ৰব্রাহ্মণত্বমাত্র গৌড়ীয় মঠের লক্ষ্য; কিন্তু এতাদৃশ ঘৃণিত চেষ্টা কোনও দিন গৌড়ীয় মঠকে বিপন্ন করে নাই। "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" এই প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণত্ব-প্রয়োগপ্রণালী কাত্যায়ণ-গৃহসূত্রের প্রযুক্ত বিষয় হইলেও বৃত্ত ব্রাহ্মণতা সার্বকালিক। বৃহদারণ্যক-উল্লিখিত, ছান্দোগ্য-উল্লিখিত, মহাভারত কথিত, ঐমন্তাগবত প্রতিপন্ন, পঞ্চরাত্রোক্তাসিত পহ্ল্যক্ষ্যপন্থী শাস্ত্রাধ্যয়নছলনারূপ অমৃতাশ্বর বিসর্গে কুলাইবে না। প্রকাশ্যভাবে দেবশর্মা নামের

যোগ্যতা লাভ করিয়া সত্য জানিবার চেষ্টা প্রত্যেক বৈদিক শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণে আছে। তাহার সহিত মেকী শূদ্রকল্পতাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভ্রান্ত হইতে হইবে না। এজন্তই শ্রীহরিভক্তিবিলাস লিখিয়াছেন—বিবাদযুগে ব্রাহ্মণব্রহ্মবর্ণ প্রকৃত বিষ্ণুভক্তগণের শত্রু হইয়া নিকষাতনয় রাবণকে বর্ণাশ্রম-ধর্মের গুরু করিবেন। শচীর ছলল তাঁহাদিগের নিকট একটু ছোট। দশরথতনয় রামচন্দ্র-পত্নী সীতাদেবী বিশ্বশ্রবাতনয়ের হরণের বস্তুবিশেষ। গোড়ীয় মঠ একপ বর্ণাশ্রমের কোনও মূল্যই জানেন না। শ্রীমন্মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এই কলিসম্মত বর্ণাশ্রম-ধর্মের আদর করেন না। সেজন্ত বাহজ্ঞানপ্রচারিত অচিদভিনিবিষ্ট ইন্দ্রিয়পর নাস্তিকগণের জন্ত যে নিরীশ্বরতাকে চাতুর্ভগ্যধর্ম বলিয়া নিরূপণ-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে তদ্বারা জীবের কোনও কল্যাণ সাধিত হয় না।

কোটি কোটি নিরীশ্বর ব্রাহ্মণ-জন্ম অপেক্ষা শৌক্রে কুলোদ্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতা সকল শাস্ত্রে সহস্রগুণে কীৰ্ত্তন করেন—ইহাকেই বলে গুণের আদর। আর সদগুণবিদ্যেয়ী, বিষ্ণুবিদ্যেয়ী, কপটযুক্তিপার মূর্খলোকের বঞ্চনার জন্ত যে অবৈধ কৌশল প্রচার করেন তাহা কখনই বর্ণাশ্রম-ধর্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে পারে না।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং ।

ন ভক্ত্যন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

আমরা কয়েকটি প্রবন্ধে এই ‘যখন তখন’ ও ‘যাহাকে তাহাকে’ কথার আলোচনা করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী নিন্দকের মনোব্যাসঙ্গ অপনোদন করাইয়া যাহাতে তাহাকে গোড়ীয়-মঠাশ্রিত প্রকৃত ব্রাহ্মণ করাইতে পারি, মঠবাসী সকলের নিকট একপ আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। মঠের অধিবাসিগণের চরণাশ্রয় করিলেই যে বিষ্ণুবিদ্যে ও বৈষ্ণববিদ্যে ছুটিয়া পলাইবে এ কথা তারস্বরে সকল শাস্ত্র গান করেন।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(ভগবদ্-রসতত্ত্ব)

১। শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসায়িতমূর্তি ও অগমোদ্ধারস্বরূপ কেন?

“শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই কেবল ঐ সর্বোচ্চ রসের একমাত্র বিষয়। নিরপেক্ষ হইয়া ও মতবাদজনিত পূর্ব সংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দেখিলে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইবে যে, রসতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই সর্বপ্রকার স্বরূপাপেক্ষা নির্মূল ও শ্রেষ্ঠ। * * * অত্যাশ্রয় স্বরূপ যেক্ষপ চিন্ময়, জড়াতীত, পূর্ণগুণ-সম্পন্ন ও মায়াবিজয়ী, কৃষ্ণস্বরূপও তদ্রূপ অপ্রাকৃত গুণশালী। কৃষ্ণ-স্বরূপের আধিক্য এই যে, প্রপঞ্চ-মধ্যে পূর্ণ চিল্লীলা স্বীয় চিহ্নজিহ্বারা জড়েন্দ্রিয়সকলকে প্রদর্শন করান। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রাপঞ্চিকব্যবহারেও সর্বত্র সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। বালকের সহিত প্রাণপ্রিয় বালকের ত্রায়, পিতা-মাতা গুরুজনের নিকট আশ্রিত শিশুর ত্রায়, মধুর-রসাস্রিত ভক্তগণের নিকট প্রাণনাথের ত্রায় ব্যবহারকালেও দীপিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। নরের নিকট নরলীলা করিতে করিতেও সমস্ত আধিকারিক দেবতার সর্বৈশ্বরের ত্রায় কার্য্য করিয়া পণ্ডিতবর্গকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কৃষ্ণ যদি গোপভায়ে এই জগৎস্রষ্টাদিনী লীলা রূপাপূর্বক প্রকট না করিতেন, তাহা হইলে কি কেহ মধুর-রসের বিষয় বলিয়া পরমেশ্বরকে অনুভব করিতে পারিত?”

—শ্রীমঃ শিঃ ৫ম পঃ

২। শ্রীকৃষ্ণের পারকীয়তা কি ঘণাই নহে?

“কৃষ্ণই যে-স্থলে নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই ঘণাস্পদ হয় না। সামান্য কোন জীব যেখানে নায়ক-পদবী প্রাপ্ত হন, সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে।”

—জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

৩। শ্রীরাধাকৃষ্ণ কি তত্ত্ব?

“শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষায় মধুর-রসই ভক্তগণের উপাস্ত। এই রসে শ্রীরাধিকার অনুগত না হইলে রসাস্বাদন হয় না। সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই পরব্রহ্ম। সচ্চিদ্রূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং আনন্দরূপিনীই শ্রীরাধা। রাধাকৃষ্ণ— এক তত্ত্ব ; রসের বিস্তৃতির জন্ম দুই রূপে প্রকাশ।”

—চৈঃ শিঃ ৪।৫

৪। রস-সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন-বিভাব কিরূপ ?

“বিজয়কুমার অতি শীঘ্র প্রসাদ পাইয়া সমুদ্রতীর-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীমিশ্রের ভবনে চলিলেন। সমুদ্রের উন্মি ও লহরী ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহার মনে রস-সমুদ্রের ভাব উদিত হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন—‘আহা, এই সমুদ্রই আমার ভাব উদয় করিতেছে। জড়বস্তু হইয়াও আমার অতিগুপ্ত চিন্তাবকে উদ্ঘাটন করিতেছে। প্রভু আমাকে যে রস-সমুদ্রের কথা বলেন, সে এইরূপ। আমার জড়দেহ ও লিঙ্গদেহ দূরে নিষ্কিপ্ত হইলে আমি রস-সমুদ্রের তীরে নিজ-মঞ্জরীস্বরূপে বসিয়া রসাস্বাদন করিতেছি। নবানুদবর্ণ কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র প্রাণনাথ। তাঁহার পার্শ্বস্থিতা বৃষভানুন্দিনীই আমাদের দৈশ্বরী অর্থাৎ জীবিতেশ্বরী। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়বিকারই এই সমুদ্র। রসভাব-সমূহই এই উন্মিমাল। যখন যে ভাব উঠিতেছে, তাহাই বিচিত্র লহরী হইয়া তটস্থ সখী যে আমি, আমাকে প্রেমরসে ভাসাইতেছে। রস-সমুদ্রই—কৃষ্ণ ; স্ততরাং সমুদ্র তবর্ণ-বিশিষ্ট, তাহাতে প্রেমতরঙ্গ—রাধা, স্ততরাং তাহাতে বর্ণলাবণ্যগত গৌরীত্ব। বৃহদবৃহদ উন্মিগণ—সখী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীগণ—সখীর পরিচারিকা। আমি একজন তন্মধ্য হইতে দূর-তটে নিষ্কিপ্তা অনু-পরিচারিকাবিশেষ।’ এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বিজয় মুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সন্ধিৎ লাভ করিয়া, ধীরে ধীরে শ্রীগুরুচরণে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া দীন-ভাবে বাসিলেন।”

—জৈঃ ৮ঃ ৩৪শ অঃ

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

স্বাধীনতা

বিশ্বে স্বাধীনতা—হেঁয়ালির কথা, সুখ-মরীচিকা শুধু দুঃখ তাই।
 হারায়ে সম্বন্ধ, বিরূপ কবন্ধ, ভোগ-মোহে অন্ধ ত্রিদিন পাই ॥
 ‘স্ব’-অর্থে আত্মা, তাঁর অধীনতা, তাহারই সাধন সমীচীন।
 ছেড়ে সে-বিশ্বাস, পরে’ মায়া-ফাঁস, সেজে মায়াদাস হ’লু পরাধীন ॥
 স্ব-অধীন যে-জন, স্ব-ভাবে মগন, থাকে অহঙ্কণ স্ব-তন্ত্র-স্বরূপে।
 গুরুদেব তা’রে, মুক্তাত্মা প্রচারে, বন্ধজীব মরে পুড়িয়া ত্রিতাপে ॥

ইতরেরে ভজি, পরমাত্ম তাজি, ভোগানন্দে মজে' হই অতি হীন ।
 ভব-কারাগৃহে, জড়মন-দেহে, ত্রিগুণের মোহে বন্দী বহুদিন ॥
 গুরু-কৃপাবলে, স্ব-সম্বন্ধমূলে, পা'নু এতদিনে মায়া-কারামুক্তি ।
 সাধন-জগতে, স্বাধীনতা পেতে, শ্রীগুরু-শ্রীপদে রহ' মোর ভক্তি ॥
 মুঞি ভক্তিহীন, অকিঞ্চন দীন, অযোগ্য নিঘূর্ণ্য বড় ছুরাচার ।
 কিছু নাহি চাই, যেথা-সেথা যাই, থাকে যেন সদা স্মরণ তোমার ॥
 ওহে অন্তর্যামি, তব পদে নমি, আশ্রয়-বিগ্রহ পতিত-পাবন ।
 সেবক অধমে, রক্ষ কৃপাক্রমে, অপনোদি' জন্ম-জন্মান্তর-ভ্রম ॥
 সব চলি' যা'বে, নিত্য নাহি র'বে, এ চঞ্চল ভবে দেহ-চিত্ত-বিস্ত ।
 তব নিত্যদাস, করে পদে আশ, স্বরূপ-স্মুরতি—ব্রজবাস নিত্য ॥

—ডা: অদ্বৈতদাস ব্রজবাসী

ধর্ম-ব্যাধের ইতিহাস

(বরাহ-পুরাণ পঞ্চম অধ্যায়)

পুরাকালে অত্রিগোত্রজাত সংযমন নামে এক পরম পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নিত্য প্রাতঃস্নান, তপশ্চরণ ও বেদাত্যাস করিতেন। একদিন ভাগীরথীর জলে স্নানার্থ তিনি ধর্মারণ্যে গমন করেন। তথায় একদল হরিণ তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি দেখিলেন, এক ব্যাধ ধনু ধারণে সেই মৃগযুথকে বধ করিতে উদ্যত। তাহার নাম নির্ধুরক। সংযমন ব্যাধকে বলিলেন, ভদ্র ! জীব হত্যা করিও না। মুনির কথা শুনিয়া সেই ব্যাধ হাস্যসহকারে বলিল,—আমি পৃথক্ জীবদিগকে হত্যা করি না; মায়াবী যেমন মন্ত্রদ্বারা নির্জীবকে সজীব করিয়া খেলা করে, সেইরূপ সাক্ষাৎ নারায়ণ এই সমস্ত প্রাণীদ্বারা লীলা করিয়া থাকেন। যাঁহারা মুমুক্শু, তাঁহারা সর্বদা অহংভাব বর্জন করিবেন। 'আমি' 'আমার' জ্ঞান জীবের যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তাহার পক্ষে মোক্ষলাভ অসম্ভব।

সংযমন নির্ধুরকের মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, ভদ্র ! তুমি এই প্রত্যক্ষ হেতুময় বাক্য কোথা হইতে শিখিলে ? ইহার অর্থ কি ? নির্ধুরক তাহা শুনিয়া একটী লৌহজাল প্রস্তুত করিয়া এবং তাহার নিয়মভাगे

কতকগুলি কাষ্ঠ রাখিয়া সংযমনের হাতে অগ্নি দিয়া বলিল, আপনি এই কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করুন। ব্রাহ্মণ অগ্নি জ্বালিয়া নীরব হইলেন। জ্বালিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে জ্বালের প্রত্যেক ছিদ্র দিয়া শত শত বহুশিখা পৃথক্ পৃথক্ বাহির হইতে লাগিল। তখন নির্ভুরক বলিল, মূনে! আপনি অগ্নির একটি শিখা গ্রহণ করুন। আমি অবশিষ্ট শিখাগুলি নিবাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া অগ্নির উপরে এক কলস জল ঢালিয়া দিল। অগ্নি তখনই নির্বাপিত হইল। অনন্তর ব্যাধ বিপ্রকে বলিল, মূনে! আপনি যে অগ্নিশিখাটি রাখিয়াছেন তাহা আমাকে প্রদান করুন। কিন্তু ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে; তিনি তাহা দেখিয়া অপ্রতিভ অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। তখন ব্যাধ ব্রাহ্মণকে বলিল, হে দ্বিজ! এই জ্বালের নিম্নে যখন অগ্নি জ্বলিয়াছিল তখন জ্বালের ছিদ্রসকল দিয়া অগ্নির সহস্র সহস্র শিখা বাহির হইতেছিল। কিন্তু তাহাদের মূল অগ্নি নিবিয়া যাওয়াতে শিখাগুলিও নিবিয়া গিয়াছে। আত্মা এইরূপ। আত্মা এক, পাত্রভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীত। ক্ষিতি, অপ্ আদি পঞ্চভূত দেহাকারে পরিণত হইয়া স্ত্রী-পুরুষাকার ধারণ করে। তাহাদের পরস্পরের সংসর্গে আবার অগ্ন স্ত্রী-পুরুষ উৎপন্ন হয়। এইরূপে জগতের সৃষ্টি। জীবিকাধর্মে যাহার যে বৃত্তি বিহিত, সে-সকল যদি আত্মায় সংযোজিত করে তবে আর তাহাকে অবসন্ন হইতে হয় না। ব্যাধ এই কথা বলিবামাত্র আকাশ হইতে তাহার মন্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এইরূপে স্বজাতিসঙ্গত-কর্ম করিয়াও জ্ঞান ও মোক্ষ লাভ ঘটে।

সুরেন্দ্র বৃহস্পতির নিকট মহর্ষি রৈভ্য ও রাজা বসু (চাক্ষুষ মন্বন্তরে জাত) এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকাটি ভগবান কপিলদেব মহারাজ অশ্বশিরার নিকট বর্ণন করেন। তাহাতে তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল। তিনি পুত্র স্থলশিরাকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া নৈমিষারণ্যে গিয়া তপস্শ্রায় প্রবৃত্ত হন। তিনি ভগবানকে এইভাবে স্তুব করিয়াছিলেন—

ইন্দ্র, ঈশ, সূর্য্য, চন্দ্র, হতাশন ও মরুকাশ যাহার রূপান্তর, সেই বিবিধ রূপী হরিকে নমস্কার। সূর্য্য-চন্দ্র যাহার চক্ষু, সংবৎসর যাহার কক্ষি, কুশাদি যাহার রোমরাজি, সেই সনাতন পুরুষকে নমস্কার। স্বর্গ-মর্ত্যের অন্তর ও দিকসকল যাহার বিরাট শরীরে ব্যাপ্ত, যিনি এই সমস্ত জগতের উদ্ভব-স্থান, অজয় হইয়াও সুরাসুরগণের জয়পরাজয় নিমিত্ত যিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ

হন, সে উগ্রতেজা জরার জন্ত শজ্জাচক্রাদি ধারণ করেন, যিনি কখনও সহস্র-
শির, কখনও মহাশৈল-সদৃশ বিরাট বপু; কখনও বা ত্রসরেণুর তুল্য অতিসূক্ষ্ম
আমি সেই যজ্ঞপুরুষকে নমস্কার করি। যিনি চতুর্ভুজরূপে জগতের স্রষ্টি,
চক্রপাণিরূপে পালন ও রুদ্ররূপে সকল ধ্বংস করেন, সেই যজ্ঞপুরুষকে
নমস্কার। হে প্রভো! আপনি সমস্ত জগতের ঈশ্বর; আমি মন-প্রাণাদি
সমস্তই আপনাতে অর্পণ করিলাম। রাজা এইপ্রকার স্তব করিবামাত্র
তঁাহার সম্মুখে এক প্রচণ্ড তেজ আবির্ভূত হইল। রাজা সেই তেজোমধ্যে
প্রবেশ করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

ধর্মজ্ঞ বসু বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইলেন
এবং প্রচুর দক্ষিণায়ুক্ত বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা
করিতে করিতে তঁাহার আত্মজ্ঞান লাভ হওয়ায় রাজ্যভোগে বিতৃষ্ণা হইল।
নিজ পুত্র বিবস্বানকে রাজ্যপ্রদান করিয়া কাশ্মীরাদিধিপতি বসু পুত্ররতীর্থে
গিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। একদিন রাজা ভগবানের স্তব করিতে
থাকিলে তঁাহার দেহ হইতে এক ভীমাকার পুরুষ নির্গত হইল। তাহার
দেহ খর্ব্ব, বর্ণ গাঢ় নীল, নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ এবং আকৃতি দম্ভকাষ্ঠবৎ ভয়ঙ্কর।
সে রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিল, হে নরনাথ, আমাকে কি
করিতে আদেশ করেন? রাজা বলিলেন, তুমি কে এবং কোথা হইতে
আসিতেছ? এখানে তোমার কি কাজ? ব্যাধ বলিল, পূর্বে কলিযুগে
দক্ষিণাপথ জনস্থানে তোমার রাজ্য ছিল। তখন তোমাকে সকলে বিচক্ষণ
রাজা বলিত। একদিন তুমি মৃগয়া জন্ত অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এক মৃগ-
বেশধারী মুনকে দণ্ডাঘাতে মারিয়াছিলে। তুমি তাহা জানিতে পারিয়া
ক্ষুব্ধ ও কাতর হইয়া কিরূপে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি পাইবে তাহাই চিন্তা
করিতে করিতে নারায়ণের চিন্তায় নিরত থাকিয়া উপবাসী রহিলে।
এবং ‘নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন’ এই কথা বলিয়া শুভদিনে ব্রাহ্মণ-
গণকে বহু গভী দান করিলে, কিন্তু ব্রত সম্পূর্ণ না হইতেই উদর-শূলরোগে
তোমার মৃত্যু হয়। তোমার পত্নী তোমার উদ্ধারের জন্ত ব্রত উদযাপন
করিলে তোমার সদগতি হয়। মরণান্তে তুমি বিষ্ণুভবনে এক কল্পকাল ছিলে,
আমি তখনও তোমার দেহে ছিলাম। সে-সমস্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি।
আমার অভিলাষ ছিল—ব্রহ্মগ্রহ হইয়া তোমার ব্রহ্মহত্যা পাপের জন্ত
তোমাকে পীড়ন করা, কিন্তু বিষ্ণুদূতগণ আমাকে মুষলাঘাত করিতে থাকিলে

তোমার লোমকূপ হইতে স্থলিত হইয়া পড়িলাম। তুমি স্বর্গস্থ হইলে আমি আবার তোমার দেহে রহিলাম। এইরূপ ব্রহ্মার দিবাকল্প অতীত হইল। বর্তমানে তুমি পুণ্ডরীকাক্ষ স্তব পাঠ করিতে থাকিলে তোমার দেহ হইতে নিজ্জাত হইলাম। আমি নিতান্ত পাণী, কিন্তু তোমার স্তবপাঠ শ্রবণ করিয়া আমার ধর্মবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে। রাজা বসু বলিলেন, তোমার কথায় যখন আমাব জন্মান্তরের কথা স্মরণ হইল, তখন তুমি আমার প্রভাবে ধর্মব্যাব্ধ হইবে।

ধর্মব্যাব্ধের নিজ বৃত্তির দ্বারা জীবিকার্জন করিতে করিতে ৪ হাজার বৎসর গত হইল। সে আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ এবং ভৃত্য, অতিথি, অগ্নির তৃপ্তি প্রদান করিত। সদা সত্যকথা বলিত এবং স্বধর্মানুসারে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিত।

কিছুদিন পরে তাহার এক ধর্মবুদ্ধি পুত্র হয়। তাহার নাম অর্জনক। আরও কিছুদিন পরে অর্জনক নামী কন্যা হইল। সে যৌবনে পদার্পণ করিলে ধর্মব্যাব্ধ মহাত্মা মতঙ্গের সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিল।

অর্জনক স্বামিগৃহে থাকিয়া শৃগুর-শাণ্ডী ও পতিসেবায় নিযুক্ত থাকিল। একদিন তাহার শাণ্ডী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলে যে, তুমি ব্যাব্ধকন্যা, পতিসেবা বা তপস্বী কেমন করিয়া জানিবি? শাণ্ডীর ভৎসনা সহ্য করিতে না পারিয়া সে রোদন করিতে করিতে পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়া পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

কন্যার কথা শুনিয়া ধর্মব্যাব্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া বৈবাহিকগৃহে উপস্থিত হইল। মহাত্মা মতঙ্গ বৈবাহিককে গৃহে পাইয়া যথোচিত সৎকার করত ভোজনের জন্ত অনুরোধ করিলেন। ধর্মব্যাব্ধ বলিল, যে-সকল খাদ্য-বস্তুর চৈতন্য নাই এমন বস্তু আমি ভক্ষণ করিব। মতঙ্গ বলিলেন, আমার গৃহে গোধূম, ক্রীহি ও ঘবাদি প্রচুর পরিমাণে আছে। তুমি স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর। ধর্মব্যাব্ধ বলিল, আপনার গৃহে যে-সমস্ত গোধূমাদি স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, তাহা আমি একবার দেখিব। মতঙ্গ তখন তাহাকে শূর্ণপূর্ণ গোধূমাদি আনিয়া দেখাইলেন। ধর্মব্যাব্ধ কিছু না বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। মতঙ্গ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আহা'র না করিয়া কিজন্ত চলিয়া যাইতেছ? ব্যাব্ধ বলিল, যে ব্যক্তি প্রত্যহ কোটি কোটি জীব হত্যা করে,

কোন সাধুপুরুষ সেই পাপাত্মার দ্রব্য ভোজন করিবে? তোমার গৃহে চৈতন্য-
হীন কোন দ্রব্য থাকিলে তাহা দাও। আমি প্রত্যহ অরণ্য হইতে আহাৰ্য্য
সংগ্রহ করিয়া তাহা সুসংস্কৃত করিয়া প্রথমে দেবতোদ্দেশে উৎসর্গ করি,
পরে সপরিবারে ভোজন করি। কিন্তু তুমি প্রত্যহ কোটি কোটি জীব হত্যা
করিয়া আত্মীয়-স্বজনসহ তাহাই ভোজন কর। অতএব তুমি যাহা আহাৰ
কর, আমার মতে তাহা অখাদ্য। ব্রহ্মা যজ্ঞার্থে ওষধি ও লতাসকল সৃষ্টি
করিয়াছেন, তাহাই প্ৰাণিগণের উপযুক্ত আহাৰ। দিব্য, ভোম, পৈন্দ্র, মানুষ
ও ব্রাহ্ম এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। গো, মৃগ ও পক্ষিগণকে
আহাৰ দিয়া যথাবিধানে অতিথিসংকার করিয়া গৃহস্থ আহাৰ করিবে।
এইরূপ করিলে অন্ন শুদ্ধ হয়, অতথা একএকটি ব্রীহি-যব একএকটি জীবন্ত
মৃগ, পক্ষী। স্ততরাং দাতা ও ভোক্তার পক্ষে তাহা মহামাংস-স্বরূপ। তোমার
ভাৰ্য্যা আমার কণ্ঠকে জীবঘাতীর কণ্ঠা বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন। কিন্তু
তোমার আচার-বিচার, দেবার্চন ও অতিথিসংকার কিরূপ? তাহার
তুমি একটীও কর না। আমি ত জীবঘাতী, কিন্তু আমার কণ্ঠা তোমার
মত ধার্মিকের পুত্রকে পতিরূপে পাইয়া পতিমাহাত্ম্যে পবিত্র হইয়াছে। অত
হইতে শাশুড়ী ও পুত্রবধূ পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস বা পরস্পরের মঙ্গল
কামনা করিবে না—এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া সেই ব্যাধ পুরুষোত্তম-
ক্ষেত্রে গমনপূৰ্ব্বক তপস্তায় নিযুক্ত থাকিল এবং কিয়ৎকাল পরে শ্রীভগবানের
পাদপদ্মে চির শরণ প্রাপ্ত হইল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী

পাঠকবর্গ অবগত আছেন, শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সন্মতির নিজস্ব অধ্যাপক-
কর্তৃক পরিচালিত নবদ্বীপ-সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত
“শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী” নামক সংস্কৃত টোল হইতে ছাত্রগণ
প্রতি বৎসরই বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।
এ বৎসরও উক্ত চতুষ্পাঠী হইতে নিম্নলিখিত বিদ্যার্থীগণ সংস্কৃত পরীক্ষায়
বিশেষ সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

- ১। শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী—কাব্য আত্ম, ২য় বিভাগ
- ২। শ্রীব্রজানন্দ ব্রজবাসী—বৈষ্ণবদর্শন আত্ম, ২য় বিভাগ

—প্রচার-সম্পাদক

সনাতনের বন্ধন-মোচন

(নাটিকা)

(পূর্ব-প্রকাশিত ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৭ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

বারাণসী ধাম

চন্দ্রশেখরের বাটী ।

মহাপ্রভু ও শ্রীকৃপপাদের প্রবেশ ।

মহাপ্রভু—(সিংহাসনে উপবেশনপূর্বক) শ্রীকৃপ, তুমি সনাতনের কোন খবর পেয়েছো ?

শ্রীকৃপ—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেদিন চর-মুখে সংবাদ জেনেছি। তিনি রাজ-ঘরে বন্দী। এখন আপনি যদি তাঁকে উদ্ধার করেন, তবেই তিনি উদ্ধার পাবেন।

মহাপ্রভু—সনাতনের বন্ধন-মোচন হয়েছে শ্রীকৃপ! সে আমার কাছে আসছে।

শ্রীকৃপ—(সানন্দে) তিনি তা'হলে বন-পথেই আসছেন ?

মহাপ্রভু—হ্যাঁ, তোমরা যেমন বনপথেই এসেছো, সেও তাই আসছে।

শ্রীকৃপ—পথে কোন বিপদ হয়নি তো ?

মহাপ্রভু—সকল বিপদই সে উপেক্ষা করে চলে আসছে। অচিরেই সে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে। তুমি নিশ্চিত থাক।

শ্রীকৃপ—(মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া) তাই যেন হয় প্রভু !

মহাপ্রভু—(শ্রীকৃপের পিঠে হাত দিয়া) কৃষ্ণের কৃপা সে অবশ্যই পাবে। তার চিন্তা শুদ্ধ হয়েছে।

[চন্দ্রশেখরের প্রবেশ ।]

(চন্দ্রশেখর মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ।)

মহাপ্রভু—এসো চন্দ্রশেখর !

চন্দ্রশেখর—প্রভু, আজ খবর পেলাম, একজন ভক্ত আসছেন। তিনি সর্বদা নামানন্দে বিহ্বল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আসছেন। সম্ভবতঃ আমাদের গোষ্ঠী বৃদ্ধি হবে।

মহাপ্রভু—(মৃদু হাসিয়া) তাই তোমরা দেখছি খুব উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছো।

প্রকৃতই সে একান্ত হরিসেবক।

শ্রীকৃষ্ণ—(হাসিতে হাসিতে) প্রভু আমাকে এই কথাই এতক্ষণ বলছিলেন।

চন্দ্রশেখর—প্রভু, একবার ভিতরে চলুন।

মহাপ্রভু—চল।

(মহাপ্রভু-সহ সকলের প্রস্থান।)

২য় দৃশ্য

হাজিপুর গ্রাম

সনাতনের প্রবেশ

সনাতন—(চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে) হা দয়াময় শচীনন্দন, আর কতদূরে তুমি আছ প্রভু! কৃপা কর—দেখা দাও! তোমায় একবার দেখলে আমার সব আশা মিটে যাবে। আবার ধরণীর বুকে সন্ধ্যা নেমে এল; এ রাতও বুঝি গাছতলায় কাটবে।

[ইত্যবসরে সনাতনের ভগিনীপতি শ্রীকান্তের প্রবেশ।]

শ্রীকান্ত—কে, ভায়া নাকি?

সনাতন—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—শ্রীকান্ত; চিন্তে পার্ছো না?

শ্রীকান্ত—এ কি বেশ ধরেছো ভায়া? ...একেবারে দরবেশ! তোমার এ মতি-গতি কবে থেকে হ'ল?

সনাতন—যাক, ভালই হ'ল তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়ে গেল। কেন, আমার মতি-গতি খারাপ দেখুছো?

শ্রীকান্ত—তা' একটু খারাপ-খারাপ বোধ হচ্ছে বৈকি? সংসারী জীবের ঐ সব বেশ-ভূষা, আর না খেয়ে বনে বনে ঘোরা—এসব কি ভাল?

সনাতন—(দীর্ঘ হাসিয়া) ভায়া, সংসারী জীব সংসার ছাড়লেই এই বেশ ধারণ করে।

শ্রীকান্ত—তোমার তো মন্ত্রী-বুদ্ধি! তোমার সঙ্গে কি কথায় পারা যায়? তা' কেমন করে তোমার বন্ধন ছুটলো?

সনাতন—একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাতেই আমার বন্ধন মোচন হয়েছে।

শ্রীকান্ত—এখন এ রাতে কোথায় থাকবে ভেবেছো?

সনাতন—কেন, ঐ গাছতলায়?

শ্রীকান্ত—তাই কখনো হয়? (সনাতনের হাত দু'টি ধরিয়া) আমার অনুরোধ, দয়া ক'রে আজ রাতটা আমার বাসায় গিয়ে থাকুন।

সনাতন—যেতে আমার আপত্তি নাই। তবে কাল প্রভাতেই আমাকে গঙ্গা পার করে দিতে হবে।

শ্রীকান্ত—নিশ্চয়ই তোমায় গঙ্গা-পার করে দেবো। তবে আমাকে তোমার এই বেশ ধারণের পূর্কপার সমস্ত ঘটনাই বলতে হবে।

সনাতন—বেশ, যখন আমার জীবনী শুন্তে চাইছো বলবো। চল, এখন তোমার আতিথ্যই গ্রহণ করি।

শ্রীকান্ত—এসো।

(উভয়ের গমন)

৩য় দৃশ্য

বারাণসী ধাম।

চন্দ্রশেখরের বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

১ম বৈষ্ণব ও ২য় বৈষ্ণবের প্রবেশ।

১ম বৈষ্ণব—মহাপ্রভু সেদিন বল্লেন যে, স্তূদূর বাংলা থেকে তাঁর একজন অনুরাগী ভক্ত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। সম্ভবই আসবার কথা! কিন্তু এর মধ্যে বাংলা থেকে কেউ এসেছেন বলে তো মনে হয় না! তুমি বাংলার কোন নূতন ভক্তকে দেখেছো?

২য় বৈষ্ণব—কই, সেরূপ কোন ভক্ত আমার চোখে পড়ে নি। আমিও তোমার মত আস্বে—আস্বেই শুনেছি।

১ম বৈষ্ণব—কি জানি! ইচ্ছাময়ের যে কি ইচ্ছা, তা তিনিই জানেন।

২য় বৈষ্ণব—প্রভু যখন বলেছেন একজন ভক্ত আস্বে, তখন নিশ্চয়ই আমরা তা'কে দেখতে পাব।

১ম বৈষ্ণব—ভক্তটীর নাম তোমার খেয়াল আছে কি?

২য় বৈষ্ণব—নামটা ঠিক স্মরণ নেই বটে, তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রভুর জ্যেষ্ঠ সহোদর।

১ম বৈষ্ণব—অহো, ঠিক বলেছো তুমি!

২য় বৈষ্ণব—সে কি রকম ভক্ত বলতো? সে কি একেবারে প্রভুকে কিনে নিয়েছে? প্রভু দিনের মধ্যে হাজার বার তার গুণগান করছেন।

১ম বৈষ্ণব—তবেই তো বোঝ! আমরা প্রভুর কাছে থাকি বলেই যে আমরা তাঁর খুব প্রিয় তা' নয়।

২য় বৈষ্ণব—সত্যই তাই। আমাদের প্রেমভক্তি গাঢ় নয়। ঈশ্বরের কাছে থেকেও ঈশ্বর-প্রেমলাভে আমরা বঞ্চিত। মন-প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করতে পারি নি। আমাদের মত পাপিষ্ঠ আর কে আছে বল!

১ম বৈষ্ণব—(দূরে লক্ষ্য করিয়া) ঐ যেন কে এদিকে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

২য় বৈষ্ণব—(দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত) হ্যাঁ, তাইতো বটে; দেখ, লোকটা চলতে পারছে না মোটেই, মনে হয় খুব শ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

১ম বৈষ্ণব—হ্যাঁ হে, এ যে দরবেশ বলে মনে হচ্ছে।

২য় বৈষ্ণব—হ্যাঁ, দরবেশই তো বটে! তবে এখানে একটু অপেক্ষা করবে?

১ম বৈষ্ণব—না—না, আর অপেক্ষায় কাজ নেই। অপেক্ষা করতে গেলে দেবী হয়ে যাবে। চল,—মন্দিরে ঈশ্বর-সেবার সময় হয়ে গেছে।

২য় বৈষ্ণব—(ব্যস্তভাবে) তবে চল,—চল। (উভয়ের প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য

বারাণসী ধাম।

চন্দ্রশেখরের বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন—আহা, এই তো বৃন্দাবন! এখানে নিশ্চয়ই প্রভু আছেন। বাতাসে পাখীর আনন্দ-গান শোনা যাচ্ছে। শুকনো গাছও যেন সজীব হয়ে উঠেছে,...ঐ কত শত রঙ-বেরঙের ফুল ফুটে রয়েছে; ভোম্রা গুন্ গুন্ রবে, যমুনা কলকল স্বরে যেন কার আবাহনী গীতি গাইছে! বড় মনোরম এই স্থান! আহা,—হরিনামের মধুর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। প্রভু, এই তোমার গোলোকধাম! তুমিই স্বাগরে এইখানে লীলা করেছিলে।

[নেপথ্যে:—দৈববাণী—সনাতন, তুমি যা'কে খুঁজছো সেই আমি এখানে আছি।—এটা বৃন্দাবন ধাম নয়, এ বারাণসী ধাম।]

সনাতন—(কাঁদিতে কাঁদিতে) কে,—কে আমায় এমন কথা বললে! প্রভু—প্রাণনাথ!...কই, আমি তো তোমায় দেখতে পাচ্ছি না? কোথায় তুমি! দেখা দাও, প্রভু! আর ছলনা করো না। আর চলতে

পারছি না। দেহ অবসন্ন হয়ে আসছে। এখানেই যদি আছো,
তো দেখা দাও!

[চন্দ্রশেখরের প্রবেশ।]

চন্দ্রশেখর—(সনাতনের প্রতি) ফকির, ও ফকির!

(সনাতনের হাত ধরিয়া) ওঠো,—এসো তোমায় প্রভু ডাকছেন!
সনাতন—(কাঁদিতে কাঁদিতে) কে, প্রভু ডাকছেন? প্রভু আমাকে
ডাকছেন! সত্যই সত্যই তুমি এখানে আছ প্রভু! প্রভু,—
এতদিনে আমায় মনে পড়েছে! তোমার জন্ত আমি চোখের জল
সার করেছি। কেঁদে কেঁদে ছুঁটি চক্ষু প্রায় অন্ধ করে ফেলেছি।
কই,—কোথা প্রভু! (ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইলেন।)

চন্দ্রশেখর—চল ফকির, নিকটেই প্রভু অবস্থান করছেন!

সনাতন—(কাঁদিতে কাঁদিতে) কই, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না!
দেখা দাও—ওগো নচীনন্দন, গৌরহরি প্রাণবল্লভ এসো!

[সনাতনকে লইয়া চন্দ্রশেখর যাইবার উত্তোগ করিতেছেন,
ইত্যবসরে মহাপ্রভু স্বয়ং উপস্থিত হইলেন।]

মহাপ্রভুর প্রবেশ।

মহাপ্রভু—এসো সনাতন! তোমার আল্লানে আমি আর স্থির থাকতে
পারলাম না। আমি এসেছি।

সনাতন—(সানন্দে অশ্রুসিক্ত-নয়নে) এসেছো—এসেছো প্রিয়তম! কই,
—কই তুমি!

মহাপ্রভু—চোখ তুলে চাও সনাতন;...দেখ, তুমি যাকে ডেকেছো, সে এসেছে
কি না!

সনাতন—(সানন্দে চোখ মেলিয়া চাহিয়া) এসেছো,—এসেছো প্রভু!

[সনাতন মহাপ্রভুর পদতলে লুপ্তিত হইতে চাহিলেন, মহাপ্রভু প্রীত
হইয়া তাঁহার ভক্ত সনাতনের হাত ধরিয়া তুলিয়া বক্ষে আলিঙ্গন
করিলেন।]

মহাপ্রভু—সনাতন, তুমি আমারই বক্ষে আছ। তোমার মত প্রিয় আমার
আর কেউ নেই। —সমাপ্ত—

—ত্রিচিন্তরঞ্জন মণ্ডল

দেহারামীর ভব-ব্যাপ্তি ও তৎপশম-প্রয়াস

মনোধর্মী দেহারামী গৃহীবাউলের আবরণে উপকুর্ঙ্গাণ বদ্ধজীব আমি।
বেশ কয়েক বৎসর পূর্বেই আমি সৎগুরু-পদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াছি।
কিন্তু শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎসেবা হইতে আমি আজও বঞ্চিত। তাঁহার
সাক্ষাৎ উপদেশ-নির্দেশ-পালনেও আমি চির-পরাভুখ। তাঁহার উদাত্ত
আলোনে আজও আমি সাড়া দিতে পারি নাই; তাহার একমাত্র কারণ—
আমার দেহারাম। “শরীরের সুখে মন! দেহ জলাঞ্জলি। এ দেহ তোমার
নয়, বরঞ্চ এ শত্রু হয়”—মহাভক্তের এই শাস্ত্রী বাণী স্মরণে কখনও
তদ্ব্যাক্যপালনে ধৈর্য্যে বুক বাঁধিয়াছি। কিন্তু হায়! অকস্মাৎ কোন্ অসতর্ক
মুহূর্ত্ত খরস্রোতের ত্রায় আসিয়া আমার সেই ধৈর্য্য-শৈলের মূলোৎপাটন
ঘটাইয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত-কাল-প্রবাহে নিক্ষেপপূর্ব্বক আমার ক্ষীণ
আশার আলোকটুকু নির্বাপিত করিয়াছে। যখনই আমি স্থিরমনে চিন্তা
করি, তখনই কিন্তু শ্রীগুরুদেবের অপার অসমোর্দ্র করুণার কথা ক্ষণিকের
জল ও হৃদয়-রাজ্যে জাগরুক হয়। তিনি যে আমার নিত্যকালের উদ্ধারকর্তা
পরমবান্ধব, তাহা অন্তর্যামি-স্বরূপে একাধিকবার আমাকে বৃথিবার বা
উপলব্ধির সুযোগ দিয়াছেন। কিন্তু হৃদয়ের আমাব! আমার দেহারামীতা,
ওঁদরিকতা, বিতৈষণা, জড় বিদ্রোপাধি-সংগ্রহ-পিপাসা ও প্রতিষ্ঠাশাদি
আমাকে শ্রীগুরু-মনোভীষ্ট-পালনে জগদ্বল প্রস্তরের ত্রায় বারবার বাধার
সৃষ্টি করিতেছে। আশাবাদী জীব আমি—তাই আজও শ্রীগুরু-মনোভীষ্ট-
পালনে ও শ্রীগুরুদেবের হাদিক করুণালাভের আশা পরিত্যাগ করিতে
পারি নাই। মহাত্মনগণ আমার ত্রায় সর্বদোষাকর, অনর্থগ্রস্তের যে
ছরবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই আমার বাস্তব-পরিচয়।—

“আমার জীবন, সদা পাপে রত, নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত, দিয়াছি জীবেরে ক্রেশ ॥
নিদ্রালগ্নহত, অকার্য্যে বিরত, অকার্য্যে উদ্বোধী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ, লোভ-হত সদা কামী ॥”

“দিন যায় মিছাকাঙ্গে নিশা নিদ্রাবসে।

নাহি জানি মরণ নিকটে আছে বসে ॥

ভাল-মন্দ খাই হেরি পরি চিন্তাহীন।

নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন দিন ॥”

“ভড়িচ্ছা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা ।

মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবেকে করয়ে গাধা ॥”

“জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা, জাননা কি তাহা মায়ার বৈভব ?

বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে রোরব ॥”

আমি এত দোষে দোষী হইলেও অদোষদরশী শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের অহৈতুকী করুণাই আমার বর্তমানে একমাত্র জীবাত্ম।—

গুরুদেব ! যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা-সার ।

করুণা না হইলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর ॥”

শ্রীহরি-গুরু-সেবা-মুখ আমি ; গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট নিক্ষেপ্তভাবে নিজের অনর্থ ও দুর্দৈবের কথা জানাইতেও কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইতেছি, তাঁহারা যে আমার নিত্যকালের পরমাত্মীয়, ভবপারের কাণ্ডারী, সংসার-কারাগারে পরম বান্ধব, তাহাতে এখনও প্রত্যয় হইতেছে না । আমি নিরাশ্রয় পথভ্রান্ত অবোধ বালকের স্থায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আশ্বাস-বাণী ও রূপা-কটাক্ষ-লাভেও অসমর্থ হইতেছি । এখানেও আমার জড়াহঙ্কার-দণ্ডশৈল ইহাতে প্রবল বাধার স্রষ্টি করিতেছে । মুখে কপট দৈর্ঘ্য করিয়া “শক্তি-বুদ্ধিহীন, আমি অতিদীন” বলিলেও সর্ববিষয়ে অযোগ্যতাই বার বার আমাকে গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী রূপা যাক্ষার প্রতি-বন্ধক হইতেছে ।

মনে মনে আমি নিজেকে পরম-যোগ্যতাসম্পন্ন বাহাদুর ব্যক্তি বলিয়া গৌরব-বোধ করিতেছি । বৈষ্ণব-সতীর্থগণের সহিত আমার স্বার্থপরতা, দান্তিকতা, জিহ্বালাম্পট্য, জাডোপাধি-সংগ্রহরূপ অত্যাভিলাষ লইয়া প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে । আমি তাঁহাদের সকলকেই আমাপেক্ষা কম বুদ্ধিমান বলিয়া ধরিয়া লইছি । তাহা না হইলে তাঁহারা পূর্বাপর নিজ-সুখ-সুবিধা চিন্তা না করিয়াই গুরুগৃহে অবস্থানপূর্বক শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-যজ্ঞে কাঁপাইয়া পড়িয়াছেন কেন ? আমি অর্কাচীনের মত তাঁহাদের স্থায় পরে পুস্তাইব না, সেজন্ত পূর্ব হইতেই আট-ঘাট বাঁধিয়া হরিভজনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিব । সকল বিষয়েই আমি বেশ বুদ্ধিমত্তার সহিত অগ্রসর হইতে-ছিলাম, কিন্তু শীল রূপপাদের “সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং” বাক্যই আমাকে বিশেষভাবে নিরুৎসাহিত করিয়াছে । এখন দেখিতেছি, আমার উপাধিলাভ অবশেষে ব্যাধির আকারে দেখা দিয়াছে এবং ওদরিকতা বা জিহ্বালাম্পট্যই

আমাকে জীবনের অন্তিম দশায় উপনীত করিয়াছে, আমি নিজ চেষ্টা দ্বারা তাহার হস্ত হইতে কোনমতেই নিষ্কৃতি পাইতেছি না, বরং আমার জিহ্বাবেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। মাঝে মাঝে আমি মহাজনগণের শিক্ষা অরণ করিয়া বিকারগ্রস্ত মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করি, কিন্তু সে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বৈরাচারের সহায়তায় জগতের সকলকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে। পরদুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণবঠাকুরও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনিও তারশ্বরে ঘোষণা করিয়া চলিয়াছেন,—

“বাক্য-মনোবেগ, ক্রোধ-জিহ্বাবেগ, উদর-উপস্থবেগ।

মিলিয়া এ সব, সংসারে ভাসায়ে, (জীবকে) দিতেছে পরমোদ্বেগ।”

“সাধক হইয়া করে জিহ্বার লালস।

পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বস ॥

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।

শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

ভাল না খাইবে আর, ভাল না পরিবে।

হৃদয়েতে রাখা কৃষ্ণ সর্বদা সেবিবে।”

এরূপ সাবধান বাণী শুনিয়া ক্ষণিকের জন্ত মন নিরস্ত হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই চঞ্চল হুই মন দ্বিগুণিত উৎসাহে আইনের ফাঁকি খুঁজিতে থাকে। সে যুক্তবৈরাগ্যের চলনায়—

‘অনাসক্তস্ত বিষয়ান্ যথাইমুপযুক্ততঃ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥”

“যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ, অনাসক্ত সেই কি আর কহব।

সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত, সংসার তাহার পায় পরাভব ॥”

বাক্যের কদর্থ করিয়া “তেন ত্যন্তেন ভুঞ্জীথা” অনাসক্তির আবরণে ভোগে অত্যাশক্তি আবাহন করে। ফলে দিশাহারা পথিকের ন্যায় ‘শয়তানের শাস্ত্র বাক্যের বুলি কপচাইয়া বলিতে থাকে’—

“পণ্ডিত ব্যক্তি যতটুকু বিষয়দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় ততটুকুই স্বীকার করিবেন; অল্প ও অধিকো পরমার্থ পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন। হে অর্জুন! অহিতভোজন-পরায়ণের যোগ হয় না; আবার একান্ত অনাহারীরও যোগ সিদ্ধি নহে। অতি নিদ্রালু ও অতি জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগে সিদ্ধি লাভ হয় না। যিনি নিয়মিত আহার-বিহার করেন, কণ্ঠসমূহ যাহার নিয়মিত, যিনি

পরিমিতভাবে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাহারই যোগ দুঃখ নিবারক হয়।”

শাস্ত্রের অবরোহ যুক্তির (শ্রয়ঃ) বুলি আওড়াইলেও সে কিন্তু তাহাতে বিশ্বাসী নহে। সে আরোহ যুক্তিকেই (প্রেয়ঃ) অন্তরে বহমানন করিয়া থাকে। “Inductive process of reasoning carries fallacy with it.”—ইহা তাহার বেশ ভালভাবেই জানা আছে। তথাপি ইহাকে (সংশয়কে) আশ্রয় না করিলে তাহার জগৎ-বঞ্চনা-কার্য্যে অবিধা হয় না। তাই অবিধাবাদীর ত্রায় সে ‘অনাসক্তি’, ‘যুক্তবৈরাগ্য’, ‘যথাযোগ্যভোগ’, ‘ত্যাগধর্ম্ম-সহকারে ভোগ’, ‘জীবনধারণোপযোগী বিষয় গ্রহণ’, ‘যুক্তাহার-বিহার’ ইত্যাদি শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যের কদর্থ করিয়া তাহার কু-মতবাদ-স্থাপনে বিশেষভাবে চেষ্টিত হয়। শাস্ত্রবাক্যের সহজ-সরল অবিধা বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সে তাহার বহুকালপুষ্ঠ অসত্বদেহ সাধনে সর্ব্বত্র লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। সে ইহাতেই একমাত্র আনন্দ ও তাহার পরিশ্রমের সার্থকতা বলিয়া মনে করে। সদ্বৈতরাজ ভিষকৃতম মহাজনগণের বজ্র-নিষেধস্বরে উচ্চারিত চেতন বাণী তাহার হৃৎকর্ণরসায়ণ হইবার পরিবর্তে উহা ‘ভূতের নিকট রাম-নামের’ ত্রায় কার্য্যকরী হয়। সে উহা সহ করিতে না পারিয়া ‘যঃ পলায়তি স জীবতি’ পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক চিরতরে সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে।

আমার প্রাণের দোসর চঞ্চল দুনিবার মন আমার অতি বিশ্বস্ত বন্ধুর ত্রায় কাজ করিয়া চলিয়াছে। সে আমার সহায়ক থাকিলে আমি “ধরাকে সরা জ্ঞান” করি। তাহার ত্রায় হিতকারী ইহ-পরকালের বান্ধবী অতি বিরল। কখনও আমি ভুলক্রমে শ্মশানে-মশানে ঘুরিতে ঘুরিতে কৃষ্ণ-রাম-নামের আখড়া মঠ-মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িলে সে অতি সময়ে তথা হইতে আমাকে প্রত্যাবৃত্ত ও প্রকৃতিস্থ করাইয়া আমার পরমাত্মীয়ের ত্রায় কার্য্য করে। তাই আমি তাহার নিকট চিরঋণী। আমার সদগুণাবলীর কথা তাহার সবিশেষ জানা আছে। সে দিন হঠাৎ আমাকে রামনামের বুলি আওড়াইতে স্তনিয়া সে বড়ই মর্ম্ম-বেদনা অনুভব করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমার গুণগানে পঞ্চমুখ হইয়া ওঠে। আমি বন্ধুর সক্রিয় সাহায্যের অভাবে মাঝে মাঝে হীনবল হইয়া পড়িলে সে পুনরায় বিবিধ মুখরোচক বুলির দ্বারা আমার মৃতকল্প শরীরে প্রাণের সঞ্চার করে।

সেদিন তাহার মুখে আমার প্রাচীন গুণাবলীর অতম জিহ্বোদর-লাল্পটের

সর্বশ্রেষ্ঠ ও বহুমুখী প্রশংসা শুনিয়া আমি বাহ-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ি। পরে ভিক্ষু-বন্ধুর পরামর্শক্রমে তাহা হইতে নিস্তার লাভের জন্ত কৃষ্ণ-চন্দ্রের অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করি। সৌভাগ্যক্রমে 'একশচ্চন্দ্রঃ তমো হস্তি ন চ তারাগণৈরপি' মন্ত্র আমি জ্ঞাত ছিলাম। তাই বন্ধুর পরামর্শ দৃঢ়ীকৃত হওয়ায় উহাই উৎকৃষ্ট চরম চিকিৎসা-পত্র বলিয়া বরণ করি। গুরুবারের বার-বেলায় ত্র্যহম্পর্শযোগে দিক্শূল-নক্ষত্রশূলে সম্মুখস্থ যোগিনীকে আশ্রয় করিয়া মধ্য নক্ষত্রে মহাবাত্রা করিলাম। একতারার কথা দূরে থাকুক, তারাগণও যথায় হটিয়া যাইতেছে সেই (কৃষ্ণ)-চন্দ্রের পুরে শরণার্থী হইলাম। আমার নিত্যসঙ্গী মন সহকারীরূপে আমার সঙ্গে চলিল। তাহার সাহায্য ব্যতীত আমি একমুহূর্তও বাঁচিতে পারি না। তথায় যাইয়া নৈলম্বুতা দেবীর উন্মুখ-মোহিনী বৃত্তিতে স্নেহপুষ্ট হইতে লাগিলাম। কিন্তু বন্ধু দুষ্টমনের দুর্নিদেশ পালন করিতে গিয়া কখনও কখনও বিকারগ্রস্ত হইয়া বাহু দশা হারাতে লাগিলাম। পূর্বেই আমার পরিচয় দিবার কালে জানাইয়াছি যে, মনোবদ্য জীব আমি। আমার মন-বন্ধুর 'এই ভাল, এই মন্দ, এইসব ভ্রম' পূর্ণ পরামর্শ লইতে গিয়া আমার প্রাণ এখন ওঠাগত। বিকারগ্রস্ত অবস্থায় কখনও আমি 'হেলনং চ বা' শ্লোক আবৃত্তি করিতেছি, আবার কখনও 'দাঁড়াশ'-সাপের দংশন ভয়ে ভীত হইতেছি, কখনও 'টমটম' গাডীতে চড়িয়া 'করোলি' যাইতেছি, আবার কখনও বা 'শুক্লিতে' রজত ভ্রম' করিয়া তর্কের আবাহন করিতেছি।

আমার একান্ত বান্ধব মনের উপদেশ-নির্দেশক্রমেই এই ছরবস্তা ঘটিয়াছে। তাহারও সেবা-যত্নের ক্রটি নাই। তথাপি বিকার কাটিয়া বাহুদশা লাভের শেষ আশাও বিলীন হইতে চলিয়াছে। গিরিবাণ-দুহিতার অকপট স্নেহ ও কৃপা-কটাক্ষ আমাকে আর সঞ্জীৱিত করিতে পারিল না। আমি তাঁহার যোগমায়া-স্বরূপের আশ্রয়পুষ্ট হইলেও তরিপবিত বৃত্তিই আমাতে রোগের চরম লক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ "পয়ঃ পানং ভুজ্ঞানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্।" খল ভুজ্ঞকে দুগ্ধ-কদলীদ্বারা সম্বন্ধিত করিলে তাহার বিষ দংশনই উপকারীর মৃত্যুর কারণ হয়। যাহার যাহা স্বভাব তাহার পক্ষে উহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব। একই গঙ্গাতীরে অবস্থিত হইয়া ও জলাকর্ষণ করিয়া রসাল ও নিম্ববৃক্ষ স্ব-স্ব-স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। অগত্যা আপন দুর্দ্দেবের বিষয় চিন্তা করিয়া বৈষ্ণবী যোগমায়ার নিকট বিদায়-কালীন প্রার্থনা জানাইলাম।—

“আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে ।
অস্থির হয়েছি পড়ি ভব-ব্যাধি-ঘোরে ॥
এ দাসে জননি ! করি’ অকৈতব দয়া ।
নন্দীপে দেহ স্থান, তুমি প্রৌঢ়ামায়া ॥”

দুর্ভাগা আমি কৃষ্ণচন্দ্রের আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া “পুনর্মুখিকো ভব” বাক্যানুসারে আবার ‘একতারকার’ শরণ গ্রহণ করিলাম। তথায় কৰ্ম্ম-জ্ঞানমার্গীয় ভীমরুল-বরুলী-সদশ ‘বিষকুন্তং পয়োমুখম্’ স্বপ্ননাখ্যদস্তু-স্তাবক-পরিবৃত পুতনার ছায় চিকিৎসকগণের কৃপাকটাক্ষ লাভের দরদী অযাচিত উপদেশ প্রাপ্ত হইলাম। আমি বিপদে পড়িলেই আমার মন-বন্ধুর সাহায্য পাইয়া থাকি। সে আমাকে গভীর ষড়যন্ত্রের বিষয় জানাইয়া সাবধান করিয়া দেওয়ায়, আমি রজস্বমোগুণাশ্রিত আত্মরিক চিকিৎসায় ব্যাধি নিরাময়ের সক্ষম পরিত্যাগ করিলাম। তখন নিগুণ বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গীয় চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আমার আর গতান্তর রহিল না। তজ্জন্তু সকল আশা পরিত্যাগ-পুষ্টক কল্পনাভীত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও একমাত্র অমন্দোদয়া চিকিৎসার উপরেই নির্ভর করিয়া রহিলাম।

ইতোমধ্যে বাহনদেবের বলী-পুরের পরিবর্তে কৃষ্ণপুরে ত্রিপাদ ভূমি যাক্ষার শুভাগমন-বার্তা পাইয়া ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া তথায় যাইয়া তাহার সাক্ষাদ্ দর্শন লাভ করি। তদর্শনফলে ও তৎকৃপা-কটাক্ষে জানিতে পারি যে, কলির রাজধানীতে মাসাধিক কালের জন্ত আ-বর্তৃত সগণ-শ্রীগুরু-গৌরাস্ত্রের সাক্ষাদ্ দর্শন-স্পর্শনেই আমার দুষ্টভব-ব্যাধির আশু উপশম হইবে। তদনুসারে কলির স্থানে মায়াদাসীর এলাকায় গোলোকনাথ গৌর-নারায়ণ ও তৎপ্রিয় মহাভাগবতগণের কিরূপে একত্রাবস্থান সম্ভব, সে-বিষয়ে সন্দিহান ও কৌতূহলাক্রান্ত-হৃদয়ে আমিও তথায় গমনপূর্ব্বক নির্বাক্ দর্শক ও শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করি। ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলাম—

“যথায় (বিষ্ণু) বৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন, সেইস্থানে আনন্দ অশেষ।”

“যাঁহা রাম, তাহা নাহি কাম।

রবি রজনী দোনো নহি মিলে একঠাম ॥”

বিষ্ণু-বৈষ্ণবগণের আবির্ভাবে কলি ও মায়াদাসী লক্ষযোজন দূরে অবস্থান করে এবং এ ক্ষেত্রে তাহা প্রত্যক্ষভাবে অমুভব ও উপলব্ধি করিলাম। শ্রীগুরু-গৌরাস্ত্রের আবির্ভাবে ও পাদস্পর্শে এই কলির স্থান পরম পবিত্র হইল ও

মায়াদাসী তাহার আবরণাল্লিকা-বিস্ফোষক বৃত্তি দ্বয় পরিত্যাগপূর্বক উন্মুক্ত-মোহিনীরূপে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবাকাজ্জা করিয়া অবস্থান করিতেছেন। অদূরে পঞ্চাননদেব পঞ্চমুখে তাঁহার ইষ্টদেবের শ্রীনাম উষর-বাণসহকারে গ্রহণ করিয়া ‘ভোলানাথ’ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন।

কিন্তু এত সব বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেও আমার দুর্দ্দৈব এখনও কাটে নাই। আমার সেই পুরাতন ভবব্যাদিরূপ বাহুদশাবিনুষ্টি ও বিকারের অবসান হয় নাই। ভববৈষ্ণব প্রভু ত্রিবিক্রমের অহৈতুকী রূপারূপ-মহৌষধি লাভে আমার বাহুদশা ও মায়িক বিকার কিছুটা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও যথাযোগ্য কৃষ্ণ-নামৌষধ ও controlled diet মহাপ্রসাদ-পথ্যগ্রহণে অনিয়ম ও অত্যাচারে অবিষ্ঠা-পিত্তরোগের উপসর্গ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। “স্বকর্ম-ফলভুক্ পুমান্,” “বদ্যন্তব্যং ভবতু ভগবন্ মৎপূর্বকর্মাহুরূপম্” বাণী শ্রবণ করিয়া ব্যাধির দুর্ভিসহক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলাম।

কিছুদিন পরে হঠাৎ প্রৌঢ়ায়ায়ার নিকট আমার পূর্ব-বিজ্ঞপ্তির কথা শ্রবণ হওয়ায়, ধামবাসের চলনায় ব্যাধি নিরাময়ের অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিলাম। সুবিধাবাদী স্বার্থাশ্রয়ী আমি—স্বার্থ ব্যতিরেকে এক পা-ও বাড়াই না। তাই মনে মনে ভাবিলাম—“রথ দেখা ও কলা বেচা” ছুই-ই একসঙ্গে চলিবে, ‘শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গা’ও হইবে। একাধারে ধামবাস-মঠবাস-গুরুদর্শনও হইল, আর চিকিৎসার অজুহাতে ‘মহাপ্রসাদসেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়’ বাক্যানুসারে ভাল-মন্দ নিজ রুচিকর দ্রব্যাদি গ্রহণেরও সুবর্ণ সুযোগ-সুবিধা মিলিবে। ভাবিলাম, “অভাগা যে দিকে যায়, সাগর শুকায়ে যায়”—এ বাক্য আমার পক্ষে আদৌ প্রযোজ্য নয়; কারণ আমি অভাগা হইলে জগতে সৌভাগ্যবান্ কে? সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন-বন্ধু আমার সহায় থাকিলে “দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল এই মন্দ এইসব ভ্রম” এই মহাজন বাক্যকে আমি হেলায় উড়াইয়া দেই। আমি নিজেকে যেরূপ ভালভাবে চিনি, অপরে তাহা বুঝিবে কিরূপে? তবে আমার একান্ত বান্ধব আমার স্তূর্ধ্ব পরিচয় না জানিলেও কিছুটা জানে। সে ও আমি যে ভদ্রাভদ্র ভালমন্দের অতীত অর্থাৎ এ দুয়ের কোনটিরই ধার ধারি না এবং ‘ভ্রম ও স্রমে’ লজ্জার মাথা খাইয়াছি, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। “যে যাহা চায়, সে তাহা পায়”—আমারও তাই মওকা মিলিয়াছে।

মঠে আজ বিরাট অনকুট মহোৎসব। এই বিশাল বজ্রে সহস্রাধিক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত! উৎসবে আহুত-অনাহুতের সংখ্যা গুনিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; নামে ‘অনকুট’ হইলে কি হয়, কার্যক্ষেত্রে স্বচক্ষে বাহা দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহাকে ‘Mole hills’ না বলিয়া ‘Mountain ranges’ বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। সেই ভোগ-সামগ্রী-পর্কতমালার বর্ণনা শ্রবণ করিলে, পাঠকবর্গ আমার হ্রায় জিহ্বালম্পট উদরিক না হইলেও, লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ! বিশাল কটাহে পর্কত-চুড়াকারে সজ্জিত চতুর্বিধ অন্ন—শুভ্রান্ন, খেচারান্ন, পরমান্ন, পুষ্পান্ন, রসগোল্লা, পানতোয়া, লুচি, পুরী, লাড্ডু-সন্দেশ, মল্লপূপ, দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন, আচার, বিবিধ ব্যঞ্জন, ফল মূল্যাদি আড়াইশত প্রকার ভোগ-নৈবেদ্য শ্রীবিগ্রহে অর্পিত হইয়াছে। মূল মন্দিরাভ্যন্তরে, জগমোহনের সম্মুখস্থ নিম্ন প্রাঙ্গণেও একদিকে এইরূপ নৈবেদ্য-কুটের বহর, অপরদিকে সহস্রকণ্ঠে দর্শনেচ্ছু ভক্ত-গণের “শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-লক্ষ্মী-বরাহদেবের” জয়গানে দিগন্ত মুখরিত হইতেছে। শ্রীল আচার্য্যদেব তৎপ্রিয় পার্শ্বদগণসহ সুসজ্জিত পুষ্পমাল্য-ভূষিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পাদষ্টম্প-ধন্ত হরিদাসবর্ষ্য গিরিরাজকে পরিক্রমা করিয়া ও প্রণতি জানাইয়া শ্রীবিগ্রহ-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃপাপূর্বক উপস্থিত জনগণকে দর্শনদান করিতে থাকেন। শিল্পীগণ এই বিরাট অনকুট মহোৎসবের বিভিন্ন আলোক-চিত্র গ্রহণে ব্যস্ত হন। প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্তব্য সম্পাদনে রত থাকিয়া তাঁহাদের পারমাথিক স্বকৃতি অর্জন করিতেছেন। কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্য গৃধ্র জরদাব আমি—গোমতীতীরের বদলে গো-ভাগাড়েই নজর আমার! কতক্ষেণে ভোগ সমাপ্তির পরে চর্ক-চোব্য-লোহ-পেয় স্বেচ্ছা মিষ্টান্নাদির আশ্বাদ গ্রহণ করিতে পারিব, সেই চিন্তাই আমাকে আকুল করিয়াছে। বাহা হউক, অনতিকাল মধ্যে সে সুবর্ণ সুযোগ মিলিল। মিষ্টান্নাদি কি খাইব, মিষ্টান্নই আমাকে গিলিয়া বসিয়াছে! সকল ভোগ একটু একটু চাখিতে চাখিতে অবশেষে গলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। “আকণ্ঠ ভোজন করি’ মুখে বল হরি হরি।” ভোজন সুষ্ঠু হইল, কিন্তু ‘হরি’ বলিবার আর সামর্থ্য নাই। এখন আমাকে লইয়া “বোলহরি, হরিবোল” পালা শুরু হইয়াছে। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন—“ও কি খাইয়াছে, ওর রোগই উহাকে গিলিয়াছে।” শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে উদ্বেগ দিয়া অবশেষে গভীর রাত্রে আমার জ্ঞান ফিরিল এবং মৃত্যু-যন্ত্রণার কিছুটা লাঘব হইল। আমার সেই পুরাতন

ব্যাধি, বাহুদশালোপ ও বিকার আদিয়া পুনরায় দেখা দিল। কয়েকদিন পর রোগের সামান্য নিরাময় হইলেই মন-বন্ধুর সহায়তায় মায়াদাসীর ক্রোড়ে পুনরায় আশ্রয় লইলাম। তাহার নিকট হইতেও ভরসা না পাইয়া—

“তবু ভরিল না চিত্ত সর্বস্থান-সার।

তাই ত তোমার স্থানে এসেছি আবার ॥”

বলিয়া উলুকের ছায় ‘একতারার’ অলাবুর বনাদিকারে পুনঃ আত্মগোপন করিলাম।

কুপমণ্ডকের ছায় এইরূপে আমার “জনক-জননীস্নেহেতে ভুলিয়া” বেশ কিছুদিন কাটিল। “আলালের ঘরের দুলাল” সাজিয়া দুধ, দই, ননী, মাখন, ছানা খাইতে লাগিলাম। ‘রাম-কৃষ্ণ-বিষ্ণু’ নাম শুনিতে পারি না, তথাপি নন্দগোয়ালার ছেলে তাঁহার সখাকে “মা ফলেষু কদাচন” বলিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। তখন ভাবিলাম,—বিষ্ণু-কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করাই বায়ুভূত-নিরাশ্রয় অশরীরী ভূত-প্রেতগণের একমাত্র ধর্ম। তাই ফলাসক্তি আমার প্রবল হইল। সপ্তাহে ‘কমলা’কে ‘আপেল’ মেওয়া দেওয়া দূরে থাকুক, নিজেই ফলাকাজ্জ্বল করিয়া তাঁহাকে ‘কদলী’ দেখাইতে লাগিলাম। ফলে দেবী অগন্তুই হইয়া ‘অনিমা’ সিদ্ধি (Animia) দিয়া আমার তেজ হরণ করিলেন। আমার এইরূপ ছরবস্তা লক্ষ্য করিয়া আত্মীয়-স্বজনগণ আমাকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। যাহাতে অণু-পরমাণুতে আমার আশু অস্তিত্ব লোপ না পায়, তজ্জন্তু তাঁহারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন।

এমন সময়ে সিদ্ধস্থান হইতে অন্তর্যামি-স্বত্রে বামনদেবের কৃপাপত্রী লাভের সুযোগ হইল। আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া স্বীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণে প্রয়াসী হইয়া সিদ্ধস্থানে পৌঁছিবার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলাম। এই অদম্য উৎসাহ ও আশা লইয়াই জীব এ জগতে বাঁচিয়া থাকে। আমার শয়তান গুরুর নিকট হইতে এ শিক্ষা আমি পূর্বেই পাইয়াছি—

“Hope springs eternal in the human breast,

Man never is, but always to be blessed.”

কিন্তু এখন শুনিতেছি যে, উহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। “আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশুং পরমং সুখম্,” “হরি বলে দাও তাই আশার মুখে ছাইরে (নিরাশ ত সুখরে)” ইত্যাদি বচনই নাকি যুক্ততর্কের অগোচর খাঁটি সত্যকথা। কিন্তু আমার দুঃসমন ইহা কিছুতেই মানিতে চাখে না। সে আমাকে বায়ু পরিবর্তন

শেষ ভাগে বিশেষভাবে প্রণোদিত করিতেছে। তাই স্বাস্থ্যলাভার্থ আমার মুদ্রাদোষ ও বাতিক আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। কখন টেণে উঠিব, কখন সিদ্ধস্থানের স্বাস্থ্য-নিবাসে পৌঁছিব—এই চিন্তাই আমাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। অগত্যা মায়াদেবীর চাকুরী হইতে কোনমতে মাসখানেকের অবসর লইয়া কলির রাজধানী অতিক্রম করিয়া ক্রম-‘বর্দ্ধমান’ অহুরাগের অধীনস্থ ‘সিদ্ধবাটী’ সিদ্ধগণের ভূমিকায় বাহ্যতঃ প্রবেশের অধিকার পাইলাম। কিন্তু খানে আসিয়াও আমি পূর্বাভ্যাসের কোনটিই ছাড়িতে পারিতেছি না।

যামার মন-বন্ধু এখানেও তাহার অকপট সহায়তাদানে আদৌ কার্পণ্য করে নাই। তাহাতে “গনিময়-মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশুতি ছিদ্রম্” বাক্যের আমি নায়ক হইয়া পড়িয়াছি। সাধক ও সিদ্ধের ভূমিকায় পার্থক্য আমি আদৌ প্রমাণ করিতে সক্ষম হইতেছি না। মাটিয়া বুদ্ধিতে যে, সিদ্ধগণের আচরণ, তাঁদের পীঠস্থানের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাহা আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

পূর্বে আমার বন্ধুবর্গের নিকট এস্থান “প্রস্তরময় অহুরীর অনাবাদী নদীনালাব দেশ” ও “কুলখ-কলাই এর বড়া বা ধোকা-ই এ দেশবাসীর একমাত্র খাদ্য” বলিয়া শুনিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, পশ্চিম বঙ্গের যেকোন স্থানাপেক্ষা এস্থান ব্রীহি-যবাদি, তরী-তরকারী, ফল-ফুলের চাবাবাদে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। বর্তমানে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুর্লভ ও অনায়াসলভ্য। তবে কি আমার একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধুবর্গ সত্যই আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন? না না, তাহা হইতে পারে না। আমার কুটুবুদ্ধির দাপটে আমি বৈষ্ণবগণের মন্তকেও ঘোল ঢালি। তবে এক্ষেত্রে আমার বিপরীত দর্শন হইতেছে কেন? আমার আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছি, সাধুরা ভেঙ্কী ও ভোজবাজী দেখাইয়া লোককে বশ করে। আমার অনেক সময় গৃহস্থের পক্ষেও ছঃসাধ্য ব্যয়বহুল ফল-মূল-মিষ্টাদি খাওয়াইয়া অজ্ঞ সাধারণের নিকট ভাল মানুষ সাজে ও বাহবা ড়াইয়া থাকে। শেষে কি স্বাস্থ্যলাভের পরিবর্তে এই সিদ্ধস্থানে ইহাদের হাতে পড়িয়া আমাকে মাঠে মাঝে পড়িতে হইবে?

সংশয়ে দোহুলায়ান হইয়া বিষমবদনে বসিয়া কত কি ভাবিতেছি! এমন সময়ে একজন সিদ্ধ আসিয়া আশ্বাস দিয়া আমাকে কহিলেন,—“অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধা-নশ্চ সংশয়ায়া বিনশ্চতি।” সাধুগণ আশ্রিতজনকে অবশ্যই রক্ষা করিয়া কেন, তাঁহারা নিম্নসর পারমহংস ধর্ম্মাশ্রিত। অনাদিকাল-বদ্ধ-জীবের

অবিজ্ঞা দূরীভূত করাইয়া তাহাদিগকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করানোই সাধু-
অহৈতুকী দয়ার পরিচয়। অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও সংশয়ান্বীত জীব তাহা বুঝে
না পারিয়া ইহ-পরকালের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয়ে উদাসীন। আদৌ
গুরুপদাশ্রয়ে কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণ এবং বিশ্রুতভাবে গুরুসেবা ও সাধু-প-
অনুবর্তনেই তাহা লাভ করা যায়। তুমি গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া
মাত্র; পরবর্তী কর্তব্যগুলি পালনে বিরত থাকায় তোমার আজ এই দুর্দশা
এতকাল তোমার ছুটমন তোমাকে যে নির্দেশ দিয়াছে, তাহাতে তুমি বঞ্চিতই
হইয়াছ। ধামকে গ্রাম মনে করিয়াছ, সাধুর সাধুত্বে সন্দিহান হইয়াছ।
হরি-গুরু-বৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধির আবাহন করিয়াছ; এক কথায় অপ্রাকৃত-
প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া তুমি নরকগামী হইতে চলিয়াছ। পরদুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণব
মহাজনগণই এই দুর্দৈব মোচনে সক্ষম ও তোমার একমাত্র রক্ষাকর্তা।
তাহারাই এই সংসার-কারাগারে তোমার আপন জন—পরম-বান্ধব।
তাহাদের অহৈতুকী কৃপাবলে তোমার ভব-ব্যাধি-নাশ হইয়া আত্ম-স্বাস্থ্য
নিত্য-শান্তিলাভ হইবে। নিরাপরাধে শ্রী নাম গ্রহণই তোমার ঔষধ ও ইমহা-
প্রসাদ সেবনেই তোমার পথের ব্যবস্থা দেওয়া হইল।

দেহারামী হইয়া গণগডালিকার শ্রোতে গা ভাসাইওনা, বাস্তব সত্যের
সন্ধান তাহারা কখনই দিতে পারিবে না। তোমার বহুকালপুষ্ট প্রাচীন
অভ্যাস উষাপান, Vitaminযুক্ত Rich food গ্রহণ-প্রচেষ্টা পরিত্যাগ
কর। তবেই অগ্নিাদি অষ্টাদশ সিদ্ধির কথায় অতিক্রমে সক্ষম হইবে।
মনোধর্মী না হইয়া আত্মস্থ হইবার চেষ্টা কর। শ্রীগুরুর নিকট সেবাফলে ও
তৎকৃপাবলে এ সকলই তোমার লাভ হইবে।”

সিদ্ধ মহাভনগণের উপদেশক্রমে আমি এখন পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করিয়াছি ও
আমার সমুদ্রিক উদয় হইয়াছে। কামাদিরিপুগণের কতই না ছুট আদেশ
আমি পালন করিয়াছি কিন্তু সেই সকল প্রভুর আমার প্রতি আদৌ দয়া
হয় নাই, হতভাগ্য আমারও লজ্জা নাই! হে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবন্! সম্প্রতি
আপনার এদাসাধমকে কৃপাপূর্ণক শ্রীচরণে স্থান প্রদান করুন। মুক্তকণ্ঠে
আমি যেন বলিতে পারি—

“বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।

সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে ॥”

“মারবি রাখবি যে ইচ্ছা তৌহার।

নিত্যদাস প্রতি তুষা অধিকারী ॥”

“আমি ত পতিত, পতিত পাবন, তোমার পবিত্র নাম।

সে সন্থক ধরি, তোমার চরণে, শরণ লইছ হাম ॥”

“তব ভক্তজন সঙ্গ অনুক্ষণ, কবে বা হইবে হরি।

শ্রীগুরু-আশ্রয়ে ডাকিব তোমায় কবে বা মিনতি করি ॥”

—জনৈক দেহারামী ভবরোগী